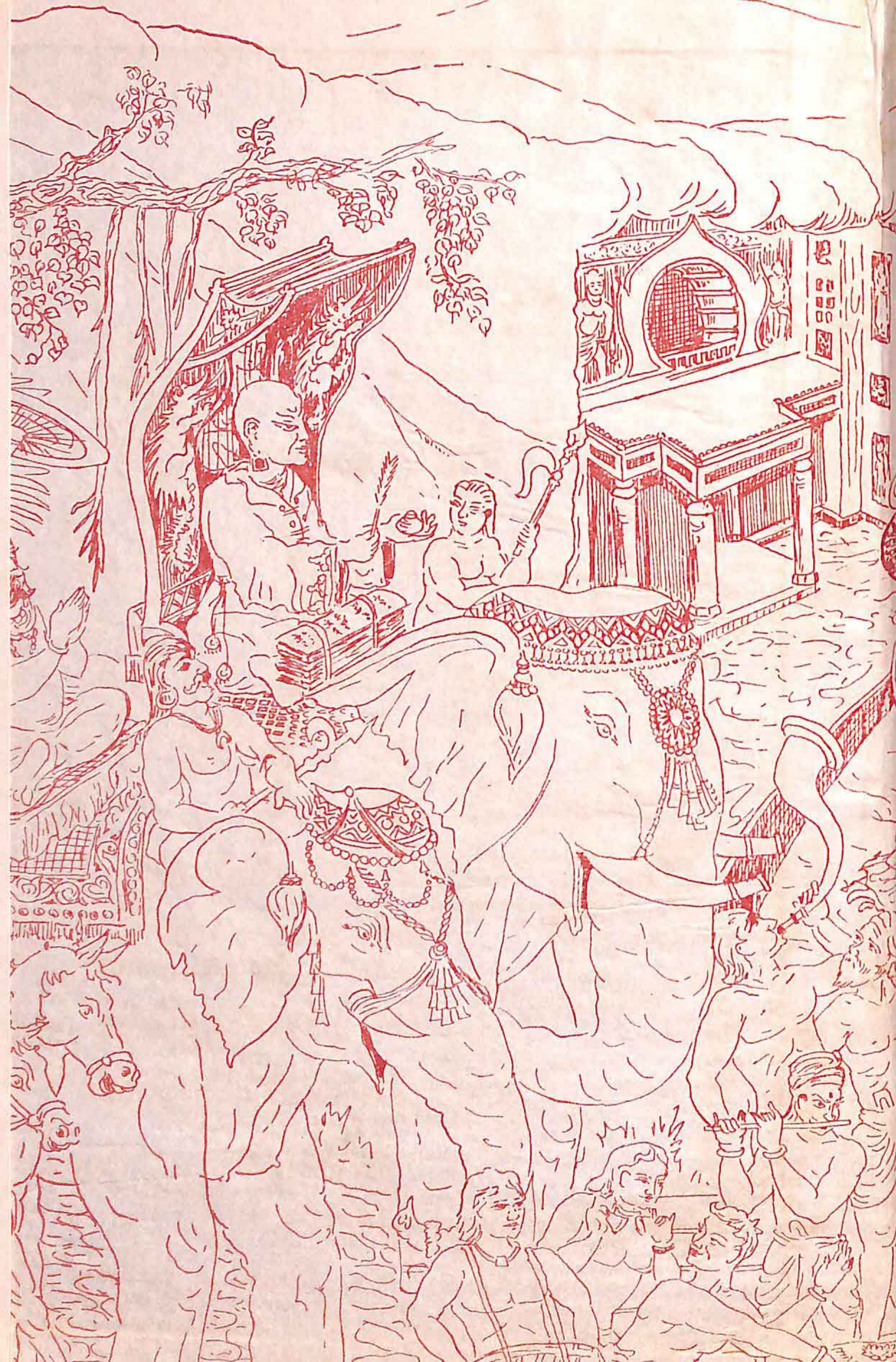
নারায়ণ সান্যাল



অজন্তা অপরূপা




17.4.84

অজন্তা অপরূপা

[রবীন্দ্র পুরস্কারধন্য (১৩৭৫) 'অপরূপা অজন্তা'-র
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপান্তর]

নারায়ণ সান্যাল

ভারতী

ভারতী বুক স্টল
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

রূপান্তরিত প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৮৩
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন, ১৩৮৬
মার্চ, ১৯৮০
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক, ১৩৯০
অক্টোবর, ১৯৮৩
পঞ্চম মুদ্রণ ঃ পৌষ, ১৩৯৫
জানুয়ারী, ১৯৮৯

এই গ্রন্থের রচনাকাল : ১৯৬৫—১৯৭৫

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার বারিক
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীতপনকুমার বারিক
অজন্তা প্রিন্টার্স, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : রেখা—নারায়ণ সান্যাল
রঙ—শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ দত্ত
মুদ্রক—প্রিন্টিং আর্ট
কলিকাতা-৯

তুলি যাঁর 'দীপণ' সেই
শিল্পী শ্রীইন্দ্র দুগাড়কে

কৈফিয়ৎ

অজন্তা দেখে এসে **'অপরূপা অজন্তা'** রচনা করতে আমার তিন বছর সময় লেগেছিল। আমি অজন্তা দর্শন করি ১৯৬৫-তে এবং 'অপরূপা অজন্তা'র প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮-তে। সে-গ্রন্থের ভূমিকায় আমি কৈফিয়তে বলেছিলাম, "দেবদূতেরাও যেখানে সন্তর্পণ পদসঞ্চারে সংকুচিত, সেখানে কেন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছি, তার কৈফিয়ৎ দিতে বসে প্রথমে সেই দেবদূতদেরই কৈফিয়ৎ দাবি করার ইচ্ছে জাগছে। পৃথিবী যদি আজ ভারতবর্ষকে জিজ্ঞাসা করে তোমার ওখানে কোন্ স্থাপত্যকীর্তি দেখতে যাব? তাহলে ভারতবর্ষ জবাবে বলবে—অজন্তা-ইলোরা, কোণারক আর তাজমহল। পৃথিবী তাই দেখতে আজও ভারতবর্ষে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সেই অজন্তাকে দেখাবার, বোঝাবার কোন আয়োজন আমরা করিনি। অজন্তায় প্রতি বছর লক্ষাধিক দর্শক আসেন, অজন্তার নামে সরকার লক্ষাধিক মুদ্রা প্রতি বছর ব্যয় করেন, তবু অজন্তা বিষয়ে প্রকৃত গাইড-বই এখনও ছাপা হয়নি। প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে প্রকাশিত ডক্টর ইয়াজদানির যে গ্রন্থটিকে অজন্তা-বিষয়ে শেষ প্রামাণিক গ্রন্থ বলতে পারি, তা দীর্ঘদিন ছাপা নেই ; তার মূল্যও সহস্রাধিক রজতখণ্ড। ভুল তথ্যে-ভরা কিছু নিম্নমানের পুস্তিকামাত্র অজন্তার কাছে-পিঠে পাওয়া যায়। ইউনেস্কোর এ্যালবামে অথবা আকাদেমী-প্রকাশিত চিত্র-সম্ভারে ভালো-ভালো ছবি আছে ; কিন্তু তাদের কোন পরিচয় নেই। জাতক-কাহিনীগুলির সঙ্গে ঐ চিত্রগুলির কী সম্বন্ধ, কোথায় তাদের অবস্থিতি, তা উপলব্ধি করা যায় না। ডাব-না-করা ফেলিনি বা বেয়ারিম্যানের চলচ্চিত্র দেখে আপনি-আমি যতটা রস গ্রহণ করতে পারি, পৃথিবী আজ ডলার-রুবল্-ফ্রাঁ-স্টার্লিনের বিনিময়ে শুধু ততটাই রস আহরণ করে নিয়ে যায়।"

প্রথম প্রকাশিত 'অপরূপা-অজন্তা'র একটি কপি ঘটনাচক্রে আমাদের জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমারের হাতে পড়ে। ঠিক জানি না, বোধকরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র-পুরস্কার কমিটি'ই তাঁকে সেই কপিটি পাঠিয়েছিলেন। যাই হোক, বইটি পড়ে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমার গ্রন্থটির সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আমার সে বিচিত্র ও দুর্লভ অভিজ্ঞতার বিবরণ আমার সম্প্রতি প্রকাশিত স্মৃতিচারণ-গ্রন্থ—"পঞ্চাশোর্ধ্বে"তে সবিস্তারে দিয়েছি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁর নির্দেশ ও উপদেশ অনুসারে গ্রন্থটি আমি পুনর্লিখন করতে শুরু করি ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দেই। সে কাজ সম্পন্ন হতে দীর্ঘ সাত-আট বছর লাগল। যে-সব চিত্র অজন্তা-প্রাচীরে বর্তমানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে প্রথম প্রকাশকালে সেগুলি আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিহার করে গিয়েছিলাম। আচার্য সুনীতিকুমার আমাকে নির্দেশ দেন—প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অবলম্বনে সেগুলির অনুলিপি করতে এবং তাদের শৈল্পিক মূল্যায়ন করতে। এ-জন্য প্রথম প্রকাশকালে যেখানে চিত্র সংখ্যা ছিল ৬২ বর্তমানে সেখানে চিত্র-সংখ্যা দ্বিগুণ—১২১। তাঁরই নির্দেশে অজন্তা স্থাপত্যের বিবর্তন, অজন্তা চিত্রের ব্যাকরণ, বিন্যাস, মর্মোদ্ঘাটন, অথবা এশীয়-শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে অজন্তা—প্রভৃতি নূতন পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছি। ফলে গ্রন্থের কলেবরও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। পরিমার্জন ও পরিবর্তনের অনুসঙ্গ হিসাবে অনেক নূতন তথ্যও সংযোজিত হয়েছে। তাই এটিকে একটি নূতন গ্রন্থ বলা যায়। তবু ক্রেতা-পাঠক যাতে বিভ্রান্ত না হন, তাই নামকরণে শুধু বিশেষ্য-বিশেষণের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমেই এর নাম-রূপের পরিচয় সীমাবদ্ধ রেখেছি।

এ-গ্রন্থে আঁকা ছবি সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ আছে। সে-কথা ইতিপূর্বেও বলেছিলাম, "আমার সবচেয়ে সঙ্কোচ, সবচেয়ে আপ্‌সোস চিত্রগুলির যথার্থ অনুকরণের ব্যর্থতায়। অসিত হালদার, নন্দলাল, ডরোথি লার্চার, প্রভৃতির আঁকা ছবির পাশাপাশি আমার স্কেচ-

গুলিকে দেখে বারে বারে মনে দ্বিধা জেগেছে—এগুলির ব্লক আদৌ করানো উচিত কিনা। প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে ফটো নিয়ে ব্লক করানো প্রায় অসম্ভব, কোন প্রকৃত অধিকারী, চিত্র-শিল্পীকে দিয়ে এগুলি অনুকৃতি করালে গ্রন্থের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। তাই সবিনয়ে নিবেদন করব, আমার আঁকা ছবিগুলিকে পাঠক যেন শুধু নির্দেশক-চিত্র বা 'ইন্ডিকেটরি-স্কেচ'-রূপেই গ্রহণ করেন। মূলের নাগাল না পেলে অন্ততঃ গ্রিফিথ, হ্যারিংহ্যাম, ইয়াজদানি অথবা ইউনেস্কো এ্যালবামে খুঁজে নেবার জন্যেই যেন আমার স্কেচগুলিকে কাজে লাগানো হয়। আমার আঁকা ছবি দেখে মূলচিত্রের বিচার করতে বসলে অজন্তার তো বটেই, আমার উপরেও অবিচার করা হবে।"

প্রচ্ছদ-পটে শিল্পী শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ দত্ত যে বহু-রঙা চিত্রটি এ'কেছেন বাস্তবে তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। তার একটি লাইন ডায়াগ্রাম শুধু পাওয়া যায়। অজন্তার ঢঙে আমরা সেই অবলুপ্ত চিত্রটিকে রঙে ও রেখায় ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি মাত্র। আসলে কোথায় কী রঙ ছিল জানার উপায় নেই।

প্রকাশক শ্রীহৃষীকেশ বারিক এবং তাঁর পুত্র শ্রীমান তপন যেভাবে যত্ন নিয়ে গ্রন্থটি ছেপেছেন তাতে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু তাহলে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা গল্পের আকারে শোনাতে হয় :

এই বইটি রচনার জন্য ইয়াজদানির আট-খণ্ডে প্রকাশিত (চার খণ্ড বিবরণ, চার খণ্ড চিত্রসম্ভার) গ্রন্থটি অপরিহার্য ছিল। জাতীয় গ্রন্থাগারে সেগুলির নাগাল পেয়েছিলাম, কিন্তু সে বই বাড়িতে আনার হুকুম নেই। এদিকে আমিও দশটা-পাঁচটার কর্মশৃঙ্খলে বন্দী—রাতটুকুই ভরসা। ফলে, জুৎ হল না। অনেক অনুসন্ধানের পর কলেজ স্ট্রীটের একজন পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক বইগুলির সন্ধান দিলেন এবং দাম চাইলেন ষোলশ' টাকা। তা আমার ক্ষমতার বাইরে। তাঁকে আমার সমস্যার কথা বলে অনুরোধ করলাম, 'আমি ষোলশ' টাকা জমা রেখে বইগুলি নিয়ে যাচ্ছি এবং চার মাস পরে বইগুলি ফেরত দেব। আপনি চারশ' টাকা কেটে রেখে আমাকে বারোশ' টাকা ফেবত দেবেন।' তিনি রাজী হলেন না, বললেন 'আমি বই বিক্রি করি, ভাড়া খাটাই না।' আমার উদ্দেশ্য ও অসহায়ত্বের কথা সবিনয়ে শুনিয়েও তাঁকে নরম করতে পারলাম না। ঐ ঘটনার মাস কতক পরে 'এ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস্' ভবনে কথা প্রসঙ্গে লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়কে আমার অভিজ্ঞতার কথা জানাই। সখেদে বলি, 'দেখন, সে-ভদ্রলোক পুস্তক ব্যবসায়ী, এ-দেশে গবেষণামূলক গ্রন্থ-রচনা যে কঠিন, তা তিনি নিশ্চয়ই বোঝেন, তবু আমার প্রস্তাবে তিনি কর্ণপাত করলেন না।' লেডী মুখার্জি সহানুভূতি জানিয়ে শুধু সংক্ষেপে বলেছিলেন, 'উপায় কি বলুন?'

তার দিন কতক পরে। চাকরটা এসে বললে, আমার বাড়ির সামনে নাকি একটা প্রকাণ্ড গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, এবং একজন ভদ্রমহিলা আমার খোঁজ করছেন। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখি তিনিই। বললেন, 'এই নিন আপনার বই। তাড়াহুড়া নেই। এ আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের। কাজ শেষ হলে ফেরত দেবেন।'

তাঁর ন্যুব্জপৃষ্ঠ ড্রাইভার ততক্ষণে আট খণ্ড বইয়ের ভারে 'গুজ্ স্টেপে' ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

গল্পটি পরিবেশনের পরে কৃতজ্ঞতাসূচক কোনও ফালতু কথা লিখলে হয়তো সৌজন্যের মর্যাদা রক্ষিত হয়,—কিন্তু গল্পটির 'রসাভাস' ঘটে। তাই গল্পের ক্লাইম্যাক্সেই পূর্ণচ্ছেদ টানতে হল।

নারায়ণ সান্যাল।
২/৯/৭৬

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

অজন্তা-পরিচয়

ঊনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের একটি মধ্যদিন।

বাসটা আমাকে অজন্তা-গুহামুখের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তার গন্তব্য পথে। সে বাস থেকে নামলুম আমি একাই। বাঁ-বগলে বাগিয়ে ধরেছি বেডিংটা, ডান হাতে স্যুটকেস। কয়েকদিন থাকতে হবে এখানে। হঠাৎ স্থির করেছি সেটা—রিসার্ভেশান করানো নেই কোথাও।

গুহা-মন্দিরের দরজা খোলে সকাল ন'টায়, বন্ধ হয় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। লক্ষ্য করে দেখি, ইতিপূর্বেই খান চার-পাঁচ মোটরগাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ আমার আগেই অনেকে এসেছেন আজ। কিন্তু ও'রা হচ্ছেন দৈনিক-যাত্রী। এসেছেন সকালে ফিরে যাবেন সন্ধ্যায়। আমার তা নয়। প্রথমেই মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে আমাকে। জলগাঁওয়ে টুরিস্ট অফিসেই খোঁজ পেয়েছি যে, এখানে একটি টুরিস্ট-লজ সদ্যঃসমাপ্ত। ফলে স্থানাভাব হবে না। তাছাড়া গুহামুখ থেকে মাইল তিনেক দূরে ফর্দাপুরে ডাকবাঙলো বা রেস্ট-হাউস আছে। কিন্তু সে-সব জায়গায় থাকতে হলে আগেভাগে লিখিত অনুমতি আনাতে হয়। আমার তা নেই। বাসটা যেখানে দাঁড়ালো, সেখানে দেখি চমৎকার একটি দ্বিতল বাড়ী। শুনলাম, এটাই নবনির্মিত টুরিস্ট-লজ। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য আমার—শোনা গেল, সরকারী খাতায় বাড়ীটি এখনও বাসোপযোগী বলে নির্দিষ্ট হয় নি। অর্থাৎ বাস্তবে শেষ হলেও যাত্রীদের কি হারে ভাড়া দেওয়া হবে তার হিসাব এখনও কষে বার করা হয় নি। সদ্যঃসমাপ্ত টুরিস্ট-লজের ভারপ্রাপ্ত ওভারসিয়ারবাবু মাথা নেড়ে হিন্দীতে বললেন—আপনাকে এখানে থাকতে দিতে পারছি না বলে আন্তরিক দুঃখিত। তাছাড়া কি জানেন, সেপটিক্-ট্যাঙ্কের সঙ্গে স্যানিটারী প্রিভির কনেক্‌শন পাইপটা...,

আমি বাধা দিয়ে বলি—সেজন্য কি, চারদিকেই তো ফাঁকা মাঠ।

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে ওভারসিয়ারবাবু বলেন—মাফ্ কিজিয়ে সা'ব। বহ্ নেহী হো সক্‌তা। যবতক এঞ্জিনিয়ার সা'ব হুকুম নেহী দেতে—তারপর একটু হেসে বলেন : আপ্ নেহী জানতে সা'ব,—পি. ডাবলু. কি কানুন বহুৎ কড়া হ্যায়!

আমার মুখ দিয়ে আচমকা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা বেরিয়ে গেল—মায়ের কাছে মাসীর গপ্পো আর নাই ঝাড়লে ভাই!

ওভারসিয়ারবাবু বলেন—ক্যা বোল্‌তে হেঁ?

আমি হেঁ হেঁ করে সামলে নিই নিজেকে। হিন্দীতে প্রশ্ন করি, বন-বিভাগের ডাক-বাঙলোতে থাকা যাবে?

: যেতে পারে। চেষ্টা করে দেখুন। বন-বিভাগের অফিসারদের অগ্রাধিকার আছে। ঔরঙ্গাবাদের ডি. এফ. ও পাঠে-সাহেবের রিসার্ভেশান ছাড়া,...তবে হ্যাঁ, ঘর খালি থাকলে চৌকিদার আপনাকে বিমুখ নাও করতে পরে।

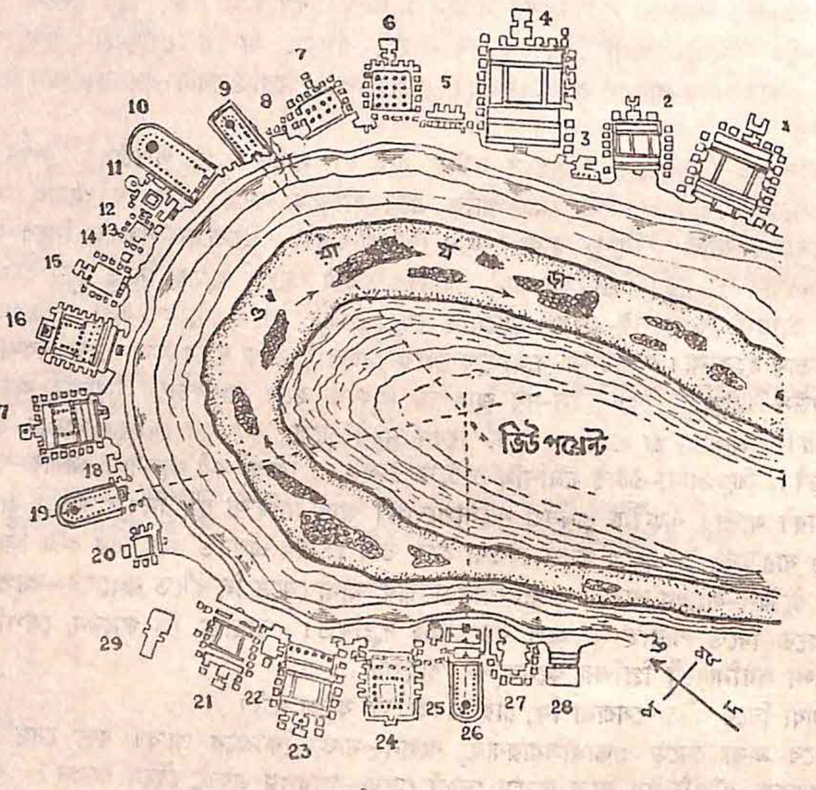
অগত্যা একটি লোকের মাথায় স্যুটকেস বিছানা চাপিয়ে সেদিক পানেই রওনা দিই। বন-বিভাগের ডাকবাঙলোটি বাঁকের মুখে। সুন্দর ছিমছাম। প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে গেলুম। যেমন করেই হোক এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। একটু হাঁকাহাঁকি করতেই চৌকিদার মহাপ্রভু বেরিয়ে এলেন। স্থির করলুম, এবার আর ভুল করব না। প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে অসি চালনা করতে হবে। টুরিস্ট-লজের ওভারসিয়ারবাবুর

সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক ডুয়েল লড়তে গিয়েই বেকায়দায় পড়েছিলুম। এবার হার মানে আক্ষরিক অর্থে পথে বসা! চৌকিদার বেরিয়ে আসতেই হিন্দীতে বলি—কোন্ ঘর রিসার্ভেশান হয়েছে আমার জন্য?

চৌকিদার একটু হতচকিত। সামলে নিয়ে বলে : আপ্ কাঁহাসে আতে হেঁ সা'ব?

জবাবে খেঁকিয়ে উঠি : কেন, পাঠে-সাহেবের চিঠি পাও নি?

পাঠে-সাহেবের নামোল্লেখেই অর্ধেক কাজ হয়। চৌকিদার এবার আমাকে একটি সেলাম করে বললে—জী নেহী সা'ব।



চিত্র—১

আমি কণ্ঠস্বর একেবারে সপ্তমে তুলে গালাগাল করতে শুরু করি। কড়া-মেজাজী বন-বিভাগের একজন হোমরা-চোমরা অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে আমাকে। সরকারী ডাক-বিভাগ থেকে শুরু করে মায় আমার ভাগ্যকে গাল পাড়তে থাকি এক নাগাড়ে। আমি আক্রমণাত্মক খেলা শুরু করতেই দেখি চৌকিদার বাবাজীবন আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলতে আরম্ভ করেছে। পাগড়ির প্রান্তভাগে মুখটা মুছে নিয়ে বলে—আপনি নারাজ হচ্ছেন কেন সা'ব? ঘর তো চারটেই খালি পড়ে আছে। যেটা ইচ্ছে দখল করুন না।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে আমার। বলি—চা খাওয়াতে পার?

: আভি লাতা হুঁ সা'ব!

চৌকিদারটি লোক ভাল। শুধু চা নয়, বিস্কুটও খাওয়াল। মধ্যাহ্নে কি খাব জেনে নিয়ে বললে রাত্রে ওকে কিন্তু ছুটি দিতে হবে। নিজেই ব্যক্ত করে কারণটা। চৌকিদার স্থানীয় লোক। মাইল তিনেক দূরে ফর্দাপুরে ওর বাড়ী। ওর স্ত্রী গ্রামে আছে। আসন্নপ্রসবা। আজ সকালেই খবর এসেছে—রাতে ওকে বাড়ী যেতে হবে। এক কথায় রাজী হয়ে যাই।

চা-পর্ব শেষ হতেই বেলা ন'টা বাজল। স্কেচ-বই, নোট-বই ইত্যাদি ঝোলা ব্যাগে ভরে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি গুহা-মন্দিরের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে আধ মাইলও হবে না। বাগোড়া নদীটি এখানে অশ্বখুরের আকারে মস্ত একটি বাঁক নিয়েছে। দু-পাশেই দেড়-দুশ' ফুট উঁচু পাহাড়। এর নাম ইন্দ্রাদ্রি পর্বতমালা। এই পর্বতমালার একদিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। অন্যদিকে তাপ্তী নদীর উপত্যকা। বাগোড়া নদীটি এই পাহাড়ের বুক চিরে ছুটে গেছে গভীর খাদের মধ্য দিয়ে পথ কেটে। পর পর সাতটি জল-প্রপাতের পথে নেমে এসেছে সমতলে। তার শেষ ধারাটি যেখানে আধখানা চাঁদের মত বাঁক নিয়েছে সেখানেই অজন্তা-গুহা।

চিত্র—১-এ অজন্তার একটি প্ল্যান এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে টুরিস্ট-লজটি দেখানো হয়েছে ঐটিই সদ্যঃসমাপ্ত যাত্রিনিবাস। চক্রযান ঐ পর্যন্ত আসে জলগাঁও থেকে। সেখান থেকেই শুরু হয়েছে সোপান। ঐ সোপান বেয়ে উঠে আসতে হবে গুহামুখের সমতলে যে পথটি আছে তার কাছে। গুহামুখগুলিকে যুক্ত করে ঐ পথটি নদীর বাঁক অনুসারে ঘুরে গেছে পূব থেকে পশ্চিমে। প্ল্যানের উপর থেকে দেখছি বলে বুঝতে পারছি না যে, রাস্তাটি বাগোড়া নদীর জলতল থেকে অনেক উপরে আছে। প্ল্যানে দেখুন, সর্বসমেত ২৯টি গুহা-মন্দির দেখা যাচ্ছে। বস্তুতঃ এখানে আরও কয়েকটি গুহা আছে, যা প্ল্যানে দেখানো যায় নি। সর্বসমেত গুহার সংখ্যা ৩০টি।

সোপান-শ্রেণী বেয়ে ধাপে ধাপে উঠে এলুম গুহার সমতলবর্তী ঐ পথটিতে।

প্রথম গুহার পাশে অফিসঘর। বিশ পয়সা দিয়ে এখানে টিকিট কিনতে হল। প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ মন্দিরে অন্ধকার গুহার ভিতরে আছে অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্র-সম্ভার। এই চারটি মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে যাত্রীদের ছবিগুলি ভাল করে দেখাবার ব্যবস্থা আছে। সেজন্য পাঁচ টাকা দিয়ে একটি পৃথক টিকিট কিনে নিলুম।

অফিসঘর ছেড়ে দু'পা এগিয়ে যেতেই সমস্ত অজন্তা উপত্যকা মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমার দৃষ্টির সম্মুখে। ঠিক এই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে শিল্পী মুকুল দে তাঁর প্রথম অজন্তা দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছিলেন—

> বাঁকের মুখে গুহা মন্দিরগুলি সর্বপ্রথম দেখে আমার মনে কী প্রচণ্ড আলোড়ন হয়েছিল তা আমার পাঠককে বোঝাতে পারব না। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে গেলুম। ধ্যানস্তিমিত মহামৌন পর্বত যেন তার দুই প্রসারিত বাহু দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। আমি এবং আমার সহযাত্রী দীর্ঘ সময় এখানে নির্বাক দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হল দীর্ঘ পথযাত্রার যা কিছু ক্লান্তি, যা কিছু গ্লানি সব যেন ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল। আমি পরমপ্রাপ্তি লাভ করলুম মন্দির প্রবেশ করার পূর্বেই।

ছেলেবেলায় রূপকথায় পড়েছি সোনার কাঠির ছোঁওয়া পেয়ে শতাব্দীর নিদ্রা ভেঙে রাজকুমারী চোখ মেলে চেয়েছিলেন। অজন্তা যেন সেই রূপকথার রাজকুমারী। সহস্রাব্দীর নিদ্রা-অন্তে সভ্যজগতের দিকে চোখ মেলে হঠাৎ সে তাকিয়েছিল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময় একদল ইংরাজ সৈন্য অজন্তা পাহাড়ের অপর দিকে শিবির সংস্থাপন করেছিল। হঠাৎ কয়েকজন লক্ষ্য করে দেখে নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি খিলান আর স্তম্ভ। দুঃসাহসী কয়েকজন সেই খাড়া পাহাড় বেয়ে নামল নদীতে। লতাগুল্ম আঁকড়ে আবার উঠল ওদিকের পাহাড়ে—ঐ গুহাগুলির সমতলে। বন্যজন্তু আর বাদুড়ের আস্তানায় দীর্ঘ দিন পরে আবার পড়ল মানুষের পদচিহ্ন। ওরা স্তম্ভিত হয়ে গেল!

কিছুদিন পরে পল্টনের দল ফিরে এল লোকালয়ে। তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। গুরুত্ব দেয় না কেউ। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যাপারটা যাচাই করতে বেরিয়ে পড়েন। সেনাবাহিনীর লোকদের কাছ থেকে তাঁরা পথের মোটামুটি নির্দেশও পেয়েছিলেন। হায়দরাবাদ রাজ্যের খান্দেশ জেলায় ইন্দ্রাদ্রি পর্বতমালায় একটি ঘাট বা উপত্যকা আছে। এই ইন্দ্রাদ্রি পর্বতের এপারে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, ওপারে তাপ্তী নদীর অববাহিকা। বাগোড়া নামক নদী এই পাহাড়ের মাঝখানে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। এই

বাগোড়াই সাতকুণ্ডু জলপ্রপাতের কাছাকাছি একটি অশ্বখুরাকৃতি বাঁক নিয়েছে। সেখানেই নাকি এই গুহাগুলির অবস্থান।

অনেক খুঁজে খুঁজে বিদ্যোৎসাহীর দল অবশেষে এসে পৌঁছালেন অজন্তা-গুহায়। লোকালয়ে ফিরে গিয়ে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন। সেটা হল ১৮২৯ খৃীষ্টাব্দ, অর্থাৎ অজন্তা পুনরাবিষ্কারের এক যুগ পরে। কিন্তু তবু কলারসিক মহলে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সাড়া জাগল না। কাটল আরও প্রায় দশ বছর। তারপর জেমস্ ফার্গুসনের নজরে পড়লো এই প্রবন্ধটি। ফার্গুসন ছিলেন সত্যিকারের পণ্ডিত ও কলারসিক। তাঁর উৎসাহও ছিল প্রচণ্ড ; বিশেষ করে ভারতীয় স্থপতির বিষয়ে। শুধু স্থপতিই বা কেন, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়েই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়। এসব বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ আজও প্রামাণ্য। এতবড় পণ্ডিত যখন স্বয়ং এই গুহাগুলি দেখে এসে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রবন্ধ লিখলেন, তখন অন্ধের পক্ষেও আর চোখ বুজে থাকা সম্ভবপর হল না। তাঁর প্রবন্ধটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ খৃীষ্টাব্দে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারদের এবার টনক নড়লো। তাঁরা মাদ্রাজ পল্টনের সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রবার্ট গিলকে পাঠালেন চিত্র-গুলির অনুলিপি তৈরি করার কাজে। মেজর গিল দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে অজন্তায় কাজ করেছিলেন। কী প্রচণ্ড অধ্যবসায় ছিল তাঁর তা কল্পনা করলে স্তম্ভিত হতে হয়! তিনি বস্তুতঃ একাই কাজ করেছিলেন সেখানে, এবং এই দীর্ঘ সময়ে ত্রিশটির ওপর বৃহদায়তন তেল-রঙের ছবি এঁকে শেষ করেন। এগুলি ক্রমে ক্রমে বিলাতে পাঠানোর ব্যবস্থা হল। কিন্তু কী আপসোসের কথা, ১৮৬৬ খৃীষ্টাব্দে সিডেনহ্যামের ক্রিস্ট্যাল প্যালেসে একটি প্রদর্শনীতে মাত্র পাঁচটি পট ছাড়া বাকি পঁচিশখানি ছবি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এমন সর্বনাশা আগুন কেমন করে লাগল জানি না, শুধু এটুকু জানি যে, সে ক্ষতি অপূরণীয়। তার কারণ মেজর গিল যখন অজন্তা-গুহাতে চিত্রগুলি দেখেছিলেন, তখন সেগুলি ছিল প্রায় অক্ষতই। আজকাল আমরা যে ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত প্রাচীর-চিত্রগুলি অজন্তায় গিয়ে দেখতে পাই, তার অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গত দেড়শ' বছরে। তাছাড়া মেজর গিল এমন কয়েকটি চিত্রের অনুলিপি করেছিলেন যেগুলি আজ বাস্তবে একেবারে অবলুপ্ত। যাই হোক, অবশিষ্ট পাঁচখানি ছবি কেনসিংটন সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত করা হয়। শুনেছি, সেখানে ভারতীয় শাখায় এগুলি আজও সযত্নে রাখা আছে।

সে যাই হোক, মেজর গিলের পর এখানে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি হচ্ছেন বোম্বাইয়ের শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জর্জ গ্রিফিথ। এজন্যও ফার্গুসন সাহেবের কাছে আমরা ঋণী ; কারণ, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মেজর গিলের ছবিগুলি পুড়ে যাওয়ার পর স্যার জেমস্ ফার্গুসন ও ডাঃ বার্জেস ভারত সরকারকে এ নিয়ে পুনরায় গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য পীড়া-পীড়ি করেন। তাঁদের উৎসাহেই সরকার এজন্য টাকা অনুমোদন করেন এবং অধ্যক্ষ গ্রিফিথ তাঁর বিদ্যালয়ের কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রকে নিয়ে ১৮৭৫ খৃীষ্টাব্দে পুনরায় কাজ শুরু করেন। প্রায় দশ বছর পরে (এর ভিতর বছর তিনেক অবশ্য কাজ বন্ধ ছিল) তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফলশ্রুতি দেখতে পাওয়া গেল ১৮৮৫ খৃীষ্টাব্দে। ছাত্রদের আঁকা এই ছবিগুলি নিয়ে গ্রিফিথ ফিরে এলেন সভ্যজগতে। সর্বসমেত চিত্রের সংখ্যা ৩৩৫। গ্রিফিথ সাহেবের হিসাব অনুযায়ী দেখছি তিনি আঁকিয়েছিলেন :

গুহা ১—১৭৭ টি	গুহা ১০—১৮ টি	গুহা ১৯—১ টি
" ২— ৫০ "	" ১১— ১ "	" ২১—২ "
" ৬— ৫ "	" ১৬—১৮ "	" ২২—১ "
" ৯— ১১ "	" ১৭—৫১ "	মোট—৩৩৫ টি

মহানন্দে অধ্যক্ষ গ্রিফিথ এই অমূল্য চিত্রসম্ভার পাঠিয়ে দিলেন বিলেতে। পশ্চিম জগৎ দেখুক এবার অজন্তার স্বরূপ! সাউথ কেনসিংটন সংগ্রহশালায় অতি যত্নে নিয়ে যাওয়া হল সেগুলিকে।

কিন্তু ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! আবার এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১২ই জুন, ১৮৮৫ তারিখে এই অনবদ্য চিত্রসম্ভারের অধিকাংশ চিত্রই নষ্ট হয়ে গেল। ৮৭-খানি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত ; আর ১৯১-খানি আংশিকভাবে ঝল্‌সে গেছে, অবশিষ্ট ৫৬-খানি ছবি ভিক্টোরিয়া ও এ্যালবার্ট সংগ্রহশালার ভারতীয় শাখায় আজও শোভা পায়।

অদম্য উৎসাহ বলতে হবে গ্রিফিথ সাহেবের। এই সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ডের পরেও তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন নি। দেখছি, তা সত্ত্বেও এই অগ্নিকাণ্ডের এগারো বছর পরে তিনি তাঁর অমর গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন—The Paintings in the Buddhist Caves of Ajanta, London 1896. যে ছবিগুলি রক্ষা পেয়েছিল এবং যে সব স্কেচ ওঁর কাছে ভারতবর্ষেই ছিল, তারই উপর নির্ভর করে দু-খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিই অজন্তার বিষয়ে প্রথম প্রামাণিক দলিল! বইটির ভূমিকা ও সম্পাদনার পরিপাট্য দেখলেই বোঝা যায় যে, এর পিছনে কী পরিমাণ পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য আর অনুসন্ধিৎসা আছে। জাতকের কাহিনী-গুলির অধিকাংশই গ্রিফিথ জানতেন না—তাই অনেকক্ষেত্রে দেখছি তিনি চিত্রগুলির মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেন নি। তবু অজন্তা-তীর্থের যে তিনিই পথিকৃৎ, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রের অক্ষত অবস্থায় কী রূপ ছিল, তা শুধু তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমেই আজ জানতে পারি। বর্তমান গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র গ্রিফিথ সাহেবের মূল গ্রন্থ অবলম্বনে আঁকবার চেষ্টা করেছি—ফলে সেগুলি প্রায়শঃই অক্ষত। বাস্তবে আজ অজন্তার ছবিগুলি এ-গ্রন্থে প্রদর্শিত চিত্রের মত অক্ষত নয়।

ইতিমধ্যে কিন্তু অজন্তার লুঠেরার দল মহানন্দে লুঠের কাজে লেগে গেছে। অরক্ষিত গুহা থেকে তারা ছবি চুরি করবার মতলবে ছিল। কিন্তু এ তো আর সংগ্রহশালার দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি নয়—এ চুরি করা যাবে কেমন করে? ওরা তাই ছুটে এল কোদাল আর ছুরি নিয়ে—পলেস্তারা-সমেত ছবিগুলিকে চেঁছে তুলে নিয়ে যাবে। এ দলের মধ্যে নিজামের কর্মচারীরাই শুধু নয়, বোম্বাইয়ের একজন প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ বার্ড-ও জুটে গিয়েছিলেন। অবশ্য, এই সব ডাকাতদলের ভাগ্যে লাভের অঙ্কে পড়েছিল শুধুই কয়েক সের রঙিন ধুলো ; আর বিশ্বললিতকলার লোকসানের খতিয়ানে যে অঙ্কটা পড়লো তা সুধীজন নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে হিজ এক্সলটেড হাইনেস নিজাম বাহাদুরের চৈতন্য হল—তিনি আইন করে এই লুঠেরাদের ঠেকাবার চেষ্টা করলেন। কিন্ত ইতিমধ্যেই অযত্নে, ঝড়জলের অত্যাচার, আর লুঠেরাদের কেরামতিতে অজন্তার অনেক ছবিই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে লেডী হেরিংহ্যাম ভারতবর্ষে আসেন এবং অজন্তা দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি অনতিবিলম্বেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ভারতবর্ষে ফিরে আসেন ঐ চিত্রগুলির নকল করানোর ব্রত নিয়ে। তাঁরই উদ্যোগে অজন্তার অনেকগুলি গুহাচিত্রের নকল করা হয়। এই নকলগুলি লেডী হেরিংহ্যাম লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে উপহার দেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি সেগুলি দু-খণ্ডে প্রকাশ করেন—'অজন্তা ফ্রেস্কোস্' নামে।

বাংলা দেশের বিদ্বৎসমাজের কানেও অজন্তার গৌরবমণ্ডিত চিত্রসম্ভারের কথা এসে পৌঁছাল। ফলে, শিল্পাচার্য নন্দলাল, অসিত হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত, মুকুল দে প্রভৃতি রওনা হলেন অজন্তার উদ্দেশ্যে। এঁরাও নিয়ে এলেন অসংখ্য অনুলিপি।

লেডী হেরিংহ্যামকে তাঁর গ্রন্থ-রচনায় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিস্ ডরোথি লার্চারের নাম সর্বপ্রথমে করতে হয়। নন্দলাল, অসিতকুমার, সমরেন্দ্র গুপ্তের চিত্রও তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ-ছাড়া সৈয়দ আহম্মদ ও মহম্মদ ফজলুদ্দীনের অনুলিপিও

আছে তাঁর গ্রন্থে। পরোক্ষভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ।

শিল্পী মুকুল দে আসেন তার অল্প কিছুদিন পরে। প্রথমবার ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ও দুই বছর পরে দ্বিতীয়বার। বিখ্যাত জাপানী শিল্পী আর. আই-এর সঙ্গে তাঁর অজন্তাতেই সাক্ষাৎ হয়।

তাঁর অনেকগুলি চিত্রের অনুলিপি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'মাই পিলগ্রিমেজ টু অজন্তা এ্যান্ড বাঘ' নামে একটি গ্রন্থে স্থান পায়।

হায়দরাবাদের নিজাম ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সরকারে একটি পুরাতত্ত্ব বিভাগ খোলেন এবং অজন্তার গুহাচিত্রগুলি সংরক্ষণে যত্নবান হন। বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজামের প্রচেষ্টায় ও অর্থে দুজন ইটালিয়ান বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর লরেনৎসো চেচ্চোনি আর কাউন্ট অর্সিনি বহু পরিশ্রম করে গুহা-চিত্রগুলিকে সাফ্ করেন। ইতিমধ্যে চিত্রগুলিকে মেরামত করবার সদুদ্দেশ্যে যে সব নিকৃষ্ট শিল্পী খেয়াল-খুশিমত বাজে রঙ লাগিয়ে অজন্তার চিত্রগুলিকে অনবধানতাবশতঃ সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছিল, এই দুজন তাঁদের সেই অপকার্যগুলি, অর্থাৎ নূতন রঙের আস্তর ঘষে ঘষে তুলে ফেললেন। তার উপর আঠার মত স্বচ্ছ এমন একটি প্রলেপ দিলেন, যাতে রঙগুলি জ্বলে না যায়, দেওয়াল থেকে খসে না পড়ে। এঁরা দু'জনেই ছিলেন এ কাজে অভিজ্ঞ। ইটালিতে এই জাতীয় কাজ ইতিপূর্বেও হয়েছে সিস্টিন চ্যাপেলে। ইটালির একটি মনাস্টারির স্যাঁতসেঁতে ঘরের দেওয়ালে আঁকা লেওনার্দো দা ভিঞ্চির বিশ্ববিখ্যাত 'শেষ সায়মাশ' প্রাচীর-চিত্রটিকে এভাবেই উদ্ধার করা হয়েছিল।

নিজাম সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ আরও একটি ভাল কাজ করলেন। ডাঃ গোলাম ইয়াজদানির সম্পাদনায় বিরাট চার খণ্ডে অজন্তার একটি এ্যালবাম প্রকাশ করা হল। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ খণ্ডটি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই চার খণ্ড চিত্রসম্ভারের অধিকাংশ ছবিই ই-এল ডেসি নামে একজন অভিজ্ঞ আলোকচিত্রশিল্পীর রঙিন ফোটোগ্রাফ থেকে নেওয়া। গ্রিফিথ তাঁর গ্রন্থে চিত্রসম্ভারে-পূর্ণ প্রত্যেকটি গুহার প্ল্যান ছাড়া দেওয়ালের এলিভেশান-ও এঁকে দিয়েছিলেন, ফলে চিত্রগুলির অবস্থান বুঝে নেওয়া সহজ হয়েছিল। অনেক পরে প্রকাশিত হলেও ইয়াজদানি সবক্ষেত্রে চিত্রগুলির অবস্থান দেখিয়ে সাঙ্কেতিক নক্সা দেন নি। ফলে, তাঁর গ্রন্থ অনুসরণে বাস্তবে চিত্রগুলিকে সনাক্ত করা শক্ত হয়ে পড়ে। তবে গ্রিফিথের চেয়ে ইয়াজদানির একটা বড় সুবিধা ছিল। ইতিমধ্যে পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের পণ্ডিতরা ফ্রেস্কোগুলির সঙ্গে জাতক-বর্ণিত কাহিনীর সম্পর্ক আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ফলে গ্রিফিথের চেয়ে ইয়াজদানির পক্ষে চিত্রের সমালোচনা করা সহজ হয়েছিল।

এছাড়া ইউ-এন-ই-এস্-সি-ও বা ইউনেসকো অজন্তা সম্বন্ধে ৩২টি রঙিন ছবিসুদ্ধ একটি চমৎকার এ্যালবাম প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, এর মূল্য বেশী হওয়ায় ইউনেসকো সেই গ্রন্থটির একটি স্বল্পমূল্যের পকেট এডিসান-ও প্রকাশ করেছেন। মূল্যের দিক থেকে বিচার করলে পকেট বইটিকে অপূর্ব বলা যেতে পারে।

স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের ললিতকলা এ্যাকাডমি অজন্তার উপর একটি এ্যালবাম প্রকাশ করেছেন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এতে আছে কুড়িটি ছবি ১৪″×১২″ মাপের। মূল্য মাত্র দশ টাকা। আট আনায় ঐ মাপের একখানি রঙিন ছবি নিশ্চয়ই খুব সস্তা। কিন্তু তবু বলব এতে যে সব রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি ঠিক বাস্তবানুগ হয়নি সব ক্ষেত্রে। সহজলভ্য করতে গিয়ে এ্যাকাডমির এ-জাতীয় রঙের স্বেচ্ছাচারিতা না করলেই ভাল করতেন। বোধ করি, এর চেয়ে শুধু রেখায় অধিকাংশ চিত্র এঁকে নমুনাস্বরূপ দু'একখানি রঙিন চিত্র দিলে খুব ভাল হত—এবং যদি সেই দু'একখানি রঙিন চিত্র গ্রিফিথ, ইয়াজদানি বা ইউনেস্কোর গ্রন্থের মতো বাস্তবানুগ হত! তবু ললিতকলা এ্যাকাডেমি যে অজন্তার

বিষয়ে একটি সহজলভ্য এ্যালবাম প্রকাশ করেছেন, এজন্যই তাঁরা ধন্যবাদার্হ। গত দশকে 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' 'অজন্তা ম্যুরাল্‌স্' নামে একটি এ্যালবাম প্রকাশ করেছেন। তাতে জাতক-কাহিনীগুলি নাই, গুহার প্ল্যানও নাই।

একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে। অজন্তা পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে—কিন্তু সেখানে তখন কি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তার বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা পাই না। সেটা পাই প্রায় ষাট বছর পরে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বার্জেস গুহাগুলি পরিদর্শন করে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তিনি তখন ১৬টি গুহার ভিতর চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন। সেই ষোলটি গুহা হচ্ছে—১, ২, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১; ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০ ২১, ২২ আর ২৬। আগেই বলছি, এর ভিতর ১১টি গুহা থেকে গ্রিফিথ সাহেব তাঁর ছবিগুলি এঁকে-ছিলেন। সেই হিসাবে গ্রিফিথ যে গুহা থেকে কোন চিত্র আঁকেন নি, সেগুলির সংখ্যা হচ্ছে ৪, ৭, ১৫ ও ২০। গ্রিফিথ ও ডাঃ বার্জেস প্রায় সমসাময়িক, ফলে অনুমান করতে পারি, গ্রিফিথ এই চারটি গুহা থেকে চিত্র আঁকেন নি ইচ্ছে করেই, চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে বলে নয়। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দি যখন পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ি, তখন দেখছি মাত্র ছ'টি গুহায় আছে দর্শনীয় চিত্রসম্ভার। সেগুলি ১, ২, ৯, ১০, ১৬, আর ১৭। তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াল? অজন্তার চিত্রগুলির জন্ম খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। এগারশ' বছর অজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল অম্লান। আর আধুনিক সভ্যজগৎ তার সন্ধান পাওয়ার পর, তার সঙ্গে ঘর করতে শুরু করার মাত্র দেড়শ' বছরের মধ্যেই শুকিয়ে যেতে বসেছে অজন্তা!

জানি, আপনি বলবেন এর জন্য দায়ী সভ্য (?) মানুষের কালাপাহাড়ী অত্যাচার। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বর্তমান শতাব্দীর জন্মমুহূর্ত পর্যন্ত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মানুষের অত্যাচারেই ষোলটি গুহার চিত্র কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ছটিতে। হতে পারে। এর জবাব দিতে গেলে জানতে হয়, নিজাম সরকার ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আইন করে যখন অজন্তা সংরক্ষণের আয়োজন করলেন, তখন কতগুলি গুহায় চিত্র দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। হয়ত পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞরা সে সংখ্যাটি জানেন—আমি জানি না। কিন্তু তবু আমি বলব শুধু তাও নয়। আমার যুক্তির সপক্ষে আমি লেডী হেরিংহ্যাম ও শিল্পী মুকুল দে-র গ্রন্থ দুটি দাখিল করতে চাই। এ দুটি গ্রন্থে যে সব চিত্র দেখছি তার অনেকগুলি তো আজ বাস্তবে নেই। ডরোথি লার্চার, নন্দলাল বসু, সমরেন্দ্র গুপ্ত, মুকুল দে, অসিত হালদার প্রভৃতি যখন ছবি এঁকেছেন, তখন তো কালাপাহাড়ী অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে?

বিশেষজ্ঞ আর বৈজ্ঞানিকের দল বসেছেন এ নিয়ে মাথা ঘামাতে। আমি বিশেষজ্ঞ নই, বৈজ্ঞানিকও নই—তাই আমার কল্পনার রাশ আল্‌গা করে দেওয়ায় কেউ বাধা দিতে আসবে না। আমার তো মনে হয়, বৈদ্যুতিক প্রখর আলোর সংস্পর্শেই শুধু নয়, আধুনিক মানুষের গায়ের গন্ধেও এই চিত্রগুলির রঙ জ্বলে যাচ্ছে। হিংসায় উন্মত্ত এই আধুনিক পৃথিবীর ঘোর কুটিল পথ আর লোভ—জটিল জীবনযাত্রা বরদাস্ত করতে পারছে না অজন্তা। তাই সে শুকিয়ে যাচ্ছে, ঝরে খসে যাচ্ছে—তাই তার অনুকৃতিগুলিকে অতি সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও বারে বারে আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে সেগুলি!

অজন্তা পরিচয়

অজন্তার সর্বসমেত ত্রিশটা গুহা-মন্দির আছে। এখানে একটা কথা বলে রাখি। অনেক সাধারণ লোকের ধারণা, বৌদ্ধ শিল্পীরা বুঝি প্রাকৃতিক গুহায় কিছু দেওয়াল-চিত্র এঁকে-ছিলেন—আর তাকেই বলা হয় অজন্তা-চিত্র। মোটেই তা নয়। এগুলি প্রাকৃতিক গুহা মোটেই নয়। রীতিমত পাথর কেটে গুহাগুলিকে এরা খুঁড়ে বার করেন। তারপর অমসৃণ পাথরের দেওয়ালকে ঘসে ঘসে মসৃণ করে তোলেন। আর তারপর সেখানে আঁকেন ঐ ফ্রেস্কোগুলি। কি-ভাবে তাঁরা এগুলি খনন করতেন, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। আপাতত সেকথা থাক।

এই ত্রিশটি মন্দিরের ভিতর মাত্র পাঁচটি (৯, ১০, ১৯, ২৬, ও ২৯) হচ্ছে চৈত্য বা উপাসনাগৃহ। বাকি পঁচিশটি বিহার বা সঙ্ঘারাম। শেষোক্তগুলি বৌদ্ধ শ্রমণদের আবাস-স্থল। এর ভিতর প্রধানতম গুহা-মন্দির বোধহয় দশম চৈত্যটি। মোট কথা, ১০, ৯, ৮, ১২, ১৩ ও ৩০ এই ছটি গুহা-মন্দিরই প্রাচীনতর যুগের। এই ছটি খৃষ্ট জন্মের দু'শ' বছর পূর্ব থেকে দু'শ' বছর পরে—মোটামুটি এই চারশ' বছর সময়ের ব্যবধানে নির্মিত। বাকিগুলি সপ্তম শতাব্দীর ভিতর তৈরী। অর্থাৎ, হিসাবে দাঁড়াল—অজন্তা তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল প্রায় ছ-সাতশ' বছর ধরে ; আর অজন্তা অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল আরও প্রায় হাজার বছর।

কে বা কারা অজন্তা পাহাড়ের বুকে গুহা-মন্দিরের কাজ প্রথম শুরু করেন, আজ আর তা জানবার উপায় নেই। সম্রাট অশোকের আমলে গয়ার কাছে চারটি গুহা-মন্দির তৈরী হয়েছিল—সুদামা, কর্ণ-কোপর, লোমশ-ঋষি আর বিশ্ব-ঝোপড়ি। এগুলি প্রাকৃতিক গুহা নয়—মানুষের তৈরী। অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম নূতন করে প্রাণ পেয়েছিল, একথা আমরা জানি। বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল লোকালয় ত্যাগ করে নির্জন প্রান্তরে তাঁদের উপাসনা-মন্দির এবং সঙ্ঘারাম তৈরী করতে প্রয়াসী হলেন। মৌর্য যুগের অব্যবহিত পরে সাতবাহন যুগে দেখি, বোম্বাইয়ের কাছাকাছি নাসিককে কেন্দ্র করে অনেকগুলি গুহা-মন্দির তৈরী হচ্ছে ; ভাজা, নাসিক, কার্লে প্রভৃতি স্থানে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বুকে একদল বৌদ্ধ শ্রমণ অনলস পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন কতকগুলি গুহা-মন্দির। প্রায় সেই সময়েই অজন্তার দশম গুহা-মন্দিরটি নির্মাণ শুরু হয়। সে যুগকে আমরা বলি হীনযান বৌদ্ধ যুগ। তখন বুদ্ধদেবের মূর্তি খোদাই করা হত না। শাক্যমুনিকে বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হত কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন—পদ্মফুল, ধর্মচক্র, স্তূপ, চরণ-চিহ্ন, বোধিবৃক্ষ বা শূন্য সিংহাসন অথবা শূন্য রাজছত্র। অজন্তার অষ্টম, নবম, দশম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুহা-মন্দিরগুলি সেই যুগের। এদের ভিতর যদি বুদ্ধদেবের কোন মূর্তি বা চিত্র দেখেন, বুঝবেন সেগুলি পরবর্তী মহাযান যুগের সংযোজন।

উত্তর ও মধ্য ভারতে যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ, তার প্রায় সমসময়ে দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি শক্তিশালী রাজ্যের সন্ধান পাই ইতিহাসে। বাকাটক ও পরে বাদামির চালুক্য রাজবংশ (বর্তমান মহীশূর) এবং রাষ্ট্রকূটরা। বৌদ্ধ ধর্মের তখন মহাযান যুগ। অর্থাৎ, তখন শাক্যমুনির মূর্তি তৈরি করার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। অজন্তার অধিকাংশ গুহা-মন্দির এই মহাযান যুগে।

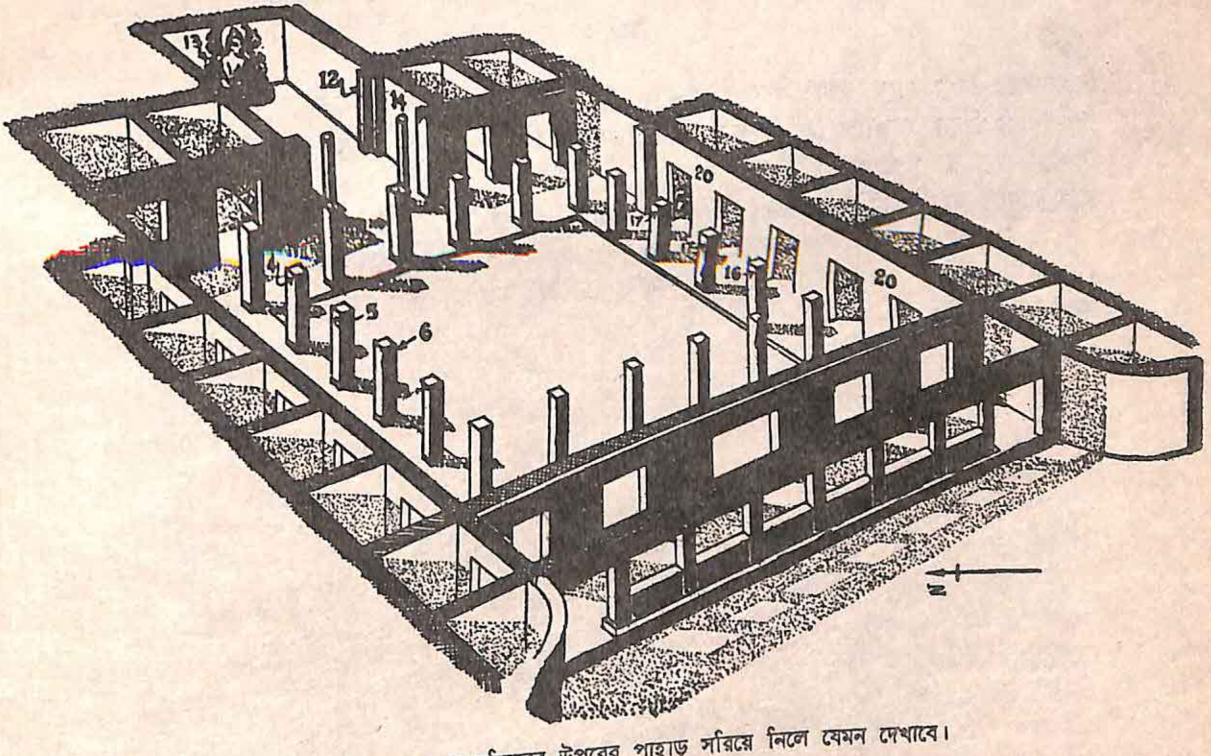
দীর্ঘ সাত-আটশ' বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল অজন্তা। প্রথমে হয়তো ছিল কয়েকজন একান্তবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুর নির্জন আবাসস্থল, ন'-নম্বর চৈত্যটিকে ঘিরে। ক্রমে হয়তো এর স্থান-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে আসতে শুরু করেন অন্যান্য ভিক্ষু এবং অর্হতেরা। মহাযান যোগাচারের প্রবর্তক মহাভিক্ষু আসঙ্গ যে দীর্ঘদিন এখানে বাস করে যান, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ শাস্ত্রে। সে-যুগে অজন্তার কী নাম ছিল, আজ আর তা জানবার উপায় নেই। সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-ৎসাঙ অজন্তায় পদার্পণ করেন নি ; তবে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছ থেকে শুনে তিনি এর উল্লেখ করেছেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে।

নবম বা দশম শতাব্দীতে অজন্তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু কেন, তা আজও জানা যায় নি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধ্বজাধারীরা অথবা মুসলমানরা এসে এই নির্জন গুহাবাসী বৌদ্ধ শ্রমণদের যে আক্রমণ করে নি, তা অনুমান করা শক্ত নয়। মূর্তিগুলির নাক ভাঙা নয় ; দেওয়াল-চিত্রগুলি অক্ষত অবস্থায় আছে—অগ্নিকাণ্ড, লুট-তরাজের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। যদি মনে করি কোন রাষ্ট্রনৈতিক কারণে অথবা কোন ব্যাপক মহামারীর ভয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন—আর ফিরে আসার সুযোগ পান নি, তাহলেও প্রশ্ন থাকে, সেক্ষেত্রে গুহা-মন্দির-গুলি তাঁরা আলগা পাথর দিয়ে বন্ধ করে গেলেন না কেন? বন্যজন্তু ও পাখীর অত্যাচার

থেকে গুহাচিত্রগুলিকে রক্ষা করার এ সহজ ব্যবস্থাটুকু নিশ্চয় তাঁরা সেক্ষেত্রে করে যেতেন। তা তাঁরা করে যান নি। প্রায় হাজার বছর পরে হঠাৎ যেদিন অজন্তা পুনরাবিষ্কৃত হল, সেদিন গুহামুখগুলি খোলাই পাওয়া গিয়েছিল ; অথচ বৌদ্ধ শ্রমণদের ব্যবহৃত কোন বস্তু পাওয়া গেছে বলে শুনি নি। ভিক্ষাপাত্র, জপের মালা, যষ্টি, বাসনপত্র—কই কিছুই তো ছিল না গুহা-মন্দিরে! কেন?

একের পর এক গুহা-মন্দিরগুলি দেখতে থাকি। ভবিষ্যৎ যাত্রীর সুবিধা হবে মনে করে বিচিত্রিত গুহা-মন্দিরগুলির একটি করে প্ল্যান এবং বিখ্যাত শিল্প-নির্দশনগুলির অবস্থান যতদূর সম্ভব এখানে সন্নিবেশিত করে দিলুম। আমরা বাড়ীর প্ল্যান দেখতে অভ্যস্ত, তবু প্ল্যান বলতে কি বোঝায় একটু আলোচনা করে নেওয়া উচিত।

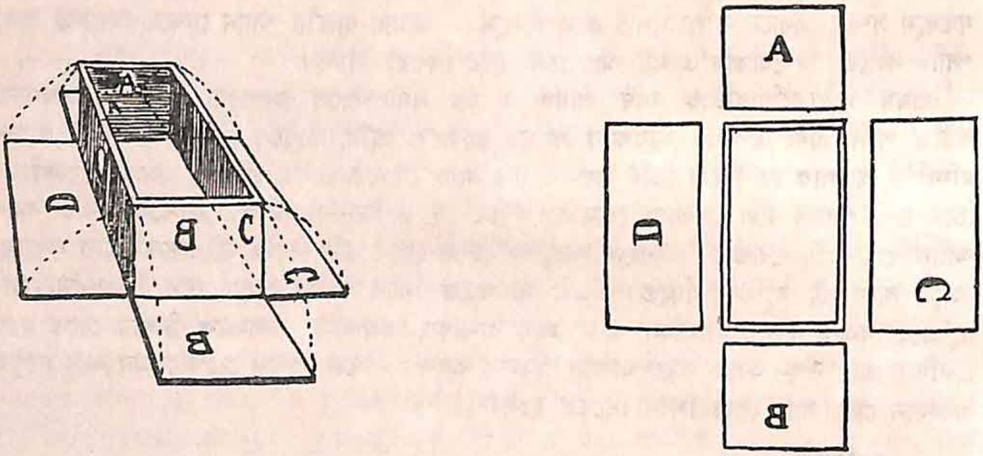
প্রথম গুহা-মন্দিরটিকে যদি আমরা মাটির সমান্তরালে কল্পনায় কেটে দু-আধখানা করতে পারি এবং উপরের আধখানা সরিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে এরোপ্লেন থেকে গুহা-মন্দিটির আলোকচিত্র নিলে সেটি চিত্র—২-এর মতো দেখতে হবে। এটাকেই আমরা সাঙ্কেতিক চিত্র—৪-এ প্ল্যান বলে বোঝাতে চেয়েছি। চিত্র—২ ও চিত্র—৪ মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে প্ল্যান বলতে কি বোঝায়। নেহাৎ অসুবিধা হলে কোন এঞ্জিনিয়ার বা ওভারসিয়ার বন্ধুকে বলুন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে। এটা না বুঝে নিলে প্ল্যান দেখে পরে শিল্প-নিদর্শন-গুলিকে সনাক্ত করতে পারবেন না। মনে রাখবেন, অজন্তায় আপনাকে নিশ্চয় যেতে হবে একদিন, আর তখন হাতে সময় থাকবে অত্যন্ত অল্প। ফলে, প্ল্যান দেখে কেমন করে বস্তুর অবস্থান চেনা যায়, সেটা শিখে নিতেই হবে।



চিত্র—২॥ প্রথম গুহা-মন্দিরের উপরের পাহাড় সরিয়ে নিলে যেমন দেখাবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, প্ল্যানে তো শুধু মেঝেটাকেই দেখছি অথচ শিল্প-নিদর্শনগুলি আছে দেওয়ালে। প্ল্যানে তো দেওয়ালের ছবি দেখা যায় না। তাই এখানে প্ল্যানের চার-পাশে চারটে দেওয়াল এঁকে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা কেমন জানেন? মনে করুন চিত্র—

৩-এ একটি কাচের বাক্স দেখা যাচ্ছে, যার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীরের ভিতর-দিকে A, B, C, D—এই চারটি অক্ষর যথাক্রমে লেখা আছে। এই কাচের বাক্সটির প্ল্যান হচ্ছে নিচের কেন্দ্রস্থলে আঁকা আয়তক্ষেত্রটা। কিন্তু প্ল্যানে আমরা দেওয়ালের লেখাগুলি দেখতে পাচ্ছি না। এবার মনে করুন, ঐ কাচের বাক্সটির চারটি দেওয়াল খুলে মাটিতে পেতে দেওয়া হয়েছে। আর তারপর আমরা তার প্ল্যান এঁকেছি। তাহলে ঐ কেন্দ্রস্থলের প্ল্যানের চারপাশে চারটি দেওয়ালকে দেখতে পাব। মাটিতে পেতে দেবার পর অক্ষরগুলি কোথায়



চিত্র—৩

কেমনভাবে দেখা যাবে, লক্ষ্য করে দেখুন। অর্থাৎ, বাক্সের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকের দেওয়ালের দিকে তাকালে 'A' অক্ষরটিকে দেওয়ালে যেখানে দেখব, প্লানের উপরদিকে তাই দেখানো হয়েছে। আবার দক্ষিণ দিকে মুখ করে দক্ষিণের দেওয়ালটিকে কেমনভাবে দেখতে পাব জানতে হলে, ছবিটা উল্‌টিয়ে 'B' অক্ষর-চিহ্নিত চতুষ্কোণটিকে দেখুন।

এ ব্যাপারটা যদি বুঝতে পারেন, তাহলে চিত্র—৪-এর সাহায্যে প্রথম গুহা-মন্দিরে দাঁড়িয়ে কোন্‌ দেওয়ালে কোন্‌ ছবিটি কোথায় আছে, তা খুঁজে বার করা নিশ্চয় কঠিন হবে না আপনার কাছে।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

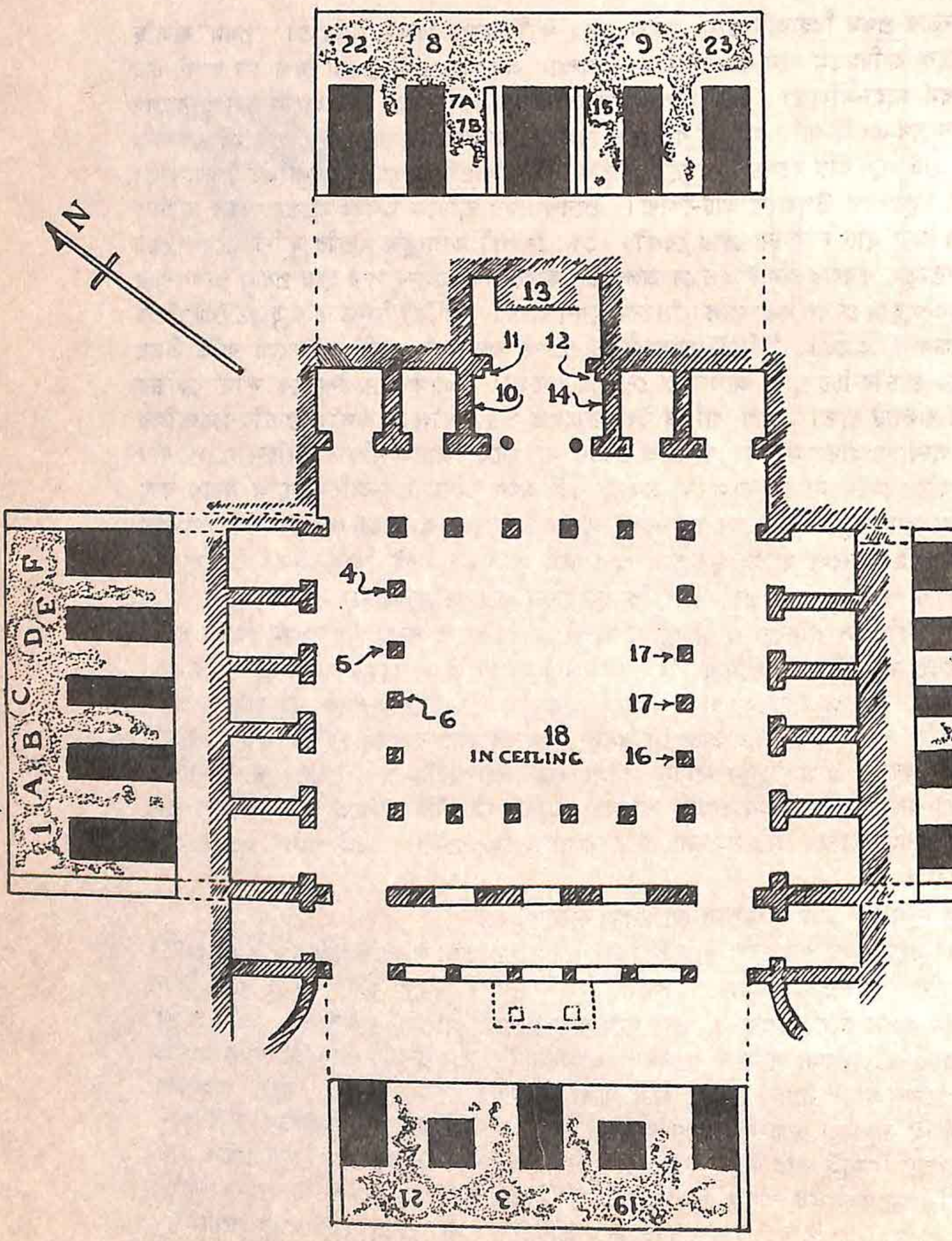
প্রথম গুহা-বিহার

অজন্তার প্রথম বিহারটি ৬০০ থেকে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ভিতর নির্মিত। 'প্রথম' বলেছি বলে এটাকে আদিমতম মনে করবেন না। অবস্থান অনুসারে এটা প্রথমে দেখা হয় বলেই এর 'নাম' প্রথম গুহা-মন্দির। এটি চালুক্য রাজাদের আমলে তৈরী। মহাযান বৌদ্ধ যুগে। গুহার সম্মুখে একটি গাড়ি-বারান্দা বা পোর্চ ছিল—এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। প্রথমেই একসারি স্তম্ভ। ছটি পূর্ণকায় স্তম্ভ আর দুটি অর্ধকায়, অর্থাৎ প্রাচীর-গাত্রে অর্ধ-গ্রথিত পিলাস্টার। স্তম্ভমূল চতুষ্কোণ, উপরাংশ আট-কোণা। প্রবেশপথের দুদিকে অর্থাৎ মাঝের স্তম্ভ দুটিতে অলঙ্করণ অন্য ছটি স্তম্ভের চেয়ে বেশী। যেন শিল্পী আগন্তুক যাত্রীর দৃষ্টি প্রবেশপথের দিকে কেন্দ্রীভূত করবার জন্যই এভাবে অলঙ্করণ করেছেন। অলিন্দ পার হয়ে প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে এবার গুহায় প্রবেশ করা গেল। ভিতরটা বেশ আলো-আঁধারি। কিন্তু এ গুহাতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। টিকিট দেখালেই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী একটি জোরালো বাতি নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রাচীর-চিত্রগুলি আপনাকে দেখিয়ে দেবেন। প্লাগ পয়েন্ট থেকে দীর্ঘ ফ্লেক্সিব্ল তার দিয়ে বাল্বটি যুক্ত। ফলে, বাতির উৎস ক্রমাগত সঞ্চরণশীল। অর্থাৎ, প্রাচীর-চিত্রগুলির অবস্থান সম্বন্ধে যদি আপনার পূর্ব-অভিজ্ঞান না থাকে, জাতক-বর্ণিত কাহিনীগুলি যদি আপনার আগে থেকে না শোনা থাকে, তাহলে এই অল্প সময়ে চিত্র-কাহিনীগুলি সনাক্ত করা দুষ্কর এবং তার পূর্ণ রসাস্বাদন অসম্ভব। আর কী দুঃখের কথা, যে কয়দিন আমি সেখানে ছিলাম, দেখেছি অসংখ্য যাত্রী আসছেন, আর চলে যাচ্ছেন। এই বিশ্ব-বন্দিত চিত্রশিল্পের পূর্ণরস তাঁরা পাচ্ছেন না! এবং তাঁরা কি হারাচ্ছেন তাও তাঁরা জানেন না!

চিত্র-কাহিনীগুলি অধিকাংশই জাতকের গল্প। গৌতমবুদ্ধ পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সব লীলা করেছেন, সেই জাতিস্মর মহাপুরুষ-কথিত সেই সব কাহিনীই জাতকের গল্প নামে পরিচিত। সর্বসমেত পাঁচশ'র উপর জাতকের গল্প আছে। এক এক রূপ নিয়ে বুদ্ধদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন—তাঁরা পূর্ণ বুদ্ধ নন,—তাঁরা বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধত্ব লাভের পথে বিভিন্ন জন্মচক্রের মধ্য দিয়ে তাঁরা চলেছেন এ মর্ত্যভূমে নানান্ লীলা করে, মহাপরিনির্বাণের পথে। জাতক-বর্ণিত চিত্র-কাহিনী বর্ণনা করার সময় প্রথমে আমাদের মূল কাহিনীটি জানতে হবে—তারপর তার চিত্রনাট্যরূপ এবং সবশেষে তার সমালোচনা বা রসোপলব্ধির প্রয়াস। এই পথেই অগ্রসর হতে হবে আমাদের।

প্রথমেই নজরে পড়লো সংঘপাল জাতকের কাহিনী (১/১):

বারাণসী মহারাজের পুত্ররূপে জন্ম নিলেন বোধিসত্ত্ব। তিনি উপযুক্ত হলে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে কাশীরাজ বানপ্রস্থ নিলেন। একটি নির্জন হ্রদের তীরে কুটির তৈরি করে তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করতে থাকেন। সেই হ্রদে বাস করতেন নাগরাজ সংঘপাল। তিনি প্রত্যহ ঐ সন্ন্যাসীর কাছে ধর্মকথা শুনতে আসেন। একদিন পিতাকে দেখতে এসে বোধিসত্ত্ব দেখতে পেলেন নাগরাজ সংঘপালকে। তাঁর মনে নাগরাজ হবার বাসনা জাগে। ফলে, পরজন্মে বোধিসত্ত্ব সত্যই নাগরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন ; কিন্তু নাগলোকের বিলাস-বৈভব—নাগ-রাজ-প্রাসাদের ঐশ্বর্য কিছুই তাঁর ভাল লাগল না। বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন—দূর থেকে মনে হয়েছিল বুঝি নাগলোকেই আছে অপার শান্তি, বিমল আনন্দ। কিন্তু তা ভ্রান্তিজনক। ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই সুখ। রাজার মনে প্রশান্তি নেই, আছে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মনে। বোধিসত্ত্ব স্থির করলেন, জগতের হিতার্থে তিনি আত্মোৎসর্গ করবেন। নাগলোক ত্যাগ করে তিনি গ্রামের পথে একটি বল্মীকের উপর বিশ্রাম নিতে থাকেন। মনে মনে বলেন,



চিত্র—৪ ॥ প্রথম গুহা-বিহারের প্ল্যান।

1 সংঘপাল জাতক (চিত্র—৫)
2 মহাজনক জাতক
A মহাজনক ও সীবলী (চিত্র—৬)
B মহাজনক সন্ন্যাসী দর্শনে চলেছেন
C হিমাবলী পর্বতে সন্ন্যাসী দর্শন
D প্রব্রজ্যাগ্রহণ (চিত্র—৭)
3 শিবি জাতক
4 নাগরাজা ও রানী (চিত্র—৯)
5 যুযুধান ষণ্ডদ্বয়
6 ষড়ভুজ বামনমূর্তি
7 রাজপুত্রের অভিষেক-স্নান (মহাজনক?) (চিত্র—১০)
8 A অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি
B অবলোকিতেশ্বরের কৃষ্ণা নায়িকা (চিত্র—৮)
9 অবলোকিতেশ্বর বজ্রপাণি
10 মার কর্তৃক বুদ্ধের তপস্যাভঙ্গের চেষ্টা (চিত্র—১১)
11 গঙ্গা (প্রস্তর মূর্তি)
12 যমুনা (প্রস্তর মূর্তি)
13 সারনাথ মৃগদাবে পদ্মাসনে বুদ্ধদেব (প্রস্তর মূর্তি)
14 সহস্র বুদ্ধ—শ্রাবস্তীর ঘটনা
15 কৃষ্ণা রাজকুমারী (চিত্র—১২)
16 যুগ্মহস্তী (প্রস্তর মূর্তি)
17 চার হরিণের এক মাথা (প্রস্তর মূর্তি)
18 পারস্য সম্রাট খুস্রো ও রানী শীরীন(?)
19 চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজসভা
20 চিত্র সনাক্ত করা যায় নি
21 পুরকামিনীর দ্বারে মহাভিক্ষু (চিত্র—১৩)
22 বোধিসত্ত্বকে অর্ঘ্যদান (মহাজনক জাতক?) (চিত্র- ১০)
23 চম্পেয় জাতক (চিত্র—১৪, ১৫)

আমার এই দেহের চামড়া দিয়ে যদি কোন চর্ম-ব্যবসায়ী লাভবান হয় তো হোক। কয়েকজন শিকারী সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় নাগরাজকে দেখতে পায় এবং তারা এই মহানাগকে বন্দী করে। নাকে দড়ি দিয়ে তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে যায় রাজপথ দিয়ে, নানাভাবে উৎপীড়ন করে। অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত বোধিসত্ত্ব কোন প্রতিবাদ করেন না। অবশেষে আলারা নামে একজন সমৃদ্ধিশালী ভূস্বামী স্বর্ণমূল্যে বোধিসত্ত্বকে উদ্ধার করেন। মুক্তিলাভ করে বোধিসত্ত্ব আলারাকে নাগরাজ্যে নিয়ে যান এবং মহাসমাদরে তাঁকে রাজপ্রাসাদে রাজ-অতিথি করে রাখেন। বৎসরাধিক কাল আলারা নাগ-রাজ্যে বাস করেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় বোধিসত্ত্বের কাছে ধর্মের কথা শোনেন। ক্রমে আলারার অন্তরেও জাগে তিতিক্ষা; তিনিও বুঝতে পারেন ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে শান্তি নেই, অগ্নিকে ঘৃতাহুতি দান করে নির্বাপিত করা যায় না। শেষ পর্যন্ত আলারাও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বোধিসত্ত্বের কাছে।

সংঘপাল জাতক

কাহিনীটি দীর্ঘ। অত্যন্ত সুসংবদ্ধভাবে স্বল্প পরিসরে শিল্পী এর চিত্র-কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন। উপরে বাম কোণে (চিত্র—৫) দেখছি, নাগরাজ সংঘপাল মনুষ্যদেহ ধারণ করে হ্রদের তীরে প্রাক্তন কাশীরাজের কাছে ধর্মোপদেশ শুনছেন। নাগরাজের মুখে একটি প্রশান্ত জ্যোতি। সন্ন্যাসীকে ঘিরে বসে আছেন কয়েকজন মুমুক্ষু। যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এমন কি বনের পশু-পাখীরাও। তার ভিতর দেখছি, একটি মেয়ে বসে আছে সন্ন্যাসীর পদমূলে চিত্রদর্শকের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে (চিত্র—৫)। হয়তো এই নারী-মূর্তিটির কথা মনে করেই গ্রিফিথ সাহেব লিখেছিলেন :

> নারীচিত্র অংকনে অজন্তার শিল্পী বিভিন্ন ও বিচিত্র ভঙ্গির পরিকল্পনা করেছেন। অনেকগুলি নারীচিত্র বিবসনা অথবা সেগুলি এত স্বল্প বস্ত্রাবৃত যে তাদের দেহসৌষ্ঠব সম্যক উপলব্ধি করা যায়। এমনি কি সম্পূর্ণ পশ্চাৎ থেকেও নারী দেহকে আঁকা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

নিচের প্যানেলে দেখছি, নাগরাজের নাকে দড়ি দিয়ে কয়েকজন শিকারী তাঁকে পথ দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। শিকারীদের দৈহিক ক্ষমতার তুলনায় নাগরাজকে এত বিশাল করে আঁকা হয়েছে যে, সহজেই বোঝা যায়, নাগরাজ স্বেচ্ছায় এ অত্যাচার সহ্য করছেন। তা না হ'লে এই কয়জন মানুষের পক্ষে ঐ প্রকাণ্ড নাগরাজকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়।

এ চিত্রগুলি অধিকাংশই নষ্ট হয়ে এসেছে।

সঙ্ঘপাল জাতকের পরে একটি দীর্ঘ কাহিনী—মহাজনক জাতক (১/২) :*

---

* এ গ্রন্থে মাঝে মাঝে বন্ধনীর ভিতর ঐ জাতীয় সংখ্যা বসিয়ে চিত্রের অবস্থান বোঝানো হয়েছে। প্রথম সংখ্যাটি গুহার নম্বর, দ্বিতীয়টি ঐ গুহার প্ল্যানে নির্দিষ্ট সংখ্যা। যেমন এখানে ১/২ অর্থে—চিত্রটি আছে প্রথম গুহায়। অবস্থান ঐ গুহার প্ল্যান অর্থাৎ চিত্র ৪-এ '২' সূচক সংখ্যা।

মিথিলার মহামন্ত্রী চেদিরাজকুমারের কর্ণমূলে নিবেদন করেন : আপনি উত্তেজিত হবেন না কুমার। আপনি বিদ্বান্ পণ্ডিত—সর্ববিদ্যাপারঙ্গম। এক উদ্ভিন্নযৌবনা চপলা নারীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে না নিশ্চয়ই।

আত্মবিশ্বাসী চেদিরাজকুমার বলেন, আপনিও অহেতুক চঞ্চল হবেন না মহামন্ত্রী। আপনি যান, রাজান্তঃপুর থেকে ডেকে দিয়ে আসুন পণ্ডিতম্মন্যা আপনাদের রাজকন্যাকে।

আহ্বানের প্রয়োজন হয় না। লূতাতন্তু-সদৃশ উশীরজালিকার অবরোধ সরিয়ে মণিদীপ্ত কক্ষে পদার্পণ করেন মিথিলার রাজনন্দিনী বিশ্ববন্দিতা সীবলী।

নিমেষহীন দৃষ্টিতে সেই নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ চেদিকুমার নির্বাক্ হয়ে যান। ভুলে যান, পিতৃহীন এই বিদুষী কন্যাটি ঘোষণা করেছে, তর্কযুদ্ধে যে কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারবে তারই কণ্ঠে বরমাল্য দেবে সে। ভুলে যান, পাণিপ্রার্থী কত রাজপুত্র, কত পণ্ডিত, কাশী তক্ষশীলার কত সেরা ছাত্রের দল এখানে এসে অপমানিত হয়ে ফিরে গেছে। মুগ্ধবিস্ময়ে তিনি দেখতে থাকেন সুরসুন্দরীনিন্দিত সুতনুকা সীবলীর রূপ। বুঝতে পারেন, দেশ-বিদেশে কেন শোনা যায়—সমস্ত জম্বুদ্বীপে আজ সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী হচ্ছেন গতায়ু মিথিলাধিপতির আত্মজা। শুধু রূপ নয়, গুণে-ও তিনি দেব-বাঞ্ছিতা। যার কণ্ঠদেশে এই বরবর্ণিনী নারী বরমাল্য দেবে সেই হবে মিথিলার অধিপতি। তাই বার বার লুব্ধ ভ্রমরের দল ছুটে আসে মিথিলায়—ঐ রূপবহ্নি-শিখার পদপ্রান্তে পরাজয়ের স্বাক্ষর রেখে ফিরে যায় আবার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের দল।

মহাজনক জাতক

সীবলী বলে—আর্য, দূতমুখে শুনেছি আপনি নাকি আমার প্রশ্নের উত্তরদানে প্রয়াসী?

কণ্ঠস্বর তো নয়, যেন বীণার ঝঙ্কার!

চেদিকুমার বলেন—বল তোমার প্রশ্ন সুন্দরী, দেখি, চেষ্টা করে।

একে একে সীবলী পেশ করতে থাকে তার কঠিন প্রশ্নগুলি। সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত বিদ্যা একত্র করেও চেদিকুমার তার সমাধান খুঁজে পান না। মনে হয়, বৃথাই তক্ষশীলায় এতদিন বেদাভ্যাস করেন।

কলকণ্ঠে হেসে উঠে সীবলী ; বলে—পথশ্রমই সার হ'ল আর্যপুত্রের।

চেদিকুমার মাথাটা আর তুলতে পারেন না।

কিন্তু এভাবে তো রাজ্য চলে না। মিথিলার সিংহাসন শূন্য। অনতিবিলম্বে সে সিংহাসন পূর্ণ করতে হবে। মহামন্ত্রী বলেন—রাজকুমারী, আমি স্থিরনিশ্চয় বুঝেছি তোমার প্রশ্ন সমাধানের অতীত। আমি বরং স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করি। তুমি নিজ অভিরুচি অনু-সারে যাকে ইচ্ছা বরমাল্য দান কর।

সীবলী হেসে বলে—তা তো হয় না মহামন্ত্রী। আমার প্রতিজ্ঞায় আমি অটল। আমার প্রশ্নজালিকাকে ভেদ না করে কেউ আমার অঙ্গস্পর্শ করতে পারবে না।

মহামন্ত্রী ডেকে আনেন গ্রহাচার্যকে ; বলেন, রাজনন্দিনীর করকোষ্ঠি বিচার করে আপনি বলুন এঁর বিবাহ হবে কি না এবং এঁর ক্রোড়ে জন্ম নেবে কি না মিথিলার ভবিষ্য-নৃপতি।

সীবলী সকৌতুকে প্রসারিত করে দেয় পদ্মকোরকতুল্য তার বামহস্ত। গ্রহাচার্য সে রেখা বিচার করে বলেন—রাজকুমারীর বিবাহ আসন্ন। কিন্তু মিথিলার রাজবংশকে ইনি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে যেতে পারবেন না।

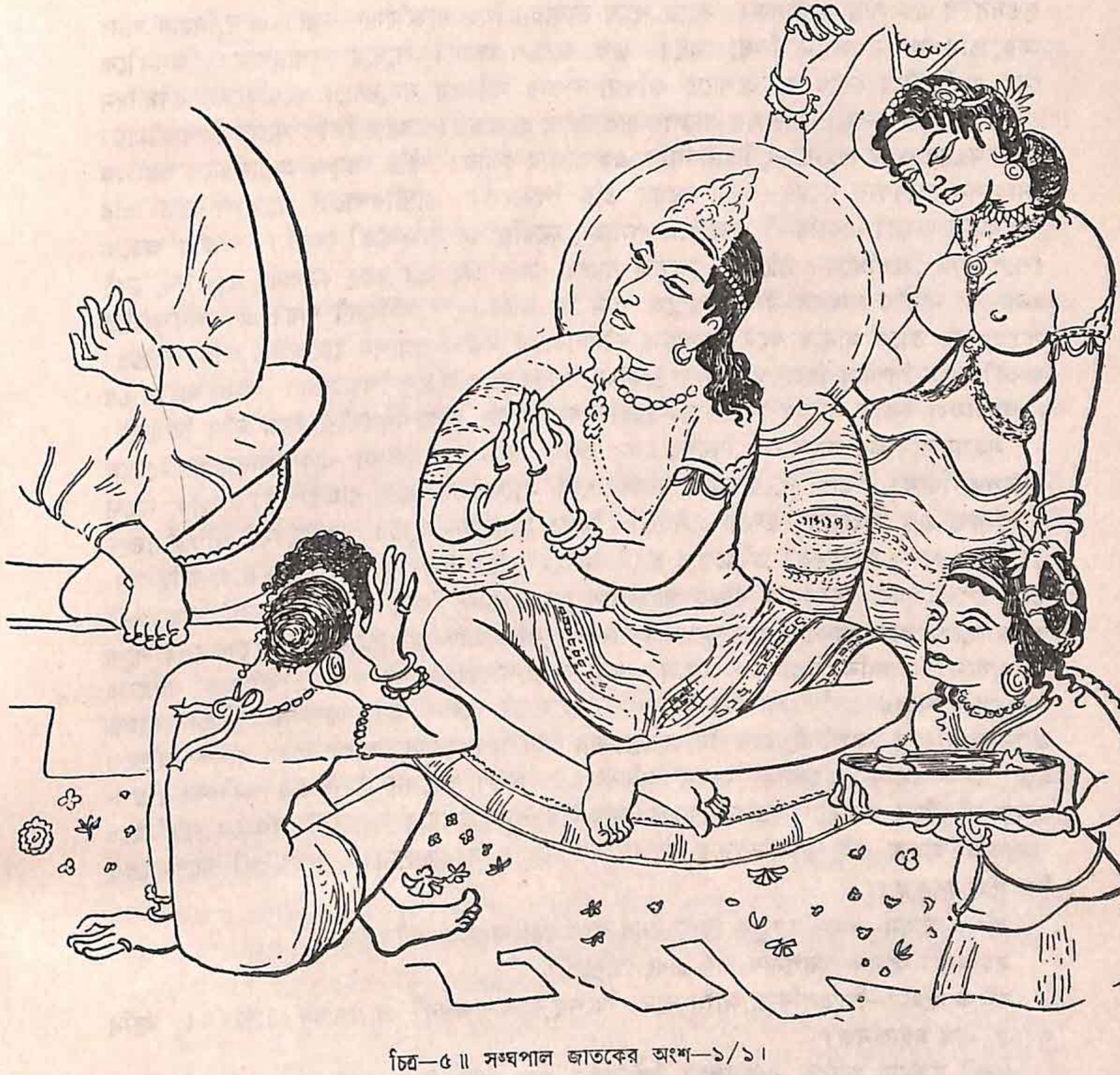
কলকণ্ঠে হেসে ওঠে সীবলী ; বলে—কেন গ্রহাচার্য? আমি কি শেষ পর্যন্ত কোন নপুংসকের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়ে বসব?

তরুণীর প্রগল্ভতায় গ্রহাচার্য ক্ষণিকের জন্য যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েন। কঠিন-কণ্ঠে বলেন—না রাজকুমারী ; তুমি যাঁকে বিবাহ করবে, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ। তিনি জনক হবার উপযুক্ত—তিনি মহাজনক। কিন্তু তুমিই তাঁকে তৃপ্ত করতে পারবে না।

শিউরে উঠেন মহামন্ত্রী, কিন্তু প্রগল্ভা রাজকুমারী হেসে বলে—আবার প্রশ্ন করছি, কেন

গ্রহাচার্য? এই অধম রমণীর রূপের মোহে শুনতে পাই আজ সমস্ত জম্বুদ্বীপ উদ্‌ভ্রান্ত। যারা আমাকে প্রত্যক্ষ করে নি, তারাও আমার রূপবর্ণনা শুনে প্রেমোন্মাদ। আর যে হত-ভাগ্যকে আমি আমার এই দুই মৃণাল ভুজদ্বয়ে বন্দী করবার সামাজিক অধিকার পাব, সে তৃপ্ত হবে না আমাকে পেয়ে? কেন?

গ্রহাচার্য বলেন, কেন জানতে চাও রাজপুত্রী? শোন তার কারণ। এ হবে তোমার অহমিকার দণ্ডভোগ। রূপের অভিমানে সৌন্দর্যের অহংকারে তুমি এযাবৎকাল যত পাণি-প্রার্থীর বুকে শেল হেনেছ, তাদের দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপ লাগবে না ভেবেছ তোমার জীবনে?



চিত্র—৫ ॥ সঙ্ঘপাল জাতকের অংশ—১/১।

মহামন্ত্রী দুই বাহু প্রসারিত করে বলে ওঠেন—ক্ষান্ত হন গ্রহাচার্য!

সীবলী কিন্তু অনমিতা। কৌতুক ছলে প্রগল্‌ভা নারী হেসে বলে—আপনি অহেতুক দুশ্চিন্তা করবেন না মহামন্ত্রী। জগদীশ্বর যদি ঐ বৃদ্ধ গ্রহাচার্যের কোটরগত চক্ষুতে দিয়ে থাকেন অপরের ভবিষ্যৎ দেখার উপযুক্ত দৃষ্টি, তাহলে এ রাজকন্যার নয়ন-কোণেও তিনি দিয়ে রেখেছেন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত বিলোল-কটাক্ষ!

গ্রহাচার্য সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কর্ণপাত না করে বলেন—মহামন্ত্রী, আপনি রাজহস্তীকে সুসজ্জিত করে রাজপথে মুক্ত করে দিন। মানুষে পারে নি কিন্তু সে পারবে। রাজহস্তীই নির্বাচন করে দেবে এ রাজ্যের অধীশ্বরকে।

রাজপুত্রী হেসে বলে—আর আমার প্রশ্নের উত্তর?

গ্রহাচার্য বলেন—মনে আছে রাজনন্দিনী। তোমার শর্তপূরণ না করে বিবাহ করতে বাধ্য করব না আমরা।

কাহিনীর দ্বিতীয় দৃশ্য মিথিলার জনাকীর্ণ এক রাজপথ। পথপ্রান্তে ধূলিশয্যায় শুয়ে আছেন একজন শালপ্রাংশু মহাভুজ যুবাপুরুষ। কিন্তু তাঁর বসন ছিন্ন, ধূলিমলিন। তিনি হৃতসর্বস্ব এক সামান্য বণিক। শুয়ে শুয়ে ভাবছেন নিজ দুর্ভাগ্যের কথা। এ দুনিয়ায় আজ আর তাঁর আপন বলতে কিছু নেই। এক আছেন জননী—সুদূর চম্পানগরে। জননীকে সেই পর্ণকুটীরে রেখে অর্ণবপোতে বাণিজ্য-সম্ভার সাজিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন দীর্ঘদিন পূর্বে। দুরন্ত সমুদ্র-ঝটিকায় তারপর হৃতসর্বস্ব হয়েছেন। আজ তিনি পথের ভিখারীমাত্র। অথচ মায়ের কাছে শুনেছেন, তিনি নাকি এক রাজার কুমার। তাঁর পিতৃব্য অন্যায়ভাবে অগ্রজের সিংহাসন অধিকার করেন—হত্যা করেন তাঁর পিতাকে। রাষ্ট্রবিপ্লবের দুর্যোগ-রাতে তাঁর গর্ভবতী জননী একাকিনী ছদ্মবেশে পলায়ন করেছিলেন রাজপুরী থেকে। গভীর অরণ্যে শেষে জন্ম দিয়েছিলেন তাঁকে। পিতৃব্য সমস্ত রাজ্য তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করেছেন, সেই পলাতকা নারীর সন্ধানে—কিন্তু খুঁজে পান নি তাঁকে। দুর্ভাগিনী নারী এক পর্ণকুটীরে সুগোপনে তাঁকে মানুষ করে তুলেছেন দীনদরিদ্রের মত। গোপন রেখেছেন তাঁর পরিচয়। জননীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁর পুত্র একদিন পুনরুদ্ধার করবে পিতৃরাজ্য। হায়, মায়ের সে স্বপ্ন সফল করতে পারেন নি তিনি—হয়েছিলেন বণিক—ভাগ্য-বিপর্যয়ে আজ দীন ভিখারী।

সহসা বণিকের কানে যায় কিসের কোলাহল। উঠে বসে দেখেন—এক শোভাযাত্রা আসছে রাজপথ দিয়ে। তার পুরোভাগে মণিমাণিক্যে সুশোভিত এক রাজহস্তী। তার পৃষ্ঠে সুসজ্জিত এক সিংহাসন, উপরে রাজছত্র। কিন্তু সিংহাসন শূন্য। কৌতূহলী বণিক সভয়ে উপলব্ধি করেন রাজহস্তী তীরবেগে ছুটে আসছে তাঁকে লক্ষ্য করেই। মদমত্ত হস্তীর পদতলে পিষ্ট হবার আশঙ্কায় বণিক গাত্রোত্থান করতে যান, কিন্তু তৎপূর্বেই সেই রাজহস্তী তাঁকে শুন্ডে আলিঙ্গনবদ্ধ করে তুলে নেয় নিজ পৃষ্ঠে। অতি যত্নে তাঁকে বসিয়ে দেয় সেই শূন্য সিংহাসনে। অমনি চতুর্দিকে বেজে ওঠে কাড়া-নাকাড়া-মঙ্গলশঙ্খ। স্তম্ভিত বণিকের সম্মুখে শ্রদ্ধানম্র প্রণতি জানিয়ে মিথিলার মহামন্ত্রী বলেন—ভদ্র, আপনার পরিচয় আমরা জানি না, কিন্তু আপনিই আজ মিথিলারাজ্যের নির্বাচিত মহান্ অধিপতি। বণিক বিস্মিত হয়ে বলেন—সেকি? কেন? কোন্ অধিকারে? মন্ত্রী বললেন—মিথিলার অধীশ্বর পোপজনক দীর্ঘদিন গতায়ু। তাঁর একমাত্র আত্মজার জন্য উপযুক্ত সুপাত্রের সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আমরা এই রাজহস্তীকে সে কার্যে নিয়োগ করেছিলাম। রাজহস্তী আপনাকেই নির্বাচন করেছে।

বণিক বলেন—এমন অদ্ভুত নির্বাচনের কথা তো কখনও শুনি নি।

মহামন্ত্রী বলেন—আপনার নাম এবং পরিচয়?

বণিক বলেন—পিতৃপরিচয় জানি না। বিশেষ কারণে জননী তা গোপন রেখেছেন। আমি ক্ষত্রিয়, নাম মহাজনক।

মন্ত্রী বুঝতে পারেন রাজহস্তী নির্বাচনে ভুল করে নি। গ্রহাচার্য বলেছিলেন বটে সীবলীর সীমন্তে যিনি সিন্দুরবিন্দু অঙ্কিত করে দেবেন তিনি জনক হবার উপযুক্ত, তিনি 'মহাজনক'!

কিন্তু বাদ সাধল স্বয়ং সীবলী। বলে—অজ্ঞাতকুলশীলে আপত্তি নেই আমার; কিন্তু আমার প্রশ্নের সমাধান?

মহাজনক এগিয়ে এসে বলেন : কী তোমার প্রশ্ন শুচিস্মিতে? সীবলী এতক্ষণে আগন্তুকের দিকে ফিরে তাকায়। এবার স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় তাকে। প্রভাতসূর্যের মত দীপ্তিমান এই শালপ্রাংশু মহাভুজ কে? ইনি কি ছদ্মবেশী কন্দর্প, অথবা স্বর্গের সিংহাসন শূন্য করে নেমে এসেছেন স্বয়ং শচীপতি শক্র? রাজকন্যা উপলব্ধি করে ইনিই তার বাঞ্ছিত বল্লভ, এঁরই প্রতীক্ষায় এতদিন সে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করেছে আসমুদ্রহিমাচলের অযুত পাণিপ্রার্থীকে। কিন্তু যদি ইনি তার প্রশ্নের উত্তরদানে অশক্ত হন? যে কঠিন প্রশ্নবাণগুলিকে রাজকন্যা এতদিন তার কৌমার্য-রক্ষার দুশ্ছেদ্য বর্ম বলে মনে করত, সে-গুলিকেই আজ প্রিয়মিলন-অন্তরায় লৌহ-শৃঙ্খল বলে মনে হল তার।

মহাজনক বলেন : পেশ করতে অহেতুক বিলম্ব করছ কেন সুচরিতে?

ব্রীড়াবনতা সীবলী সংবিৎ ফিরে পায়। লাজনম্র কম্প্রকণ্ঠে একে একে পেশ করে তার কূটপ্রশ্নগুলি।

কিন্তু মহাজনক হলেন বস্তুতঃ স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। জ্ঞানের আকর তিনি, বুদ্ধদেবের অংশে জন্ম তাঁর। হেসে বলেন : কি আশ্চর্য রাজকুমারী, তুমি এতদূর বিদ্যাভ্যাস করেও এই সহজ সরল প্রশ্নগুলির সমাধান জান না?

স্তম্ভিত সীবলী শোনে ক্ষুরধার যুক্তির অশনি-আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় তার কঠিন প্রশ্নগুলি।

ধীর পায়ে এগিয়ে আসে লজ্জাবনতা কুমারী। পরিয়ে দেয় অজ্ঞাতকুলশীল মহাজনকের কণ্ঠে নিজকণ্ঠের মণিদীপ্ত শতনরী।

বেজে ওঠে মঙ্গলশঙ্খ, নহবতে বাজতে থাকে মিলনসঙ্গীতের তান। মহাজনক বলেন—বিবাহে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তৎপূর্বে চম্পানগরে পল্যঙ্কিকা পাঠাও। আমার জননীকে নিয়ে এস এখানে।

গ্রহাচার্য আপত্তি জানিয়ে বলেন—তা যে হবার নয় মহারাজ। চম্পানগর সমুদ্রপারে, দীর্ঘ-দিনের পথ। অথচ গণনায় দেখছি আজ রাত্রি প্রভাতের মধ্যে যদি রাজপুত্রীর বিবাহ না হয়, তাহলে আর তাঁর বিবাহযোগ নাই।

মহাজনক আর কি করেন? ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দেন। বুঝতে পারেন, জননী এ সংবাদে খুশীই হবেন নিশ্চয়। পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখার স্বপ্ন তিনি দেখে আসছেন আজ দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল। এইবার তাঁকে জেনে নিতে হবে তাঁর পিতৃপরিচয়! এখন আর তিনি অরক্ষিতা পর্ণকুটীরবাসিনী পলাতকার অসহায় পুত্র নন যে, তাঁর পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়লে গুপ্তঘাতক তাঁর ক্ষতি করবে। এবার মিথিলার সৈন্য-বাহিনী নিয়ে তিনি পিতৃব্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন—পুনরুদ্ধার করবেন অজ্ঞাত পিতৃরাজ্য।

মহা আড়ম্বরে উদযাপিত হয়ে গেল বিবাহ উৎসব। মহাজনক স্বর্ণমণ্ডিত শিবিকা পাঠিয়ে দিলেন চম্পানগরে—জননীকে সসম্মানে মিথিলায় আনয়নের উদ্দেশ্যে।

আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে কাহিনীর ঠিক এইখানে আমি গাইডকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলুম, ইস্‌মাইল সা'ব, গল্পের বাকিটুকু আমি অনায়াসেই অনুমান করে নিতে পারছি। এবার গল্প থামিয়ে ছবিগুলির ব্যাখ্যা করুন বরং।

আমার অজন্তা-গাইড মীর্জা ইস্‌মাইল বৃদ্ধ। দাড়িতে হাত বুলিয়ে মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বেশ তো, বলুন না বাবুজি, গল্পটা কী ভাবে শেষ করেছেন জাতককার?

আমি বলি, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। মহাজনক মিথিলার রাজা হলেন, জননীর কাছ থেকে পিতৃব্যের পরিচয় সংগ্রহ করে তাকে বধ করলেন এবং ইংরাজী রূপকথায় যাকে বলে 'and lived happily ever afterwards' তাই করলেন, অর্থাৎ সীবলীকে রানী করে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে থাকেন।

মীর্জা ইস্‌মাইল বলেছিলেন, উহুঁ! না, বাবুজি ঠিক ঠিক মেলেনি। এ গল্প চেকভ,

মোপাসাঁ, টুর্গেনিভ লেখেন নি তা মানছি ; তবে দু-তিন হাজার বছর আগে সৃষ্ট কাহিনীটা ছোট গল্প হিসাবে উৎরেছে ভালই। শেষ পর্যন্ত শুনতে হচ্ছে আপনাকে।

অগত্যা তাই শুনেছিলুম বাধ্য হয়ে। আপনারাও শুনুন :

পল্যাঙ্ককা এসে উপনীত হল রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে। মহাজনক সস্ত্রীক এসে প্রণাম করলেন জননীকে। কিন্তু এ কী? রাজমাতা তো আনন্দের আতিশয্যে জড়িয়ে ধরলেন না ওঁদের? তাঁর দৃষ্টি বিধ্বস্তকুলায় ঝটিকাতাড়িত বিহগীর মত বিহ্বল, তাঁর সমস্ত মুখাবয়বে যেন এক বিন্দু রক্ত নাই!

জননীকে দুই শালপ্রাংশু ভুজদ্বয়ে বেষ্টন করে মহাজনক বলেন—তুমি কি অসুস্থা? পথশ্রমেই কি তোমার এ দশা?

সে কথার প্রত্যুত্তর না করে জননী প্রতিপ্রশ্ন করেন—বিবাহকার্য কি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে?

: হ্যাঁ মা। কিন্তু তুমি কি সুখী হও নি আমার রাজ্যলাভে? এ অনিন্দ্যকান্তি রমণী-রত্নকে পুত্রবধূ হিসাবে লাভ করে তুমি কি তৃপ্ত নও?

জননী কোন প্রত্যুত্তর করেন না। নীরবে প্রবেশ করেন অন্তঃপুরে, তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষে! মহাজনক আহত হন জননীর এই নিরুত্তাপ উদাসীনতায়—ততোধিক মর্মাহতা হল সীবলী, এ উপেক্ষায়।

নবাগতা রাজমাতার সেবাযত্নের কোন ত্রুটি হল না রাজান্তঃপুরে ; কিন্তু বৃদ্ধা জল-স্পর্শমাত্র করলেন না। কিঙ্করীর মুখে সংবাদ পেয়ে ছুটে এল সীবলী, বলে—মা আপনি নাকি সমস্ত দিন উপবাসী আছেন আজ?

জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়েন রাজমাতা, ধিক্কার দিয়ে ওঠেন—দূর হয়ে যা রাক্ষসি!

স্তম্ভিত সীবলী শ্বশ্রূমাতার এ সম্বোধনে দিশেহারা হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে, মহাজনক-জননী বিকৃতমস্তিষ্কা!

সেদিন গভীর রাত্রে গ্রহাচার্যের ডাক পড়ল রাজমাতার নিভৃত কক্ষে। বৃদ্ধ আচার্য দীর্ঘকাল এ রাজপরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী ; যুগে যুগে তাঁকে আসতে হয়েছে এভাবে রাজান্তঃপুরে—গণনা করে বলতে হয়েছে পুরকামিনীদের ললাটলিখন। তাই রাজমাতার আহ্বানমাত্রে আজও তিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর রুদ্ধদ্বার নিভৃত কক্ষে। অনবগুণ্ঠিতা রাজমাতা মণিদীপ তুলে ধরে বলেন—আমাকে চিনতে পারেন মিথিলারাজের একান্ত সখা মহাগ্রহাচার্য?

এ অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হন আচার্য, রাজমাতার বিকৃতমস্তিষ্কের কথা ইতিমধ্যেই কর্ণগোচর হয়েছে তাঁর। ভয়ে ভয়ে বলেন : পারি বই কি রাজমাতা। আপনি চম্পানগর থেকে সদ্য-আগতা মহারাজ মহাজনকের জননী।

রাজমাতা হাসেন। বলেন—আপনি কি শুধু ভবিষ্যৎই দেখতে পান আচার্য? অতীতকে কি দেখতে পান না একেবারেই?

এবার চমকে ওঠেন বৃদ্ধ। ম্লান রত্নদীপের মৃদু আলোয় বলিরেখাঙ্কিত ঐ প্রৌঢ়ার মুখের উপর ফুটে উঠতে দেখেন দীর্ঘ পঞ্চবিংশতিবর্ষ পূর্বেকার আর একটি পুরসুন্দরীর মুখ। তাকে যেন এখানে, এই ঘরেই দেখেছিলেন একদিন! স্তম্ভিত গ্রহাচার্য বলেন—আপনি কি...আপনি কি...

সহসা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে ছিন্নলতার মত লুটিয়ে পড়েন রাজমাতা, আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন : হ্যাঁ তাই। আমিই সেই অভাগিনী নারী! আপনার প্রিয় বন্ধুর পলাতকা স্ত্রী।

ভূকম্পস্পন্দিত ভূধরের মত একবারমাত্র কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে যান গ্রহাচার্য। বলেন—ভাগ্যের কী বিচিত্র খেলা! মিথিলাধিপতি অরিষ্টজনকের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র মহাজনক আজ তার পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট, অথচ মহারাজের পলাতকা রাজমহিষী সে আনন্দের দিনে ভূলুণ্ঠিতা! কেন? না, মহাজনক বিবাহ করেছে তার পিতৃহন্তা পোপজনকের কন্যাকে—আপন পিতৃব্য-কন্যাকে।

সাশ্রুনয়নে রাজমাতা বলেন—আপনি আমাকে পথের নির্দেশ দিন আচার্য। এ অসামাজিক অসিদ্ধ-বিবাহ কেমন করে মেনে নেব আমি?

গ্রহাচার্য তাঁকে বাহুমূল ধরে তুলে বসান, বলেন—তুমি বৃথা মনস্তাপ করছ রাজমাতা। তুমি আমি কুশীলব মাত্র, যে বিচিত্র নাট্যকার অলক্ষ্যে বসে এই অপূর্ব নাটকটি রচনা করেছেন —তিনি আমাদের নাগালের বাইরে। অপ্রতিবাদে তাঁর নাটকে আমাদের অভিনয় করে যেতে হবে শুধু।

রাজমাতা বলেন—কিন্তু আমার স্বামীহন্তা পোপজনকের কন্যা তার পিতৃঋণ শোধ করবে না?

: করবে বৈকি রাজমাতা!

: কেমন করে? মহাজনকের মত স্বামী, মিথিলা-রাজ্যের মহারাণীর বিলাসব্যসনের বিপুল আয়োজন—তার দণ্ডভোগ হবে কেমন করে?

গ্রহাচার্য হেসে বলেন—হ্যাঁ রাজমাতা, বিলাসব্যসনের মধ্যেই সে দণ্ডভোগ করে যাবে। এ বিলাসব্যসন বিষ হয়ে উঠবে তার কাছে। তার কামনার ধন সে কিছুতেই পাবে না।

: আর কি কামনা থাকতে পারে তার?

: নারীজন্মের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সন্তান!

চমকিতা রাজমাতা বলেন—সে কি? কেন?

: কারণ আপনার পুত্র মহাজনক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। কোনও অনাচার তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিজ ভগ্নীর গর্ভে তাঁর সন্তান হবে কেমন করে?

রাজমাতা বলেন—ঠিক কথা। আমি পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেব।

গ্রহাচার্য নিরুত্তর থাকেন।

পরদিনই রাজমাতা ডেকে পাঠালেন পুত্রকে। বললেন—সীবলীকে ত্যাগ করতে হবে। আমি পুনরায় তোমার বিবাহ দেব।

মহাজনক প্রশ্ন করেন—সীবলীর অপরাধ?

: সেকথা শোনার কোন প্রয়োজন নেই তোমার। এ তোমার প্রতি আমার মাতৃআজ্ঞা।

মহাজনক এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলেন—আমাকে মার্জনা কর। তোমার এ আদেশ আমি মানতে পারব না।

স্তম্ভিত রাজমাতা বলেন—তোমার আজন্ম সহচর মায়ের চেয়ে আজ নববধূই বেশী মূল্যবান? এই তোমার শিক্ষা?

মহাজনক বলেন—তুমি ভুল করছ মা। জননীর আদেশের চেয়ে এ দুনিয়ায় আমি কোন কিছুকেই বেশী মূল্যবান বলে মনে করি না। শুধুমাত্র একটি ব্যতিক্রম আছে তার।

: কী সেই ব্যতিক্রম?

: আমার 'ধম্ম'! মাতৃআজ্ঞায় আমি ধর্মকে বিসর্জন দিতে অক্ষম।

নিরুপায় রাজমাতা আবার ডেকে পাঠালেন গ্রহাচার্যকে। বললেন—মহাজনক সীবলীকে ত্যাগ করতে রাজী নয়। কিন্তু এ অসামাজিক বিবাহ কেমন করে মেনে নেব আমি?

গ্রহাচার্য বলেন—তোমার এ প্রশ্নের উত্তর তো আমি পূর্বেই দিয়েছি রাজমাতা। মহাজনক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। সংসারে থাকবে না। কামিনীকাঞ্চনে তার কোন মোহ নেই। নারী-মাত্রকেই সে জননীজ্ঞানে, ভগ্নীজ্ঞানে, শ্রদ্ধা করবে। এমনকি সীবলীর গাত্রস্পর্শও সে করবে না কোনদিন!

সহসা দলিতা ভুজঙ্গীর মত ঋজুভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ান রাজমাতা। বলেন—না! আমি তা হতে দেব না! স্বামীর বংশ আমি নির্বংশ হতে দেব না। সন্ন্যাস নিতে দেব না পুত্রকে। এ অসামাজিক বিবাহের কথা শুধু আমিই জানি। সমাজ জানে না। পাপ যদি কারও হয়, তবে হবে আমার! আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব—কিন্তু পুত্রকে সুখী করতেই হবে।

গ্রহাচার্য মৃদু হাসলেন শুধু।

নিরুপায় হয়ে রাজমাতা ডেকে পাঠালেন পুত্রবধূকে। সভয়ে সুসজ্জিতা নববধূর বেশে সীবলী আবার এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আশ্চর্য, এবার আর কোন তিরস্কার শুনতে হল না তাকে। পুত্রবধূর চিবুক স্পর্শ করে চুম্বন করেন রাজমাতা, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলেন—সব কথা তোমাকে বলতে পারব না। শুধু এটুকু জেনে রাখ—আমার পুত্রের ললাটলিখন সে অকালে সন্ন্যাস নেবে। যেমন করে পার সে ভাগ্যলিখন ব্যর্থ করতে হবে তোমাকে। এই তোমার ব্রত! এই তোমার ধম্ম!

সীবলী শিউরে উঠেছিল সেকথা শুনে। তার মনে পড়ে যায় গ্রহাচার্যের অভিশাপের কথা। মনে পড়ে যায়, গত ত্রিযামা যামিনীর ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতার কথা। মহাজনক এখনও গাত্রস্পর্শমাত্র করে নি এই ভুবনবাঞ্ছিতা রূপদর্পিতা নারীর!

এর পর থেকে শুরু হয়ে যায় এক নূতন অধ্যায় ঐ হতভাগ্য নারীর জীবনে। বিলাসব্যসন ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে আয়োজনের ত্রুটি নাই ; কিন্তু রাজা মহাজনক যেন শুভ্র রাজহংস। সংসারের জলবিন্দু মলিন করে না তাঁর কুন্দশুভ্র পালক। তিনি সর্বদাই কেমন যেন উদাসী অন্যমনা। মণিদীপ্ত প্রমোদভবনের নিভৃতে বিকচযৌবনা দেববাঞ্ছিতা সীবলী প্রণয়মধুর কূজনে মহারাজকে কাছে টানবার চেষ্টা করে, নৃত্যে-গীতে হাস্যে-লাস্যে চুম্বনরভসে ঐ অনাসক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষটিকে বিহ্বল করে তুলতে চায় ;—কিন্তু হায়, মন্দভাগিনী স্বতঃই লক্ষ্য করে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে ঐ তরুণ তাপসের মনের কোণে ঘনিয়ে ওঠে আষাঢ়সঘন জলদস্তবক ; তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়—দিগন্তনিবদ্ধ দৃষ্টিতে, পার্থিব কোন কিছুই আর তখন নজরে পড়ে না তাঁর।

সীবলী বলে : তুমি কি আমাকে পেয়ে সুখী হও নি রাজা?

মহাজনক বলে : তোমার স্নেহের মন্দাকিনীতে অবগাহন করে আমি ধন্য হয়েছি সীবলী! মনে হয়, আমার নিজের কোন ভগ্নী থাকলেও আমাকে এত স্নেহ করত না!

সূর্যোদয়ে পূর্ণেন্দুর মত ম্লান হয়ে যায় রাজকন্যা!

মৃণালভুজের দুটি বাহুতে মহারাজকে বন্দী করে বলে : কিন্তু আমার দেহমনের নিভৃতে প্রেমাস্পদের জন্য কী সম্পদ আমি লুকিয়ে রেখেছি তা তো তুমি দেখতে চাইলে না কোন দিন।

মহাজনক বলে : শুধু তোমার কেন সীবলী, এই জগতের মর্মমূলে কোন্ গোপন রহস্য লুক্কায়িত আছে তাই যে আমি দেখতে চাই। বিশ্বাস কর, এই উপকরণের দুর্গে আমার যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসে, মনে হয় এ রাজৈশ্বর্যের অবরোধের মধ্যে আমার স্থান নয়, আমাকে সুদূর যেন হাতছানি দেয়!

সীবলী গোপনে অশ্রু মোচন করে। দৃঢ়তর করতে চায় তার প্রেমের নিগড়। পরিচারিকাকে বলে—নব আভরণে আমাকে সাজিয়ে দাও কিংকরী। নিয়ে এস ইন্দ্রনীলমণিহার, পরিয়ে দাও মণিখচিত স্বর্ণমেখলা, অলক্তকরাগরঞ্জিত আমার চরণে দাও কলহংসকণ্ঠ-নিঃস্বনমধুর নূপুর।

প্রসাধনদক্ষতার অনলস রূপসজ্জায় কোন ত্রুটি থাকে না। রানীর সীমন্তে এঁকে দেয় বালার্কবিন্দু, স্তবকিত মেঘভারের মত অলকগুচ্ছে দেয় পুষ্পাভরণ, যৌবনের যুগ্ম-জয়-স্তম্ভের উপর রচনা করে কুংকুম-চন্দনের বিচিত্র আলিম্পন!

মহারাজ দেখে মুগ্ধ হন, বলেন—আহা কী সুন্দর! যেন স্বর্গের দেবী!

শুনে মরমে মরে যায় পোপজনকতনয়া। আর্তকণ্ঠে বলতে চায়—ওগো না না, দেবী নয়, চেয়ে দেখ, আমি মর্ত্যের সামান্যা মানবী। আমার প্রতি রোমকূপে কামনার শিহরণ, আমার প্রতি অংগে সৃষ্টির অভিলাষ, আমার শোণিত-সমুদ্রে আজ মিলন-তৃষিত যৌবন-জোয়ার!

কিন্তু অনাঘ্রাতা কুমারীর অধরোষ্ঠ কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারে না সেই নির্লজ্জ ভাষা! বুক ফাটে, তবু তার মুখ ফোটে না!

রাজনটীকে নির্দেশ দেয়—নিত্য নবীন সাজে, নিত্য নূতন নৃত্যভঙ্গিমায় মহারাজের চিত্ত-বিনোদন করতে। কিন্তু রাজর্ষি মহাজনকের মৌন প্রশান্তি তাতে একতিল বিচলিত হয় না। দিন যায়, মাস যায়, ঋতুচক্র ঘুরে ঘুরে আসে—উর্বশী-নিন্দিত রূপের পশরা সাজিয়ে সীবলী

বৃথাই প্রহর গণে। মহাজনকের স্নেহ-করুণালাভে সে বঞ্চিতা নয় ; কিন্তু সে যেন ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার প্রেম ! এ লজ্জার কথা, এ পরাজয়ের কথা কাউকে বলতে পারে না প্রাণ খুলে —নিকটতমা সখীর কাছেও নয়।

অন্তরঙ্গা বয়স্যার দল প্রশ্নবাণে জর্জরিতা করে তোলে তাদের প্রিয় সহচরীকে। তারা জানতে চায় সদ্যোবিবাহিতা যৌবনবতীর প্রতি-রজনীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। সকৌতুকে ওরা কলকণ্ঠে প্রশ্ন করে : অত সংক্ষেপে বললে চলবে না রাজকুমারী, আরও বিস্তারিত করে বল। সে প্রশ্নে অনাদৃতা রাজনন্দিনীর হৃদ্‌পিণ্ড যেন নিষ্পেষিত হয়ে যায়। মন্দভাগিনী মিথ্যার কুহক রচনা করে। স্বকপোল-কল্পিত মিলনের বর্ণনা দেয়—যে মিলন আজও হয়নি, যার স্বপ্ন দেখে সে প্রতি রাত্রে মহারাজের পার্শ্বে একাকী রাত্রিযাপনে।

কিন্তু তদপেক্ষা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ওকে যখন নিষ্ফলা মিলন-রাত্রির অবসানে দ্বার খুলে বেরিয়ে এসে দেখে অলিন্দের একান্তে অপেক্ষা করছেন মহাজনক-জননী। পুত্রবধূকে বুকে টেনে নিয়ে যখন তিনি একান্ত আগ্রহে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে থাকেন : আমার কাছে কিছু গোপন কর না মা, বল, সত্য করে বল, কবে দেখতে পাব মিথিলারাজ্যের উত্তরাধিকারীকে? কবে তুমি সফল করবে আমার স্বপ্ন!

সে প্রশ্নের গরলে জর্জরিতা হয়ে যায় যৌবনদৃপ্তা সীবলীর কম্রতনু।

মন্দভাগিনী অনুভব করে আর বিলম্ব করা অনুচিত। মধুমাসের এক পূর্ণিমারাত্রে সে যেন প্রগল্‌ভা বারবণিতার মত উদ্দাম হয়ে ওঠে। প্রসাধনদক্ষার রূপসজ্জাকে নিক্ষেপ করে দূরে। খুলে ফেলে রক্তাম্বরা পট্টবস্ত্র, ময়ূরকণ্ঠিবর্ণা মেখলাবাস, অন্তর্বাসের চম্পকচীনাংশুক। সদ্যোস্নাতা নিরাবরণার বেশে সজ্জিত করে অনিন্দ্যসুন্দর বরতনু। মণিস্তবকিত বেণীতে দেয় ইন্দ্রনীলের চন্দ্রকণা, কম্বুকণ্ঠে দুলিয়ে দেয় মৌক্তিকনির্ঝর শতনরী, অপাবৃত গুরু-নিতম্বে ঝুলিয়ে দেয় মাণিক্যখচিত স্বর্ণমেখলা!

মণিদীপজ্বালা প্রমোদকক্ষে রত্নসিংহাসনে যেখানে প্রতীক্ষা করছিলেন মহাজনক ধীর পদে সেখানে এসে দাঁড়ায়। অপাপবিদ্ধ দুটি মুগ্ধনয়ন তুলে মহারাজ দেখতে থাকেন এই অপরূপা নারী মূর্তিটিকে—নিরাবরণার সকুণ্ঠ লাজনম্র ভঙ্গী। সীবলী বসে পড়ে তাঁর পাশে—লুটিয়ে পড়তে চায় আশ্লেষ-শয়নে ; কিন্তু দেখে উদাসী আনমনা হয়ে গেছেন মহারাজ!

আর্তকণ্ঠে রত্যাতুরা সীবলী বলে : আজ আমাকে দেখে তোমার মনে কোন বাসনা—কোন কামনা জাগছে না মহারাজ?

দূর-দিগন্তে-নিবদ্ধদৃষ্টি রাজর্ষি বলেন—জাগছে সীবলী! ইচ্ছা করছে আমার মন্দিরের দেবীপীঠে বসিয়ে তোমাকে আজ পূজা করি!

যেন এক আর্ত হাহাকারে ভেঙে পড়ে সীবলী। এতক্ষণে মনে হয়, সে রতি-মন্দির দর্শনা-ভিলাষী তীর্থযাত্রিণীর মত নিরাবরণা নয়, সে প্রগল্‌ভা নির্লজ্জা বারবণিতার মত নগ্নিকা! দু হাত বাড়িয়ে খুঁজতে থাকে তার লাজবস্ত্র!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একদিন গোপনে মহারাজ বেরিয়ে গেলেন হস্তিপৃষ্ঠে হিমাবলী পর্বতের সানুদেশে এক সন্ন্যাসীর দর্শনমানসে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। গুরু-শিষ্যে কি কথোপকথন হল জানি না, কিন্তু মহারাজ প্রাসাদে ফিরে এলেন যেন অন্য মানুষ। রাজমাতা সীবলীকে জনান্তিকে ডেকে বলেন : ছি ছি ছি! কেন মুহূর্তের জন্যও শিথিল করেছিলে তোমার আলিঙ্গনপাশ—কেন ওকে যেতে দিলে ঐ সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে?

কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। মহাজনক তাঁর মনোবাসনার কথা অকপটে জানালেন সীবলীকে। এতদিনে তিনি পথের সন্ধান পেয়েছেন। এ রাজৈশ্বর্যের বিলাসব্যসনে তাঁর অভিরুচি নেই—তিনি সন্ন্যাস নেবেন। উপকরণের এ দুর্গটিকে ত্যাগ করে যাবেন তিনি।

সীবলী আর্তকণ্ঠে বলে : উপকরণের দুর্গ কাকে বলে মহারাজ? এ রাজপ্রাসাদ, এ ঐশ্বর্য কেন ঘৃণার্হ?

মহাজনক বলেন—সে তো তুমি বুঝবে না সীবলী। সে তো কথায় বোঝানো যায় না।

: তবে কেমন করে বোঝা যায়?

: সময় যখন হবে তখন আপনি বুঝবে।

এ-মর্মান্তিক দুঃসংবাদে মহাজনক-জননী শয্যা নিলেন। আর উঠলেন না! তবু মহাজনক রইলেন অটল। বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী সীবলীর অশ্রুবন্যায় ভেসে গেল মেদিনী, তবু মহারাজ তাঁর সঙ্কল্পে অটল। অশ্বপৃষ্ঠে তিনি রাজধানী ত্যাগ করে গেলেন। তাঁর প্রিয় প্রজার দল শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করে তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এল রাজ্য-সীমান্ত পর্যন্ত। সংবাদ পেয়ে উন্মাদিনীর মত ছুটে এল উপেক্ষিতযৌবনা সীবলী, আর্তকণ্ঠে বললে—আমাকেও সঙ্গী করে নাও। আমি তোমার সাধনার পথে অন্তরায় হব না। বিশ্বাস কর।

মহাজনক বলেন—এ পথ তোমার নয় শুচিস্মিতে! এ যে আমার একলা চলার পথ!

আর্তকণ্ঠে সীবলী বলে—আমি এখানে কি নিয়ে থাকব? স্বামী বনবাসী, সন্তানলাভে বঞ্চিতা এ নারী কি অবলম্বন করে বেঁচে থাকবে এর পর?

অবিচলিতকণ্ঠে মহাজনক বলেন, 'ধম্ম'-ই মানবমাত্রের অবলম্বন।

সীবলী শেষ আর্তনাদ করে ওঠে—আমি মানব নই মহারাজ, আমি মানবী! আমি সন্তান চাই, মাতৃত্ব চাই,—মানবীর তাই যে ধর্ম মহারাজ। আপনার স্বর্গগতা জননীর কাছে আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ধুলায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে সীবলী। দীর্ঘ সময়। কেউ তাকে বাহুমূল ধরে উঠিয়ে বসায় না। অবশেষে সে নিজেই উঠে বসে। দেখে, বিজন প্রান্তরে সে একাকী! মহাজনক চলে গেছেন তাঁর মহাপ্রস্থানের পথে।

সীবলী উঠে দাঁড়ায়। মনস্থির করে। মহাজনক যদি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, তবে সে-ও সিদ্ধকাম হতে পারবে সাধনার পথে। মহাজনক-জননীর কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মহাজনক-পুত্রকে সে জঠরে ধারণ করবে।

একে একে সীবলী খুলে ফেলে তার রত্নাভরণ, কেয়ূর-কণ্ঠী-মণিবলয়-সীমন্তী-মেখলা। স্বর্ণখচিত চীনাংশুকের পরিবর্তে অঙ্গে তুলে নেয় ভিক্ষুণীর পীত অজিন। জলদস্তবক-নিন্দিত কেশভার চ্যুত হয় মস্তক থেকে। মুণ্ডিতশীর্ষা শ্রমণীর বেশে প্রস্তুত হয় সে। বিদ্যায় হয় নি, রূপে হয় নি, ভালবাসায় হয় নি—এবার অভাগিনী মেয়েটি শেষ চেষ্টা করে দেখবে, তপস্যায় হয় কি না! মিথিলা-রাজ্যের সীমান্তে এক আম্রকাননে, ঠিক যে স্থানটিতে প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে মিথিলাধিপতি তাঁর রানীকে শেষ সম্বোধন করে বিদায় নিয়েছিলেন, ঠিক তার পাশেই তৈরি করে নেয় মৃত্তিকালিপ্ত এক পর্ণকুটীর। ভিক্ষুণীর আবাসস্থল।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন মহামন্ত্রী আর বৃদ্ধ গ্রহাচার্য। মহামন্ত্রী বলেন, এ কঠোর তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য কী রানী?

সীবলী বলে, আর রানী নয় মহামন্ত্রী, আমি এক সামান্যা ভিক্ষুণী! গ্রহাচার্যের দিকে ফিরে বলে, অনেক প্রগল্‌ভতা করেছি, ক্ষমা করুন, তবু যাবার আগে বলে যান, আমি কি আমার তপস্যায় সিদ্ধকাম হতে পারব না?

: কী তোমার কামনা সীবলী?

: মহারাজের পুত্রকে জঠরে ধারণ করা। স্বর্গগতা মহারাজ-জননীর কাছে আমি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ!

গ্রহাচার্য ম্লান হেসে বলেন, তুমি কি ভেবে দেখছ সীবলী, তোমার সিদ্ধিলাভ মানেই মহারাজের ব্রতচ্যুতি?

অচঞ্চল দীপশিখার মত যুক্তকরে সীবলী বলে ওঠে : আচার্যদেব! মহারাজের কী ব্রত আমি জানতে চাই না। আমি চলেছি আমার ধর্মপথে! মাতৃত্ব-ধর্মের চেয়ে নারীজন্মে বড় ধর্ম নাই! আপনি বলুন ত্রিভুবনে কি এমন শক্তি আছে, যে আমাকে এই একনিষ্ঠ সাধনা থেকে চ্যুত করতে পারে? আমার সিদ্ধিলাভে অন্তরায় হতে পারে?

গ্রহাচার্য আশীর্বাদ করে বলেন, তোমার মুখে আজ স্বর্গের দ্যুতি দেখতে পেয়েছি সীবলী! তোমাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারে ত্রিভুবনে এমন শক্তি নাই! তুমি সিদ্ধকাম হবেই।

মহামন্ত্রী শিউরে উঠে বলেন, কী বলছেন আচার্যদেব! তাহলে কি ব্রাত্য হবেন মহাজনক? তিনি যে স্বয়ং বোধিসত্ত্ব!

: না! তিনিও সিদ্ধিলাভ করবেন তাঁর কঠোর সাধনায়। চিরকৌমার্যব্রত অমলিন থাকবে তাঁর!

মহামন্ত্রী বিহ্বলের মত বলেন, মার্জনা করবেন গ্রহাচার্য, এবার যে আমাকেই বলতে হচ্ছে—আপনার ভবিষ্যদ্বাণীর কোন যুক্তিনির্ভর পারম্পর্য থাকছে না!

এবার আর রাগ করেন না গ্রহাচার্য। বলেন, অযৌক্তিক কথা আমি বলি নি মন্ত্রীপ্রবর! জম্বুদ্বীপের অযুত পাণিপ্রার্থীর কাছে যে সমস্যা ছিল সমাধানের অতীত, দেখেছ নিশ্চয় মহাজনকের কাছে তা মনে হল সহজ সরল। তেমনি তোমার-আমার কাছে যা নাকি মনে হচ্ছে সমাধানের অতীত সমস্যা—বিশ্বপ্রপঞ্চের এক অলক্ষ্য নাট্যকারের কাছে তাই সহজ সরল। মহাজনক এ জন্মে চরমসিদ্ধি লাভ করতে পারবেন না। তবু সাধনমার্গে অগ্রসর হয়ে যাবেন অনেকখানি। বহু জন্ম পরে শাক্যবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন সিদ্ধার্থ গৌতমরূপে। সেই জন্মেই তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবেন—হবেন বুদ্ধদেব! মহাপরিনির্বাণ লাভ করবেন সেই জন্মে। তেমনি মা সীবলীও এ জন্মে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন না। তবে তিনিও অগ্রসর হয়ে যাবেন অনেকটা পথ—তাঁর মাতৃত্ব-তীর্থের পথে! বহু জন্ম পরে তিনিও আবার আবির্ভূতা হবেন এই ধরাধামে সুপ্রবুদ্ধতনয়া যশোধরার ভূমিকায়। সেই জন্মে মহাজনককে মিটিয়ে দিতে হবে সীবলীর দাবী! সীবলী সেই শেষ জন্মে জঠরে ধারণ করবেন রাজপুত্রকে! সেই ভুবন-বিজয়ী পুত্রের নাম হবে রাহুল!

সীবলী তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে বলে, রাহুল! রাহুল! এই আশীর্বাদই করুন!

মহামন্ত্রী বলেন, কিন্তু এ পর্ণকুটীর কেন মা? ঐ অপরূপ চৈত্যগৃহের উপযুক্ত স্ফটিক-নির্মিত সংঘারাম নির্মাণ করিয়ে দিই আমি। তুমি সেখানেই তপস্যা কর।

সীবলী হেসে বলে : কিন্তু সে স্ফটিকনির্মিত উপকরণের দুর্গে যে আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসবে মহামন্ত্রী!

মহামন্ত্রী বলেন : তোমার কথা যে আমি বুঝতে পারছি না মা। উপকরণের দুর্গ কাকে বলে?

অতি দুঃখেও সীবলীর ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে অস্তচন্দ্রের মত ম্লান হাস্যরেখা। বলে—এ কথার অর্থ যে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না বিপ্রবর!

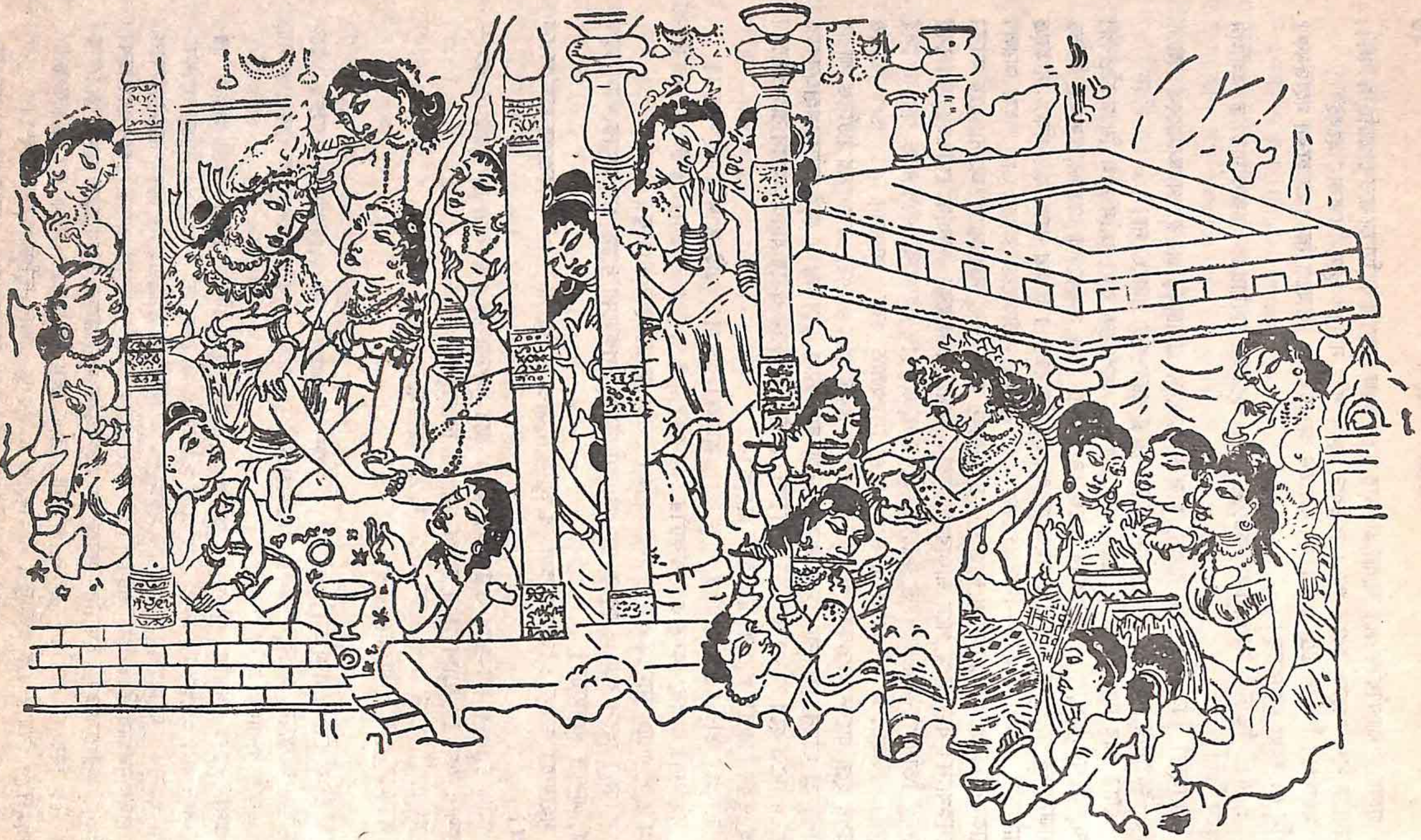
মহামন্ত্রী বলেন : তবে কী দিয়ে বুঝতে হয় মা?

সীবলী বলে : জীবন দিয়ে!

জাতকবর্ণিত মূলকাহিনী ঐটুকুই। অজন্তার শিল্পী এই কাহিনীটুকু অবলম্বন করে রূপায়িত করেছেন অপরূপ একটি চিত্র-কাহিনী (১।২ক—১।ঙ)। দেওয়াল চিত্র তো নয়, যেন একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক।

প্রথম অঙ্কে দেখছি (চিত্র—৬ অর্থাৎ ১।২ক), মণিদীপিত প্রমোদভবনে একটি রত্ন-সিংহাসনে বসে আছেন মহাজনক এবং রানী সীবলী। এ যেন সেই মধুমাসের বিচিত্র পূর্ণিমা-রাত্রির ঘটনা। মহারাজের সর্বাবয়বে মহামূল্য অলঙ্কারের সমারোহ। কিন্তু রানীর অঙ্গে নেই প্রসাধনদক্ষার নির্বাচিত পট্টবাস। ওঁদের ঘিরে রয়েছে নয়জন পরিচারিকা—ছত্রধারিণী, ব্যজনিকা, করঙ্কবাহিনী ইত্যাদি। সীবলীর দক্ষিণহস্ত মহারাজের বামজানুতে ন্যস্ত, আশ্লেষ-শয়না এই বিবসনা নারীর অঙ্গের প্রতিটি রেখা যেন মহারাজের দিকে ছুটে যেতে চায়। আত্মসমর্পণে উন্মুখ এক রত্যাতুরা নারীমূর্তি। কিন্তু রাজার দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ।

বেশ বোঝা যায়, সে দৃষ্টি উদাসীনের, বীতরাগ নিস্পৃহের। প্রমোদকক্ষে কয়েকটি



চিত্র—৬ ॥ মহাজনক জাতক—প্রমোদকক্ষে মহাজনক ও সীবলী (অবস্থান—1|2A)।

অলংকৃত স্তম্ভ, উপর থেকে ঝুলছে মুক্তামালা। রাজার সম্মুখে একটি পিকদানী, নিম্নাংশে ইটের গাঁথনিতে জোড়াইয়ের কাজ নিখুঁত। দূরে একটি প্রাসাদের ইন্দ্রকোষ। আলন্দের এ প্রান্তে একটি স্তম্ভের কাছে দুটি সখীতে কি নিয়ে যেন জল্পনা করছে, বোধ করি ওরা রাজারানীর অন্তর্দ্বন্দ্বের কিছুটা আভাস পেয়েছে। দ্বারের বাহিরে রাজনর্তকী তার গীত-বাদ্যের সহচরীদের নিয়ে প্রতীক্ষা করছে—ইঙ্গিতমাত্র যেন শুরু হয়ে যাবে নৃত্যগীতের আসর। রাজনটীর কবরী কুসুমসজ্জিত, অঙ্গে তার বুটিদার পুরো-হাতা জ্যাকেট, তার নয়নকোণে বিলোল কটাক্ষ।

দ্বিতীয় অঙ্কে নীচের প্যানেলে দেখছি, রাজা হস্তিপৃষ্ঠে চলেছেন সন্ন্যাসীর দর্শনমানসে। তিনি একটি তোরণদ্বার অতিক্রম করছেন। বলা বাহুল্য, এটি রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণ-দ্বার (১।২খ)।

তৃতীয় অঙ্কে দেখছি, হিমাবলী পর্বতের পাদমূলে মহাজনক বসে আছেন মহাসন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে (১।২গ)। যুক্তকর তাঁর মূর্তিটি সত্যই সত্যান্বেষী মুমুক্ষুর। সন্ন্যাসীর হাতে জপমালা, মাথায় জটাভার, বসে আছেন বনকুসুম-লাঞ্ছিত এক প্রস্তরাসনে। তাঁর চরণতলে দুটি উন্মুখ মৃগশিশু ঊর্ধ্বমুখে যেন তার মুখ-নিঃসৃত বাণী শুনছে। এ ধর্মপ্রচারের দৃশ্যটি আঁকবার সময় কি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অবচেতন মনে সারনাথ-মৃগদাবে গৌতমবুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারের কথা জাগরূক হয়েছিল? তাই কি এই দুটি মৃগশিশু এ চিত্রের আবশ্যক অঙ্গ হয়ে পড়েছে?

তারপর চতুর্থ অঙ্কের আগে দেখছি, একটি ছোট গর্ভাঙ্ক দৃশ্য। মহাজনক-জননী সীবলীকে ভৎসনা করছেন। যুক্তকরে সীবলী তার অপরাধ স্বীকার করছে। (চিত্র—৭; ১।২ঘ বামপ্রান্তে)।

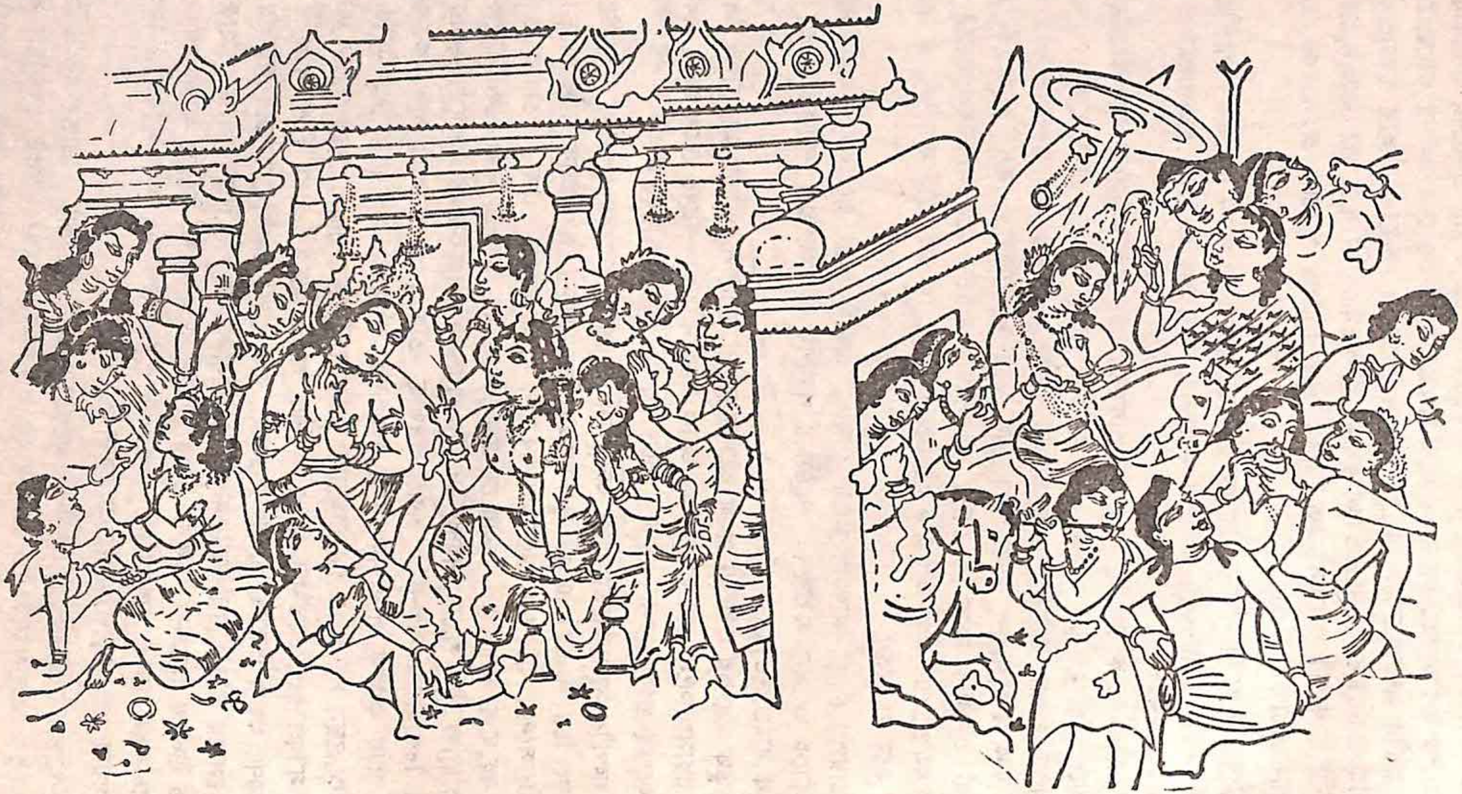
চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্যপট প্রথম অঙ্কের মত। সেই সুশোভিত মণিদীপজ্বালা প্রমোদকক্ষ। সেই রত্নসিংহাসনে বসে আছেন মহাজনক আর সীবলী—যাঁদের দেখেছিলাম নববিবাহিতরূপে এই কক্ষেই প্রথম দৃশ্যে। কিন্তু পটভূমির কি বিরাট পরিবর্তন!

শিল্পীর সূক্ষ্মহাতের কাজ অনুধাবন করতে হলে প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্যটির (অর্থাৎ চিত্র ৬ এবং চিত্র ৭-এর) একটি তুলনামূলক সমালোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্বদৃশ্যে দেখেছি সদ্যোবিবাহিত মহাজনকের সর্বাঙ্গে মণিমাণিক্যের প্রাচুর্য। তাঁর কণ্ঠে ক্রমান্বয়ে তিন সারি বহুমূল্য মণিহার। এবার সেখানে দেখছি মাত্র একছড়া মালা—যেন রুদ্রাক্ষ! পূর্বদৃশ্যে রাজার দৃষ্টি ছিল শূন্যে নিবদ্ধ, উদাসীন পথভ্রান্ত পথিকের আবিল দৃষ্টি—তার দক্ষিণহস্তের মুদ্রায় দিশাহারার ব্যঞ্জনা। এবারে দেখছি, তাঁর দৃষ্টি মেদিনীনিবদ্ধ, করুণায় আপ্লুত। এবার তাঁর করাঙ্গুলিতে দিশাহারা পথভ্রান্ত নাবিকের অভিব্যক্তি নেই—দুটি হাতে তিনি রচনা করেছেন সুবিখ্যাত ধর্মচক্রমুদ্রা! তিনি যে পথের সন্ধান পেয়ে গেছেন এবার! অপর-পক্ষে, সীবলীর পরিবর্তনটা আরও অর্থবহ, আরও করুণ : প্রথম দৃশ্যে সীবলী ছিল বস্তুতঃ নিরাবরণা, অথবা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃতা, রাজপুত্রের বামজানুতে তাঁর দেহভার ছিল ন্যস্ত। তিনি সেবার তাঁর সুরসুন্দরী-নিন্দিত যৌবনোদ্ধত রূপের শিকল পরিয়ে মহাজনককে বেঁধে রাখতে উন্মুখ ছিলেন। কিন্তু এবার দেখছি, তাঁর অঙ্গে উঠেছে লজ্জাবরণ। তিনি আর আশ্লেষ-শয়না নন। মহারাজের সংকল্পের দৃঢ়তা উপলব্ধি করে সীবলীও নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত ঋজুভঙ্গিমায় উপবিষ্টা।

এ পাশের দেওয়ালে (১।৩) শিবি জাতকের একটি কাহিনী। জাতক-বর্ণিত শিবি কাহিনী কিন্তু নয়। মহাভারতে শিবিরাজার যে উপাখ্যানটি আছে তাকেই রূপায়িত করা হয়েছে।

শিবি জাতক

মহারাজ শিবি বসে আছেন রত্নসিংহাসনে। তাঁর একহাতে শরণাগত কবুতর, সম্মুখে শ্যেনপক্ষী। পরের প্যানেলটিতে দেখছি মহারাজ নিজ অঙ্গ থেকে মাংস কেটে নিয়ে তুলাদণ্ডে ওজন করছেন। চিত্রটি অনেকাংশে নষ্ট হয়ে এসেছে।



চিত্র—৭ ॥ মহাজনক জাতক—মহাজনক প্রব্রজ্যাগ্রহণের সংকল্প জানাচ্ছেন/মহাজনকের মহানিষ্ক্রমণ (অবস্থান—1|2D)।

সঙ্ঘপাল ও মহাজনক জাতকের চিত্র-সম্বলিত প্রাচীরের সম্মুখে যে ছয়টি স্তম্ভ আছে, তার শীর্ষদেশগুলি লক্ষণীয়। কোথাও নাগরাজা স্তূপমূলে প্রণাম করছেন (১।৪)। কোথাও দুটি যুযুধান ষণ্ডের যুদ্ধদৃশ্য (১।৫)। বলদর্পী যুগ্মষণ্ডের প্রতি অঙ্গে মাংসপেশী প্রকটিত। কোথাও বা ষড়ভুজ বামন মূর্তি (১।৬)।

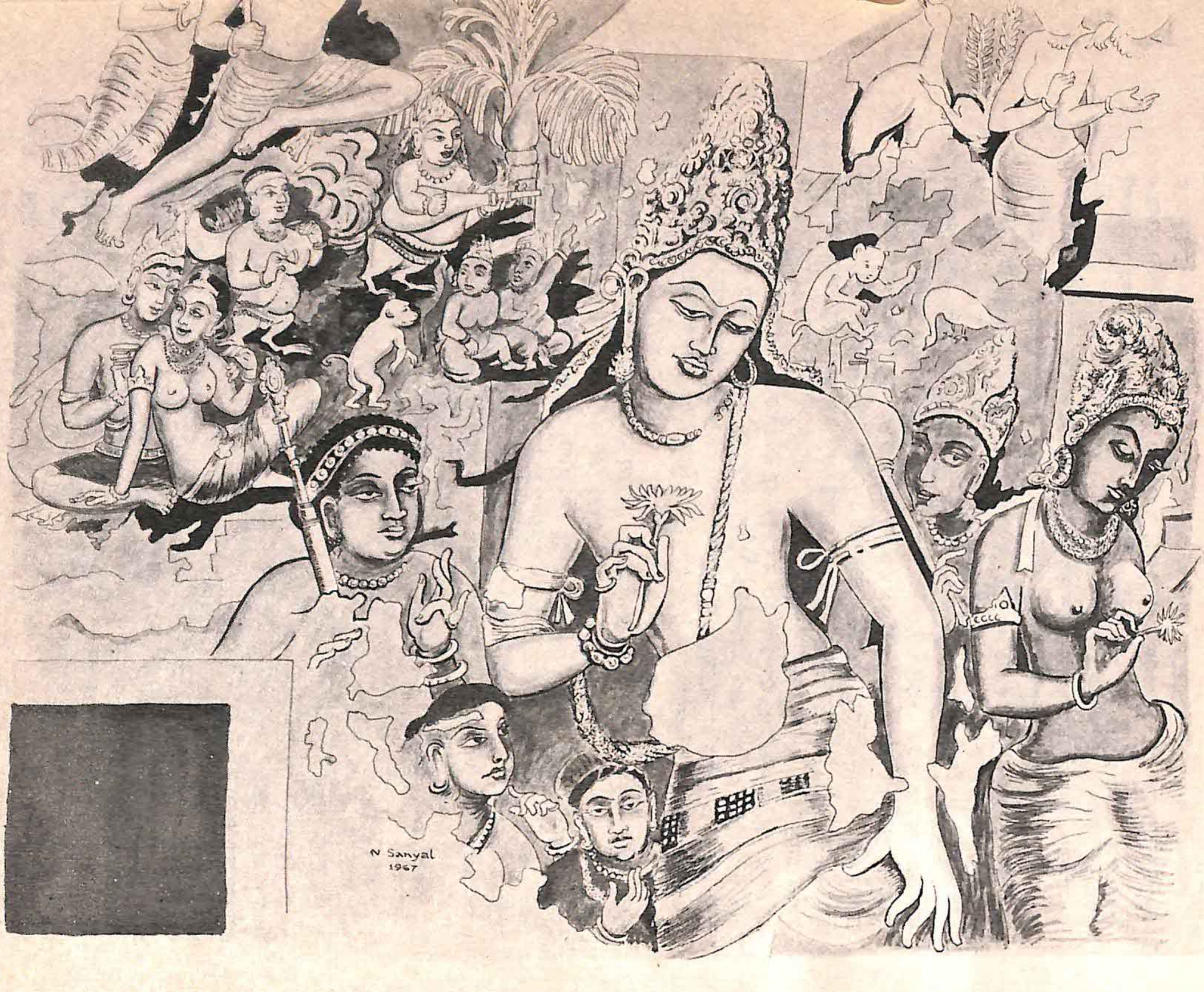
মন্দির-স্থপতির ভাষায় মূল-গর্ভমন্দিরের সম্মুখস্থ ছোট কক্ষটিকে বলা হয়—'অন্তরাল'। এ গুহায় অন্তরালের প্রবেশপথে দুদিকে দুটি বিরাটাকার বোধিসত্ত্বের আলেখ্য! একদিকে অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির (১।৮ ক) আলেখ্য, অপরদিকে বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির চিত্র (১।৯)। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালুম বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির সম্মুখে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এ পদ্মপাণিকে বর্ণনা করার মত কলম, অথবা এঁকে দেখাবার মত তুলি আমার নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি এ চিত্রে এমন একটা কিছু আছে যার জন্য এঁর সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা যায়। বারে বারে ফিরে ফিরে এঁকে দেখলেও চোখ ক্লান্ত হয় না—পীড়িত হয় না। অজন্তায় একাধিক চিত্র আছে যা নাকি শুধু রেখা দিয়ে বা রঙ দিয়ে আঁকা নয়—যেন তার মধ্যে হাজার বছর ধরে বন্দী হয়ে আছে শিল্পীর একটি অনুক্ত কথা, একটি অপ্রকাশিত ধ্যানের মন্ত্র! যা খোলা নয়, ঢাকা। তবু তা যে আছে তা অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায় শ্রদ্ধানম্র ঐকান্তিকতা নিয়ে ঐ চিত্রের সামনে এসে দাঁড়ালে। এ চিত্রটি সেই জাতের। বিশাল হ্রদের গভীরতা যেমন তার উপরিভাগের নিস্পন্দ রূপরেখায় ব্যক্ত হয় না, যেমন তা অনুমাননির্ভর—এই অবলোকিতেশ্বর মূর্তির ভাবের ব্যঞ্জনাও তেমনি অনুভূতিসাপেক্ষ। বোধ করি একেই আচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন —চিত্রের প্রাণ, তার ব্যঙ্গ!

এই চিত্রে সেই ব্যঙ্গের মর্মবাণী উদ্ঘাটন করতে পারব না, তবে বহিরঙ্গের বা রূপরেখার কিছুটা আভাস দেওয়া যেতে পারে। চিত্র—৮ হচ্ছে সেই অপটু-প্রয়াশের ফলশ্রুতি। এ চিত্রটির মর্মোদ্ঘাটন করতে হলে অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির দার্শনিক তত্ত্বটাকে বুঝে নিতে হবে। অবলোকিতেশ্বর একজন বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধদেবের আংশিক অবতার, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন—এ বিশ্বপ্রপঞ্চের যাবতীয় জীবের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত নির্বাণ-লাভে সচেষ্ট হবেন না। তিনি মুমুক্ষু, কিন্তু জগতের সব পাপী-তাপীকে নিয়েই তাঁর মুক্তিমার্গে অভিযাত্রা। এজন্য তাঁর চরিত্রে একটা বৈপরীত্য আছে—সব পাওয়া ও সব হারানো। বোধিসত্ত্বের ঐ দ্বৈতসত্তা—রাজসিক ও সাত্ত্বিক-সত্তার-সহাবস্থান-টিকে অপূর্ব দক্ষতায় মূর্ত করেছেন অজন্তা শিল্পী। অবলোকিতেশ্বরের উন্নত মস্তকে পরিয়েছেন রত্নখচিত রাজমুকুট, কণ্ঠে দুলিয়ে দিয়েছেন মুক্তার শতনরী, সর্বাবয়বে আভিজাত্যের ব্যঞ্জনা। তবু ওঁর আনত-দৃষ্টিতে, করুণাঘন আননে ত্যাগের মহিমা, তিতিক্ষার বিগলিত ধারা। মূলমূর্তির পশ্চাৎপটটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিল্পী সেখানে মহান বিশাল কিছু আঁকেন নি—তারকাখচিত নৈশ আকাশের অসীমতা, ধ্যানস্তিমিত তুষারমৌলী পর্বতমালার গাম্ভীর্য অথবা দিগন্ত-অনুসারী মহাঅর্ণবের কোন পরিকল্পনা নেই সেই পশ্চাৎপটে। আছে—এই দুনিয়ার ছোট-ছোট হাসি-অশ্রুর ঘরোয়া টুকরো : গন্ধর্ব, কিন্নর-কিন্নরী, ক্রৌঞ্চ-মিথুন, উল্লম্ফনরত বানর, নবকিশলয়-সজ্জিত পাদপ এবং প্রাসাদ-তোরণ। সমস্ত পশ্চাৎপট যেন সোচ্চারে ঘোষণা করছে : 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।'

অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি

ঐ সঙ্গে দেখুন, অবলোকিতেশ্বরের বামে আছেন এক শ্যামাঙ্গিনী। পদ্মপাণির নায়িকা শক্তিমূর্তি, প্রায় নিরাবরণা, অথচ মাতৃত্ব-ভাব ছাড়া ঐ অনাবৃতার তনুদেহে অন্য কোন লাস্যময়ীভাবের বাষ্পমাত্র নাই। পশ্চাৎপটের ঐ অসংখ্য খণ্ডচিত্রের প্রসঙ্গে জার্মান পণ্ডিত ডক্টর জিমার বলছেন, "ওরা যেন সব শরতের মেঘ ; মূলমূর্তিটিকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। তবু ওদের আপাত-অসঙ্গতির মধ্যেও কি জানি-একটা ছন্দ আছে—ওরা পরস্পরের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এ মেঘসম্ভারে নেই বৈপরীত্যের আভাস।"—ঐ প্রতীকটিকে আরও



চিত্র—৮ ॥ অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি (অবস্থান—1|7A)।

একটু বিস্তার করে আমরা বলতে পারি—'শরতের পুঞ্জীভূত মেঘস্তূপ যতই ঘননিবদ্ধ হ'ক না কেন, তারা সারা আকাশকে চিরকাল কিছুতেই আড়াল করে রাখতে পারে না। শরৎসূর্যের বৈদূর্যদীপ্তি সে জলদ-সম্ভার ভেদ করে বেরিয়ে আসবেই।'—এখানেও তাই হয়েছে।

পাশ্চাত্য-শিল্প-দেখার অভ্যস্ত চোখে হয়তো আমরা এ-চিত্রে কোথাও কোথাও শারীর-সংস্থানের ত্রুটি বা 'এ্যানাটমিক্যাল-ডিফেক্ট' দেখতে পাব। যেমন ডান হাতের কনুই অথবা বাঁ-হাতের কাঁধের কাছে। আসলে এগুলি যে ত্রুটি নয় তা বোঝা যাবে যখন পরবর্তী নবম পরিচ্ছেদে ভারতীয় চিত্রের ধ্যান-ধারণার কথা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত এটুকু বলে রাখি যে, ভারতীয় চিত্রশিল্পী বাস্তবানুগ চিত্র আঁকার চেয়ে কাব্য-প্রতীকী প্রতিরূপ আঁকার দিকে বেশি উৎসাহী। সংস্কৃত-কাব্যে আজানুলম্বিত বাহুর সঙ্গে কবিরা করিকুম্ভের তুলনা করে থাকেন। চিত্র—৯৩।ক-তে আমরা সেইটাই দেখাবার চেষ্টা করেছি। অবলোকিতেশ্বরের ভঙ্গিতে দাঁড়ালে রঞ্জনরশ্মিতে অস্থি-সংস্থান কেমন দেখা যাবে এবং বাস্তব-মডেলের আলোকচিত্র-ধর্মী দেহাকৃতি কেমন দেখাবে তা আমরা পাশাপাশি এঁকে দেখাবার চেষ্টা করেছি। হস্তিকুম্ভের প্রতীক থেকে দুটি বাহুর বহিরঙ্গ রেখা কী-ভাবে তরঙ্গায়িত হয়েছে তাও দেখানো হয়েছে। ভাব-সাযুজ্যে চিত্রের এই রূপান্তর ঘটানোকে বলা হয়—'সাদৃশ্য', যেটি ভারতীয় চিত্রের ষড়ঙ্গের অন্যতম অঙ্গ।

অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির পাশের একটি প্যানেলে ছিল নাগলোকের কিছু দৃশ্য। চিত্রগুলি নিঃশেষে অবলুপ্ত। একটি প্রাচীন অনুলিপি দেখে একটি খণ্ডদৃশ্য এখানে অনুকৃত করে দিলাম (চিত্র—৯)। কম্পোজিশনের কেন্দ্রে আছেন নাগরাজা ও রানী। তাদের ঘিরে আছে নয়জন নরনারী, বিভিন্ন ভঙ্গিতে। রাজারানীর এই যুগল মূর্তির সঙ্গে অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি চিত্রে (চিত্র—৮) গন্ধর্ব-দম্পতির চিত্রটি তুলনীয়। তা-ছাড়া এ-ছবিটির সঙ্গে সপ্তদশ-বিহারে বিশ্বান্তর-মাদ্রীর (চিত্র—৬০) যুগল মূর্তিটিরও তুলনা চলে। কে কার অনুকরণ জানি না, কিন্তু বিভিন্ন গুহার তিন-জোড়া দম্পতির ঘন-হয়ে-বসা ভঙ্গিমাটি এক জাতের। তিনটি চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করতে বসলে বলব—এদের মধ্যে আলোচ্য-চিত্রের পুরুষ মূর্তিটিই সবচেয়ে উৎরেছে ভাল; তিনটি স্ত্রীমূর্তির মধ্যে সবচেয়ে ভাল হয়েছে চিত্র—৬০-এর নায়িকামূর্তি। তিনটি ক্ষেত্রেই দেখছি, পুরুষটি ডান-হাতে পানপাত্র নিয়ে প্রেমিকাকে মধুক-রস পান করতে বলছে। লক্ষ্য করে দেখুন, পরিকল্পনা এক-জাতের হলেও তিনটি নায়িকা-মূর্তির ব্যঞ্জনা যেন তিন রকম।

প্রথমতঃ আলোচ্য চিত্রের (চিত্র—৯) নায়িকা যেন বিস্মিতা। সে যেন বুঝে উঠতে পারছে না, ব্যাপারটা কি! তুলনায় চিত্র—৮-এর মেয়েটি হাসছে; সেও যেন পূর্ব-মুহূর্তে চমকে উঠেছিল; তার হাতে একটি দর্পণ। অপরপক্ষে চিত্র—৬০-এর নায়িকার অভিব্যক্তিতে শিল্পী আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব অদ্ভুতভাবে ফুটিয়েছেন—তার প্রসারিত বাম করে মধুক-পাত্র গ্রহণের মুদ্রা, কিন্তু গ্রীবাভঙ্গিমায় আমাদের মনে পড়ে যায়—'নহি নহি বোলবি মোড়য়িবি গীম';—বিলোল-কটাক্ষে মাধবীচষকের প্রতি আকর্ষণ ও ভীতির অপূর্ব যুগ্মব্যঞ্জনা।

আমার তো মনে হয়েছে আলোচ্য চিত্রের (চিত্র—৯) নায়িকার আলেখ্যে মহাকবির মেঘদূতের একটি চরণ যেন অনুরণিত : "প্রত্যাদেশাদপি কা মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।" অর্থাৎ—দীর্ঘদিন যক্ষ প্রবাসে থাকায় প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা মাধবীরসের আস্বাদটুকুই শুধু নয়, ঐ সঙ্গে ভুলেছে তার ভ্রূবিলাসভঙ্গিমাও।

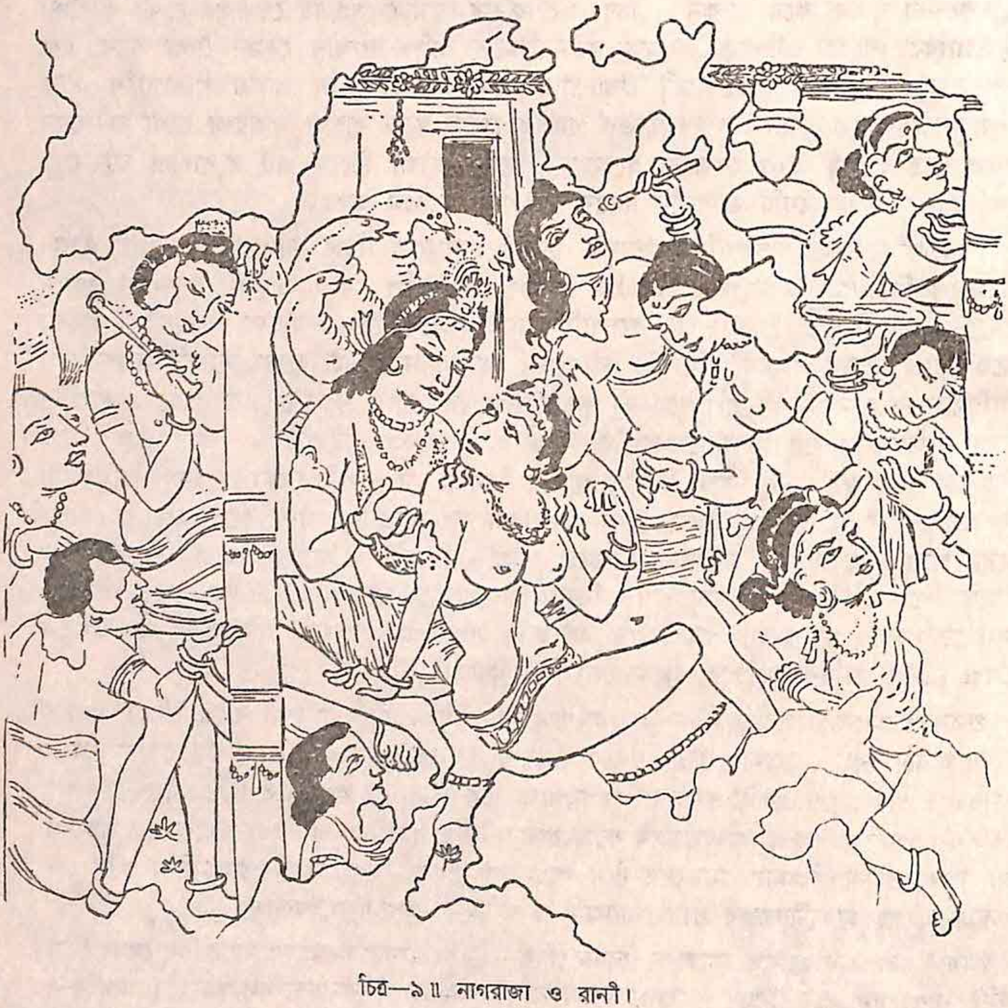
তুলনায় আবার চিত্র—৮-এর দর্পণহস্তাকে দেখে আবার মনে পড়ে যাচ্ছে রঘুবংশের একটি 'আক্রান্তনায়িকা'কে :

দর্পণেষু পরিভোগদর্শিনীর নর্মপূর্বমানুপৃষ্ঠসংস্থিতিঃ।
ছায়য়া স্মৃতমনোজ্ঞায়া ভাদুর্হনিমীলিতমুখীশ্চারশণ॥ [রঘুবংশ XIX, ২৮]

অর্থাৎ মেয়েটি যেন দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দেখতে ব্যস্ত ছিল, সহসা পিছন থেকে তার

নায়ক বামস্কন্ধ স্পর্শ করায় সে যেন সচকিতা,—পিছন ফিরে পরিচিত প্রেমাস্পদকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

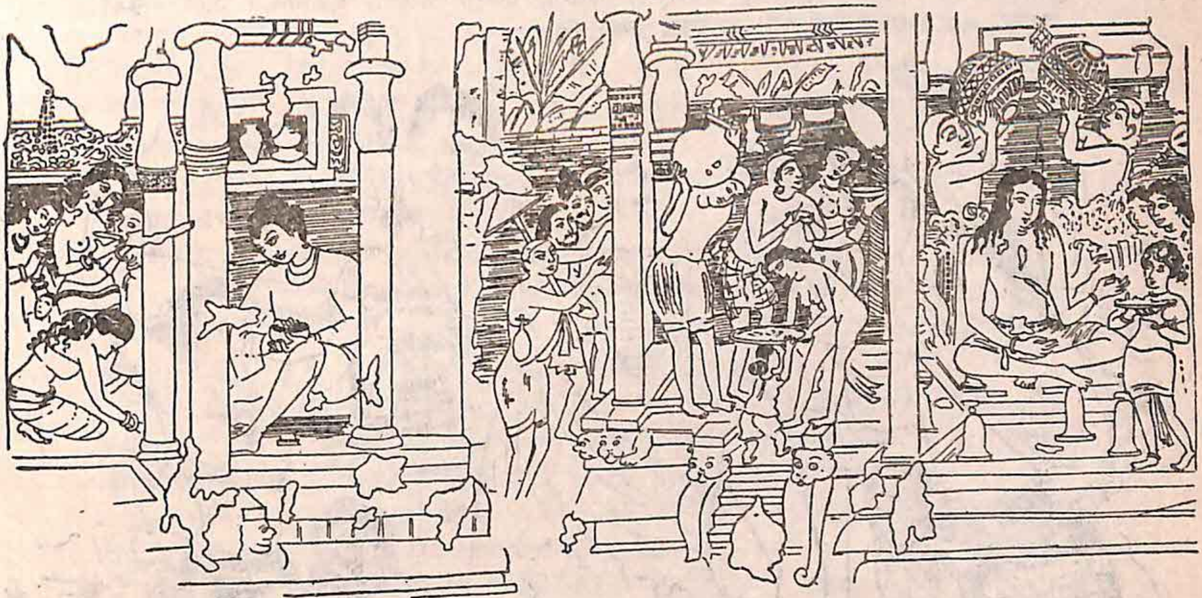
কালিদাসের প্রভাব অজন্তা-শিল্পীর উপর পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। অজন্তা গুহাগুলি যে রাজকুলের অনুগ্রহে নির্মিত সেই বাকাতক-নৃপতি রুদ্রসেন বিবাহ করেছিলেন গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের আত্মজা প্রভাবতী গুপ্তাকে। জামাতার মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্য সদ্যবিধবা কন্যার রাজকার্য পরিচালনার জন্য যে স্বীয় রাজসভার কয়েকজন অমাত্যকে বাকাতকরাজ্যে পাঠিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক নজির আছে। ফলে, কে বলতে পারে স্বয়ং কালিদাস ঐ গুহাগুলির নির্মাণকালে সেগুলি দেখেছিলেন কি না? কে বলবে, অজন্তা-শিল্পী স্বয়ং কালিদাসের মুখেই ঐ শ্লোকগুলির আবৃত্তি শুনেছিলেন কি না।



চিত্র—৯॥ নাগরাজা ও রানী।

উত্তর-প্রাচীরে পাঁচটি চৌখুপিতে পাঁচটি দৃশ্যের সমাহারকে একত্রে বলা হয়—রাজপুত্রের অভিষেক-দৃশ্য (চিত্র—১০)। প্রথমেই দেখছি, একটু নিচু সিংহাসনে যুবরাজকে দু-জন কিঙ্কর অভিষেক-স্নান করাচ্ছে। সিংহাসনের দুই প্রান্তে উল্লম্ফনরত দুটি হরিণমূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। রাজপুত্রের সম্মুখে গন্ধদ্রব্য-থালিকাবাহী একজন বামন-কিঙ্কর। দ্বিতীয় দৃশ্যের কেন্দ্রে একজন বৃদ্ধ সেবক যষ্ঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার সম্মুখে অর্ঘ্য-থালাবাহী একটি করঙ্কবাহিনী এবং পশ্চাতে জলের ঘড়া-কাঁধে একজন কিঙ্কর। ঐ তিনটি

মূর্তির সম্মুখে একজন বিবসনা সুন্দরী নিচু হয়ে বামনের হস্তধৃত পাত্র থেকে কোন গন্ধদ্রব্য তুলছেন। ঐ মণ্ডপের বামে বাহিরদ্বারে কয়েকজন ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসী, যাঁরা অভিষেক-দান গ্রহণে সমবেত। ঐ বহিঃদৃশ্যের ওপাশে আবার একটি মণ্ডপ। সেখানে একজন মহাভিক্ষুকে দেখা যাচ্ছে। স্তম্ভের ও-প্রান্তে চারজন পুরকামিনী মহাভিক্ষুকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিতে আসছেন।



চিত্র—১০॥ রাজপুত্রের অভিষেক (অবস্থান—1|8)।

ডাঃ ইয়াজদানির মতে এ প্রাচীর-চিত্র মহাজনক-জাতকের অন্তর্ভূত—মহাজনকের অভিষেক দৃশ্যই দেখানো হয়েছে এখানে। ললিতকলা-এ্যাকাদেমি প্রকাশিত গ্রন্থেও এ মতের সমর্থন। মদনজিৎ সিংও দেখছি একই মত পোষণ করেছেন। পুরাতত্ত্ব-বিভাগ থেকে প্রকাশিত ডঃ ঘোষ সম্পাদিত গ্রন্থে কিন্তু কিছু সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। দুটি কারণে আমি ঐ তথ্য মেনে নিতে পারছি না। প্রথমতঃ দ্বিতীয় প্যানেলে স্নানরতা মহিলাটি বিবসনা এবং তাঁকে যারা স্নান করাচ্ছেন তারা কিঙ্কর, কিঙ্করী নয়। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে—এটাতো ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় কোন যুগেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ—এখানে ঐ নারীটি যদি সীবলীই হবে তবে সে শুভ্রবর্ণা কেন? পূর্ব-বর্ণিত মহাজনক জাতক চিত্রে সীবলীকে প্রতিটি চিত্রে গাঢ় শ্যামাঙ্গী করে আঁকা হয়েছে। অজন্তা-শিল্পী সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য বিষয়ে কখনও ভুল করেন না। বিশ্বান্তক জাতক, মহাজনক জাতক, বিধুর পণ্ডিত জাতক, সিংহল-অবদান প্রভৃতি বড় বড় কাহিনী-চিত্রে কোন কোন চরিত্রকে ছয়বার বা আটবার আঁকতে দেখেছি—কিন্তু তাদের আকৃতি-গত, বর্ণগত, ধর্মগত কোন বৈপরীত্য কখনও নজরে পড়েনি। আধুনিক চলচিত্রের যখন স্যুটিং হয় তখন একজন টেক্‌নিশিয়ান ঐ সামঞ্জস্য বা 'কন্‌টিন্যুইটি' দেখবার জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত হন। অজন্তা-শিল্পীর অন্তরে যেন তেমনি এক সদাসতর্ক কন্টিন্যুইটি-ম্যান উপস্থিত আছেন। তাই মন মানতে চায় না ঐ শুভ্রবর্ণা মেয়েটি সেই শ্যামাঙ্গী সীবলী।

প্রসঙ্গত একটি কৈফিয়ৎ বোধকরি দেওয়া দরকার। আমি বলেছি—সীবলী ছিল অপূর্ব সুন্দরী, আবার বলছি তাকে শ্যামাঙ্গী করে এঁকেছেন শিল্পী। দুধে-আলতা-রঙের বর্ণনায় অভ্যস্ত পাঠক এবং বলাবাহুল্য পাঠিকা এ ক্ষেত্রে আমাদের কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারেন বটে।

তাই বলি : অজন্তা-শিল্পীর চোখে গৌরবর্ণ সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল না ; যেমন ছিল না কবি কালিদাসের—যাঁর নায়িকা 'সৃষ্টিরাদ্যের ধাতুঃ' হওয়া সত্ত্বেও ছিল 'তন্বীশ্যামা'। শুভ্রাঙ্গীর অভাব নেই অজন্তায়, কিন্তু কৌতুককর ঘটনাটা হচ্ছে এই—শ্যামাঙ্গী-পাঠিকা নোট করে রাখতে পারেন—যে কয়টি নারী অজন্তার জগতে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা বলে স্বীকৃত তাঁরা সকলেই কৃষ্ণবর্ণা। সীবলী কালো, মরণাহতা জনপদকল্যাণী কালো, গোপা কালো, ইরান্দাতী কালো—কৃষ্ণা অপ্সরা এবং কৃষ্ণা-রাজকুমারী তো ঘোর কৃষ্ণবর্ণের।



চিত্র—১১॥ মার ও বুদ্ধদেব (অবস্থান—1|10)।

এবার সরে আসুন অন্তরালের ক্ষুদ্রতর কক্ষে। সেখানে পশ্চিমদিকের প্রাচীরে দেখুন—একটি বৃহদায়তন প্যানেল (১।১০)। তপস্যারত সিদ্ধার্থকে সসৈন্য 'মার' আক্রমণ করেছে (চিত্র—১১)। মারের তিন লাস্যময়ী আত্মজা— তৃষ্ণা, রতী ও রঙ্গ বিচিত্র ভঙ্গিমায় সিদ্ধার্থের চিত্তহরণে উদ্যতা। তাদের মধ্যে একজন আবার আসন্ন-প্রসবা। ধ্যানগম্ভীর সিদ্ধার্থের চতুর্দিকে মার-সৈন্যদলের ভয়াবহ আক্রমণের দৃশ্য। কাম, লোভ আর ভয়—কিন্তু জ্ঞাননির্ধৃতকল্মশ জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী নির্বিকার। কিন্তু ভূমিস্পর্শমুদ্রা কেন? তাহলে গল্প বলতে হয় :

বুদ্ধ ও মার

'মার' অর্থাৎ বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে অনঙ্গ-দেবতা যখন শুনলেন সিদ্ধার্থ সিদ্ধির সমীপবর্তী হয়েছেন তখন তিনি তপস্যারতের সম্মুখে উপস্থিত হলেন কপিলাবস্তুর একজন সংবাদবহের ছদ্মবেশে। বললেন, 'যুবরাজ! আপনি গৃহত্যাগ করার পরে আপনার জ্ঞাতিভ্রাতা দুরাত্মা দেবদত্ত বিদ্রোহ করেছিল। মহারাজ শুদ্ধোদনকে সে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। সতী-সাবিত্রী যশোধরাকে বলপূর্বক অধিকার করেছে।' সিদ্ধার্থ এ মিথ্যা সংবাদ শ্রবণে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, মৃদু হাসলেন শুধু। মার প্রণিধান করলেন—তাঁর মিথ্যার মায়াজাল বিদীর্ণ করেছেন সিদ্ধার্থ গৌতম। তখন সংযম হারিয়ে 'মার' বললেন, সিদ্ধার্থ! এ বিশ্বে আমার অধিকার অনস্বীকার্য! কামনা-বাসনা এ পৃথিবীর মজ্জায়-মজ্জায়। ইন্দ্রিয়-সুখই তার চরম লক্ষ্য। এ পৃথিবী ভোগের।

সন্ন্যাসী বললেন, না! এ পৃথিবী ত্যাগের। কামনার জয়, বাসনার ক্ষয় আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই এ পৃথিবীর চরম লক্ষ্য।

মার বললেন, প্রমাণ দাও। কে তোমার সাক্ষী?

: স্বয়ং পৃথিবীই আমার সাক্ষী!—এই বলে শাক্যমুনি তাঁর সাধনপীঠ থেকে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত। করাঙ্গুলি দিয়ে স্পর্শ করলেন মেদিনীকে, যেন ধরণীকে প্রশ্ন করলেন—বল! তুমি কি ইন্দ্রিয়সুখের দাসী হয়েই থাকতে চাও?

সরমে শিউরে উঠলেন সর্বংসহা ধরিত্রীমাতা—কী লজ্জা! ইন্দ্রিয়সুখের দাসত্বই নাকি কাম্য! সে প্রচণ্ড শিহরণে সসৈন্য মার হল ভূতলশায়ী। শুধু পিণাকপাণির ত্রিশূলধৃত বারানসীধামের মত ভূকম্পনে-অবিচল রইল মহাসন্ন্যাসীর সাধনপীঠ।

ভূমিস্পর্শ মুদ্রার এই হল ব্যঞ্জনা। ঐ মূর্তি সারা ভারতে দেখতে পাবেন—অজন্তায়, সারনাথে, নালন্দায়, মথুরায় এবং অসংখ্য সংগ্রহশালায়।

গর্ভমন্দিরের দুই প্রান্তে দুটি প্রস্তর-নির্মিত নারীমূর্তি। একজন—গঙ্গা (১।১১), অপর জন—যমুনা (১।১২)।

মূল-গর্ভমন্দিরে বিরাট বুদ্ধমূর্তি (১।১৩)। সারনাথ মৃগদাবে বুদ্ধদেব বসে আছেন পদ্মাসনে—ধর্মচক্র মুদ্রায়। গাইড এই মূর্তিটির তিন দিকে আলো ফেলে বুদ্ধদেবের তিন রকম ভাব-ব্যঞ্জনা আপনাকে দেখিয়ে দেবে। একপাশে আলো ধরলে মনে হবে তিনি হাসছেন —অপরপাশে আলোকপাত করলে মনে হবে তিনি বিষাদখিন্ন। আলো সামনে ধরলে মনে হবে তিনি ধ্যানমগ্ন। তা সত্যিই মনে হয়; কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা এ শুধু এ্যাক-সিডেণ্টাল আর্ট! অনেকে এ চাতুর্যে মুগ্ধ হচ্ছেন দেখলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্পীর মনে একথা ছিল না। আলোকসম্পাতের চাতুর্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন না অজন্তার জাত-শিল্পীর দল।

অন্তরালে পূর্বদিকের প্রাচীরে দেখি সারি সারি বুদ্ধমূর্তি (১।১৪)। অসংখ্য! না, সংখ্যাতীত নয়, এক হাজারটি। শ্রাবস্তী নগরীতে একবার অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বুদ্ধদেব সহস্র মূর্তিতে প্রকটিত হয়েছিলেন। এই প্রাচীর-চিত্রে সেই অলৌকিক ঘটনাটি বিধৃত।

এর পরে বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির মূর্তিটি। তাঁর পায়ের কাছে যে প্রতিহারীটি আছে, তাকে পারস্যদেশীয় বলে মনে হয়। তার কোমরবন্ধে চামড়ার বকলেশটি দ্রষ্টব্য। বোধিসত্ত্বের বামে দুটি নারীমূর্তি। তার ভিতর একটি নিকষ কালো। ইনিই কৃষ্ণারাজকুমারী (১।১৫)।

অপূর্ব রূপবতী এই কৃষ্ণ-রাজকুমারী (চিত্র—১২)। বোধ করি, শিল্পের বিচারে অজন্তার ত্রিশটি গুহার যাবতীয় নারীমূর্তিকে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় এ পিছনে ফেলে আসতে পারে। অথচ এর গাত্রবর্ণ কষ্টিপাথরের মত কালো। উন্নত-নাসা পদ্মকোরকতুল্য দুটি ভাববিহ্বল নয়নে মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি। ললিত কপোলে কুঞ্চিত কেশদাম কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছে তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি। ললাটে মণি-মাণিক্যখচিত টায়রা, পুষ্প-মাল্যে ঘননিবদ্ধ কবরীপাশ। নিরাবরণ উরসে যৌবনের যুগ্ম-জয়স্তম্ভ। কিন্তু হায়! ইনি

চিরবিরহিণী! এই অন্ধ গুহার বন্ধ কক্ষে হাজার বছর ধরে শবরীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে চলেছেন কৃষ্ণা-রাজকুমারী। এঁর নায়ক আজও এসে পেঁছায় নি! শিয়রের কাছে এক বৃদ্ধের মূর্তি। বোধ করি, ইনি বৃদ্ধ রাজা—অর্থাৎ রাজকুমারীর পিতা। দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় জরাগ্রস্ত। পাশেই রাজকুমারীর একজন সখী। হাতে তার অর্ঘ্য-থালিকা। তার একটিমাত্র চোখ অক্ষত আছে—কিন্তু ঐ একটিমাত্র নয়নের দৃষ্টিতেই ঝরে পড়ছে তার প্রাণের আকুলতা, তার উৎকণ্ঠা। কান পাতলে শুনতে পাবেন ঐ একটিমাত্র নয়নের দৃষ্টিতেই ফুটে উঠেছে তার ঐকান্তিক আবেদন—'এমন করলে যে তুমি মারা যাবে সখি,—এ থালা থেকে যা হোক কিছু তুলে মুখে দাও!'

কৃষ্ণা-রাজকুমারী

বিশ্বাস করুন, এই একটিমাত্র খণ্ড-চিত্রই আপনাকে পাগল করে দেবে!



চিত্র—১২ ॥ কৃষ্ণা-রাজকুমারী ও সখী (অবস্থান—1|15)।

স্তম্ভশীর্ষে কোথাও দেখছি যুগ্মহস্তী (১।১৬), কোথাও বা হরিণশিশু (১।১৭)। হরিণগুলির লক্ষণীয় শিল্প-চাতুর্য এই যে, চারটি হরিণ খোদাই করা হয়েছে যাদের একটিমাত্র সাধারণ মাথা।

এখানে একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করি। গাইড বারে বারে আপনার দৃষ্টি এই সব লঘু শিল্পচাতুর্যের দিকে আকৃষ্ট করবে। এই দেখুন—চার হরিণের এক মাথা, এই দেখুন—ছয় নর্তকীর ছয় হাত, ঐ দেখুন দুই ঘোড়ার এক মাথা। আলো ডাইনে-বাঁয়ে সরিয়ে দেখাবে বুদ্ধদেব হাসছেন, কাঁদছেন; কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ দেখতে আপনি অজন্তায় যান নি। এ নিয়ে মুগ্ধ হবেন না আপনি। এ নিয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করবেন না। অজন্তার মহত্ত্ব এই সব সস্তা শিল্পচাতুর্যে নেই—তা আছে ঐ অবলোকিতেশ্বরে, ঐ মরণাহতা রাজকন্যার চিত্রে, ঐ সারিপুত্রের পরীক্ষায়, আর গোপা ও রাহুল আলেখ্যে। প্রদীপ ধরে যেমন সূর্যকে দেখানো যায় না—যতই বাক্‌বিস্তার করি, ভাষায় তেমন সে চিত্রগুলির মর্মকথা বোঝাতে পারব না। ওখানে গিয়ে দাঁড়ান, মনকে সংযত করুন, শ্রদ্ধানম্র করুন, মনে মনে বলুন: নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স। প্রাসাদ-কণা কিছুটা নিশ্চয়ই পাবেন। আর শিল্পচাতুর্যের এই সব লঘু নিদর্শন দেখেই যদি তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসেন, তবে আপনার অবস্থা হবে সেই তান্ত্রিক সাধকের মতো—যে কিছুমাত্র বিভূতি লাভ করে ত্যাগ করে তার পরমপ্রাপ্তির সাধনা, মশ্‌গুল হয়ে থাকে অলৌকিক কিছু ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে!

অন্তরালের সিলিঙে গোলাকৃতি পদ্মের নক্‌শা। মাঝের বড় হল-কামরার উপরে যে সিলিঙ, তাতেও নানা জাতের অসংখ্য চৌখুপি ও নক্‌শা। ছাদের একটি বিশেষ স্থানে (১।১৮) দাড়িওয়ালা এক বিদেশী রাজার মূর্তি। পাশে রানী। কেউ কেউ বলেন, ইনি পারস্যদেশীয় সম্রাট খুস্‌রো ও তাঁর রানী সুন্দরী শীরীন।* এদিকের প্রাচীরে দেখি আর

* এই নিয়ে গত শতাব্দীর শেষপাদে ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মিঃ জেমস্ ফার্গুসনের মধ্যে মত-বিরোধজনিত বাদ-প্রতিবাদ হয়। শেষ পর্যন্ত সুধীজন ফার্গুসন-সাহেবের মতই মেনে নেন—অর্থাৎ, ওটি পারস্য দরবারের দৃশ্য ['On the Age of Ajanta'—by Babu Rajendralal Mitra, Indian Society, Jan., 1880 দ্রষ্টব্য]।

একটি রাজসভার দৃশ্য। এটি সম্ভবতঃ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজসভা (১।১৯)। চিত্রে দেখছি, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী সিংহাসনে আসীন। পিছনে ছত্রধারী। সম্মুখে তাঁর পদতলে পুষ্প-আস্তরণে একটি ব্যজনিকা। কয়েকজন পারস্যদেশীয় রাজদূত উপঢৌকনের অর্ঘ্য-থালিকা হাতে একে একে প্রবেশ করছে রাজসভায়। একজনের হাতে একছড়া মুক্তামালা।

খসরৌ, শীরীন ও পুলকেশী

পূর্বদিকের দেওয়ালে চিত্রগুলিকে সনাক্ত করতে পারি নি। সেগুলি অধিকাংশই নষ্ট হয়ে এসেছে (১।২০)। শিবি জাতকের পাশের প্যানেলে (১।২১) দেখছি, একটি রাজপ্রাসাদে জনৈক রানীকে কিঙ্করী এসে সংবাদ দিচ্ছে—দ্বারে একজন মহাভিক্ষু সমুপস্থিত (চিত্র—১৩)। পাশে দ্বার এবং দ্বারের ওপাশে মহাভিক্ষুকেও দেখা যায়। তাঁকে দেখে মনে হয় স্বয়ং বুদ্ধদেব। কাহিনীটি বিশেষজ্ঞরা সনাক্ত করতে পারেন নি। কিন্তু আমি তো বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে অজন্তা দেখতে যায় নি, তাই অনায়াসে মনে করে নিলুম এ ঘটনা কপিলাবস্তুর! বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে বুদ্ধত্বলাভ করার পর বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে এসেছিলেন —নগর সন্নিকটে ন্যাগ্রোধারাম বিহারে কয়েকদিন বাস করেন। ভিক্ষার্থে তিনি কপিলাবস্তু নগরে প্রবেশ করেন। তখন নাকি যশোধরা শুদ্ধোদনের কাছে আপত্তি জানিয়েছিলেন—রাজপুত্র ভিক্ষা চাইছেন, এ অনাচার সহ্য হয় নি তাঁর। কিন্তু বুদ্ধদেব তা শোনেন নি। তিনি নগর-ভ্রমণের পথে সারিপুত্র ও মহামৌদ্গল্ল্যায়নের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত রাজবধূর কক্ষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এ ছবিটি যে সেই দৃশ্য নয়, তা-ই বা জানব কেমন করে?

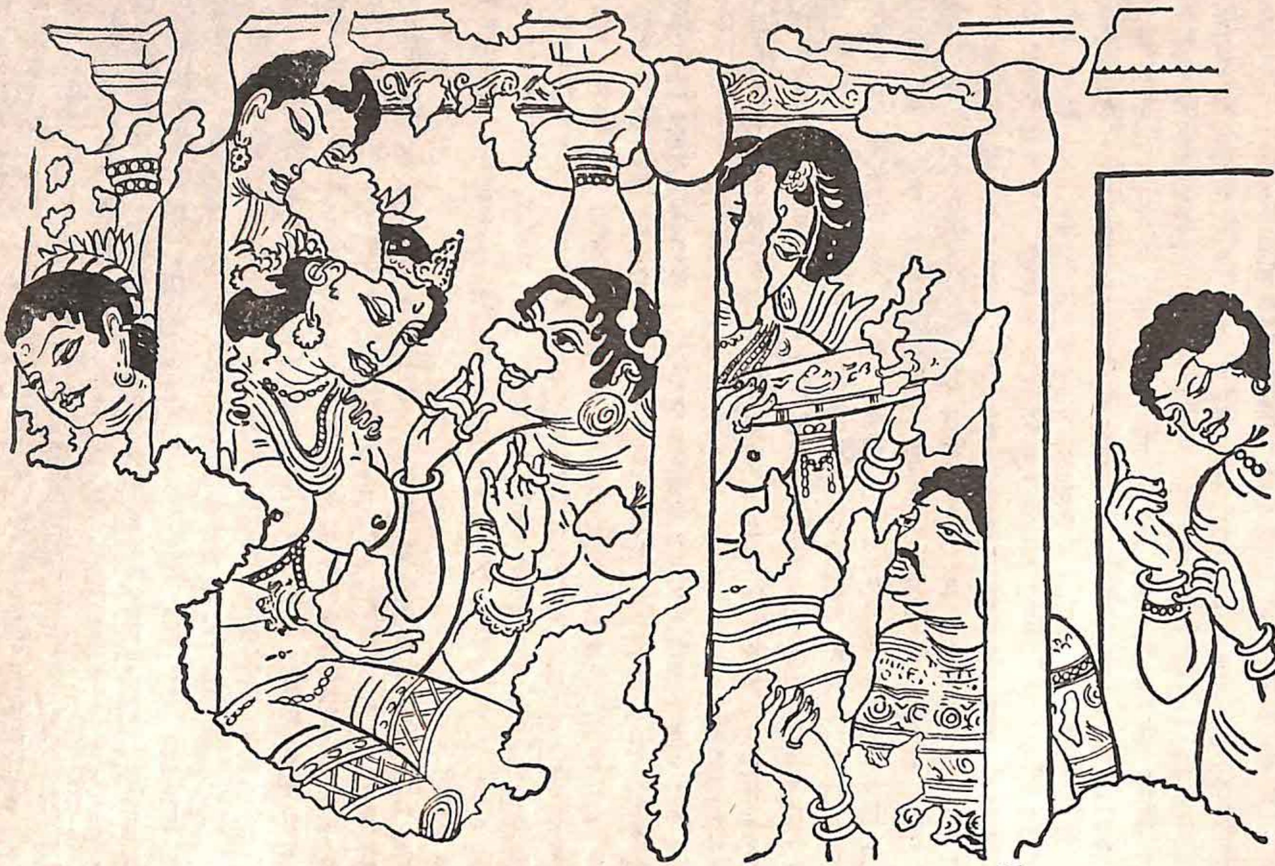
চম্পেয় জাতকের কাহিনীটি (১।২৩) বর্ণনা করে এবার আমরা প্রথম গুহা-মন্দির থেকে বিদায় নেব।

অঙ্গ আর মগধ রাজ্যের সীমানায় বয়ে যায় চম্পানদী। অঙ্গ আর মগধে বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই আছে—অথচ চম্পানদীর অতল জলের গভীরে নাগরাজ্যের কথা কেউই জানে না। সেখানে বিবাদ নেই, বিরোধ নেই, শুধু আমোদ আর প্রমোদ—বিলাস আর ব্যসন। পূর্বজন্মে এই নাগলোকের কথা শুনে বোধিসত্ত্বের মনে বাসনা হয়েছিল ঐ নাগরাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার। পরজন্মে সত্যই তিনি জন্মেছিলেন চম্পানদীর অতল জলের গভীরে. ঐ নাগরাজার প্রাসাদে রাজপুত্র হয়ে। কালে তিনি হলেন নাগরাজ্যের অধীশ্বর। নাগকন্যা সুমনাকে বিবাহ করলেন তিনি।

কিন্তু প্রতি জন্মে যা হয়েছে এবারও তাই ঘটল। বোধিসত্ত্বের মনে শান্তি নেই। তাঁর অন্তরের নিভৃতে অনন্ত জিজ্ঞাসা, তিনি ভূমার পরশপ্রার্থী। মণি-মুক্তাখচিত প্রাসাদে বিলাস-ব্যসনের চূড়ান্ত আয়োজনের মধ্যেও নাগরাজ কেমন যেন উদাসী—অন্যমনা। নাগরানী সুমনা লক্ষ্য করেন স্বামীর ভাবান্তর। তিনি গোপনে পরামর্শ করেন মন্ত্রীর সঙ্গে। নিত্য-নূতন আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হয়। কিন্তু তাতে শান্ত হয় না বোধিসত্ত্বের বিক্ষুব্ধ হৃদয়। মর্ত্যলোকের দুঃখ-দুর্দশা দেখে নাগরাজ স্থির করলেন, রাজবৈভব ত্যাগ করে তিনি গোপনে সন্ন্যাস নেবেন। সদ্গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়বেন একাই। পাছে মহামন্ত্রী বাধা দেন, পাছে নাগকন্যা সুমনা পথরোধ করে দাঁড়ায়, তাই কাউকে কিছু জানালেন না। একদিন গভীর রাত্রে গোপনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন পথে—জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার মূল অন্বেষণ করে দেখবেন তিনি। দেখবেন, কেমন করে এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-অধ্যুষিত মরজগৎকে আনন্দ-নিকেতনে রূপান্তরিত করা যায়। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হল। তবু পথ চলেছেন নাগরাজ চম্পেয়্য। কে তাঁকে দেবে সত্য পথের নির্দেশ? কে শোনাবে তাঁকে মুক্তির মন্ত্র? অস্নাত অভুক্ত পথশ্রমে অনভ্যস্ত নাগরাজ অবশেষে দিনান্তে এসে আশ্রয় নেন পথের পাশে! ক্লান্তদেহে বিশ্রাম নিতে থাকেন তিনি।

চম্পেয়্য জাতক

ঠিক সেই সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক সাপুড়িয়া। হঠাৎ তার নজরে পড়ে, পথপ্রান্তে ক্লান্তদেহে পড়ে আছে এক মহানাগ। চমকে ওঠে সাপুড়িয়া! এ যে নাগরাজ! এ-কে কি ধরা



চিত্র—১৩॥ রাজদ্বারে মহাভিক্ষু (অবস্থান—1|21)।

যাবে? যদি দেশ-বিদেশে এই নাগরাজের নাচ সে দেখাতে পারে, তাহলে তার ভাগ্যই ফিরে যাবে যে! কিন্তু ও কি ধরা দেবে? সভয়ে এগিয়ে আসে সাপুড়িয়া সেই মহানাগের দিকে। আশ্চর্য, নাগরাজ কোন বাধা দেন না—বিনা প্রতিবাদে তিনি প্রবেশ করেন তার ঝাঁপিতে। অহিংসার অবতার বোধিসত্ত্ব কোন প্রতিবাদ করেন না। ভাগ্যের নির্দেশ তিনি মেনে নেন বিনা প্রতিবাদে। ভাগ্যের কী বিড়ম্বনা! যাঁর মস্তকে একদিন শোভা পেত হীরা-মুক্তা-খচিত চম্পেয়্যরাজ্যের রাজছত্র, তিনি আজ পথে পথে নাচ দেখিয়ে বেড়ান—সামান্য এক সাপুড়িয়ার নির্দেশে।

এদিকে নাগরাজ গৃহত্যাগ করার পরদিন প্রভাতে জেগে উঠে চম্পেয় মহারানী মাথায় হাত দিয়ে বসেন। যা ভয় করেছিলেন, তাই হয়েছে। সর্বনাশ হয়ে গেছে। রাজপুরী শূন্য হয়ে গেছে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন মহামন্ত্রী, সেনাপতি আর নগরকোটাল। দেশে দেশে চর পাঠানো হল—খুঁজে বার করতেই হবে নিরুদ্দিষ্ট রাজাকে। কিন্তু কেউ কোন সন্ধান পায় না। একে একে ফিরে আসে ব্যর্থকাম সন্ধানীর দল। মহারাজের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি যেন হাওয়ায় মিশে গেছেন। দুঃখে অনুশোচনায় মহারানী শয্যা নিলেন। এলেন রাজবৈদ্য। রানী বলেন : তোমরা পার নি, আমি নিজে একবার চেষ্টা করে দেখব। আমি তাঁকে খুঁজে বার করবই।

রাজবৈদ্য মাথা নেড়ে বলেন : তা তো হবে না মা। তুমি আজ আর এ দুনিয়ায় একা নও। তোমার দেহের মাঝে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি যে। মহারাজকে আমরা হারিয়েছি, কিন্তু নাগরাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজাকে আমরা হারাতে রাজী নই।

রানী সুমনার দু-চোখে ভরে আসে অশ্রুজল। সে জল আনন্দের, সে জল বেদনার।

এদিকে সাপুড়িয়ার সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়ান নাগরাজ চম্পেয়্য। অবন্তী, শ্রাবস্তী, বিদিশা—প্রভৃতি নিত্য নূতন দেশ ; কিন্তু তাঁর ভাগ্যের কোন পরিবর্তন নেই। কদন্নের আহার্য, সেই বন্ধ ঝাঁপির রুদ্ধ কারা, সেই বাঁশির সুরে দুলে দুলে নাচা, সেই কৌতূহলী বালকদলের লোষ্ট্রাঘাত! অহিংসার অবতার দিন গুণছেন শুধু—কে জানে কবে হবে মুক্তি। ক্রমে ভুলে গেলেন তিনি তাঁর আত্ম-পরিচয়। ভুলে গেলেন—কোথা থেকে তিনি এসেছেন। তবু এতদিন মাঝে মাঝে মনে পড়ত নাগকন্যা সুমনার কথা—ক্রমে সে-কথাও আর মনে রইল না তাঁর! শুধু মহানির্বাণের, মহামুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন তিনি।

ওদিকে চম্পানদীর অতল জলের গভীরে চম্পেয় রাজপুরীতে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। রাজপ্রাসাদে বন্ধ হয়েছে নহবতের মূর্ছনা। স্তব্ধ হয়েছে বৈতানিকের ঘোষণা। প্রতি সন্ধ্যায় মহারাজের প্রমোদকক্ষে আর জ্বলে না রত্নদীপাবলী, রাজনর্তকী বাত-ব্যাধিগ্রস্তা। আনন্দ-নিকেতন পরিণত হয়েছে নিরানন্দ লোকে। দিন আসে, দিন যায়, কিন্তু যার প্রতীক্ষায় রাজপুরীর প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড স্তব্ধ হয়ে প্রহর গণে, সে ফিরে আসে না। এ দৃশ্য আর সহ্য হল না নাগরানী সুমনার। তিনি একদিন গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করলেন গোপনে। খুঁজে তিনি বার করবেনই নিরুদ্দিষ্ট মহারাজকে।

কাহিনীর যে পর্যন্ত বলেছি, আসুন, এবার সেটুকু থেকে রসাস্বাদন করি। চিত্র—১৪-তে তিনটি খণ্ড দৃশ্য। বামপ্রান্তে দেখছি, সিংহাসনে-আসীন নাগরাজ চম্পেয়্যকে। তিনি উদাসীন, আনমনা ; তাঁর বাম হস্তের মুদ্রায় পথভ্রষ্ট নাবিকের অসহায়ত্বের ব্যঞ্জনা। লক্ষণীয়, রানী সুমনাকে শিল্পী এখানে দুবার এঁকেছেন। রাজার বামস্কন্ধের উপর থেকে ঝুঁকে আছেন তিনি, আবার তাঁর দক্ষিণ দিকেও ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে আছেন। যেন উদাসীন রাজার জীবনকে ঘিরে আছেন নাগমহিষী! রানীর দুটি আলেখ্যেই তাঁর ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে। এভাবে একই চিত্রে একই ব্যক্তিকে একাধিকবার আঁকার কায়দাটা যেন আধুনিক চলচিত্র-শিল্পের 'সুপার-ইম্পোজিশন' কলাকৌশলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐ কলাকৌশল অজন্তায় বারে বারে দেখেছি। বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে প্রথম প্রবেশ করলে প্রথম পিতৃদর্শনের আনন্দে রাহুলকে



চিত্র—১৪ ॥ চম্পেয়্য জাতক।
বামে—মুমুক্ষু নাগরাজ ও রানী
মধ্যে—কাশীরাজের দ্বারে নাগরানী, শিশু ও দ্বারপাল
দক্ষিণে—কাশীরাজের রাজসভা

দেখেছি তাঁকে ঘিরে নৃত্য করতে। সে যাই হোক, এখানে রাজা ও রানীর যুগল চিত্র ছাড়াও আছে একটি বামন। সেও ব্যাকুল—বাড়িয়ে ধরেছে একটি অর্ঘ্যথালিকায় কিছু আহার্যদ্রব্য।

স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে—বামনটি এল কেন? সচরাচর বিদূষকরূপেই বামনকে দেখতে পাই রাজসভায়। এমন একটি বেদনাবিধুর গম্ভীর দৃশ্যে কৌতুকরসনিষিক্ত বামনটা কি রসাভাস ঘটাচ্ছে না? উত্তরে তিনটি যুক্তি মনে আসছে। প্রথমতঃ ঐ বামনটি বিদূষক—জাতক-কাহিনীতে বলা হয়েছে রানী সুমনা নানাভাবে নাগরাজার আনন্দবর্ধনের চেষ্টা করেছিলেন ; ফলে বিদূষক বামনের উপস্থিতি অপ্রাসঙ্গিক নয়, কাহিনীর অনুগ। দ্বিতীয়তঃ শিল্পী জীবনকে পরিপূর্ণভাবে দেখাতে চান—শিল্পের রাজ্যে আমরা, কথাসাহিত্যিকেরা, হাসি ও অশ্রুকে মিশাতে ভয় পাই অথচ বাস্তব-দুনিয়ায় হাসি ও অশ্রুর সহাবস্থান প্রত্যক্ষসত্য। বিবাহের শোভাযাত্রা এ বাস্তব-পৃথিবীর পথে শববাহীদের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে। অজন্তা-শিল্পীও এদিক থেকে বিশ্বনিয়ন্তার মত উদাসীন। হয়তো এই যুক্তিতেই সপ্তদশ-বিহারের প্রবেশ পথে আটটি কুলুঙ্গিতে সারি-সারি বুদ্ধমূর্তির ঠিক নিচের আটটি কুলুঙ্গিতে তাঁরা আটটি মিথুন-মূর্তি আঁকতে কোন সঙ্কোচবোধ করেননি। আমরা হলে বলতুম—"মিথুন মূর্তি আঁকার আর জায়গা পেলে না? ঠিক বুদ্ধ মূর্তির তলায় তলায়?" তৃতীয়তঃ হয়তো শিল্পী ঐ কৌতুকময় বামনের হাতে উপবাসখিন্ন রাজার জন্য আনা আহার্যথালিকায় সেই রসটাই পরিবেশন করতে চেয়েছেন, যে রস বারে বারে পরিবেশন করেছেন বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জীবন-শিল্প-রসিক চার্লি-চাপলিন তাঁর অনবদ্য কৌতুক-বেদনায়!

পথে পথে ঘুরছে এক উন্মাদিনী নারী। সাপুড়িয়া পাড়ায় যেখানে শোনে সাপ খেলানো হচ্ছে, সেখানেই ছুটে যায়। দেখে আর হতাশ হয়ে ফিরে আসে। যাকে খুঁজছে এ তো সে নয়! দিন যায়, মাস যায়, ক্রমে দেহ অশক্ত হয়ে পড়ে। পা আর চলে না ; মনের ভারের চেয়ে দেহের ভার বেশী বলে মনে হয়। পথপ্রান্তে বসে পড়েন মহারানী। এতক্ষণে মনে পড়ে যায় রাজবৈদ্যের সাবধান-বাণী। ওঁর দেহের অভ্যন্তরে চম্পেয়্য রাজ্যের ভবিষ্যৎ নৃপতির উদ্দেশ্যে বৈতানিকের দল মাঙ্গলিক তান শুরু করেছে, কিন্তু নির্বিঘ্নে কি তিনি তাকে আনতে পারবেন এ ধরাধামে? দু-চোখে জলের ধারা নেমে আসে রানীর। পথপ্রান্তে ধূলি-শয্যায় শায়িতা নারী অন্তিম যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ করেন অবশেষে!

চিত্র—১৪-র দক্ষিণপ্রান্তে দেখছি এক রাজদরবার। মহামহিম বারাণসীর স্বনামধন্য অধিপতি উগ্‌গসেন (উগ্রসেন) বসে আছেন রত্ন-সিংহাসনে। তাঁর চারপাশে মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপতির দল। দেখছি এক কাশীর পণ্ডিতকেও। মাথায় মস্ত অর্কফলা, হাতে লাঠি, গায়ে চাদর। সকলেই কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে। কী দেখছে ওরা? দেখছে সাপের খেলা। সাপুড়িয়া তার ঝাঁপি খুলেছে। তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন ভীমকান্তি এক মহানাগ! অথচ কী শান্ত, সমাহিত আত্মমগ্ন ভাব তাঁর। সাপুড়িয়ার বাঁশির তালে তালে দুলছেন তিনি। (সাপের ছবি চিত্র—১৪-র বাইরে, আরও দক্ষিণে)।

কিন্তু দ্বারের বাইরে ও কার মূর্তি? ছিন্নবসনা শীর্ণদেহা ধূলিমলিনা এক অনাথিনী নারীমূর্তি। (চিত্র—১৪, মধ্যমাংশ)। কোন ভিখারিণী হবে বোধ হয়। কিন্তু ওর মুখে তো ভিখারীসুলভ কাঙালপনা দেখছি না। জীর্ণমলিন বহিরঙ্গ ভেদ করে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন আভিজাত্যের জ্যোতি। তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক শিশু—মায়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে। আহা কী সুন্দর! ভিখারিণীর এমন সন্তান হয়? মনে হয় যেন কোন রাজকুমার! মায়ের চোখে নেমেছে দুটি জলের ধারা। যেন দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে অবশেষে এসে দাঁড়িয়েছে তীর্থপথের শেষ প্রান্তে, দেবমন্দিরের দ্বারে! তার একটি হাত ঐ পুত্রের কাঁধে—যেন ঠেলে দিয়ে বলছে : দ্যাখরে পাগলা—ঐ তোর বাপ!

মুগ্ধ হয়ে দেখছি নাগরানী সুমনার এই তীর্থযাত্রার ফলশ্রুতির দৃশ্যটি। কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। সংবিৎ ফিরে পেলাম বঙ্গভাষায় একটি বামাকণ্ঠের প্রশ্নে : এ-গুলো কিসের ছবি?

সঙ্গে সঙ্গে শুনি উত্তর—দেখেও বুঝলে না? সাপ খেলানো হচ্ছে। স্নেক-চার্মার। ও-সব দেখবে ফরেন টুরিস্ট, যারা আমাদের মতো পথে-ঘাটে সাপ-খেলানো দেখে না। চল চল, অনেক বাকি আছে এখনও।

সদলবলে ও রা চলে গেলেন সাপ-খেলানোর এ-চিত্রটি এক নজর দেখে কি না দেখে!

সাপুড়িয়ার বাঁশির তালে তালে দুলছেন নাগরাজ—আত্মনিমগ্ন তিনি—হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল দ্বারপথে। বিদ্যুদ্‌স্পৃষ্টের মত চমকে উঠলেন একবার। তারপর স্থির হয়ে গেলেন। নাগরাজের পূর্বস্মৃতি ফিরে এসেছে। ঐ দ্বার-প্রান্তের ভিখারিণীকে দেখে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির হয়ে গেছেন তিনি। তালভঙ্গ হল নৃত্যছন্দে। বিরক্ত হলেন কাশীরাজ। বিস্মিত হল সাপুড়িয়া। কিন্তু নাগরাজের অভিজ্ঞান ফিরে এসেছে ততক্ষণে। ঐ অনাথিনী ভিখারিণীকে উপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। সব ভুল হয়ে গেল তাঁর—নরদেহ ধারণ করে এগিয়ে গেলেন দ্বারের দিকে। ভিখারিণীর ভীরু করাঙ্গুলি তুলে নিলেন নিজ হাতে, বললেন—অপরাধ করেছি, তুমি ক্ষমা কর আমাকে!

নিরুদ্দিষ্ট নাগরাজ চম্পেয়্য-র কথা কে না জানে জম্বুদ্বীপে? পরিচয় পেয়ে কাশীশ্বর উগ্‌গসেন সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সসম্মানে রাজর্ষি চম্পেয়্যরাজকে এনে বসালেন আর একটি রত্ন-সিংহাসনে। রাজান্তঃপুর থেকে নাগরানী সুমনার উপযুক্ত বসন-ভূষণ নিয়ে এল পরিচারিকার দল!

পরের প্যানেলটিতে দেখছি কাশীরাজ উগ্‌গসেন আর নাগরাজ চম্পেয়্য বসেছেন মুখোমুখি। বোধিসত্ত্ব চম্পেয়্য শোনাচ্ছেন ধর্মের অনুশাসন (চিত্র—১৫)।



চিত্র—১৫ ॥ চম্পেয়্য জাতক—কাশীরাজ উগ্‌গসেন ও নাগরাজ চম্পেয়্য।

এই দরবার-দৃশ্যে এক প্রান্তে শিল্পী কিছু কৌতুককর খণ্ড-চিত্র এঁকেছেন। নাটকের মাঝে মাঝে যেমন খণ্ড-দৃশ্যে বিদূষক এসে দর্শকদের মনটা হাল্‌কা করে দিয়ে যায়, অজন্তার শিল্পী যেন চম্পেয়্য রাজারানীর মিলন-দৃশ্যের পরে তেমনি এক খণ্ড-চিত্রে কিছু কৌতুক পরিবেশন করতে চেয়েছেন।

নাগরাজ ধর্মের কথা শোনাচ্ছেন। এ-পাশে কয়েকটি লোকের জটলা। মুখের ভাবব্যঞ্জনা দেখে বেশ বোঝা যায়, তাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী। কেউ ধর্মকথায়

আত্মমগ্ন, কেউ পারলৌকিক তত্ত্বের চেয়ে লৌকিক লাভের আশায় সক্রিয়। একটি লোককে দেখছি, যেন স্পেন বা ফরাসী দেশীয় পোশাক-পরা। একজন সুতনুকা পরিচারিকা তন্ময় হয়ে নাগরাজের মুখ-নিঃসৃত ধর্মকথা শ্রবণ করছে। তার দক্ষিণহস্তে ফল ও মিষ্টান্নপূর্ণ একটি অর্ঘ্য-থালিকা। পিছন থেকে একটি নীচ জাতীয় হস্তলাঘব সুকৌশলে ঐ থালিকা থেকে ফল চুরি করছে। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে লোভ এবং ভয়ের সংমিশ্রণ। ঠিক পাশের ব্যজনিকাটি এ চৌর্যবৃত্তিটি দেখতে পেয়েছে। সে পার্শ্ববর্তী তন্ময় পরিচারিকাটিকে যেন সাবধান করে দিচ্ছে। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী এমনই একটি ঘটনাস্রোতে যেন গা ভাসিয়েছিল, আর শিল্পী যেন এক স্ন্যাপশটে এই খণ্ডমুহূর্তটিকে শাশ্বত করে ধরে ফেলেছেন হঠাৎ!

প্রসঙ্গান্তরে যাবার পূর্বে আর একটি কথা বলব : আপনি-আমি ভুলে গেলেও শিল্পী ভুলতে পারেননি প্রথম দৃশ্যের সেই বিদূষক-বামনকে। এ মিলন দৃশ্যে সে আবার ফিরে এসেছে। নাগরাজার মাথার উপর দিয়ে যেন টুলে দাঁড়িয়ে সে উঁকি মারছে। তার হাতে প্রকাণ্ড একটা তরবারী। ভ্রূভঙ্গি করে তার দেহাকৃতির তুলনায় অতি প্রকাণ্ড আয়ুধটা দেখিয়ে সে যেন বলতে চাইছে—'অহিংসার কথা যতই প্রচার কর, রাজ্য রক্ষা করতে হবে এই অস্ত্রের সাহায্যেই'। কে জানে, হয়তো 'উদ্বাহুরিব' ঐ বামনের অস্ত্র-আস্ফালনের মাধ্যমে শিল্পী 'হিংসা-তত্ত্ব'কেই একটি ব্যঙ্গাত্মক আঘাত হানতে চেয়েছেন!

ঐ য়ুরোপীয় পোশাক-পরা মানুষটিকে দেখে মনে পড়ছে অজন্তার বিভিন্ন চিত্রে অসংখ্য বিদেশীকে বারে বারে দেখেছি। মঙ্গোলীয়, পারসীক, গ্রীক, শক, পহল্‌বদের দেখেছি বহু চিত্রে। তাদের মুখাকৃতি, তাদের পোশাক দেখে বোঝা যায়, বৌদ্ধ শিল্পীরা একান্তবাসী



চিত্র—১৬ ॥ বিভিন্ন চিত্র থেকে সংকলিত বিদেশীদের আলেখ্য।

হলেও, তদানীন্তন ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগসূত্রটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। হয়তো এই শিল্পীর দলে অনেকেই ছিলেন—যাঁরা বৌদ্ধ ভিক্ষু হবার আগে, পূর্বাশ্রমে, রাজদরবারের দৃশ্যগুলি অতি নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। অজন্তার একান্ত গুহায় এই সব বিদেশীর যাতায়াত ছিল না নিশ্চয়—কিন্তু কী নিখুঁতভাবে এদের পোশাক, শিরস্ত্রাণ, মুখাবয়ব এঁকেছেন এই নির্জনবাসী শিল্পীরা শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে! বিভিন্ন গুহা-চিত্র থেকে সংগৃহীত সামান্য কয়েকটি নমুনা—চিত্র—১৬তে সন্নিবেশিত করলাম এই প্রসঙ্গে।

তা যেন হল—কিন্তু আমি ভাবছিলুম অন্য কথা। প্রাচ্য শিল্প-বিশারদ্ লরেন্স বিনিয়ন বলেছেন :

"অজন্তার শিল্পী যা-কিছু এঁকেছেন তার প্রত্যেকটির পিছনে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। চীন, জাপান বা দূর প্রাচ্যের বৌদ্ধ শিল্পীরা বুদ্ধের জীবনের বা জাতকের যে সব চিত্র এঁকেছেন, তার পশুপাখী গাছপালা ঘরবাড়ী সব-কিছুকেই তাঁদের কল্পনায় দেখতে হয়েছে! কিন্তু অজন্তার বৌদ্ধ শিল্পী যে-সব রাজারানী দাসদাসী সাধু ভিখারীর চিত্র এঁকেছেন, তাদের যে-সব আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তিকে তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন সেগুলি তাঁরা অতি নিকট থেকে দেখেছেন। আর তাই সেগুলি এত বাস্তবানুগ, এত জীবন্ত হয়েছে।"

তাই ভাবছিলুম—এ-কথা যদি সত্য হয়, তাহলে কোন্ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে অজন্তার বৌদ্ধ শিল্পী কাশীরাজের দরবারের বাহির-দ্বারে ঐ অনাথিনীর ভাবব্যঞ্জনাকে রূপায়িত করেছিলেন?

এ-দৃশ্যে ঐ বিদেশীটির চিত্র দেখে মনে হয়েছিল, শিল্পী বিদেশীদের খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। রাজসভার নিখুঁত আলেখ্য দেখে মনে হয়, যেন কোন এক বাস্তব রাজ-দরবারের সঙ্গে শিল্পীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

কল্পনার রাশ আল্‌গা করে দিলুম। কে জানে, এই অনবদ্য দরবার-দৃশ্যটি এঁকেছেন যে বৌদ্ধ শ্রমণ তিনি হয়তো সত্যই ছিলেন এক রাজপুত্র। সেই অজ্ঞাত ভিক্ষু কি আজ থেকে হাজার বছর আগে একদিন গোপনে ত্যাগ করে এসেছিলেন তাঁর রাজপ্রাসাদ, শরণ নিয়েছিলেন তথাগত বুদ্ধের, ধর্মের আর সঙ্ঘের? কে জানে, হয়তো তিনি নিজেই ত্যাগ করে এসেছিলেন আসন্ন-প্রসবা এক হতভাগিনী সীমন্তিনীকে কোন অবন্তী-বিদিশা-শ্রাবস্তী কিংবা উজ্জয়িনীর এক নির্জন কক্ষে। পীতবসনে আচ্ছাদিত করেছিলেন অন্তরের রক্তরাগকে। হয়তো দীর্ঘদিন নিযুক্ত ছিলেন এই গুহা-মন্দিরে আলেখ্য রূপায়ণের কাজে। আর তারপর কি কোন এক অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত গোধূলি লগ্নে আলেখ্য-নিবদ্ধদৃষ্টি শ্রান্ত শ্রমণ হঠাৎ মুখ তুলে দেখতে পেয়েছিলেন এই গুহা-মন্দিরের সম্মুখে, ঐ স্তম্ভটির পাদমূলে দাঁড়িয়ে আছে একটি অনাথিনী নারীমূর্তি—অনিন্দ্যকান্তি এক দেবশিশুর হাত ধরে? হঠাৎ কি সেই ভিক্ষু ফিরে পেয়েছিলেন পূর্ব অভিজ্ঞান, চিনতে পেরেছিলেন ঐ ভিখারিণীকে, আর তার দেব-দুর্লভকান্তি শিশুপুত্রকে?

হে অপরিচিত মহান্ শিল্পী, আজ হাজার বছরের এপার থেকে তোমাকে প্রশ্ন করতে চাই—তুমিও কি শিউরে উঠে স্থির হয়ে গিয়েছিলে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত? নাগরাজ চম্পেয়্য-র মত তুমিও কি গুহার দ্বারদেশে এগিয়ে এসে বলেছিলে—অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা কর?

জানি, আমার এ প্রশ্নের জবাব বৃথাই মাথা খুঁড়ে মরবে এ গুহা-প্রাচীরে! তবু বিশ্বাস করতে মন চায়—এ সত্য! না হলে কোন্ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে সেই বৌদ্ধ শ্রমণ আঁকতে পেরেছিলেন এই মহান্ দৃশ্যপট!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় গুহা-বিহার

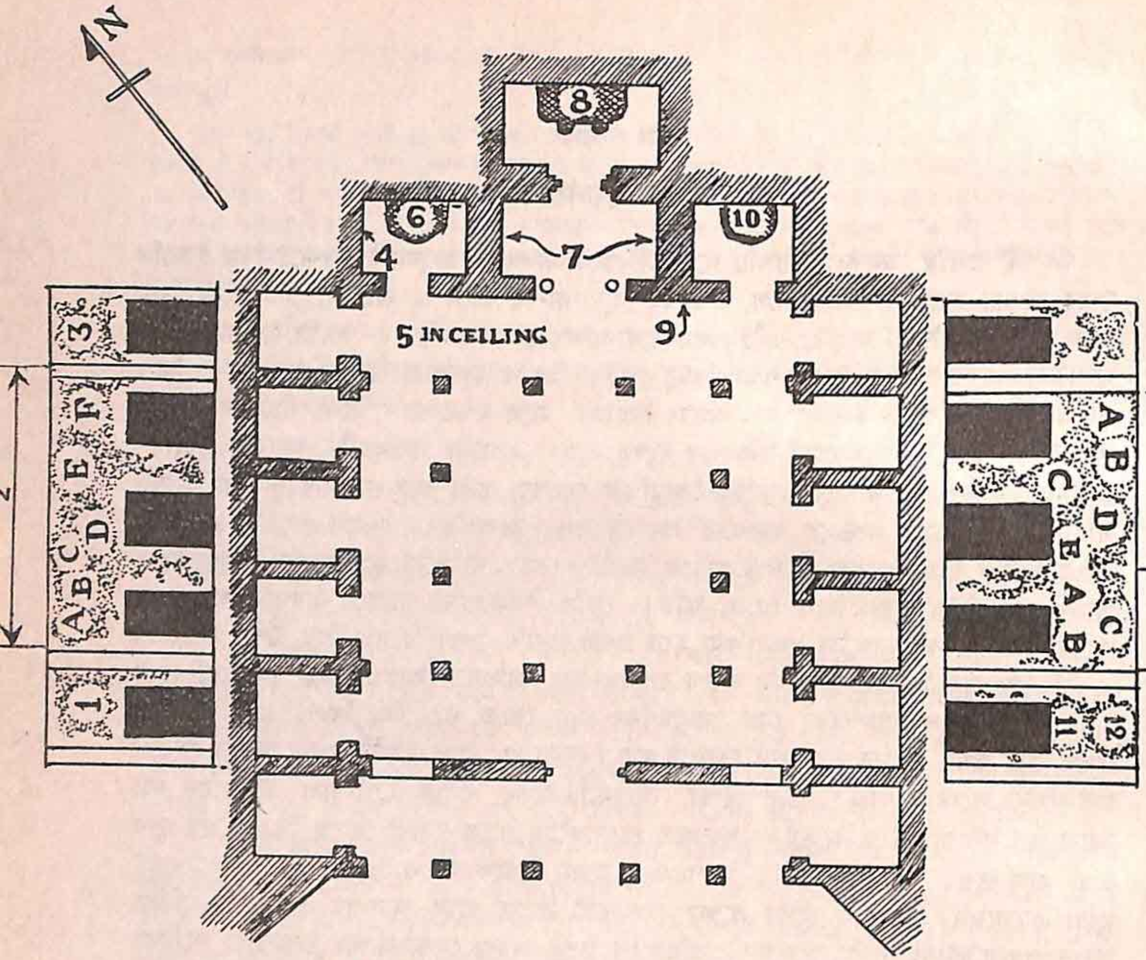
আগেই বলেছি, অজন্তার ত্রিশটি গুহা-মন্দিরকে অবস্থান অনুযায়ী এক-দুই-তিন ইত্যাদি নম্বর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, দ্বিতীয় গুহা-মন্দির মানে এ নয় যে, প্রাচীনতার দিক থেকে এটি দ্বিতীয়। বস্তুতঃ, এটি প্রথম গুহা-মন্দিরের সমসাময়িক। অর্থাৎ, মহাযান বৌদ্ধ যুগের। আকারে প্রথমটির অপেক্ষা কিছু ছোট। মাঝের হলকামরাটি ১৪·৬ × ১৪·৩ মিঃ। এটিও বৌদ্ধ শ্রমণদের আবাসস্থল। অর্থাৎ বিহার। মূল মণ্ডপের দুদিকে পাঁচটি করে এবং সামনে আরও দুটি করে ছোট কক্ষ এর সঙ্গে যুক্ত। এগুলি গবাক্ষহীন অন্ধকার কুটুরি। প্রথমের মত দ্বিতীয় মন্দিরেও কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোয় ভাল করে দেখাবার ব্যবস্থা আছে। এটিও প্রাচীর-চিত্রের সম্ভারে অজন্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এখানে প্রাচীর-চিত্রে নীল রঙের প্রাবল্য লক্ষ্য করলাম। সম্মুখদিকে চারটি স্তম্ভ এবং দুটি অর্ধ-স্তম্ভ (পিলাস্টার)। প্রবেশ-দ্বার দিয়ে সভামণ্ডপে প্রবেশ করি। দেখি, পলেস্তারা অনেক জায়গায় খসে খসে পড়েছে। গুহা-মন্দিরগুলি খনন করা হয়ে গেলে, বৌদ্ধ শিল্পীর দল তার উপর মৃত্তিকার একটি আস্তরণ দিতেন। মাটির সঙ্গে গোময় এবং আঁশযুক্ত আরও কিছু মেশানো হত। এই প্লেস্তারা বা আস্তরের বেধ আনুমানিক ২৫ থেকে ৪০ মিঃ মিঃ। এটি শুকিয়ে গেলে তার উপর ডিমের উপরকার খোলার মত পাতলা ও মসৃণ একটি চুনের আস্তর দেওয়া হত—যেন পঙ্খের কাজ! তার উপর গিরিমাটি-রঙের রঙিন পেন্সিলে চিত্রকরের দল আলেখ্যের বহিরংগটি আঁকতেন। সবশেষে পাথরগুঁড়ো গুলে অথবা ভেষজ কিছু বেটে তার উপর জল-রঙের কাজ করতেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'টেম্পেরা' ও 'ওয়াশ' দুই পদ্ধতিতেই তাঁরা এঁকেছেন। অর্থাৎ, চুনের সূক্ষ্ম আস্তরটি ভিজে থাকা অবস্থায় এবং তা শুকিয়ে যাবার পর দুভাবেই আঁকা হয়েছে। অধিকাংশ চিত্রই অবশ্য দেওয়াল-গাত্র ভালভাবে শুকিয়ে যাবার পর আঁকা। ক্ষেত্রবিশেষে রঙ বেশ মোটা করে দিয়েছেন—তেল-রঙের ছবিতে অনেক সময় যেমন রঙ উঁচু হয়ে লেগে থাকে—চোখ বুজে হাত দিলেও যেমন বোঝা যায়, তেমনি আর কি। সবশেষে জলবায়ুর আক্রমণে যাতে ছবির রঙ জ্বলে না যায়, তাই কিছু একটা আস্বচ্ছ আস্তর দিতেন তাঁরা। সেটি যে কী, তা আজও জানা যায়নি।

বামদিকের প্রাচীরে প্রথমেই নজরে পড়ল হংস জাতকের একটি কাহিনী (২।১)।

কাশীর মহারানী ক্ষেমাদেবী স্বপ্ন দেখলেন, এক স্বর্ণ-রাজহংস তাঁকে ধর্মের বাণী শোনাচ্ছেন। স্বপনভঙ্গে রানী কাশীরাজকে তাঁর সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বললেন, মিনতি জানালেন—তিনি স্বর্ণ-হংসের কাছে ধর্মকথা শুনতে চান। শুনে রাজা অবাক্ হন। এ আবার কি অদ্ভুত প্রস্তাব! মহারাজের ব্যঙ্গবিদ্রূপে মহারানী মর্মাহতা—তিনি অন্নজল ত্যাগ করলেন। কাশীরাজ বিরক্ত হলেন ; শেষ পর্যন্ত কথা প্রসঙ্গে সভাপণ্ডিতকে সে-কথা বলতেই তিনি সবিনয়ে বললেন, মহারাজ, মহারানী যে স্বপ্ন দেখেছেন তার পিছনে কিছু সত্যের ইঙ্গিত আছে। আপনি অবগত নন, কিন্তু পরমবুদ্ধ বর্তমানে এক স্বর্ণ-রাজহংসের মূর্তিতে বোধিসত্ত্বরূপে ধরাধামে সত্যই অবতীর্ণ হয়েছেন। ক্ষেমাদেবী সম্ভবতঃ তাঁকেই স্বপ্নে দেখেছেন। আপনি বোধিসত্ত্বকে কাশীতে আনয়নের আয়োজন করুন।

হংস জাতক

তখন সভাপণ্ডিতের পরামর্শমত কাশীরাজ একটি পবিত্র স্থানে এক মনোরম সরোবর খনন করালেন। সে বার্তা দেশ-বিদেশে প্রচারিত হল। দূর দেশের যাত্রীরা দলে দলে আসতে থাকে এই অপরূপ সরোবরটি দেখতে। শেষে হংসরাজ বোধিসত্ত্ব সপার্ষদ্ একদিন সে সরোবর



চিত্র—১৭ ॥ দ্বিতীয় গুহা-বিহারের প্ল্যান।

1 হংস জাতক
2 বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনা
A ত্রিতিংশ স্বর্গে বুদ্ধদেব
B মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন
C শুদ্ধোদনের রাজসভা (চিত্র—১৮)
D স্তম্ভের পাশে মায়া (চিত্র—১৯)
E বুদ্ধের জন্ম
F শিশুর সংতপদ পরিক্রমা
3 একসারি বুদ্ধমূর্তি
4 অর্ঘ্যদানেচ্ছু রমণীবৃন্দ
5 তেইশটি হাঁসের মালা
6 শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির মর্মর-মূর্তি
7 শ্রাবস্তীর সহস্র বুদ্ধ
8 ধর্মচক্রমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি
9 বৃহদায়তন বুদ্ধদেবের আলেখ্য
10 জম্ভল ও হারিতীর মর্মর-মূর্তি
11 ভগ্নদূত (চিত্র—২০)
12 ক্ষান্তিবাদী জাতক (চিত্র—২১)
13 পূর্ণ অবদান জাতক (চিত্র—২২)
A পূর্ণ বুদ্ধদেবের কাছে দীক্ষা নিচ্ছে
B ভাবিলার বাণিজ্যতরী
C শ্রাবস্তীতে পূর্ণ ও ভাবিলা
14 বিধুর পণ্ডিত জাতক
A ইন্দ্রপ্রস্থ রাজসভায় পুণ্যাক
B অক্ষক্রীড়ার দৃশ্য (চিত্র—২৩)
C বিধুর পণ্ডিতের বিদায় যাত্রা
D নাগরাজ্যে বিধুর (চিত্র—২৪)

দেখতে এলেন। মহারাজের নির্দেশ দেওয়াই ছিল। কাশীরাজ-নিযুক্ত শিকারী বন্দী করে ফেলে স্বর্ণহংসকে। নিয়ে আসে তাঁকে রাজদরবারে। মহারানী ক্ষেমা সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। পরম যত্নে তিনি স্বর্ণ-হংসকে সেবা-যত্ন করতে থাকেন। স্বর্ণ-হংস প্রীত হয়ে বলেন —তুমি কী চাও মা?

ক্ষেমা বলেন : আপনার কাছে ধর্মের মূল কথা শুনতে চাই প্রভু।

বোধিসত্ত্ব বলেন : বেশ। শোনাব তোমাকে।

রাজাদেশে দরবারের এক প্রান্তে আয়োজন করা হল এক ধর্মসভার। স্বর্ণ-হংস বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ ও মহারানীকে সদ্ধর্মের মূল কথাগুলি একে একে বলতে থাকেন।

এই ম্যুরালটির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। যেটুকু দেখা যায়, তাতে দেখতে পাচ্ছি একটি পদ্মবন-শোভিত সরোবর...তাতে রাজহংস...তীরে উদ্যত ধনুকহাতে শিকারী...। আর দেখছি, কাশীরাজের আয়োজিত ধর্মসভা...কাশীরাজের মুকুট-শোভিত মাথাটি শুধু দেখা যায় ...বোধিসত্ত্বের মূর্তিটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে...অক্ষত আছে তাঁর করাঙ্গুলির ধর্মচক্রমুদ্রাটি। বোধিসত্ত্বের বামদিকে রাজমহিষী ক্ষেমাদেবীকে* সনাক্ত করা যায়...ভক্তিরসে তাঁর মুখাবয়ব আপ্লুত...রানীর পদপ্রান্তে একটি নীলকমল...রাজসভার বাহিরে একটি অস্ত্রদণ্ড লক্ষণীয়... দণ্ডে নানান্ জাতের আয়ুধ...ঢাল, ভল্লা, খড়্গ, চামড়ার কোমরবন্ধ।

এর পরেই একটি বিস্তৃত প্যানেলে গৌতম বুদ্ধের জীবনের আদিপর্বের কয়েকটি অপরূপ চিত্র-সম্ভার (২।২)। এগুলি অধিকাংশই অক্ষত। উপরে প্রথম দেখছি, তুষিত স্বর্গে বোধিসত্ত্ব শেষবার জন্মগ্রহণের পূর্বমুহূর্তে চিন্তামগ্ন (২।২ক)। তিনি ভাবছেন, কোন্ ভূ-ভাগে, কোন্ পরিবারে তিনি শেষবারের মত জন্মগ্রহণ করবেন। অবশেষে মনস্থির করেন তিনি —ভূমিষ্ঠ হবেন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে। কপিলাবস্তুর মহারাজ শুদ্ধোদনের বংশকে ধন্য করবেন তিনি। কৃতার্থ করবেন কপিলাবস্তুর রাজমহিষী মায়াদেবীকে।

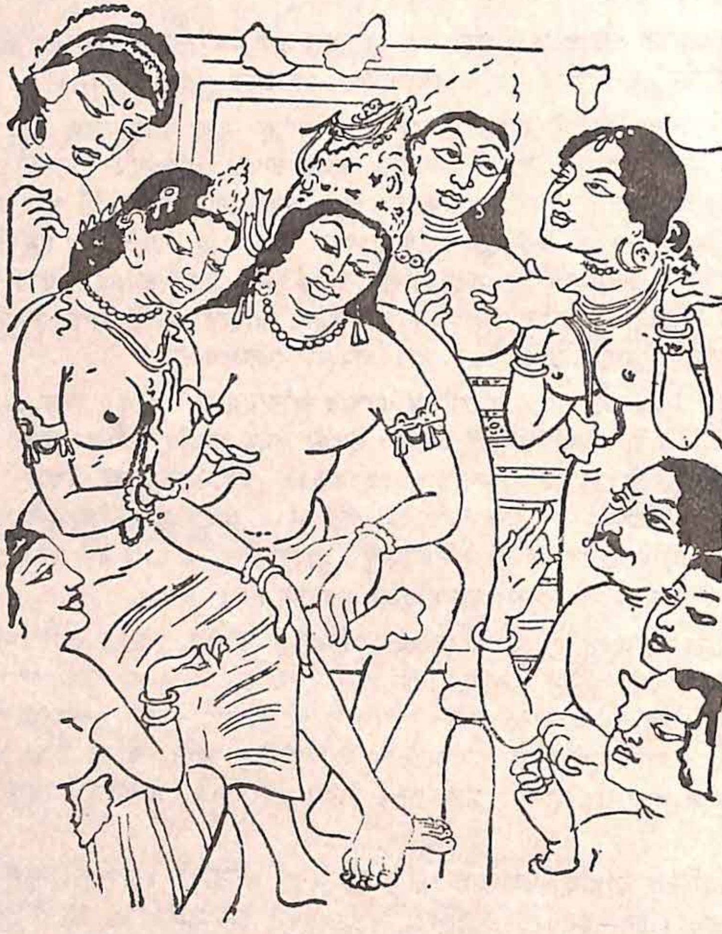
পরের চিত্রে দেখছি, মায়াদেবী স্বপ্ন দেখছেন শূন্যপথে এগিয়ে আসছে এক শ্বেতহস্তী, অমিতবিক্রম সে। এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই শ্বেতহস্তীর অঙ্গ থেকে। ক্রমে সেই হস্তী তাঁর দক্ষিণ অঙ্গে প্রবেশ করল। স্বপ্নভঙ্গের পরে মায়াদেবী রাজা শুদ্ধোদনকে এই অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শনের কথা শোনালেন (২।২খ)। মহারাজ সভাপণ্ডিতদের ডেকে প্রশ্ন করেন, মহারানীর এ অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শনের তাৎপর্য কি?

গৌতমের জন্মকাহিনী

পরের প্যানেলটিতে দেখছি, মহারাজ শুদ্ধোদন এবং মহারানী মায়াদেবী বসে আছেন একটি রত্নসিংহাসনে (চিত্র—১৮)। ব্যজনিকা, ছত্রধারিণী, চামরধারিণীর দল ঘিরে আছে তাঁদের দুজনকে। সম্মুখে একটু নিম্নাসনে একজন পণ্ডিত স্বপ্নমঙ্গলের কথা শোনাচ্ছেন। পণ্ডিতের সযত্নবিন্যস্ত গুম্ফরাজি লক্ষণীয়। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, মহারানীর দক্ষিণ-হস্তের বেড় দেহের তুলনায় ছোট। কোনও পাশ্চাত্য চিত্র-রসিকের মতে, এটি চিত্রাঙ্কনের ত্রুটি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা জানি, ভারতীয় চিত্রকর বহিরঙ্গের দিকে অতটা সূক্ষ্ম নজর দিতে নারাজ। স্বপ্নমঙ্গলের বৃত্তান্ত শুনতে বসে রানীর মুখে কী অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে—এইটি আঁকতেই শিল্পী তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত করেছেন। এখানেই রাফায়েল, মিকেলাঞ্জেলোর সঙ্গে অজন্তা শিল্পীর প্রভেদ, এখানেই গ্রীক ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের তফাত। জ্যোতিষী বলছেন—এ স্বপ্ন-দর্শনের অর্থ হল মহা-রানীর গর্ভে জন্ম নেবেন এক মহাপুরুষ! তিনি যদি সংসারে থাকেন, তবে হবেন ত্রিভুবনবিজয়ী রাজচক্রবর্তী, আর যদি সংসারে বীতরাগ হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে তিনি

* পরে ক্ষেমাদেবী অগ্রশ্রেবিকা হন, অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মানুসারে সারিপুত্র, মহামৌদ্গল্ল্যায়ন, উৎপলপর্ণা ও ক্ষেমা সমশ্রেণীর। বুদ্ধের অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যা এ মর্যাদা পাননি।

হবেন জগদ্‌গুরু, বিশ্বত্রাতা মহা-অবতার! কোন একটি বিবাহিতা অপুত্রক নারী যদি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের সম্বন্ধে এই রকম ভবিষ্যদ্বাণী শোনেন, তবে তাঁর কী জাতীয় ভাবাবেশ হয় তাই ফুটিয়ে তুলতেই অজন্তার শিল্পী তাঁর সমস্ত প্রতিভা ব্যয় করেছেন। নিরলস সাধনায় মায়াদেবীর মুখে তিনি সেই ভাবব্যঞ্জনাটি মূর্ত করতে চেয়েছেন—তাঁর কাছে তখন হাতের বেড়ের মাপ ছিল তুচ্ছ, নগণ্য, এহ বাহ্য!



চিত্র—১৮ ॥ সভাপণ্ডিত মহারাজ শুদ্ধোদন ও মায়াদেবীকে স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন (অবস্থান—2|2c)।

শিল্পী যেন মায়াদেবীর অপূর্ব চিত্রটি এঁকে তৃপ্ত হননি। তাঁর মনে হল, রাজসভায় সর্বসমক্ষে মায়াদেবীর মুখে সেই ভাবাবেশটি ফুটিয়ে তুলতে পারেননি তিনি। মায়াদেবী যেন এ-কথা শুনে ছুটে চলে যেতে চেয়েছিলেন তাঁর নির্জন নিভৃত কক্ষে। যেন আনন্দের অশ্রুপ্লাবনে ভেসে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর। শিল্পী তাই ঠিক পরের প্যানেলেই এঁকেছেন একটি অপূর্ব চিত্র। রাজসভা থেকে বেরিয়ে এসে মায়াদেবী একাকী দাঁড়িয়ে আছেন একটি স্তম্ভের সম্মুখে। তাঁর বামচরণ স্তম্ভ স্পর্শ করে আছে। সদ্যোশ্রুত স্বপ্নমঙ্গলের কথাই ভাবছেন তিনি, তাঁর প্রতি রোমকূপে রোমাঞ্চের শিহরণ, তাঁর হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার (চিত্র—১৯)।

পরের প্যানেলে দেখছি, শিবিকারোহণে মায়াদেবী চলেছেন পিত্রালয়ে। যাচ্ছেন লুম্বিনী-কাননের মাঝখান দিয়ে...সঙ্গে চলেছেন মহারানীর শত সখী। কিন্তু পিত্রালয়ের নিরাপদ

আশ্রয়ে পেঁছানো সম্ভবপর হল না। পরের চিত্রে দেখছি, একটি শালবৃক্ষের কান্ডে দেহভার ন্যস্ত করে মায়াদেবী দণ্ডায়মানা...তাঁর একটি বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত—যেন শালভঞ্জিকামূর্তি। তাঁর রোমাঞ্চিত তনুদেহটি ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাঁর ভগ্নী, শুদ্ধোদনের অপরা মহিষী মহাপ্রজাপতি বা মহাগৌতমী ; আর মায়াদেবীর দক্ষিণ উদর থেকে নির্গত হচ্ছেন মহাজাতক, জগৎত্রাতা ভবিষ্য-বুদ্ধ।

চলেছে চিত্রের মিছিল—যেন চলচ্চিত্রের সিকোয়েন্সের পর সিকোয়েন্স। পরের প্যানেলে দেখছি, স্বর্গ থেকে দেবগণ মর্ত্যে নেমে এসেছেন, ঋষিলোক থেকে সিদ্ধাচার্যের দল এসেছেন মহাজাতককে সম্মান দেখাতে। এসেছেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অসিত, দেবল। দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রোড়ে দেখছি নবজাতককে। ত্রিনয়ন ইন্দ্রকে সনাক্ত করা কঠিন নয়। তাঁর পাশেই দেখছি, প্রজাপতি ব্রহ্মা রাজছত্র ধরে আতপতাপ থেকে শিশুকে রক্ষা করছেন। পাশে চামরধারী। চিত্রে দেখছি জন্মলাভমাত্র শিশু বলছেন : অগ্গোঽহম্ অস্মি লোকস্স ; বলছেন —আমিই এ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ! এ-কথা বলেই শিশু সপ্তপদ অগ্রসর হয়ে যান অনায়াসে। তাঁর প্রতি চরণপাতে ফুটে উঠল এক-একটি স্থলপদ্ম (২।২চ)। চিত্রে সেই সপ্তপদ্মকে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। দেখছি, ত্রিনয়ন ইন্দ্র রাজছত্র ধারণ করে শিশুর পিছন পিছন অনুগমন করছেন সপ্তপদ! সম্পূর্ণ দেওয়াল জুড়ে এইভাবে তথাগত বুদ্ধের জীবনের আদিপর্ব এখানে বিধৃত। এই প্রাচীরের উপর দিকে কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত (২।৩)।

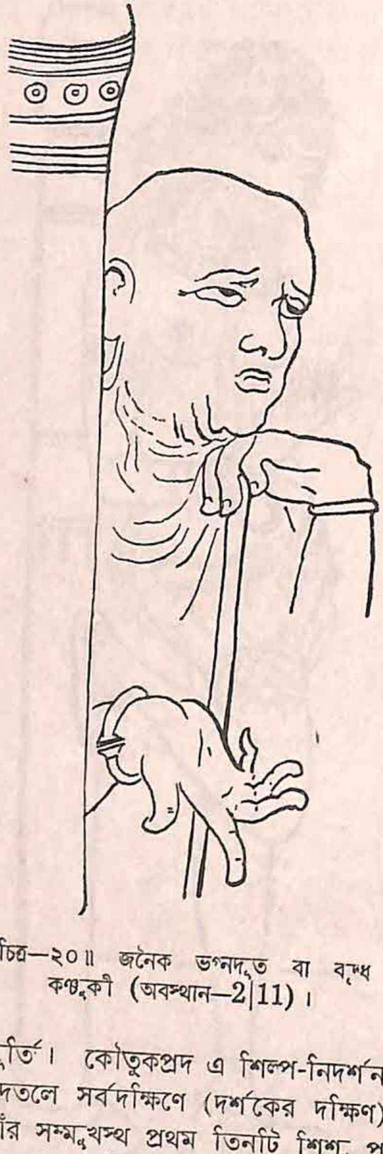
পায়ে পায়ে এগিয়ে আসি অন্তরালের বামপার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্রায়তন কক্ষটিতে। বামদিকের প্রাচীর-গাত্রে (২।৪) কয়েকটি রমণীর দণ্ডায়মান মূর্তি। তাঁরা সারি বেঁধে বুদ্ধদেবকে অর্ঘ্য দান করতে চলেছেন। এ মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ পরবর্তী যুগের, তখন শিল্পের সৌকর্য নিম্নাভিমুখী। চিত্রের মূর্তিগুলি হারিয়েছে অজন্তা-চিত্রের স্বাভাবিক পেলবতা, চিত্রে অঙ্কিত স্তম্ভগুলি অস্বাভাবিকভাবে শীর্ণকায়।



চিত্র—১৯ ॥ গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভাবাবিষ্টা মায়াদেবী (অবস্থান—2|2D)।

এই ক্ষুদ্রায়তন কক্ষটির সামনে সিলিঙে (২।৫) তেইশটি হংসের একটি বিচিত্র গোলাকৃতি আলিম্পন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই তেইশটি হংসের একটিও অপর কোন একটির নিছক অনুকরণ নয়। আলপনার নক্শায় এটি অস্বাভাবিক। আলপনার ধর্মই হচ্ছে একই চিত্রের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে নক্শার কারুকার্য গঠন করা। অথচ এখানে প্রত্যেকটি হংসের চিত্রই মৌলিক চিত্র—কেউ কারও অনুকৃতি নয়। প্রত্যেকটি হংসের ভঙ্গি বিচিত্র, বিশিষ্ট এবং মৌলিক। 'স্টেনসিল' ব্যবহৃত হয়নি।

এই কক্ষটিতে আছে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির দুটি মর্মর-মূর্তি (২।৬)। এঁরা দুজন জম্ভল বা কুবেরের দুই অনুচর। অন্তরালের বাম ও দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে (২।৭) শ্রাবস্তীর সহস্র বুদ্ধের অনুকৃতি—এক-একদিকে পাঁচশতটি। মূল গর্ভগৃহে মর্মর-মূর্তিটি (২।৮) মৃগদাবে পদ্মাসনে বসা বুদ্ধদেবের। তাঁর করাঙ্গুলি এখানেও সেই ধর্মচক্রমুদ্রা রচনা করেছে।



চিত্র—২০॥ জনৈক ভগ্নদূত বা বৃদ্ধ কঞ্চুকী (অবস্থান—2|11)।

ওপাশে একটি দীর্ঘকায় বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত ছিল (২।৯)। এখন শুধু মস্তক ও পদদ্বয় দেখা যায় মাত্র। তার পাশে গর্ভকক্ষে জম্ভল ও হারিতীর প্রস্তর-মূর্তি (২।১০)। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে এঁরা যেন কুবের ও তাঁর স্ত্রীর পরিপূরক। কিছুটা প্রভেদ আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে হারিতী ছিল রাক্ষসী। কিন্তু সে শিশুদের ভালবাসে ; অনেকটা আমাদের ষষ্ঠীমায়ের মত। বুদ্ধদেবকে একবার আক্রমণ করেছিল হারিতী ; কিন্তু তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত সে নতিস্বীকার করে। তাঁর আশীর্বাদ পায়। ফলে, তার রাক্ষসী-প্রবৃত্তি ত্যাগ করে শিশুদের নিয়েই মায়ের ভূমিকায় জীবনযাপন করে। রাক্ষসীকে মাতৃ-মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন বুদ্ধদেব। এখানে মর্মর মূর্তিতে সেই কাহিনীটি বিধৃত।

দেখছি, স্ফীতোদর জম্ভল ও হারিতী বসে আছে যুগ্মাসনে। হারিতীর এক হাতে স্বর্ণমুদ্রা-পূর্ণ মঞ্জুষা, অপর হাতে একটি শিশু। জম্ভলের হাতটি ভাঙা। সে হাতে কি ছিল জানা যায় না। জম্ভলের উপরে দেখছি চতুর্ভুজা রাক্ষসীর বেশে হারিতী আক্রমণ করছে বুদ্ধদেবকে। বুদ্ধদেব শান্ত, অবিচলিত। পরের দৃশ্যটি হারিতীর মূর্তির উপরে খোদাই-করা। সেখানে দেখছি, হারিতী তথাগতকে প্রণাম করছে। হারিতীর ক্রোড়ে এবার একটি শিশু। আক্রমণের সময় সে ছিল চতুর্ভুজা আয়ুধ-ধারিণী রাক্ষসী। প্রণামের সময় সে শিশুক্রোড়ে মাতৃ-মূর্তি। সিংহাসনের নীচে দশটি শিশুর মূর্তি। কৌতুকপ্রদ এ শিল্প-নিদর্শনটি। দশটি শিশুমূর্তি দুই ভাগে বিভক্ত। জম্ভলের পদতলে সর্বদক্ষিণে (দর্শকের দক্ষিণ) দেখছি পাঠশালার গুরুমশাই, তাঁর হাতে বেত্রদণ্ড। তাঁর সম্মুখস্থ প্রথম তিনটি শিশু পড়াশুনা করছে। তাদের পিছনে দুটি শিশু মল্লযুদ্ধ করছে। হারিতীর পদতলে পাঁচটি শিশুই ভেড়ার লড়াই নিয়ে মেতে আছে। অভিকর্ষের সূত্রের অনুকরণে আমরা বলতে পারি, শিশুদের বিদ্যার প্রতি মনোযোগ শিক্ষকের দূরত্বের ব্যস্তানুপাতে নির্ভরশীল। যে যত কাছে সে তত মনোযোগী। যে যত দূরে সে ততই দূরে সরে গেছে বিদ্যা থেকে!

জম্ভল ও হারিতী

দক্ষিণের দেওয়ালে একটি বৃদ্ধ কঞ্চুকীর অপূর্ব চিত্র। হতভাগ্য ভগ্নদূত কিছু দুঃসংবাদ বহন করে এসে দাঁড়িয়েছে রাজার সম্মুখে। গাইডকে প্রশ্ন করে, বই ঘেঁটে উদ্ধার করতে পারলুম না—কে সেই রাজা, কিসের এই দুঃসংবাদ। মহাকালের অঙ্গুলিহেলনে সে রাজাও নেই, সেই দুঃসংবাদও আজ ছায়ার চেয়েও ছায়া—এমনকি ইতিহাসও ভুলে গেছে সে ঘটনা। শুধু ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত প্রাচীর-গাত্রে অক্ষয় হয়ে আছে ভগ্নদূতের সেই অপূর্ব অভিব্যক্তিটি

(চিত্র—২০)। তার দক্ষিণহস্তের মুদ্রা, বিষাদখিন্ন দৃষ্টি দেখে অনুমান করা শক্ত হয় না কী জাতীয় সংবাদ বহন করে এনেছে হতভাগ্য ভগ্নদূত (২।১১)।

এই গুহা-মন্দিরেই রুরুজাতক ও ক্ষান্তিবাদী জাতকের দুটি অনবদ্য চিত্র-কাহিনী ছিল বলে পড়েছি প্রামাণিক গ্রন্থে। অনেক চেষ্টা করেও তাদের সনাক্ত করতে পারলুম না। শুধু ক্ষান্তিবাদী জাতকের একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ টিকে আছে। সেটির কথা বলি :

সদ্ধর্মের প্রতি বিরূপ এক নরপতি একবার তাঁর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নর্তকীদের নিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণে গিয়েছিলেন। উৎসব ও আমোদে ক্লান্ততনু মহারাজ প্রমোদ-কাননের একান্তে নিদ্রাভিভূত হওয়ায়, নর্তকীর দল ইচ্ছামত কাননে পরিভ্রমণ করতে থাকে। সহসা তারা বনের একান্তে এক পীতবসনধারী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পায়। সন্ন্যাসী ওদের দেখতে পেয়ে কাছে ডাকেন, সস্নেহে নানা কথা আলোচনা করতে থাকেন। এই সন্ন্যাসী বস্তুতঃ বোধি-সত্ত্ব। তাঁর মুখনিঃসৃত ধর্মকথায় নর্তকীর দল ক্রমশঃ বিভোর হয়ে যায়। ওদের প্রধান রাজনর্তকী ভাবাবেশে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। নিদ্রান্তে মহারাজ নর্তকীদের দেখতে না পেয়ে ক্রোধান্ধ হয়ে পড়েন। সন্ধান করতে করতে তিনি আসেন সন্ন্যাসীর নিকটে। মহারাজ বোধিসত্ত্বকে তরবারি দ্বারা ক্রমাগত আঘাত করতে থাকেন। ক্ষান্তিবাদী বোধিসত্ত্ব সমস্ত আঘাত অবিচলভাবে গ্রহণ করেন। এতে রাজনর্তকী আরও অভিভূত হয়ে প্রতিবাদ করতে যায়। তাই দেখে মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে বধ করতে যান নটীকে। রাজনটী তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে।

ক্ষান্তিবাদী জাতক



চিত্র—২১ ॥ ক্ষান্তিবাদী জাতক—অপরাধিনী রাজনর্তকীকে শাস্তিদানে উদ্যত রাজা (অবস্থান—2|12)।

কাহিনীর সমস্তটাই অবলুপ্ত, শুধু টিকে আছে একটি খণ্ডচিত্র (২।১২)। দেখছি, একটি রাজদরবার। সিংহাসনে বসে আছেন একজন রাজা, তাঁর দক্ষিণহস্তে কোষমুক্ত তরবারি। রাজনর্তকী লুটিয়ে পড়েছে তাঁর চরণমূলে। পার্শ্ববর্তী নর্তকী দুহাতে নিজের মুখ ঢেকেছে। অপর একজন পলায়নে উদ্যতা। ক্রোধোন্মত্ত বলদর্পী মহারাজের ভঙ্গিটিও লক্ষণীয় (চিত্র—২১)।

রাজার চরণপ্রান্তে প্রণতা রাজনর্তকীর এ প্রণামের ভঙ্গিটি আমাদের কাছে অতি পরিচিত, কিন্তু এই বহুল-ব্যবহৃত নক্শা-চিত্রটির মূল উৎস যে কী তা হয়তো জানতুম না আমরা।

ছবিটি দেখে মনে মনে হাসি। চিত্রটির কিছুটা অংশ আছে, কিছুটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মহাকালের নির্দেশে। মনে মনে বলি, হে মহান্ শিল্পী, তুমি এমন একটি খণ্ড-মুহূর্তের পরিকল্পনা করেছিলে, যার পরমুহূর্তেই ঐ হতভাগিনী রাজনটীর শিরশ্ছেদ হওয়ার কথা! অন্ততঃ হাজার বছর পূর্বে তাই তুমি ভেবেছিলে। জানি না আজ অর্মত্য-লোকের কোন অন্তরাল থেকে তুমি তোমার এই অনবদ্য চিত্রপটটি দেখতে পাচ্ছ কি না। পেলে তুমি নিশ্চয় আমারই মত হাসছ। তোমার প্রিয় রাজনর্তকীর মস্তক আজ হাজার বছরেও দেহচ্যুত হয়নি। অস্পষ্ট হয়ে এলেও তার ঘনানিবদ্ধ পুষ্পস্তবক-লাঞ্ছিত কবরীর আভাস আজও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। অথচ যে উদ্ধত নৃপতি ওর শিরশ্ছেদ করবার জন্য তরবারি উত্তোলন করেছিলেন তিনি নিজেই আজ ছিন্নশির! খসে পড়েছে পলেস্তারার ঐটুকু অংশ!

মহাকাল তোমাকে প্রণাম! ধন্য তোমার সূক্ষ্ম রসবোধ! মহারাজের মুণ্ডপাত করার পরেও কৌতুক করে জিইয়ে রেখেছ তার কোষমুক্ত নিষ্ফলা তরবারিটিকে।

কিন্তু তাই তো দেখতে পাই দুনিয়ায়! গর্বান্ধ পন্তিউস্ পিলাত-এর বিচারসভার ধূলিকণাও আজ খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ টিকে থাকে ক্রুশবিদ্ধ নগ্নকায় মানুষটির বাণী! হিটলারের বিপুল পান্‌ৎসার বাহিনী ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়, অথচ ঝড়ঝঞ্ঝায় হারিয়ে যায় না অ্যানি ফ্রাঙ্কের দিনলিপির একটি পাতাও!

দ্বিতীয় গুহা-মন্দিরে উত্তর দিকের প্রাচীরে দুটি বৃহদায়তন প্যানেলে দুটি জাতক-কাহিনী বিচিত্রিত। সে দুটি হচ্ছে পূর্ণ-অবদান (২।১৩) এবং বিধুর পণ্ডিতের কাহিনী (২।১৪)।

পূর্ণ-অবদানের কাহিনীটি আগে বলি :

সূর্পারক জনপদে একজন বণিকের পুত্র ছিলেন পূর্ণ ; কিন্তু তিনি ছিলেন দাসীপুত্র। পিতার দেহাবসানের পর পূর্ণ জানতে পারলেন পিতা তাঁকে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভাবিলকে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে গেছেন। এজন্য মহামতি পূর্ণের মনে কোন ক্ষোভ নেই। অন্যান্য ভাইদের প্রতি কোন ঈর্ষা বা বিদ্বেষ ছিল না তাঁর। তিনি বাণিজ্যে মনোনিবেশ করলেন। পর পর ছয়বার তিনি সমুদ্রযাত্রা করেন এবং দেশ-বিদেশ থেকে বহু সম্পদ্ আহরণ করে আনেন। ক্রমে পূর্ণ হয়ে পড়েন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বণিক। ছয়বার বাণিজ্যে সফলকাম হওয়ায় পূর্ণ অবসর নিতে চাইলেন ; কিন্তু আত্মীয়-বন্ধুদের একান্ত অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সপ্তমবার তিনি বাণিজ্যযাত্রা করলেন।

পূর্ণ-অবদান

সেইবার সমুদ্রযাত্রায় শ্রাবস্তীর কয়েকজন নাবিককে তিনি নিজ নৌকায় নিয়েছিলেন। পূর্ণ লক্ষ্য করেন, প্রতিদিন এই নাবিকের দল একত্র হয়ে একটি অপূর্ব সঙ্গীত গায়। সে সঙ্গীতের প্রভাব সুদূরপ্রসারী—পূর্ণের হৃদয়ে তা অপার্থিব ভাবের সঞ্চার করে—তাঁর মন-প্রাণ ভরে যায়। শেষে একদিন তিনি নাবিকদের ডেকে জানতে চাইলেন—এই স্বর্গীয় সঙ্গীতটি তারা কোথায় শিখেছে।

উত্তরে বিনয়াবনত নাবিকরা বলে : প্রভু, এ কোন সঙ্গীত নয়—এ প্রার্থনা-গাথা। এ মন্ত্রধ্বনি। এ মন্ত্র আমরা শিখেছি এক মহাপুরুষের কাছে।

পূর্ণ প্রশ্ন করেন : কে সেই মহাপুরুষ?

—কে তা জানি না। শুনেছি তিনি ছিলেন রাজপুত্র। এখন ভিখারী!

—কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়?

—এখনও তিনি শ্রাবস্তীতেই আছেন।

পূর্ণ মনে মনে ভাবে ইতিপূর্বে ছয়বার বাণিজ্যযাত্রায় সে প্রভূত ধনসম্পদ্ আহরণ করে

এনেছে ; কিন্তু কই তাতে তো তার মনের তন্ত্রীতে এ ধরনের অনুরণন হয়নি। সে ভাবে, এই অপূর্ব সঙ্গীত-গাথার যে মূল উৎস তার সঙ্গেই প্রথমে এক হাত বাণিজ্যের লেনদেন করে নিলে কেমন হয়?

শ্রাবস্তীতে এসে পূর্ণ এক নূতন আলোকের সন্ধান পেল। পীতবসনধারী দেবদুর্লভ-কান্তি দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসীকে ভিক্ষাপাত্র হাতে শ্রাবস্তীর রাজপথে ভিক্ষা করতে দেখে লুটিয়ে পড়ল তাঁর চরণে। মহাভিক্ষু আশীর্বাদ করলেন ওকে।

পূর্ণ শুনল, ইনি যুগাবতার—নাম গৌতম বুদ্ধ।

সংসারে আর মন নেই পূর্ণের। পার্থিব ধনসম্পদ্ সব তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে। সে যে পরশমণির সন্ধান পেয়েছে—মণিকে আর মণি-জ্ঞান করে না। ওর দাদা ভাবিল এসে বলে—তোর কি হয়েছে বল তো?

পূর্ণ হেসে বলে—সে তুমি বুঝবে না দাদা। তবে আমার যা-কিছু বিষয়-সম্পদ্ আছে, তা দান করে আমি সঙ্ঘে যোগদান করতে চাই।

: তোর এত এত বিষয়-সম্পত্তি সব দান করে যাবি?

: না ঠিক দান নয়, ভাবছি এ-সবের বিনিময়ে একটি চন্দনকাঠের চৈত্য-বিহার নির্মাণ করাব। তারপর তাঁকে নিয়ে আসব সেখানে।

ভাবিল ছোট ভাইয়ের হাত দুটি ধরে বলে—সন্ন্যাসীর চন্দনকাঠে কী প্রয়োজন ভাই? আমার দিকে চেয়ে দেখ বরং। পিতৃধনে বঞ্চিত হয়েছি—তুইও ত্যাগ করে যাচ্ছিস্—

বাধা দিয়ে পূর্ণ বলে—নাও দাদা, তুমিই নাও এ-সব। আমি বরং ভিক্ষা করেই আমার শেষ মনোবাসনা পূরণ করব—

ভাবিল মনে মনে হাসে। ভাবে, তার ভাই পূর্ণের একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জম্বুদ্বীপে তখন চন্দনকাঠের প্রচণ্ড অভাব, তার বিক্রয়-মূল্য বর্ধিত হয়ে গেছে শতগুণ! ভিক্ষালব্ধ ধনে পূর্ণ সেই চন্দনকাঠের সঙ্ঘারাম নির্মাণ করতে চায়! পাগল আর কাকে বলে!

পূর্ণের যা-কিছু সম্পদ্ তা গ্রহণ করে ভাবিল। বাণিজ্য-সম্ভারে সপ্ত-মধুকর-ডিঙা সাজিয়ে প্রস্তুত হয় সমুদ্রযাত্রায়। মুণ্ডিতশীর্ষ পীতবসনধারী পূর্ণ অগ্রজকে প্রণাম করে বিদায় নেয়—সে যেতে চায় এক নির্জন দ্বীপে। সেখানে শ্রোণপরন্তক নামে নরমাংসভুক্ এক হিংস্র জাতির বাস। পূর্ণের অভিলাষ, সে ঐ হিংস্র জাতির মধ্যে প্রচার করবে অহিংসার বাণী, সৎ ধর্মের অনুশাসন!

ভাবিল বলে : ভাই, আর কি কোনদিন আমাদের দেখা হবে না?

পূর্ণ বলে : হবে না কেন? যেদিন প্রয়োজন বুঝবে আমাকে স্মরণ করবে! আমি আহ্বানমাত্র উপস্থিত হব তোমার কাছে।

ভাবিল আবার মনে মনে বলে : একেবারে বদ্ধ উন্মাদ!

দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে থাকে ভাবিল। ক্রমশঃ তার সপ্তডিঙা পরিপূর্ণ হয়ে যায় মণি-মুক্তা, লাক্ষা ও গন্ধ দ্রব্যে। সমস্ত বাণিজ্য-সম্পদ্ নিয়ে সে অবশেষে আসে চন্দনদ্বীপে। ভাবিল জানে, এই চন্দনদ্বীপে বাস করে দুর্দান্ত যক্ষ মহেশ্বর—একখণ্ড চন্দনকাঠও সে দ্বীপের বাইরে যেতে দেয় না। তাই আজ জম্বুদ্বীপে চন্দনকাঠের এই কৃত্রিম অভাব। ভাবিল সংবাদ পেয়েছে, যক্ষ মহেশ্বর চন্দনদ্বীপে অনুপস্থিত। সেই সুযোগে সে সমস্ত বাণিজ্য-সম্ভারের বিনিময়ে তার সপ্তডিঙা পূর্ণ করে উৎকৃষ্ট চন্দনকাঠের সম্ভারে। মহেশ্বর দ্বীপে ফিরে আসার আগেই যাত্রা করে স্বদেশে।

দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রার পর নাবিকের দল খুশী হয়ে ওঠে। সপ্তডিঙার পালে যে লেগেছে ঘরে-ফেরার-হাওয়া।

বাণিজ্যতরী যখন দ্বীপ ছেড়ে মধ্যসমুদ্রে, তখন হঠাৎ ওঠে দুরন্ত সমুদ্র-ঝটিকা। প্রচণ্ড-ভাবে দুলতে থাকে সপ্তডিঙা!

প্রধান নাবিক ছুটে এসে বলে—প্রভু, সর্বনাশ হয়েছে! যক্ষ মহেশ্বর সংবাদ পেয়ে গেছে! তারই আক্রোশে এ অকাল ঝটিকা।

দক্ষ নাবিকদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও নৌকা রক্ষা করা যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে! ঝড়ের বেগ যেন ক্রমবর্ধমান, সমুদ্রের তলদেশ থেকে যেন কোন অদৃশ্য শক্তি বাণিজ্য তরীগুলিকে ক্রমাগত নীচের দিকে টানছে। নাবিকের দল ভয়ে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ে।

নিরুপায় ভাবিল তখন যুক্তকরে প্রার্থনা করতে থাকে, বলে—পূর্ণ, তুমি বলেছিলে আমার বিপদের সময় আমাকে রক্ষা করবে। আজ আমি একান্তমনে প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে বিপদ্‌মুক্ত কর, দুর্দান্ত যক্ষ মহেশ্বরকে বধ করে ত্রাণ কর আমাকে!

কিন্তু সে প্রার্থনায় কোন ফল হয় না। নিমজ্জিত হতে থাকে বাণিজ্যতরী। ভাবিল পুনরায় বলে : হে পূর্ণ, আমি জানি তুমি মহাপুরুষের আশীর্বাদে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তুমি এসে রক্ষা কর আমাদের। আমার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় এভাবে ধ্বংস হতে দিও না!

কিন্তু তবু কোন সাহায্য এসে পৌঁছায় না!

সহসা ভাবিলের মনে পড়ে যায় পূর্বকথা। বলে : হে পূর্ণ, তোমার অভিলাষ পরি-পূরণ করব আমি। প্রতিশ্রুতি দান করছি, যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর, তবে এই সমুদয় চন্দনকাঠ দিয়ে আমি তথাগত বুদ্ধের জন্য একটি অপরূপ সংঘারাম নির্মাণ করে দেব!

আশ্চর্য! তবু কোন সাহায্য এসে পৌঁছায় না। তিল তিল করে নিমজ্জিত হতে থাকে বাণিজ্যতরী।

তখন চতুর্থবার চীৎকার করে ওঠে ভাবিল : নিষ্ঠুর! তোর কি একটুও দয়া নেই? আমি কিছুই চাই না, শুধু আমার সহকর্মী নাবিকদের প্রাণরক্ষা করতে চাই। এতগুলি নিরপরাধ প্রাণীর কি সলিল-সমাধি হবে ভাই?

উচ্চারণমাত্র নৌকায় আবির্ভূত হন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। পীতবসন, মুণ্ডিতশীর্ষ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। ভাবিল সবিস্ময়ে দেখে, অলৌকিক ক্ষমতাবলে শূন্যপথে উড়ে এসেছেন মহাভিক্ষু পূর্ণ! পূর্ণের আবির্ভাবমাত্র শান্ত হয়ে যায় সমুদ্র-ঝটিকা, পরাভূত যক্ষ সহ্য করতে পারে না সে সন্ন্যাসীর অমিত পুণ্যপ্রভাব। পলায়ন করে সে।

আনন্দাশ্রু-বিগলিত ভাবিল আলিঙ্গন করে পূর্ণকে। বলে : ভাই, এত বিলম্ব করলে কেন? আমি যে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

পূর্ণ বলে : ভুল বলছ দাদা। আমি আহ্বানমাত্র এসেছি।

ভাবিল বলে : কী বলছ ভাই! তোমাকে আমি চারবার ডেকেছি।

হেসে পূর্ণ বলে : না। একবার মাত্র! তুমি চারবার আমাকে স্মরণ করেছ বটে, কিন্তু ভেবে দেখ কেন ডেকেছিলে। প্রথমবার তুমি ডেকেছিলে যক্ষ মহেশ্বরকে বধ করবার জন্য; কিন্তু দাদা, হননেচ্ছা তো কোন প্রার্থনা-মন্ত্র হতে পারে না। দ্বিতীয়বার ডেকেছিলে তোমার সম্পদ্‌ রক্ষার জন্য; কিন্তু পার্থিব ধন-সম্পত্তি রক্ষা তো কোন প্রার্থনা-মন্ত্র হতে পারে না। তৃতীয়বার ডেকে বলেছিলে এ উপকারের বিনিময়ে তুমি আমাকে প্রতিদান দিতে চাও; কিন্তু দান-প্রতিদানের নিরিখে তো কোন প্রার্থনা-মন্ত্র রচিত হতে পারে না। ভেবে দেখ, শেষবার তুমি আমাকে গালিমন্দ করে ডেকেছিলে জীবে দয়া প্রদর্শনের জন্য; অহিংসার মন্ত্রে সে প্রার্থনা-ধ্বনি অন্তর স্পর্শ করেছে আমার। আমি আহ্বানমাত্র ছুটে এসেছি তোমার পাশে।

ভাবিল ভাইকে আলিঙ্গন করে বলে—আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি ভাই! কিন্তু আর ভুল করব না। আমিও যোগ দেব ঐ ব্রতে। শরণ নেব বুদ্ধের, ধর্মের এবং সঙ্ঘের।

পূর্ণ বলে—আর তোমার এই চন্দনকাঠের বিপুল সম্ভার?

: ও দিয়ে নির্মাণ করব আমরা দুই ভাইয়ে মিলে এক অপরূপ সঙ্ঘারাম। না না, কোন প্রতিদান চাই না আমি! আমি চাই, এই চন্দনকাঠ ধন্য হোক সেই তথাগত বুদ্ধের সেবায়।

দুই ভাইয়ে মিলে অবশেষে রচনা করে একটি অপূর্ব চন্দন চৈত্য-বিহার।

বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে তথাগত বুদ্ধ স্বয়ং এসেছিলেন সেই অপরূপ সঙ্ঘারামে!

জাতকানুসারে মূল কাহিনী এইটুকুই। দ্বিতীয় গুহা-মন্দিরের প্রাচীরে (২।১৩) অজন্তার শিল্পী এই কাহিনীটি অবলম্বন করে যে প্রাচীন-চিত্র এঁকেছেন, এবার তার কথা



চিত্র—২২ ॥ উপরেঃ (বামে ও মধ্যভাগে) পূর্ণ ও ভাবিল বুদ্ধদেবকে অর্ঘ্যদান করতে চলেছে ; (সর্বদক্ষিণে) বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীতে ধর্মপ্রচারে রত। নীচেঃ (সর্ববামে) পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করছে ; (মধ্যভাগে) ভাবিলের বাণিজ্যতরী ; (দক্ষিণে) আকাশপথে পূর্ণের আগমন ; (সর্বনিম্নে) যক্ষ মহেশ্বরের অনুচর মৎস্যকন্যাদ্বয় (অবস্থান—2|13)।

বলি। কথা-সাহিত্যের খাতিরে মূল কাহিনীকে কিছুটা ঢেলে সাজিয়েছি আমি—ইচ্ছামত সংলাপ সংযোজন করেছি, যেমন—জাতকের মূল কাহিনীতে ভাবিল চারবার প্রার্থনা করেছিল এমন কোন উল্লেখ নেই ; সেটি আমার কল্পনা। অজন্তার শিল্পীও শিল্পের খাতিরে কাহিনীকে নিজ ইচ্ছানুসারে সাজিয়েছেন (চিত্র—২২)।

প্যানেলের নীচে বামদিকে দেখছি, শ্রাবস্তীনগরে এসেছেন পূর্ণ (২।১৩ক)। তথাগত বুদ্ধের সম্মুখে তিনি প্রণামরত! পীতবসন সন্ন্যাসী একটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পূর্ণের মস্তকের উপর, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে! দুটি আলেখ্যেই মস্তকের অংশ নষ্ট হয়ে গেছে।

তার দক্ষিণে দেখছি, সমুদ্রের মাঝখানে ভাবিলের বাণিজ্যতরী (২।১৩খ)। চৈনিক শিল্প-পদ্ধতি অনুসারে জল আঁকা হয়েছে। নৌকার উপর পাল তোলা ; তাতে তিনটি দাঁড়। নৌকার গলুইয়ে বারোটি জলপূর্ণ পাত্র—অর্থাৎ এ সমুদ্রযাত্রা ; পানীয় জল তাই সুরক্ষিত। নৌকা চন্দনকাঠে বোঝাই। তলদেশে জলজন্তুরা আক্রমণ করেছে। দুটি উৎক্ষিপ্ত বাহু মৎস্যকন্যা—সম্ভবত যক্ষ মহেশ্বরের অনুচর। এদের ঊর্ধ্বাঙ্গ মনুষ্যাকৃতি, নিম্নাঙ্গ মীন। এ দুজনের উৎক্ষিপ্ত বাহু দুটির ভঙ্গিমা লক্ষণীয়—সে বাহুর রেখায় সমুদ্রতরঙ্গের লীলায়িত ছন্দ। নৌকাটি মকরমুখী মধুডিঙা। দেখতে পাচ্ছি নৌকার উপর যুক্তকরে ভাবিল প্রার্থনা করছে। তার চোখে আর্তি! আরও দেখতে পাচ্ছি শূন্যপথে উড়ে আসছেন একজন দেবদূত—ভাবিলের রক্ষাকর্তা। দেবদূতের উপর আকাশপথে নেমে আসছেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মহাভিক্ষু পূর্ণ। এই আলেখ্যটিতেও পূর্ণের মুখটি নষ্ট হয়ে গেছে (২।১৩গ)।

এই সমুদ্রযাত্রা দৃশ্যটির উপরে এক বিস্তারিত প্যানেল। সেটি পরবর্তী ঘটনার দ্যোতক। উদ্ধারপ্রাপ্ত ভাবিল পূর্ণকে নিয়ে শ্রাবস্তীনগরে এসেছে তথাগত বুদ্ধকে অর্ঘ্যদান করতে। বামদিকে একটি প্রবেশদ্বার। সেখানে দুটি রমণী, তৃতীয় একটি কামিনী সোপানের নিকটবর্তী। তার হাতে অর্ঘ্য-থালিকা, তার চাহনি বঙ্কিম চটুল। পাঁচটি সোপান অতিক্রম করে আসতে হবে সভামণ্ডপে। এই সোপানের উপর আরও একটি মেয়ে। মণ্ডপের মাঝামাঝি পূর্ণ ও ভাবিল। ভাবিল তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে—এ অপরিচিত স্থানে কিভাবে সহবত রক্ষা করতে হয় তা ভাইয়ের কাছ থেকে সে জেনে নিতে চায়। পূর্ণের আকৃতি কিছু বড়। এই প্যানেলে পূর্ণের আলেখ্যই মূল আকর্ষণ। অজন্তার শিল্পী অনেক স্থলে প্রতিভা ও মহানুভবতা আরোপ করতে বিশেষ কোন মূর্তিকে পার্শ্ববর্তী মূর্তিগুলির তুলনায় বড় করে এঁকেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম গুহায় অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির (চিত্র—৮) মূর্তি, কিংবা সপ্তদশ মন্দিরের বিখ্যাত 'গোপা ও রাহুল' চিত্রে বুদ্ধদেব (চিত্র—৫৭)। কিন্তু এ কোন স্বতঃসিদ্ধ ব্যবস্থা নয়। কারণ অজন্তার শিল্পী জানেন, ত্রি-মাত্রিক বাস্তব দৃশ্যকে দ্বি-মাত্রিক আলেখ্যে রূপায়িত করার মূল সূত্র হচ্ছে কাছের জিনিস বড় দেখাবে, দূরের জিনিস ছোট। তাই এই চিত্রের সর্বদক্ষিণে যখন তিনি তথাগত বুদ্ধকে এঁকেছেন, তখন তাঁকে আকারে বৃহৎ করেননি। প্রতিভায় ও মহানুভবতায় বুদ্ধদেব পূর্ণের চেয়ে অনেক বড় ; কিন্তু যেহেতু তিনি দূরে আছেন তাই তাঁকে বৃহদায়তন করে আঁকা সম্ভব হয়নি। বিকল্প ব্যবস্থায় শিল্পী সেখানে আলোকপাতের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধমূর্তিটি তাই সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বলতা যেন আয়তনের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। বাস্তবে রঙিন চিত্রটি দেখলে, এ সত্য অনুধাবন করতে পারবেন, যা আমার রেখাচিত্রে প্রতিভাত হচ্ছে না।

ভাবিল ও পূর্ণকে ঘিরে চারজন দাসী চলেছে অর্ঘ্য-থালিকা বহন করে। পিছনে একটি নহবৎখানা। তাতে তিন কক্ষ—তিন কক্ষে তিন রমণীমূর্তি। একজন বাজাচ্ছে খঞ্জনি, একজন মাদল, তৃতীয় জন কি বাজাচ্ছে তা জানবার উপায় নেই। সে চিত্রটি অক্ষত নেই। নহবৎখানার পাশে দেখছি আর একটি প্রবেশদ্বার। সেখানে পুনরায় দুটি নারীমূর্তি। একজন সুসজ্জিতা, মনে হয় সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা, সঙ্গে তাঁর সহচরী। এঁরাও পূজা নিবেদন করতে আসছেন।

সর্বদক্ষিণে একটি গর্ভগৃহে বুদ্ধদেব ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন

সর্বসমেত নয়জন ভক্ত। সাতজন পুরুষ, দুটি রমণী। স্ত্রীলোক দুজন বসেছেন শালীনতা রক্ষা করে কিছু তফাতে।

তার পরের চিত্রে দেখছি (চিত্র—২২-এর অন্তর্ভুক্ত নয়) চন্দন-বিহারে বুদ্ধদেব আসছেন। তিনি আসছেন শূন্যপথে দুই শিষ্যসমেত। দেখছি একটি ধাতব পাত্র নিয়ে পূর্ণ এসেছে তাঁর চরণ ধৌত করতে। পূর্ণের পশ্চাতে চারজন পুরকামিনী। পশ্চাৎপটে দেখতে পাচ্ছি চন্দন-বিহার।

অজন্তার শিল্পী চিত্র-কাহিনীর যবনিকা টেনেছেন পূর্ণের অভিলাষ পূরণে। চন্দন-বিহারে বুদ্ধদেবের আগমনে।

পূর্ণ-অবদানের উপরে আঁকা আছে এক বিস্তারিত কাহিনী-চিত্র। পুণ্যক ও ইরান্দাতীর উপাখ্যান। এটি বস্তুত বিধুর পণ্ডিত জাতকের কাহিনী (২।১৪)।

পাতালপুরীর অতল গভীরে বাসুকি-পরিশাসিত নাগলোকে রাজকন্যা ইরান্দাতীর মনে নেমেছে শ্রাবণ রাত্রির ঘনান্ধছায়া। নাগরাজ্যে বিলাস-ব্যসন, আমোদ-প্রমোদের কোন বিরাম নেই। রাজপ্রাসাদের রত্নমণিদীপিত নৃত্যসভা, রাজোদ্যান-সংলগ্ন স্ফটিকস্বচ্ছ পদ্মশোভিত সরোবর, মুক্তাখচিত স্বর্ণখট্টাঙ্গে আশ্লেষশয্যা, রাজকুমারীর বিলাসের উপকরণের অভাব নেই কোন। তবু এ প্রাচুর্যের মধ্যেও রাজকন্যার মনে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। কঞ্চুকী মর্ত্যলোকের এক নির্বাসিতা মানুষীকে পেঁাছে দিয়ে গেছে রাজকন্যার কাছে,—সে বর্তমানে তাঁর পরিচারিকা, প্রিয় সখী মাতলী। রাজনন্দিনীর চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে সে তাঁকে শুনিয়েছে পৃথিবীর কাহিনী। আর তাই শুনে মনোবিকার হয়েছে বাসুকি-তনয়া ইরান্দাতীর।

বিধুর পণ্ডিত জাতক

স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ শুক-সারীকে দেখেন আর তাঁর মনে পড়ে যায় মাতলীর বর্ণনা—মুক্ত নীলাকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের সন্তরণের কথা!

নাগকন্যা প্রশ্ন করেন—মুক্ত নীলাকাশ কাকে বলে মাতলী?

নির্বাসিতা মানুষী হেসে বলে—কেমন করে তোমাকে বোঝাব রাজকন্যা? মনে কর, এই পাতালপুরীর সুবর্ণ-চন্দ্রাতপ নেই—সেখানে কেবল দূর—শুধুই দূর—সীমাহীন ব্যাপ্তি!

রাজকন্যা অবাক্ হয়ে বলেন—তা কি কখনও হয়?

মাতলী বলে—হয় বইকি নাগকন্যা, আর সেই নীলাকাশে অন্ধকারের যবনিকা সরিয়ে ধরণীর বুকে যখন উঠে আসেন সূর্যদেব, তখন বালার্করক্তিমরাগে লজ্জারুণ হয়ে ওঠে পার্থিব প্রভাত! আবার মধ্যাহ্ন-ভাস্করের উজ্জ্বল আলোকে পৃথিবী যখন সাজে, তখন তার দিকে তাকানো যায় না। মণিদীপ্ত নাগলোকের কৃত্রিম আলোকের সঙ্গে সে উজ্জ্বলতার তুলনাই হয় না। আবার দিনান্তে অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত গোধূলি-মুহূর্তের যে বেদনা-বিধুর অনুভূতি তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি—না রাজকন্যা, এ নাগলোকের স্বর্ণপুরীতে তেমন কিছু আজও দেখিনি!

নাগরাজ-দুহিতার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তিনি জানেন মুক্ত পৃথিবীতে কোনদিনই পদার্পণ করতে পারবেন না তিনি। নাগকন্যার অধিকার নেই এই পাতালপুরীর বাহিরে যাবার। এ অতলান্ত নাগলোকের গভীরে জন্মলাভ করেছেন, এখানেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। সে-কথা স্মরণ করে ম্লান হয়ে যান রাজকন্যা।

মাতলী বলে, তুমি যে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার মত প্রতিদিন ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছ রাজনন্দিনী!

বিস্মিতা ইরান্দাতী বলে : কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলা কাকে বলে সখী?

মাতলী হাসে, বলে, তাও জান না নাগকন্যা? উপরের পৃথিবীতে পূর্ণচন্দ্র যে প্রতিদিন হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে, ক্ষয়িত হতে থাকে তার আকার ও জ্যোতি।

ভীতা রাজকন্যা বলে, কী সর্বনাশ, এভাবে যে শেষ হয়ে যাবে সে একদিন!

—তাই তো যায়, অমাবস্যায় সম্পূর্ণ অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যায় সে।

—তারপর?

—তারপর আবার শুক্লপক্ষে তিল তিল করে সে বাড়তে থাকে। দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়ে যাত্রা করে পূর্ণিমা রাত্রির সার্থকতার দিকে।

করতালি দিয়ে হেসে ওঠেন কিশোরী নাগকন্যা, বলেন—কী মজা! ওখানকার রাত্রিগুলো তাহলে এ কৃত্রিম আলোয় উদ্ভাসিত নাগরাজ্যের রাত্রির মতো স্থির-জ্যোতি নয়?

—মোটেই নয়। পৃথিবীতে হাসির পাশেই আছে অশ্রু, আনন্দের পাশেই বেদনা। আলো আর অন্ধকার, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা সেখানে মিতালি পাতায়। তোমাদের এ নাগলোকের মত শুধু হাসি, শুধু আমোদ, আর শুধু আলো দিয়ে ঠাসা নয়।

ইরান্দাতী বলে, আমি চাই না এ নাগলোকের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ! আমিও কাঁদতে চাই।

মাতলী শিহরিত হয়, বলে—চুপ চুপ। এ-কথা মহারাজের কর্ণগোচর হলেই সর্বনাশ!

কিন্তু অশ্রুর ধর্মই হচ্ছে সে যখন আসে আষাঢ়-সঘন বর্ষণরাত্রির মত সমস্ত আকাশ আবৃত করে আসে। মহারানীর মহলে ঠিক ঐ কথাই বলছিলেন বাসুকি-মহিষী বিমলা তাঁর প্রিয়সখীকে। বলছিলেন,—আজ আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে, অথচ এদেশে যে কাঁদবারও আইন নেই।

প্রিয়সখী প্রত্যুত্তর করে না। সে জানে মহারানীর অপূরণীয় মনোবাসনার কথাটি। জানে, কেন অভিমান-ক্ষুব্ধ মহারানী অন্নজল ত্যাগ করেছেন। সে আর এক কাহিনী!

নাগরাজ বাসুকি গিয়েছিলেন মর্ত্যলোকে কুরুনৃপতির আমন্ত্রণে, তাঁর রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে এক ধর্ম মহাসভায়। কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জ্ঞাননির্ধূতকল্মষ মহাপণ্ডিত বিধুর। বস্তুত তিনি ছিলেন স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। কুরুরাজকে তিনি শুধু ঐহিক পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না—প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি মহারাজকে শোনাতেন সৎ ধর্মের মর্মকথা। তিনি ছিলেন সমস্ত আর্যাবর্তের সর্বজন-নমস্য পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহামতি। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপণ্ডিতের সুখ্যাতি ছিল সমস্ত জম্বুদ্বীপে সুবিদিত—ভু-ভারতের দূরতম প্রান্ত থেকে প্রতিদিন দলে দলে মুমুক্ষু যাত্রীর দল সমবেত হত ইন্দ্রপ্রস্থে—বিধুর পণ্ডিতের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ধর্মকথা শুনতে। গিয়েছিলেন নাগরাজ বাসুকিও, মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর ধর্ম-ব্যাখ্যায়। এতদূর অভিভূত হয়েছিলেন যে, নিজ কণ্ঠের ইন্দ্রনীল মণিহার খুলে জড়িয়ে দিয়েছিলেন বিধুর পণ্ডিতের উষ্ণীষে।

নাগপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে মহারানী বিমলার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন বিধুর পণ্ডিতের কথা। ভুল করেছিলেন সেখানেই। সব কথা শুনে মহারানী আবদার করেন—তিনি স্বকর্ণে বিধুর পণ্ডিতের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ধর্মের মর্মকথা শুনতে চান। স্পর্শ করতে চান সেই মহাপণ্ডিতের হৃদয়টি। মহারাজ কত বুঝিয়েছেন, সে অসম্ভব। নাগকন্যা হিসাবে বিমলার পক্ষে নাগলোকের বাহিরে পদার্পণ করা সম্ভবপর নয়, ওদিকে ইন্দ্রপ্রস্থরাজ নিশ্চয় সম্মত হবেন না একটি দিবসের জন্যও মহামতি বিধুর পণ্ডিতকে চক্ষের আড়াল করতে।

শুনে প্রমোদকক্ষ ত্যাগ করে উঠে যান রানী। শয়নকক্ষের অর্গলবদ্ধ একান্তে সহচরীকে ডেকে বলেন—আজ আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে!

প্রাসাদ-কাননের এক নিভৃত প্রান্তে সপ্তপর্ণীর শাখায় রাজকুমারী ইরান্দাতীর একটি প্রিয় প্রেঙ্খা প্রলম্বিত ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাজনন্দিনী এই দোলনায় এসে বসে, কাটিয়ে যায় নিঃসঙ্গ কয়েকটি সান্ধ্য মুহূর্ত। সেদিনও গোধূলি লগ্নে যথারীতি উদ্যানের এই নির্জন প্রান্তে এসে প্রেঙ্খার উপর বসেছে রাজপুত্রী। কর্ণে নবকর্ণিকার, নয়নে কৃষ্ণকজ্জলী, কালাগুরু-ধূপিত অলকগুচ্ছে বনকুসুমের মালিকা-প্রসাধনদক্ষা মাতলীর রূপসজ্জায় ত্রুটি নেই, রাজকন্যা ইরান্দাতী উদ্যানভূমিকে আলোকিত করে প্রেঙ্খায় দোলায়িত করছিল নিজ অনিন্দ্য কম্রতনুটি।

শুধু দেহে নয়, ওর অন্তরেও যে আজ দোলা লেগেছে। সরোবর-নীরে মৃদুস্পন্দিত যৌবনভারনম্র নিজ দেহের প্রতিবিম্বটি দেখে আজ হঠাৎ এক বেদনা অনুভব করেছে রাজকন্যা। জীবনে এই প্রথম এভাবে ভাবতে শুরু করেছে সে। মাতলী বলে—ঐ ঊর্ধ্বলোকের পৃথিবীতে হাসি অশ্রুর সন্ধানে ছোটে, আনন্দ বেদনার অন্বেষণে ফেরে, আলোক অন্ধকারের অভিসারে ধাবমান! অভাব ভিন্ন পূর্ণতার উপলব্ধি নেই! কিন্তু কেন? শুধু হাসি, শুধু আনন্দ, শুধু আলোক কেন একাই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না? দোসর ছাড়া কি দুনিয়ায় কেউ তৃপ্ত নয়? আর সে দোসর কি হতে হবে বিপরীতধর্মী? হাসি যেমন আলোককে পেয়ে পূর্ণ হয় না, সে অশ্রুকে খোঁজে—আলোক যেমন হাসির মিতালিতে তৃপ্ত হয় না, সে অন্ধকারের উদ্দেশ্যে ঘুরে মরে। আজ কি রাজকন্যা নিজেও তেমনি কোন দোসর খুঁজছেন? সরোবর-সলিলে তাঁর বিকচযৌবন প্রতিবিম্ব কি সে কথাই তাঁর কানে কানে বলে গেল? এমন একজন দোসর, যে ওঁর শত সহচরীর মত সহধর্মী নয়, অন্য কিছু? বিপরীতধর্মী? কিন্তু কী তা?

বনপ্রান্তরের দিকে কজ্জললাঞ্ছিত দুটি নয়ন তুলে রাজনন্দিনী সহসা প্রত্যক্ষ করে তার মনোগত প্রশ্নের মূর্তিমান উত্তর। স্তম্ভিত হয়ে যায় সে। নবোদিত প্রভাতসূর্যের মত দীপ্তিমান এক তরুণকান্তি প্রিয়দর্শন যুবাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। তরুবীথিকার অন্তরালে অনিমেষ লোচনে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে।

ধীরপদে প্রেংখা থেকে নেমে এসে দাঁড়ায় ইরান্দাতী।

মন্থর চরণে তরুবীথি থেকে এগিয়ে আসে তরুণ, বলে—আমি যক্ষ সেনাপতি পূণ্যক। এ পথে আমার এই পক্ষিরাজ অশ্বের পিঠে যাচ্ছিলাম মর্ত্যলোকে, তোমাকে দোল খেতে দেখে নেমে এলাম।

রাজনন্দিনী সভয়ে ধীরে ধীরে বলে—কেন, দোল খাওয়া কি দোষের?

অনাঘ্রাতার এ সরল প্রশ্নে হেসে ওঠে পূণ্যক। রাজকন্যা আরও অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

পূণ্যক বলে—নিশ্চয় দোষের। দোল খাওয়া নয়, একা একা দোল খাওয়া। দেখ না, কুমুদিনী দোলায়িত হয় যখন আকাশে ওঠে পূর্ণচন্দ্র, পঙ্কজকানন আনন্দের হিন্দোলে মাতে যখন দিনকর উদিত হন পূর্ব গগনে।

সরলা বালিকা এর নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না; বলে—কেমন করে জানব? চন্দ্র-সূর্য তো এদেশে নেই। এ যে পাতালপুরী!

পূণ্যক বলে, দেখতে চাও পৃথিবীকে, চন্দ্রসূর্য-উদ্ভাসিত দেশকে?

সাগ্রহে ইরান্দাতী বলে—নিয়ে যাবে আমাকে তোমার পক্ষিরাজে?

পূণ্যক বলে—যাব, কিন্তু তোমার পিতার অনুমতি ভিন্ন তুমি তো যেতে পারবে না!

ইরান্দাতী বলে—কেন?

—তোমার গাত্র স্পর্শ করি কোন্ অধিকারে?

—কেন স্পর্শ করলে কি হয়?

পূণ্যক বুঝতে পারে এ সরলা বালিকা কিছুই জানে না, বলে—কিন্তু পৃথিবীকে দেখবার জন্য এত আগ্রহ কেন তোমার?

রাজকন্যা অবাক্ হয়ে বলে—আগ্রহ হবে না? সে যে একেবারে অজানা নূতন দেশ?

—কিন্তু আরও একটি অজানা মহাদেশ যে তোমার মধ্যেই লুকিয়ে আছে, তার সংবাদ কি তুমি পেয়েছ পাতালপুরীর নাগকন্যা? এ নাগলোকের রাজ্যসীমা অতিক্রম করার জন্য তুমি উদ্‌গ্রীব, কিন্তু সন্ধান রাখ কি কৈশোরের সিংহদ্বার অতিক্রম করে যৌবরাজ্যে পদার্পণের শুভলগ্ন আজ এসেছে তোমার?

সরলমতি অনভিজ্ঞা কুমারী কন্যা এ প্রশ্নেরও অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। মৃগনয়ন

দুটি পুণ্যকের মুখে সংস্থাপিত করে অস্ফুটে বলে, তোমার এ কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না যক্ষ সেনাপতি।

আর আত্ম-সংবরণ করতে পারে না পুণ্যক। দুই আজানুলম্বিত বাহুতে বন্দী করে ফেলে উদ্ভিন্নযৌবনা সুতনুকা ইরান্দাতীর কম্রতনু। ওর কম্পমান বিহ্বল বিম্বাধরে এঁকে দেয় তার একান্ত প্রণয়ের রক্তিম স্বাক্ষর!

শিহরিততনু ইরান্দাতী তার পদ্মকোরকতুল্য দুটি হাতে আবৃত করে লজ্জারুণ মুখ-পঙ্কজ। সে বুঝতে পেরেছে সেই উদ্‌ভ্রান্ত গোধূলিলগ্নে কিসের তৃষ্ণায় উন্মনা হয়ে ছিল এতক্ষণ। কৈশোরের সিংহদ্বার অতিক্রম করে সে দেখতে পেয়েছে যৌবরাজ্য-সীমায় নূতন মহাদেশ। দ্রুতপদে অন্তর্হিতা হয় সচকিতা রাজনন্দিনী—রাজোদ্যানের পাষাণ-বেদীতে প্রতিহত হয়ে ফেরে পলায়নপরার নূপুর নিক্কণ।

নাগরাজ বাসুকি বিনিদ্রনয়নে ত্রিযামা রাত্রি একা বসে থাকেন। অভিমান-ক্ষুব্ধা মহারানী বিমলা বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন—অন্যদিকে আরও গুরুতর বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে নাগরাজ্যে। অমিতবিক্রম যক্ষ সেনাপতি পুণ্যক এসে নাগরাজ বাসুকির কাছে প্রস্তাব করেছে, সে রাজকন্যা ইরান্দাতীর পাণিপ্রার্থী। নাগরাজ স্থিরনিশ্চয় জানেন, এ বিবাহ অসম্ভব। নাগকন্যার সঙ্গে নাগরাজপুত্রের বিবাহই বিধেয়। যক্ষের পক্ষে নাগকন্যা লাভ কিছুতেই সামাজিক অনুমোদন পাবে না। নাগপণ্ডিতরা মেনে নেবেন না এই অসবর্ণ বিবাহকে।

সমস্যা সমাধানের কোন সূত্রই যখন দেখতে পাচ্ছেন না মহারাজ, তখন তাঁর একান্ত সচিব ওঁর কানে কানে বলে—আমার পরামর্শ শুনুন মহারাজ। আমি আপনার সমস্যার সমাধান করে দেব। আপনি যক্ষ সেনাপতিকে বলুন—কন্যা সম্প্রদানে আপনি সম্মত, কিন্তু তাকে উপযুক্ত কন্যাপণ দিতে হবে।

—কি সে কন্যাপণ?

—ইন্দ্রপ্রস্থরাজের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে বিধুর পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ডটিকে।

—তাতে কি লাভ?

—যক্ষ সেনাপতিকে যদি আপনি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে নাগ ও যক্ষ সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়বে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় যক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যাবে কুরুরাজের। তৃতীয় পক্ষ নাগলোক থাকবে যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে।

—কিন্তু সেক্ষেত্রে জীবিত বিধুর পণ্ডিতকেই অপহরণ করে আনতে বলি না কেন? তাঁর হৃৎপিণ্ডের কথা উঠছে কি কারণে?

মন্ত্রী হেসে বলে, কিন্তু মহারাজ! মহারানী কি বিধুরের 'হৃদয়টিই' প্রার্থনা করেন নি?

—হৃদয় মানে হৃৎপিণ্ড নয় নিশ্চয়।

মন্ত্রী হেসে বলে—এ কূট রাজনীতি মহারাজ। যক্ষ সেনাপতির পক্ষে জীবিত বিধুর পণ্ডিতকে নাগলোকে আনয়ন অসম্ভব নাও হতে পারে। যক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে অনিচ্ছুক কুরুরাজ কিছুদিনের জন্য বিধুরকে এ নাগলোকে পাঠাতে সম্মত হলেও হতে পারেন। কিন্তু যক্ষ যখন বিধুরের হৃৎপিণ্ডটি প্রার্থনা করবে, তখন যুদ্ধ হয়ে পড়বে অনিবার্য।

নাগরাজ বলেন—ধন্য তোমার কূটবুদ্ধি নাগমন্ত্রী।

মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন—তবু তো মহারানী এখনও আমাকে সেই প্রাকৃত নামেই সম্বোধন করে থাকেন।

হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে নাগরাজের পক্ষে। তিনি জানেন, তাঁর এই কুটিল মন্ত্রীটি বিধুর পণ্ডিকে ঈর্ষা করে, আর তাই মহারানী বিধুর পণ্ডিতের অনুকরণে এই পণ্ডিতম্মন্য কুচক্রী নাগমন্ত্রীর নামকরণ করেছেন—বাদুড় পণ্ডিত!

যক্ষ সেনাপতি প্রতিশ্রুত হল এ কন্যাপণ প্রদানে। শ্বেত পক্ষিরাজে আরোহণ করে সে

যাত্রা করে ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশ্যে। ঈর্ষাকাতর নাগমন্ত্রীর উল্লাস আর ধরে না। এইবার বিধুর পণ্ডিত কেমন করে আত্মরক্ষা করে সে দেখবে একবার।

পূণ্যক জানে, কুরুরাজ অক্ষক্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত। সে একটি মহামূল্য ইন্দ্রকান্তমণি সংগ্রহ করে উপস্থিত হল কুরুরাজসভায়। এই অমূল্য মণিখণ্ডটিকে পণ রেখে সে কুরুরাজকে অক্ষক্রীড়ায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। একে অক্ষক্রীড়ায় আসক্তি, তদুপরি ইন্দ্রকান্তমণির লোভ। ইন্দ্রপ্রস্থ অধিপতি সম্মত হলেন ; কিন্তু তিনি কী পণ রাখবেন? পূণ্যক বলে, এই মহামূল্যমণির একমাত্র উপমান হতে পারেন বিধুর পণ্ডিত। কুরুরাজ বলেন, তথাস্তু।

অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হলেন কুরুরাজ। নিরুপায় হয়ে তাঁকে বিদায় দিতে হল বিধুর পণ্ডিতকে। শোভাযাত্রা করে রাজ্যসীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল গুণমুগ্ধ কুরুদেশবাসী। সেখানে পূণ্যক বিধুর পণ্ডিতকে তুলে নিল অশ্বপৃষ্ঠে। কিন্তু অনতিবিলম্বে এক নির্জন প্রান্তরে পূণ্যক অশ্বের গতিবেগ সংবরণ করে। বিধুর পণ্ডিত বলেন, আমরা কি নাগরাজ্যের সীমানায় উপনীত হয়েছি যক্ষ সেনাপতি?

পূণ্যক বলে, না, কিন্তু আপনি আপনার জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন পণ্ডিত-প্রবর। নাগরাজ বাসুকির কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আপনার হৃৎপিণ্ডটি উৎপাটিত করে নিয়ে গেলে তবে তিনি তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করবেন আমার হাতে।

তরবারি নিষ্কাশিত করে পূণ্যক বলে—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন মহামন্ত্রী।

মহামন্ত্রী হেসে বলেন, জীবনে ঐ একটি জিনিসের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই পূণ্যক। প্রস্তুত অপ্রস্তুত সকলের কাছে মৃত্যু একই বেশে আসে।

পূণ্যক বলে, এভাবে আপনাকে হত্যা করছি বলে আপনি কি আমাকে অভিশাপ দেবেন?

বিধুর হেসে বলেন : অভিশাপ কেন দেব পূণ্যক? আমার হৃৎপিণ্ডে যদি দুটি তরুণ-তরুণীর মিলনের অন্তরায় ঘুচে যায়, তাহলে আমার প্রাণদান তো সার্থক।

পূণ্যক অবাক্ হয়ে যায়। এ ধরনের কথা তো সে কখনও শোনেনি। তরবারি উত্তোলন করতে যায়, পারে না। মনে দ্বিধা এসেছে তার।

বিধুর বলেন, তরবারি আমার হস্তে অর্পণ কর যক্ষ সেনাপতি। আমি স্বহস্তে আমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করে দিচ্ছি। তাহলে নরহত্যার পাপ তোমার লাগবে না।

একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে পূণ্যক। বলে—কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে আমার এক প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়ে যান আপনি।

—কি তোমার প্রশ্ন? বল।

—নাগকন্যা ইরান্দাতীকে আমি হৃদয় সমর্পণ করেছি, কিন্তু আমি যক্ষ—নাগ নই। এ অসবর্ণ বিবাহ কি অনুমোদনযোগ্য?

বিধুর হেসে বলেন : এ প্রশ্নের জবাব তো এককথায় হবে না। তোমার যে প্রিয়া-মিলনে বিলম্ব হয়ে যাবে যক্ষপ্রবর!

পূণ্যক বসে পড়ে ভূ-শয্যায়, বলে, হোক বিলম্ব, আপনি বলুন।

বিধুর পণ্ডিত তখন বলতে থাকেন তাঁর কথা।

অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে যক্ষ সেনাপতি। নাগরাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছে বিশ্ব-বিশ্রুত বিধুর পণ্ডিতকে। সংবাদ পেয়ে নাগলোকের যাবতীয় নরনারী রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সমবেত। বিধুর পণ্ডিতের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন নাগরাজ।

সহসা বাদুড় পণ্ডিত বলে ওঠে, কিন্তু এমন কথা তো ছিল না যক্ষ সেনাপতি। আপনি বিধুর পণ্ডিতকে সশরীরে এখানে এনেছেন কেন? শর্ত ছিল তার হৃৎপিণ্ডটি শুধু নিয়ে আসবেন।

পূণ্যক হেসে বলে, লৌকিকতার নির্দেশ মহামূল্য রত্ন উপহার দিতে হলে রত্ন-মঞ্জুষায় আবৃত করে দিতে হয়। তাই দিয়েছি আমি। মহামন্ত্রীর যদি সন্দেহ থাকে যে, রত্নমঞ্জুষা শূন্যগর্ভ তাহলে

তিনি সেটি নিজেই খুলে দেখতে পারেন। সেক্ষেত্রে কুরুরাজও আপনার হৃৎপিণ্ডটির সন্ধান করবেন হয় তো!

শুনে সভাস্থ সকলে হেসে ওঠে, পণ্ডিতম্মন্য বাদুড়-পণ্ডিতের লাঞ্ছনায়।

ততক্ষণে রাজান্তঃপুর থেকে এসে পৌঁচেছেন রাজমহিষী বিমলা, সম্মানিত মহান্ অতিথির জন্য স্বহস্তে পাদ-অর্ঘ্য নিয়ে। তাঁর পশ্চাতে সলজ্জচরণে এসে দাঁড়িয়েছে চিত্রার্পিতাবৎ রাজকন্যা ইরান্দাতী। মুগ্ধনয়নে পুণ্যক তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নাগরাজার কানে কানে মহারানী বলেন : বাদুড় পণ্ডিত এখানে কেন?

সে অনুচ্চ কণ্ঠও শ্রবণগোচর হয় লম্বকর্ণ বাদুড় পণ্ডিতের। স্থানত্যাগ করে সে অধোবদনে!

রাজা ও রানী মহান্ অথিতিকে নিয়ে ব্যস্ত। রাজপ্রাসাদের প্রহরীর দল ক্রমাগত ছুটাছুটি করছে। এমন সুযোগ হারাতে রাজী নয় পুণ্যক। সে গোপনে প্রবেশ করে অন্তঃপুরে। রাজকন্যার নিভৃত শয়ন-কক্ষে এসে দাঁড়ায়।

সচকিতা রাজকন্যা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। পুণ্যকের সন্নিকটে এসে বলে : কেমন করে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করলেন আপনি?

পুণ্যক বলে, প্রেমের মন্ত্রে তুমি যে আমাকে অজেয় করে দিয়েছ বাসুকি-তনয়া।

তবু উৎফুল্ল হতে পারে না ইরান্দাতী। আতপ-তাপিত কুমুদিনীর মত ম্লানমুখী কিশোরী বলে, কিন্তু সে প্রেম যে শেষ পর্যন্ত নিষ্ফলা হয়ে গেল যক্ষ সেনাপতি।

—নিষ্ফলা! কেন?

—আপনি শোনেন নি, মহারাজের সভাপণ্ডিত কি বিধান দিয়েছেন?

পুণ্যক হেসে বলে—নাগরাজ্যের বাদুড় পণ্ডিতের বিধান নিষ্প্রয়োজন ইরান্দাতী। ত্রিভুবনে আজ যিনি সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত, তাঁর বিধান নিয়েই আমি তোমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি বাসুকি-তনয়া।

—কে সেই পণ্ডিত?

—এখনও বোঝ নি? স্বয়ং বিধুর পণ্ডিত।

—কি বলেছেন তিনি?

—তিনি বলেছেন, সামাজিক বিধান অমোঘ। কিন্তু সমাজ সৃষ্টি করেছে জীব ; সেই জীবের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর বিধান আরও অমোঘ। তিনিই সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও প্রকৃতি —সৃজনের মহানন্দে বিভোর তিনিই সঞ্চারিত করেছেন তাদের অন্তরে অনুরাগের অমৃত! তাকে অমর্যাদা করাই পাপ। সামাজিক বিধানের অজুহাতে যারা সেই স্বর্গীয় প্রেমকে হত্যা করে, তারাই প্রকৃত পাপী!

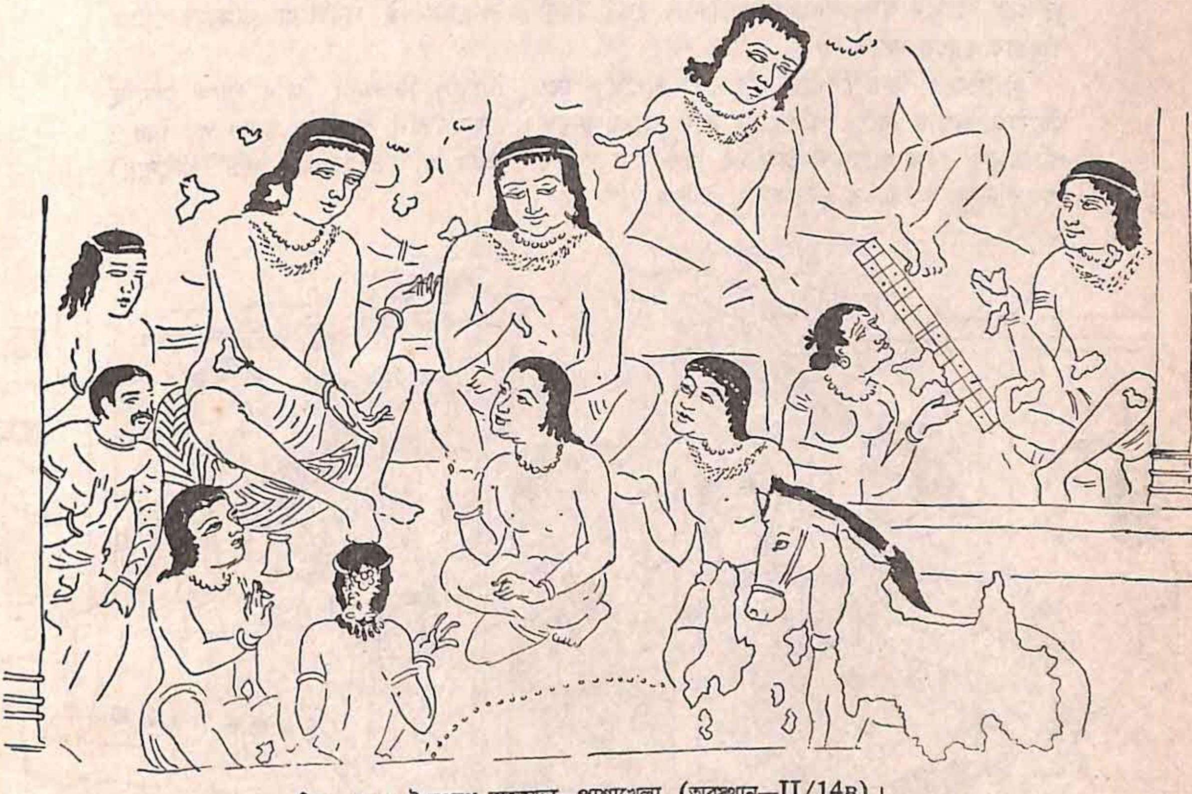
আনন্দের আতিশয্যে নাগকন্যা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। তার ভীরু কপোতকম্পিত মুখ আশ্রয় খোঁজে যক্ষ সেনাপতির কবাটবক্ষে।

জাতক-বর্ণিত এই মূল কাহিনীটিকে অজন্তার শিল্পী রূপায়িত করেছেন একটি দীর্ঘায়ত চিত্র-কাহিনীতে (২।১৪)। কালানুক্রমিকভাবে সাজালে যে দৃশ্যগুলি পর পর আসা উচিত, চিত্র-কাহিনী কিন্তু সেভাবে সাজানো নয়। ফলে, যে দর্শক মূল কাহিনী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, চিত্র দেখে তাঁর পক্ষে মন-গড়া একটি কাহিনী গঠন করে নেওয়া শক্ত। শিল্পী কেন এভাবে কোন কোন চিত্র-কাহিনী সাজিয়েছেন জানি না—চিত্র-নাট্যের ব্যাকরণ নিয়ে না হয় আমরা এর পর আলোচনা করব। আপাততঃ যা দেখছি তাই বলি :

অজন্তা শিল্পী এখানেও জাতক-কাহিনীতে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন ; কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক যতটুকু স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন তিনি তার বেশি হননি। বস্তুতঃ আমিও কাহিনী লিপিবদ্ধ করার সময় কিছুটা অদল-বদল করেছি। যথা, বাদুড় পণ্ডিতের কথা জাতকে নেই। জাতককার বলছেন, বিমলা আক্ষরিক অর্থেই বিধুর-পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ডটি প্রার্থনা করেছিল। তার কোন অর্থ আমি খুঁজে পাইনি। ফৌসবৌল অথবা ঈশানচন্দ্র ঘোষ

মশাই বুঝিয়ে দেননি—কেন বিমলা সর্বক্ষণ বিধুর-পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর হৃৎপিণ্ডটি কামনা করে বসল। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে বাদুড়-পণ্ডিতের চরিত্রটি কল্পনা করতে হয়েছে—কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে।

বাঁ-দিকে উপরে দেখছি ইন্দ্রপ্রস্থরাজ ধনঞ্জয়ের রাজসভায় এসেছে পূণ্যক (২।১৪ক)। কুরুরাজ সিংহাসনে আসীন। সিংহাসনে দাগ-কাটা নক্‌শা। রাজার দক্ষিণে দর্পণহস্তে কুরুমহিষী। রাজার সামনে পূণ্যক; সে বিনয়াবনত; তার হাতে ইন্দ্রকান্তমণি। সেটিকে সে সুকৌশলে প্রদর্শন করছে কুরুরাজকে (চিত্র—২৩)। রাজার পার্শ্বে দুজন অমাত্য।



চিত্র—২৩ ॥ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজসভা—পাশাখেলা (অবস্থান—II/14B)।

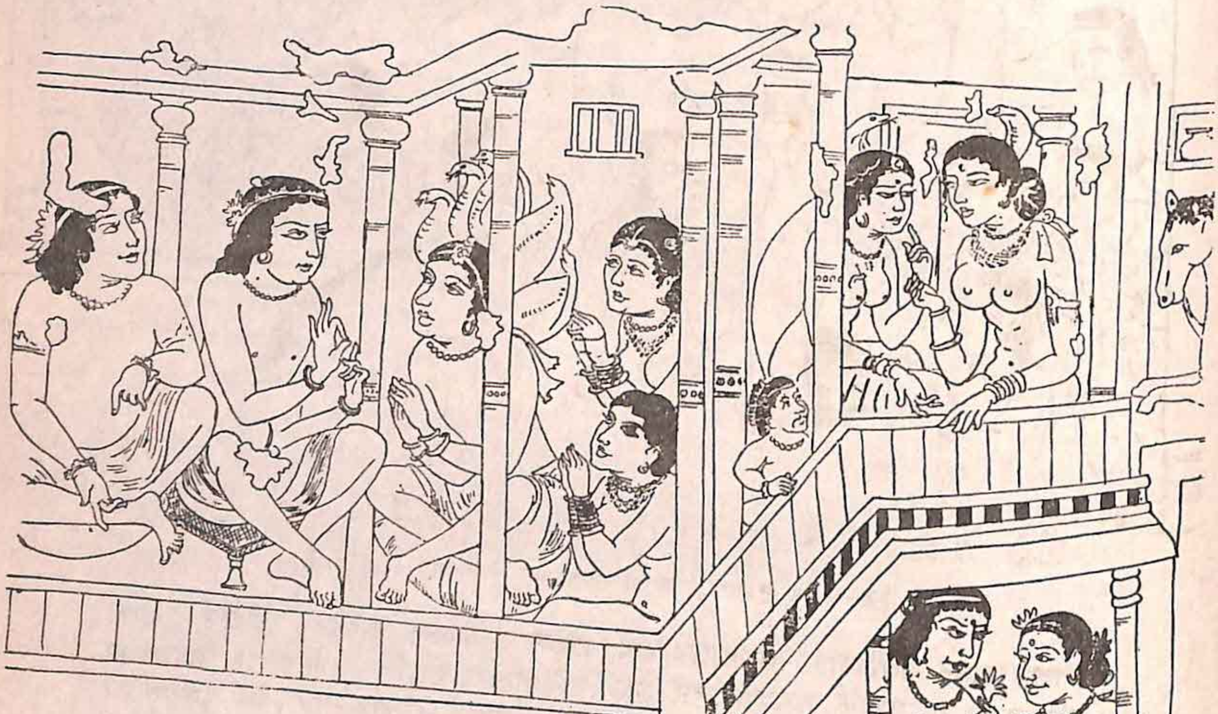
পিছনে দুজন ব্যজনিকা। অমাত্যদের মধ্যে একজন অন্যমনস্ক, অপরজন চিন্তিত। রাজা দক্ষিণহস্তে যে মুদ্রাটি করেছেন সেটি মোট 'দুই'-সংখ্যার দ্যোতক। চিত্র যদি নির্বাক না হয়ে সবাক চলচ্চিত্র হত, আমরা তাহলে সংলাপ শুনতে পেতাম—"হে যক্ষ সেনাপতি! রাজছত্র ও ক্ষত্রিয় পৌরুষ এই দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া আর যে কোন সম্পদ আমি পণ রাখতে সম্মত।"

রাজার পদতলের দিকে একজন পুরোহাতা-জামা গায়ে দ্বারোয়ানের গোঁফ-জোড়া লক্ষ্য করার মত। দ্বারপালের সামনে এবং সিংহাসনের নিচে আরও দুজনের মূর্তি। একজন পুরুষ এবং একজন রমনী। পুরুষটি যে মুদ্রা করেছে তার অর্থ—সমস্যা। স্ত্রীলোকটি তার ডান হাতের তিনটি আঙ্গুল মেলে ধরেছে। আমাদের সবাক চিত্রনাট্যের পরবর্তী সংলাপটি কি ঐ মেয়েটির? "—মার্জনা করবেন মহারাজ! রাজছত্র ও পৌরুষ ছাড়া আরও একটি সম্পদ আপনি বাজি রাখতে পারেন না—আপনার আত্মসম্মান!"

ঐ দৃশ্যের দক্ষিণের প্যানেলে দেখা যাচ্ছে পাশাখেলার আসর (২।১৪খ)। চিত্র—২৩-এ তার কিয়দংশ পরিদৃশ্যমান। অক্ষক্রীড়ার ছকটি আসনের উপর কিন্তু শোয়ানো নয়, যেন

ছকটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে—মনে হচ্ছে যেন উপর-থেকে-দেখা পাশার ছকের প্ল্যান আঁকা হয়েছে। পাশ্চাত্য চিত্র-ব্যাকরণের অনুশাসন অনুসারে এটিকে পরিপ্রেক্ষিতের ত্রুটি বলে মনে হতে পারে। বস্তুত তা নয়। কেন নয়, সে সম্বন্ধে নবম পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করব। এই চিত্রে দেখছি, কুরুরাজ ক্রমশঃ হেরে যাচ্ছেন—তিনিই ঐ খণ্ডমুহূর্তে দান ফেলেছেন। জাতককার বলছেন, এই অক্ষক্রীড়া দেখতে শতাধিক ভারতীয় নৃপতি সমবেত হয়েছিলেন—যেন স্প্যাস্কি-ফিশারের প্রতিযোগিতা! চিত্রে আমরা তাঁদের দুজনকে মাত্র দেখতে পাচ্ছি। এ-চিত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কুরুরানীর আলেখ্যটি—তিনি করুণ নয়নে তাকিয়ে আছেন যক্ষ-সেনাপতির দিকে, যেন মিনতি করছেন—ঐ সর্বনাশা অক্ষক্রীড়াটিকে পরিহার করতে বলছেন।

ঐ চিত্রের নিচে দেখছি কুরুরানী দাসীকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁর পাশে দেখছি মহারাজ ধনঞ্জয় বিধুর পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপনরত। যেন তিনি পরাজিত হবার পর বিধুর পণ্ডিতের কাছে পরামর্শ চাইছেন, এখন কি কর্তব্য ; আর পণ্ডিত বলছেন, শর্ত অনুযায়ী বিধুর এখন পূণ্যকের ক্রীতদাস। তাঁকে যেতে হবে।



চিত্র—২৪ ॥ নাগলোক ও বিধুর (অবস্থান—II/14D)।

পরের চিত্রটি (চিত্র—২৪) দেখে বুঝতে পারি মহারানী দাসীকে কী নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাকে আদেশ করেছিলেন—বিধুর পণ্ডিতকে রানীর মহলে আহ্বান জানাতে। এ চিত্রে দেখছি, রানীর মহলের কেন্দ্রস্থলে সিংহাসনে বিধুর পণ্ডিত আসীন, আর পুরকামিনীর দল তাঁকে ঘিরে আছে যুক্তকরে। এই চিত্রে বিধুরের আলেখ্যটি সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ছবিটি দেখে বোঝা যায়, কীভাবে তাঁর মনুষ্যাকৃতিতে শিল্পী দেবভাব আরোপ করেছেন। প্রতিভাদীপ্ত মহামতি বিধুরের এই আলেখ্যটি সম্ভবতঃ এই সম্পূর্ণ চিত্র-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ খণ্ডাংশ।

এই দুটি খণ্ডচিত্রের নিচে একটি বিশালায়তন প্যানেলে দেখছি (২।১৪গ) কুরুরাজ্যের ভক্ত প্রজাবৃন্দ বিধুর ও পূর্ণককে শোভাযাত্রা করে রাজ্যসীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে। এই প্যানেলটির কম্পোজিশন লক্ষণীয়। হস্তিপৃষ্ঠে মহামাত্য বিধুর—দ্বিতীয় হস্তীতে পূর্ণক স্বয়ং তাঁর পাশে।

অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে শিল্পী মুকুল দে এই প্যানেল-এর বর্ণনায় বলেছিলেন* :

"ডানদিকের প্রাচীরে এ গুহার অন্যতম কৌতূহলোদ্দীপক চিত্রসম্ভার। শোভাযাত্রা করে একজন রাজা (বিধুর পণ্ডিত) চলেছেন রাজপথ দিয়ে হস্তিপৃষ্ঠে। তাঁর মস্তকে রাজছত্র (বস্তুতঃ সম্মান-ছত্র) এবং হস্তে অংকুশ।...পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় হস্তীতে অপর একজন সম্মানীয় অমাত্য (বস্তুতঃ পূর্ণক)।...সম্মুখে পাঁচটি অশ্বারোহী, তাদের দৃষ্টি রাজার দিকে ফেরানো (বিদায়কামী বিধুরের দিকে)।...তৎসহ চতুর্দশ সংখ্যক পদাতিক। এদের মধ্যে এগারোজন সৈনিক বলে মনে হয়, তাদের হস্তে নগ্ন কৃপাণ ও ঢালিকা।...দুজন বংশীবাদক এবং একজন ঢোলকও চলেছে শোভাযাত্রার সঙ্গে।"

তখনও জাতক-কাহিনীর সঙ্গে চিত্রটির সম্পর্ক ছিল অনাবিষ্কৃত।



চিত্র—২৫ ॥ পূর্ণক ও ইরান্দাতীর প্রথম সাক্ষাৎ (অবস্থান—II/14E)।

এর পরের প্যানেলটি নাগরাজ্যে (২।১৪ঘ)। নাগরাজসভায় বিধুর পণ্ডিত নাগরাজ বাসুকিকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। নাগরাজার মস্তকে পঞ্চনাগের ফণা, যুক্তকর মুমুক্ষুর অভিব্যক্তি। বিধুর বসেছেন একটি চারপায়াতে,—নাগরাজ ভূমিতলে আসনে উপবিষ্ট। রাজার স্থান অজন্তারাজ্যে সর্বত্রই সন্ন্যাসীর নিচে। সপ্তদশ গুহাতেও আমরা দেখব—মহারাজ

* My Pilgrimage to Ajanta & Bagh—Mukul Dey, London, 1925.

শুদ্ধোদন ভূতলে উপবিষ্ট অথচ ঋষি অসিত বসেছেন কাষ্ঠাসনে। অন্দরমহল থেকে অগ্রসর হয়ে আসছেন নাগরানী বিমলা ও নাগকন্যা ইরান্দাতী। সকলের দৃষ্টিই বিধুর পণ্ডিতের দিকে নিবদ্ধ। একমাত্র ব্যতিক্রম চিত্রের সর্ববামে যক্ষ সেনাপতি পূর্ণ্যক—তার দৃষ্টি সর্ব-দক্ষিণের উদ্ভিন্নযৌবনা একটি নারীমূর্তির দিকে দৃঢ়নিবদ্ধ।

কালানুক্রমিকভাবে পরবর্তী দৃশ্যটি দেখা যাচ্ছে চিত্র—২৪এ-র দক্ষিণ দিকে। বারান্দার ও-প্রান্তে দেখছি বিমলা ও ইরান্দাতী আলাপনরত—নাগ-মা ও নাগ-মেয়ের মাথায় একটি করে নাগফণা। নজর করলে দেখবেন, ঐ চিত্রের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে পূর্ণ্যকের অশ্বটির মাথা উঁকি মারছে'—অর্থাৎ মা-মেয়ের এই নিভৃত মন্ত্রণা-সভার বাইরেই পূর্ণ্যক অপেক্ষা করছে, কখন তার প্রেমাস্পদা বেরিয়ে আসে।

বারান্দার নিচে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষে এরপর দেখছি, একজন পুরুষ ও একজন রমনী একান্তে আলাপনরত। ডঃ ইয়াজদানী বলছেন, এ'রা দুজন বিধুরপণ্ডিত ও বিমলা। অর্থাৎ বিধুর নিভৃতে নাগরানীকে ধর্মের মূল কথা শোনাচ্ছেন। যুক্তির স্বপক্ষে তাঁর বক্তব্য—পুরুষটির বামহস্তে একটি পদ্মফুল, যা-নাকি অবলোকিতেশ্বরের পরিচায়ক। পদ্মই ইঙ্গিত করছে যে উনি বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি।

মাপ করবেন, আমি মানতে রাজী নই। দুজনের দৃষ্টিতে যা দেখছি তাতে ঠিক 'মদন-ভস্মের পরে'র কথা মনে পড়ছে না! বিশেষ করে মেয়েটির কটাক্ষে এবং ঠোঁটের কোনায় শিল্পী যেন অন্য কি একটা কথা বলতে চেয়েছেন! আমার ধারণা ওরা দুজন আমাদের কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা—পূর্ণ্যক ও ইরান্দাতী। পদ্মফুল? তাতে কি শুধু পদ্মপাণিরই একচেটিয়া অধিকার? অনুরাগরক্তিম পূর্ণ্যকের পক্ষে মিলন-মুহূর্তে ইরান্দাতীকে পুষ্প-উপহার দেওয়ার প্রয়াশটা কি এতই অসম্ভব?

সর্বশেষে দেখছি একটি দোলনা। ইরান্দাতী দোল খাচ্ছে (চিত্র—২৫)। দোলনায় আবদ্ধ বস্ত্রখণ্ড হাওয়ায় উড়ছে। তার সামনে শ্বেত অশ্বের সম্মুখে যক্ষ সেনাপতি পূর্ণ্যক এবং তার কাছে পুনরায় ইরান্দাতী। ব্রীড়াবনতা নতমুখী বালিকামূর্তি। দোলনায়-বসা নাগ-কন্যার মস্তকে মনে হয় যেন সাপের ফণা, আসলে সেটি হাওয়ায়-ওড়া বস্ত্রখণ্ড মাত্র। এ ঘটনাটি কাহিনী-চিত্রের সর্বপ্রথমে আসা উচিত ছিল। বোধ করি মিলনদৃশ্যের পরে শিল্পী পূর্বকথন শুনিয়েছেন। অর্থাৎ আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষায় যেন "ফ্ল্যাশ্-ব্যাক"!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তৃতীয়—পঞ্চদশ বিহার

তৃতীয় ও পঞ্চম গুহা-মন্দির দুটি অসমাপ্ত। পঞ্চম মন্দিরের প্রবেশ-পথে দুদিকে দুটি মকরবাহিনী নারীমূর্তি খোদিত। এ-দুটি বিহার সপ্তম শতাব্দীতে অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত। চতুর্থ বিহারটি আকারে বৃহত্তম। কেন্দ্রস্থলের চত্বরে পাথরে খোদাই-করা—সিংহ, হস্তী, অগ্নি, সর্প ইত্যাদি আটটি আধিভৌতিক শত্রু দ্বারা আক্রান্ত মনুষ্য-মূর্তি। শিল্পীর বক্তব্য, তথাগতের শরণ নিলে মর-মানুষ এই অষ্ট প্রকার দুর্দৈবের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। হল্-কামরায় স্তম্ভগুলির পাদমূল চতুষ্কোণ, মধ্যভাগ আটকোণা। হলের সম্মুখে বারান্দার দুই প্রান্তে দুটি গর্ভমন্দির। হলের ভিতরেও দু-পাশে ছটি করে গর্ভগৃহ এবং পিছন দিকে আরও কয়েকটি গর্ভগৃহ। অন্তরালের সম্মুখবর্তী কেন্দ্রীয় স্তম্ভ দুটির অলঙ্করণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। মূল গর্ভমন্দিরে ধ্যানস্তিমিত বুদ্ধমূর্তি, বসে আছেন পদ্মাসনে, ধর্মচক্রমুদ্রায়। দু-পাশে দুই বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধমূর্তির পদতলে ধর্মচক্র ও মৃগযুগল। অন্তরালের দুই প্রান্তে দুটি করে সর্বসমেত চারটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি। বরদাহস্তমুদ্রা।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বিহার

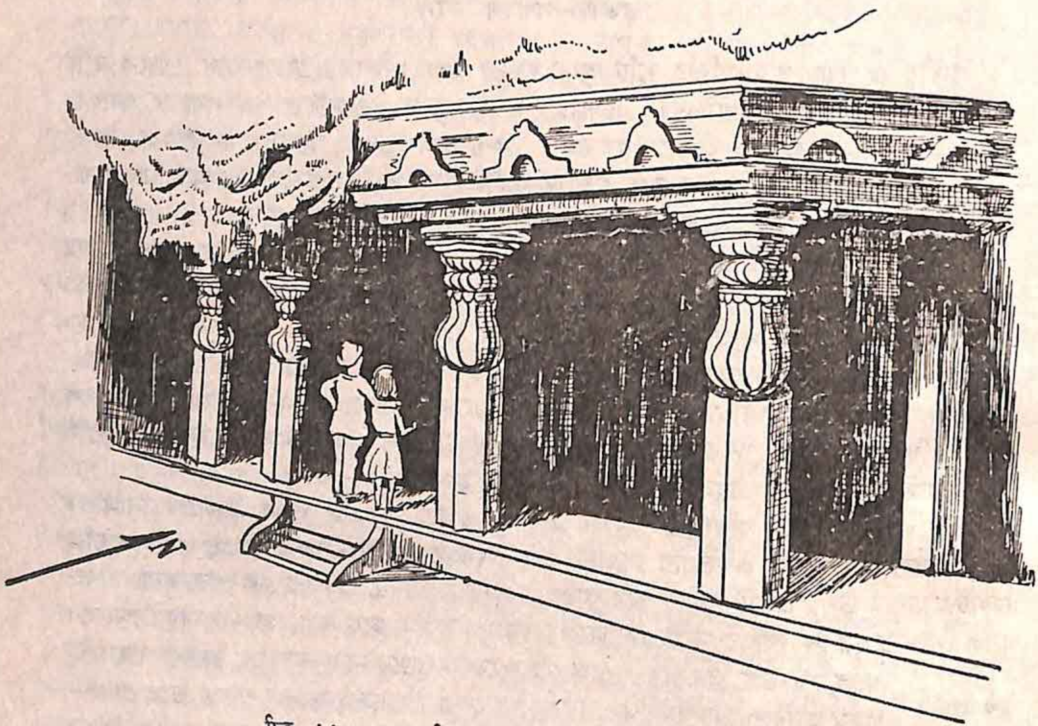
ষষ্ঠ গুহা-মন্দিরটি অজন্তায় একমাত্র দ্বিতল বিহার। এটি পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একতলায় ষোলটি এবং দ্বিতলে বারোটি স্তম্ভ আছে, এবং সেগুলি একটির মাথার উপর একটি নয়। তার কারণ, অজন্তায় ছাদের ভার গ্রহণ করবার জন্য স্তম্ভ-গুলি নির্মিত হয় নি—পাথর কেটে এগুলিকে রূপায়িত করা হয়েছে শুধু অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে। ফলে, স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়লেও ছাদ ভেঙে পড়বে না। বস্তুতঃ, অনেক গুহাতেই প্রথম আবিষ্কারের সময় গত শতাব্দীতে দেখা গিয়েছিল অনেক স্তম্ভ ভেঙে গেছে—ছাদ আছে অক্ষত। সপ্তম গুহার যে ছবিটি চিত্র—২৭-এ দেওয়া হয়েছে, সেটি দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। ষষ্ঠ বিহারের প্রবেশ-পথের দুদিকে দুটি ছোট গবাক্ষ। একতলার স্তম্ভগুলিতে কোন পাদপীঠ বা শীর্ষপীঠ নেই। আট-কোণা স্তম্ভগুলি উপরদিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে উঠেছে। একতলায় অনেকগুলি ছোট ছোট গর্ভগুহা আছে। এখানে এখনও কিছু কিছু প্রাচীর-চিত্র নজরে পড়ে। অধিকাংশই নক্শা—কিছু দ্বারপাল, দু-একটি বুদ্ধমূর্তি বা বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ ও মারের সংগ্রামের একটি চিত্রও অল্প অল্প দেখতে পাওয়া যায়। একতলায় মূল গর্ভমন্দিরে সিংহাসনে উপবিষ্ট অভয়-মুদ্রায় বুদ্ধদেবকে এবং দ্বিতলের মূল গর্ভগৃহে ধর্মচক্রমুদ্রায় মৃগদাবের বুদ্ধদেবকে দেখতে পাবেন। এছাড়া, অনেকগুলি প্রস্তর-মূর্তিও আছে এখানে। শুনেছি, অতি সাম্প্রতিককালে (১৯৭৭) এখানে দুটি নতুন ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন জাতকের তা এখনও কেউ বলতে পারেনি। চিত্র দুটি আবিষ্কারের পর আমি অজন্তায় যাইনি। ফলে এ সংবাদ শ্রুতিনির্ভর।

ষষ্ঠ বিহার

সপ্তম বিহারটির পরিকল্পনায় মৌলিকতা আছে। এর সম্মুখ-ভাগে দুটি পোর্টিকো বা প্রবেশ-মণ্ডপ। এ-রকম জোড়া-পোর্টিকো অজন্তার অন্য কোনও গুহায় নেই। এলিফান্টা গুহার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য মনে হল যেন। ভিতরে অন্তরালে শ্রাবস্তীর অলৌকিক ঘটনাটি পাথরে খোদাই করা আছে। মূল গর্ভমন্দিরের প্রবেশ-পথে যে দ্বার, তার দু-পাশে দুটি মকরবাহিনী নারীমূর্তি। মূল মূর্তিটি বুদ্ধদেবের। দু-পাশে চামরবাহী দুই বোধিসত্ত্ব এবং উড্ডীয়মান গন্ধর্বমূর্তি। চিত্র—২৬-এ সপ্তম বিহারের প্রবেশ-পথের একটি চিত্র দেওয়া গেল। এটি দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে আঁকা। এতে জোড়া-পোর্টিকোকে বেশ পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। পূর্বদিকের জোড়া-স্তম্ভের উপরে ছাদটিকে দেখা যাচ্ছে

সপ্তম বিহার

অক্ষত অবস্থায়, অথচ পশ্চিম দিকের ছাদ অনেক অংশে ভেঙে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে বলি, অজন্তায় আমরা আজ গিয়ে যা দেখি, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে মেরামতির কাজ। আমার মনে হয়েছে, এভাবে মেরামত করানো উচিত হয়নি। এমনভাবে ভেঙে-পড়া স্থাপত্য-কীর্তিগুলি সারানো উচিত ছিল, যাতে দর্শক বুঝতে পারেন কতটুকু অরিজিনাল বা আদিম



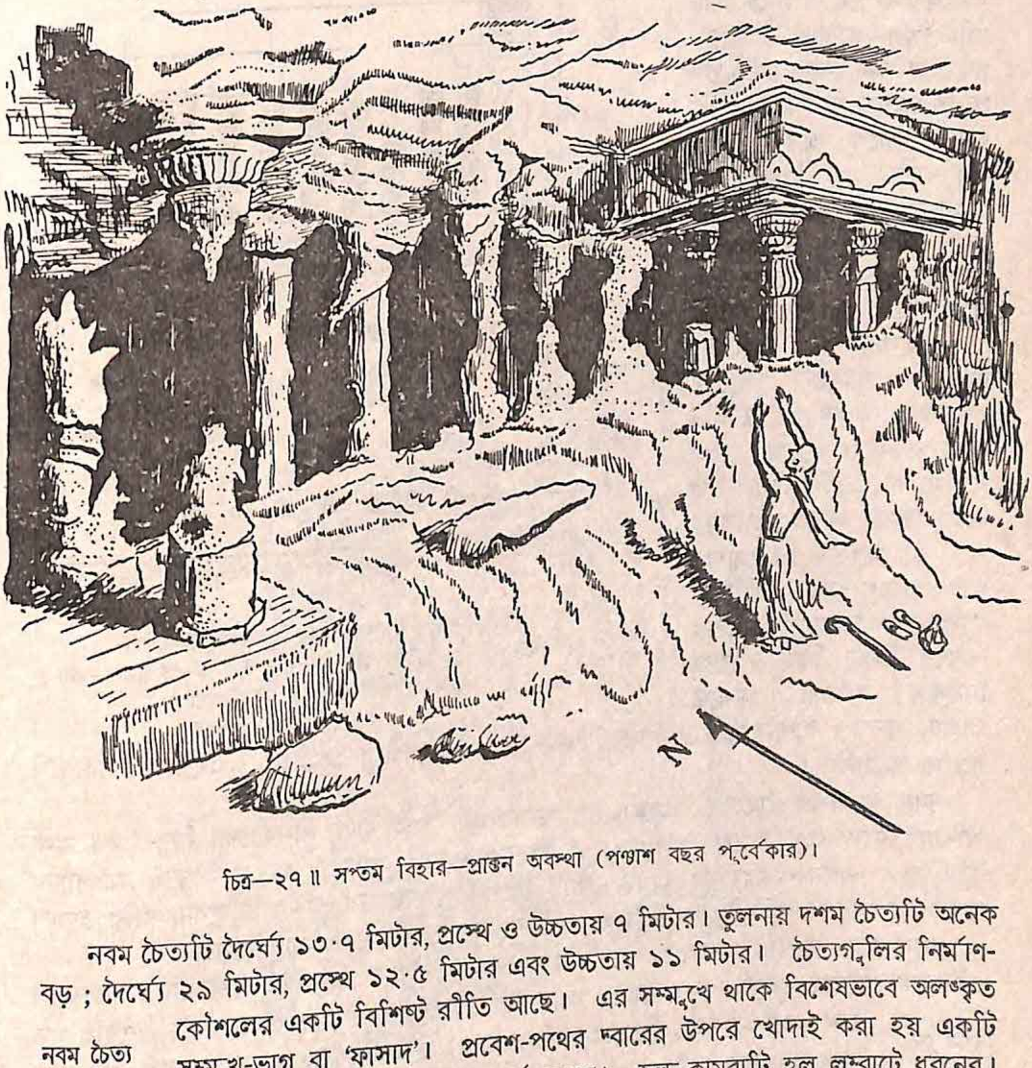
চিত্র—২৬ ॥ সপ্তম বিহার—বর্তমান (১৯৬৫) অবস্থা।

রূপ, আর কতটুকু বর্তমান যুগের কারিগরি। মেরামতি-অংশে সিমেণ্ট-গোলা দিয়ে অথবা অত্যন্ত হাল্‌কা চুনাপাথরের রঙ করে এই পার্থক্যটুকু বজায় রাখা যেত। এই নীতি আর্কিওলজিকাল-বিভাগ চিত্রগুলির মেরামতের সময় মেনে চলেছেন। প্রাচীর-চিত্রের যে অংশ ভেঙে পড়েছে, সেখানে নূতন করে আঁকবার চেষ্টা করেন নি। সিমেণ্টের পলেস্তারা করে ছেড়ে দিয়েছেন। ভালই করেছেন। আমি খুশী হতুম সেই নীতি ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-কীর্তিতেও অনুসরণ করা হলে। আমার বক্তব্যটা বুঝিয়ে বলি : চিত্র—২৬ হচ্ছে আমি অজন্তায় ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যা দেখেছি তাই ; কিন্তু তা দেখে কি বুঝতে পারছেন কতটুকু অজন্তা-শিল্পীর কাজ আর কতটুকু এ-যুগের? না, তা পারছেন না। এইবার চিত্র—২৭-এর দিকে চেয়ে দেখুন। এটি শিল্পী মুকুল দে-র গ্রন্থ অবলম্বনে আঁকা। পঞ্চাশ বছর পূর্বে ঐ প্রবেশ-পথের যে রূপ তিনি দেখেছিলেন, তাই দেখতে পাচ্ছি। তিনি অবশ্য এঁকেছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। চিত্র—২৬ ও ২৭ মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কতখানি মেরামত করা হয়েছে। বুদ্ধগয়ার মূল মন্দিরটি মেরামত করতে গিয়ে যে ভুলটি করা হয়েছিল গত শতাব্দীতে, অজন্তাতেও প্রায় সেই জাতীয় ভুল করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

অষ্টম বিহার

অষ্টম বিহারটি রাস্তা থেকে কিছুটা নিচুতে। ঠিক সাঁকোটির ধারে। দর্শনীয় কিছুই নেই। এটি কিন্তু অজন্তার অন্যতম প্রাচীন গুহা। প্রায় নবম চৈত্যের সমসাময়িক। ডায়নামোটিকে এখানে বসানো হয়েছে—এখান থেকেই সমস্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়।

নবম ও দশম গুহা-মন্দির দুটি, আগেই বলেছি, বিহার নয়—চৈত্য। অর্থাৎ, বৌদ্ধ শ্রমণদের আবাস-গৃহ নয়, উপাসনা-মন্দির। এ-দুটি অতি প্রাচীন গুহা-চৈত্য, অজন্তায়। নবম গুহাটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত, দশমটি সম্ভবতঃ আরও প্রায় একশ বছর আগেকার, বস্তুতঃ অজন্তায় তৈরী প্রথম চৈত্য।



চিত্র—২৭॥ সপ্তম বিহার—প্রাক্তন অবস্থা (পঞ্চাশ বছর পূর্বেকার)।

নবম চৈত্যটি দৈর্ঘ্যে ১৩·৭ মিটার, প্রস্থে ও উচ্চতায় ৭ মিটার। তুলনায় দশম চৈত্যটি অনেক বড়; দৈর্ঘ্যে ২৯ মিটার, প্রস্থে ১২·৫ মিটার এবং উচ্চতায় ১১ মিটার। চৈত্যগুলির নির্মাণ-কৌশলের একটি বিশিষ্ট রীতি আছে। এর সম্মুখে থাকে বিশেষভাবে অলংকৃত সম্মুখ-ভাগ বা 'ফাসাদ'। প্রবেশ-পথের দ্বারের উপরে খোদাই করা হয় একটি বৃহদায়তন গবাক্ষ। তাকে বলা হয় সূর্য-গবাক্ষ। হল্‌-কামরাটি হল লম্বাটে ধরনের। দু-পাশে দুই সারি স্তম্ভ, তার মাঝখানে উপাসনা-স্থল, যাকে ইংরেজিতে বলে 'নেভ' এবং স্তম্ভ ও পর্বত-গাত্রের মাঝখান দিয়ে যে গলিপথ তাকে বলে প্রদক্ষিণ-পথ, ইংরেজিতে বলে 'আইল'। এই চৈত্যগুলির পরিকল্পনার সঙ্গে রোমান 'বাসিলিকা'র আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

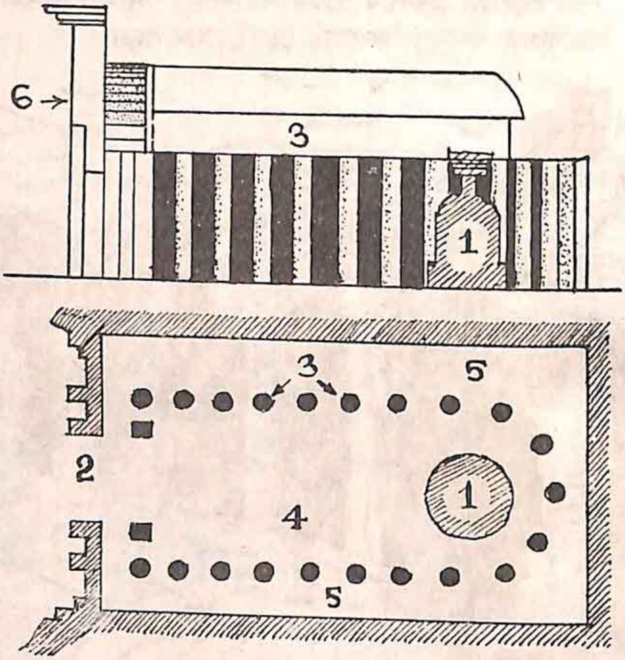
নবম চৈত্য

চিত্র—২৮-এ নবম চৈত্যের প্ল্যান ও সেক্‌শানাল এলিভেশান দেখানো হয়েছে। প্রবেশ-পথের (৯।২) বিপরীত প্রান্তে রয়েছে স্তূপটি (৯।১)। সর্বসমেত ২১টি আট-কোণা স্তম্ভ উপাসনা-স্থলকে (৯।৪) বিযুক্ত করেছে প্রদক্ষিণ-পথ (৯।৫) থেকে। প্রবেশ-পথের উপরে রয়েছে সূর্য-গবাক্ষটি (৯।৬)। ঐ ২১টি আট-কোণা স্তম্ভ ছাড়াও প্রবেশ-পথের দুদিকে দুটি চার-কোণা স্তম্ভ আছে।

নবম গুহার সম্মুখ-দৃশ্য বা 'ফাসাদ'টির স্বরূপ বোঝাবার উদ্দেশ্যে এখানে একটি চিত্র

সংযোজিত করা গেল। এই চিত্র—২৯ নবম গুহার বাহিরের পথ থেকে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আঁকা।

এখানে সূর্য-গবাক্ষটিকে ভালভাবে দেখা যাছে। সূর্য-গবাক্ষের উপরে ও নিচে ছোট ছোট খিলানগুলিও ঐ সূর্য-গবাক্ষের অনুকরণে খোদিত। প্রবেশ-পথের দু-পাশে দুটি, তারও পাশে আবার দুটি অর্ধ-স্তম্ভ বা পিলাস্টার। এ-ছাড়া, দুই প্রান্তে দুটি গবাক্ষও আছে। পূর্বদিকের প্রাচীরে দণ্ডায়মান বৃহদায়তন বুদ্ধমূর্তি এবং ছোট ছোট যে বুদ্ধমূর্তি দেখছেন, এগুলি পরবর্তী যুগের সংযোজন। কারণ, এই চৈত্যটি হচ্ছে হীনযান যুগের, তখন বুদ্ধমূর্তি তৈরি করা হত না। হয়তো কয়েক শত বছর পরে এই মূর্তিগুলি খোদাই করে প্রবেশ-পথের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। চৈত্যের ভিতরে কিছু কিছু চিত্রের নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি ও বজ্রপাণি প্রভৃতি। এগুলিও পরবর্তী যুগের সংযোজন।



চিত্র—২৮ ॥ নবম চৈত্যের প্ল্যান ও এলিভেশান
১—স্তূপ ; ২—প্রবেশ-পথ ; ৩—স্তম্ভ ; ৪—উপাসনা-স্থল ;
৫—প্রদক্ষিণ-পথ ; ৬—সূর্য-গবাক্ষ।

নবম ও দশম চৈত্যের আলোচনায় ভারতবর্ষে গুহা-চৈত্য নির্মাণের বিবর্তনের কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। বস্তুতঃ, এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমরা কিছুই আলোচনা করি নি। এখনও করব না—সেটি একটি বিশেষ পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হবার দাবি রাখে। আপাততঃ তাই এ দুটি চৈত্যে দর্শনীয় যা-কিছু আছে, তাই দেখে যাব আমরা।

দশম গুহা-চৈত্যটি অজন্তার প্রাচীনতম চৈত্য, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর। আকারে এটি নবম গুহার তুলনায় বেশ বড়। দশম চৈত্যের শেষপ্রান্ত গোলাকার, নবম চৈত্যের মত কোণ-বিশিষ্ট নয়। ভিতরে সর্বসমেত ৩৯টি আট-কোণা স্তম্ভ। প্রবেশ-পথে নবম গুহায় যেমন দুটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে, এখানে তেমন কোনও স্তম্ভ নেই। চৈত্যপ্রান্তে স্তূপটি অলংকরণ-বর্জিত এবং আকারে বেশ বড়। চিত্র—৩০-এ দশম চৈত্যের প্ল্যান ও সেক্শানাল এলিভেশান দেওয়া হয়েছে।

দশম চৈত্য

দশম চৈত্যে যে চিত্রগুলি আছে, আছে না বলে অবশ্য 'ছিল'ই বলা উচিত—কলা-বিশারদ্‌রা তাদের দুটি বিভিন্ন যুগের বলে সনাক্ত করেছেন। কিছু চিত্র খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ; বস্তুতঃ অজন্তার আদিমতম চিত্র। আর কিছু পরবর্তী মহাযান যুগের সংযোজন।

প্রথমেই বাম প্রাচীরে নাগরাজার শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য (১০।৫)। সপার্ষদ্ নাগরাজ স্তূপমূলে অর্ঘ্যদান করতে চলেছেন। অজন্তায় গিয়ে আপনি এ চিত্র আর দেখতে পাবেন না। না, মহাকালের হস্তক্ষেপ নয়, মানুষের অত্যাচারে। বলছি সে-কথা। আর দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে ছিল ষড়দন্ত বা ছদ্দন্ত জাতকের একটি অনবদ্য কাহিনী-চিত্র। এটিও

নিঃশেষে অবলুপ্ত। ধৈর্যশীল দর্শক যদি নমুনাচিত্র নিয়ে খুঁজতে থাকেন, তবে অল্প অল্প অংশ হয়তো এখনও দেখতে পাবেন। মেজর গিল, গ্রিফিথ, ইয়াজদানী অথবা লেডি হেরিংহ্যামের গ্রন্থ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ; তাই তাঁদের গ্রন্থ অবলম্বনে এই দুটি চিত্রের অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছি এখানে।



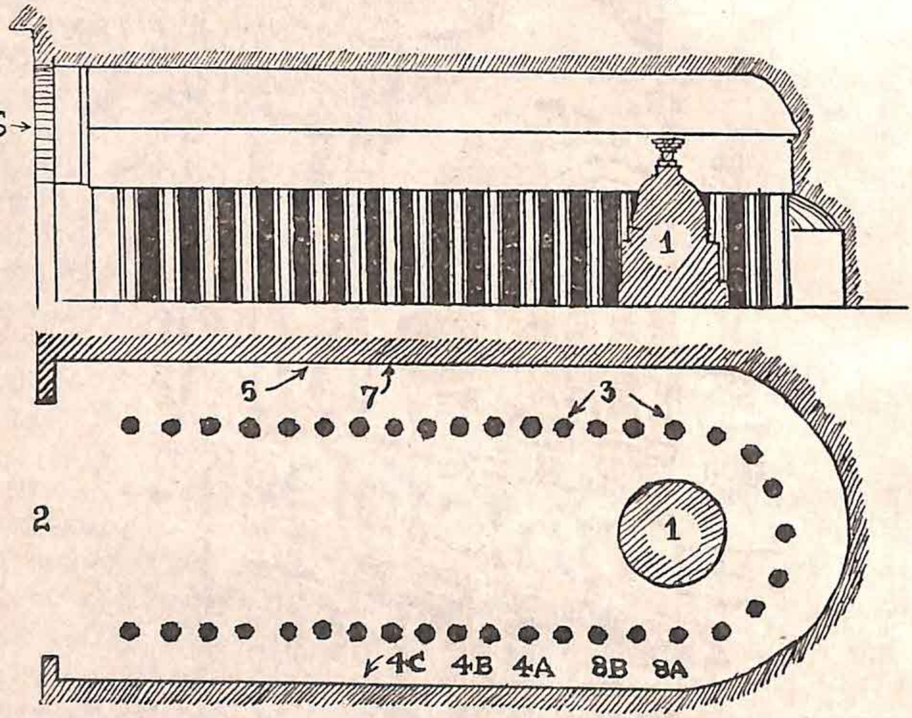
চিত্র—২৯ ॥ নবম চৈত্যের সম্মুখ-ভাগ বা ফাসাদ।

নাগরাজা

নাগরাজার চিত্রটি (চিত্র—৩১) দেখে কে বলবে, এই চিত্রের মানুষগুলি দু'হাজার বছর আগেকার যুগের। মনে হয়, দণ্ডকারণ্যের একদল 'মাড়িয়া' আদিবাসীকে জড়ো করে কেউ বুঝি রঙিন গ্রুপ-ফটো তুলেছে এই বিংশ শতাব্দীতেই। ঐ রকম মোটা রুলি, পুঁতি ও কড়ির মালা, টিকলি, কর্ণাভরণ, শিরস্ত্রাণ,—অমনি অনাবৃতবক্ষা নারীর দল আমি যে এই সেদিনও দেখে এসেছি দণ্ডকারণ্যের 'কোকোমেটার মাড়াই'-এ।

বামদিকে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ স্তম্ভের মাঝখানে ছিল শ্যাম-জাতকের একটি কাহিনী। এ চিত্রগুলিও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। প্রাচীন গ্রন্থ থেকে ঐ প্রাচীর-চিত্রের একটি খণ্ডাংশ এখানে এঁকে দিলাম (চিত্র—৩২)। প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বলি : এই কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণে বর্ণিত রাজা দশরথের একটি মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার বেশ কিছুটা মিল আছে। শ্যাম ছিলেন অন্ধ-পিতামাতার সন্তান। বৃদ্ধ অন্ধ-দম্পতি বানপ্রস্থ নিয়েছেন—শ্যামই তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। একদিন বারানসীরাজ শিকারে গিয়ে কোন নদীর সমীপবর্তী হয়ে শুনলেন, ঘন পত্রান্তরালে একটা বন্যপশু জলপান করছে। যথারীতি রাজা শব্দভেদী বাণ ছুঁড়লেন, এবং পিতামাতার জন্য পানীয় জল সংগ্রহরত শ্যাম শরবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালো। মর্মাহত কাশীরাজ শ্যামের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে এলেন অন্ধ সন্ন্যাসী দম্পতির কাছে। এ-ক্ষেত্রে কিন্তু কাহিনীর উপসংহারটি করুণ নয়। রাজার আবেদনে এক বনদেবী মন্ত্রবলে শ্যামকে পুনর্জীবিত করেন এবং অন্ধ দম্পতিও তাঁদের দৃষ্টি ফিরে পেলেন।

শ্যাম জাতক



চিত্র—৩০॥ দশম চৈত্যের প্ল্যান ও এলিভেশান : ১—স্তূপ ; ২—প্রবেশ-পথ ; ৩—স্তম্ভ ; ৪—ছদ্দন্ত জাতক (চিত্র-৩৩—৩৭) ; ৫—নাগরাজার শোভাযাত্রা (চিত্র-৩১) ; ৬—সূর্য-গবাক্ষ।

চিত্র—৩২-এ বামদিকে দেখছি, কাশীরাজ সসৈন্য শিকারে আসছেন। সৈন্যদলের পুরোভাগে শরসন্ধানরত কাশীরাজের আলেখ্য। তাঁর দক্ষিণে একটি বৃক্ষের ছেদচিহ্ন। তার ও-পাশে দেখা যাচ্ছে শ্যামকে। তার বামস্কন্ধে জলপূর্ণ কলস এবং দেখছি, তার বক্ষপঞ্জর ভেদ করেছে সেই শব্দভেদী শায়ক। শ্যাম ডানহাতে সেই তীরটি টেনে বার করবার চেষ্টা করছে। আরও দক্ষিণে এগিয়ে গেলে পুনরায় দেখব কাশীরাজকে। ডানহাত তুলে তিনি দুর্ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন। সর্বদক্ষিণে অন্ধদম্পতিকে দেখা যাচ্ছে। ঐ অন্ধদম্পতির ঠিক উপরেই একদল পলায়মান কৃষ্ণসার মৃগের অনবদ্য চিত্র। সমস্ত ঘটনাটা যে বনদেবী অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন তাও দেখা যাচ্ছে—বৃক্ষান্তরালে মেঘের ভিতর থেকে হাত তুলে বনদেবী যা বলছেন তার ভাষা আমাদের অতি পরিচিত : ভো ভো রাজন! এ আশ্রমমৃগকে হত্যা করবেন না!

দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে ছিল বিরাটাকার একটি প্রাচীর-চিত্র (১০।৪)। বিষয়-বস্তু ষড়দন্ত জাতক। এ চিত্রটিও ইয়াজদানী অবলম্বনে এখানে সন্নিবেশিত করলুম। প্রথমে কাহিনীটা বলে নিই :

ষড়দন্ত জাতক

পূর্বজন্মে বুদ্ধদেব ষড়দন্ত-গজরাজের মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই ধরাধামে। তিনি বুদ্ধ নন, বোধিসত্ত্ব। হিমালয়ের পাদদেশে ছিল ছদ্দন্ত নামে একটি বিশাল হ্রদ,—নিত্যপদ্ম, নির্মল তার জল। গজরাজের আয়তন ছিল বিশাল। বিরাশি হাত উঁচু এবং একশ-বিশ হাত লম্বা এই মহাগজের অধীনে ছিল আট হাজার হস্তী অনুচর। মহাধার্মিক এই মহামতি গজরাজের ছিল দুই রানী—খুল্ল-সুভদ্রা আর মহা-সুভদ্রা। দুই মহিষীকে গজরাজ সমান স্নেহ করতেন—একদেশদর্শিতা বা পক্ষপাতিত্বের চিহ্নমাত্র ছিল না সমদর্শী এই মহাগজের চরিত্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, বড়রানী খুল্ল-সুভদ্রা সব সময় সন্দেহ করতেন যে, গজরাজ কনিষ্ঠা মহিষীকেই বেশী স্নেহ করেন। তাঁর এ অনুযোগের উত্তরে গজরাজ তাঁকে বারে বারে বুঝিয়েছেন—এ-জাতীয় ঈর্ষাকাতরতায় মহিষী অহেতুক মনোবেদনায় কষ্ট পান—এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক ; কিন্তু তবু মাৎসর্য-বিষে জর্জরিতা জ্যেষ্ঠা মহিষীর চেতনা হয় না।



চিত্র—৩১॥ নাগরাজা সপরিবারে স্তূপমূলে অর্ঘ্যদান করতে চলেছেন—দশম গুহা ; প্রাচীনতম চিত্র অজন্তায়। (অবস্থান—১০।৫ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী)।

একদিন পঙ্কজ সরোবরে অবগাহন-স্নানান্তে গজরাজ তীরে উঠবার সময় দেখতে পেলেন ফুল্ল-কুসুমিত একটি অশোকতরু। মহারাজ ক্রীড়াচ্ছলে বৃক্ষের কাণ্ডটি শুণ্ডে আলিঙ্গন-বদ্ধ করে প্রকম্পিত করলেন। ঝড়ে পড়ল বনকুসুম। কিন্তু দৈবের কী নির্দেশ! ফুল-গুলি সবই ঝরে পড়ে কনিষ্ঠা মহিষীর কুম্ভে। আর কিছু শুষ্ক শাখা ভেঙে পড়ে জ্যেষ্ঠা মহিষীর মাথায়। কলকণ্ঠে হেসে ওঠে গজসখীর দল। অভিমানিনী বড়রানীর ঈর্ষাকাতর-তার কথা গোপন ছিল না সখীমহলে—তাই এ নিয়ে কৌতুক করতেও ছাড়ল না ওরা। প্রচণ্ড অপমান-বোধ হল জ্যেষ্ঠা মহিষীর, দুরন্ত অভিমানে স্থানত্যাগ করলেন তিনি। ক্ষুব্ধ মহারাজ পিছন থেকে বারে বারে তাঁকে ডাকলেন ; কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করলেন না। এই সামান্য দুর্ঘটনার পথ বেয়েই এল চরম সর্বনাশ। সমস্ত দিন অপেক্ষা করে রইলেন গজরাজ, কিন্তু ফিরে এলেন না বড়রানী। যূথবেষ্টনী ভেদ করে দুরন্ত অভিমানে সেই যে তিনি চলে গেলেন, তারপর থেকেই আর তাঁর সন্ধান নেই। পরদিন থেকে মহারাজ অনুসন্ধান চালালেন। বনে-বনান্তরে অন্বেষণ করতে থাকে অনুচরের দল, কিন্তু মহারানী যেন হাওয়ায় মিশে গেছেন। শেষকালে স্বয়ং গজরাজ উন্মাদের মত নিজেই নিরুদ্দিষ্টার অন্বেষণে বের

হয়ে পড়েন। কত মরু-প্রান্তর, কত গহন অরণ্য অতিক্রম করে এলেন তিনি—কিন্তু নিরুদ্দিষ্টার কোন সন্ধান পেলেন না।

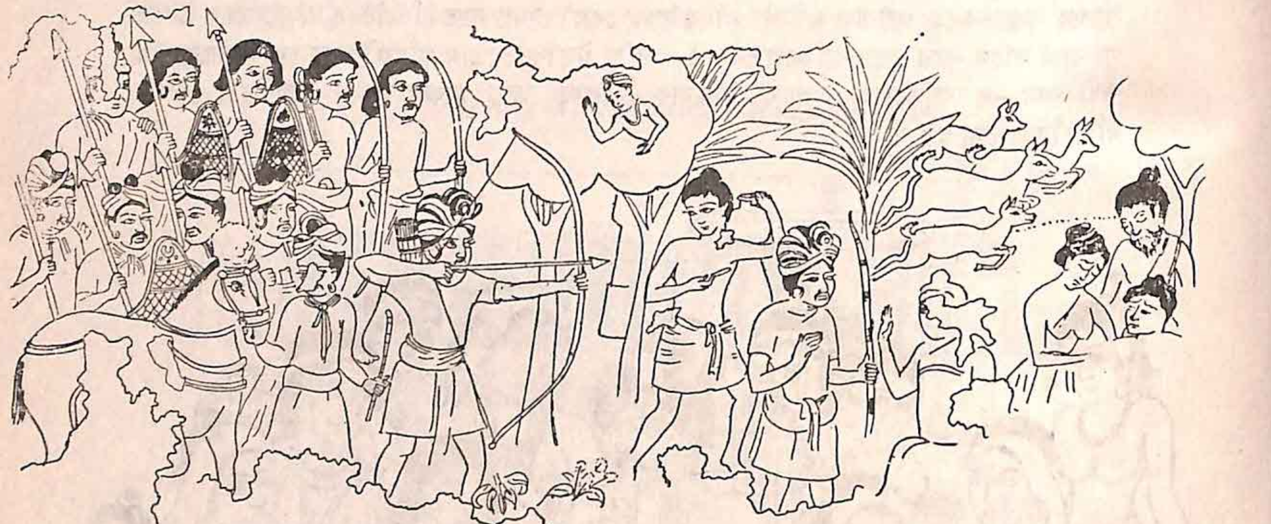
দুঃখে অনুশোচনায় গজরাজ শয্যা নিলেন।

দীর্ঘদিন পরে মহারাজের এক বিশ্বস্ত অনুচর ফিরে এল মহারানীর সংবাদ নিয়ে। রাজমহিষী হিমালয়ের এক গহন অরণ্যে গিয়ে তপস্যা করেছিলেন।

গজরাজ সোৎসাহে বলে ওঠেন, তুমি তাঁর দেখা পেয়েছ?

অধোবদনে অনুচর বলে, না মহারাজ—যে সব নির্জন গুহাবাসী সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগ করে তপস্যা করেন, তাঁদের কাছেই সন্ধান পেয়েছি আমি। তাঁদের শরণ নিয়েছিলেন মহারানী। তাঁদের নির্দেশেই কঠিন তপশ্চর্যা করে সেই হিমশীতল রাজ্যেই তিনি দেহ রেখেছেন।

ষড়দন্ত-গজরাজের দুচোখে নেমে আসে দুটি জলের ধারা।



চিত্র—৩২॥ শ্যাম জাতক।

মহামন্ত্রী প্রশ্ন করেন, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি তিনি?

অনুচর বলে, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারলাম না মহামন্ত্রী। যে সন্ন্যাসীর কাছে মহারানীর সংবাদ পাই, তিনি বলেছিলেন—শেষ তপস্যায় রাজমহিষী সাফল্যলাভ করে ছিলেন। তাঁর ইষ্টদেব এসে তাঁকে বরদানও করে যান, অথচ—

—অথচ কি?

—অথচ তিনি আজ জীবিতা নেই। কেমন করে প্রার্থনা পূরণ হবে তাঁর?

গজরাজ এতক্ষণে প্রশ্ন করেন, কী বর প্রার্থনা করেছিলেন খুল্ল-সুভদ্রা?

অনুচর অধোবদনে নিরুত্তর থাকে।

গজরাজ সহাস্যে বলেন, তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? মহারানী আমার উপর প্রতিশোধ নেবার বর প্রার্থনা করেছিলেন, এই তো?

অধোবদনেই অনুচর প্রত্যুত্তর করে—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

কনিষ্ঠা মহিষী ভীত সচকিতকণ্ঠে বলেন—ভাগ্যে তিনি জীবিতা নেই। না হলে—

বাধা দিয়ে গজরাজ বলেন—দেবতার আশীর্বাদ তা সত্ত্বেও ফলবে মহা-সুভদ্রা! তাঁর মনস্কামনা নিষ্ফল হবে না!

কনিষ্ঠা মহিষী সবিস্ময়ে বলেন—কেমন করে মহারাজ?

গজরাজ সে কথার উত্তর দেন না, ম্লান হাসেন শুধু।

কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর অচিরেই উপলব্ধি করলেন কনিষ্ঠা মহিষী। গজরাজের যেন কী হয়েছে—আহার-বিহার কোন কিছুতেই তাঁর মন নেই। সমস্ত দিন তিনি অন্যমনে কি যেন চিন্তা করেন। মিথ্যা অভিমানে জ্যেষ্ঠা মহিষী যে তাঁকে অপদস্থ করে চলে গেছেন, এ-কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না বোধিসত্ত্ব মহারাজ। তিনি যেন সকলের চোখে ছোট হয়ে গেছেন। যিনি দুই সহধর্মিণীর প্রতিই সাম্য-দৃষ্টি রাখতে পারেন না, তিনি কেমন করে যাবতীয় প্রজাসাধারণকে সমদৃষ্টিতে দেখবেন?

দিন দিন ক্ষয়িত হতে থাকে মহাগজের বিশাল দেহ। শেষে রাজ্যভার যোগ্যতম গজের হস্তে সমর্পণ করে তিনিও চলে গেলেন প্রব্রজ্যা নিয়ে। জ্যেষ্ঠা মহিষীর মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রইল না—ষড়দন্ত-গজরাজের সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল।

ক্রমে কনিষ্ঠা মহিষী মহা-সুভদ্রাও গত হলেন—একে একে বিদায় নিলেন সংসার থেকে মহারাজের অন্যান্য বিশ্বস্ত অনুচরের দল। শুধু মহাস্থবির বৃদ্ধ গজরাজের যেন মৃত্যু নেই। সামান্য কয়েকজন অনুচরসমেত তিনি হিমালয়ের এক নিভৃততম কন্দরে শেষজীবন যাপন করতে থাকেন।

একদিন সায়াহ্নকালে সরোবরে অবগাহন-স্নানান্তে মহাগজ নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছেন—মনে মনে বলছেন, আমার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয়নি প্রভু? মুক্তির দিন কি আমার আজও আসেনি?

হঠাৎ তাঁর পৃষ্ঠদেশে একটি প্রচণ্ড শরাঘাত হল। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গজরাজ পশ্চাতে ফিরে দেখেন, একজন ধানুকী তীরে দাঁড়িয়ে তাঁকে শরসন্ধান করছে। বাধা দিলেন না মহারাজ। মুহুর্মুহু শরবাণে তাঁকে বিদ্ধ করল শিকারী। তারপর সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

গজরাজ ওকে ক্ষান্ত হতে দেখে বলেন—তুমি কি চাও বন্ধু? এভাবে আমাকে ক্রমাগত শরবিদ্ধ করছ কেন?

স্তম্ভিত শিকারী এ-কথায় এগিয়ে এসে বলে, আমি আপনার ঐ প্রকাণ্ড ছটি দাঁত নিয়ে যাব বলে এসেছিলাম। আপনাকে যে বিষ-মিশ্রিত বাণে আঘাত করেছি, তাতে যে-কোন হস্তীর মৃত্যু হওয়ার কথা, অথচ—

গজরাজ হেসে বলেন, আমাকে বধ করবার মত বাণ তো তোমার তূণীরে নেই বন্ধু। তা তুমি আমার দাঁতগুলি চাও তো নিয়ে যাও না। এস, কাছে এস—উৎপাটন কর আমার গজদন্ত, আমি কিছু বলব না।

সাহসে ভর করে শিকারী সদলবলে এগিয়ে আসে। বহু আয়াসেও কিন্তু তারা উৎপাটিত করতে পারে না গজরাজের মহাদন্ত।

তখন গজরাজ বলেন—বেশ, তুমি অপেক্ষা কর, আমি স্বয়ং এই ছটি গজদন্ত উৎপাটিত করে দিচ্ছি। দন্ত-উৎপাটনমাত্র আমার মৃত্যু হবে। সেজন্য খেদ নেই; কিন্তু আমার এ দাঁতগুলি তোমার কি কাজে লাগবে ভাই?

শিকারী বুঝতে পারে ইনি সামান্য গজ নন। সে তখন যুক্তকরে নিবেদন করে—মহাশয়, আপনি আমার উপর রুষ্ট হবেন না। আমি আজ্ঞাবহমাত্র। আমি মহামহিম কাশীরাজের মৃগয়াধিপতি, আমার নাম সোনুত্তর। আমাদের মহারানী স্বপন দেখেছেন যে, হিমালয়ের এক নিভৃত কন্দরে এক মহাগজ আছেন—যাঁর ছটি বিরাটাকার গজদন্ত আছে। মহারানীর শখ, তিনি সেই গজদন্ত-নির্মিত পালঙ্কে শয়ন করবেন। তাই রাজাদেশে শত-সহস্র শিকারী সমস্ত হিমাচলখণ্ডে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। আজ দৈবক্রমে আমি আপনার সাক্ষাৎ পেয়েই বুঝেছি যে, মহারানী আপনাকেই স্বপ্নে দেখেছিলেন।

গজরাজ সে-কথা শুনে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। তারপর ধ্যানভঙ্গ হলে তিনি বললেন, তোমার উপর আমি রুষ্ট হইনি মৃগয়াধিপতি সোনুত্তর। আমি স্বয়ং আমার ছটি গজদন্ত উৎপাটিত করে দিচ্ছি। এ ঘটনা কেন ঘটেছে, তা ধ্যানে উপলব্ধি করেছি আমি। এ

দৈবনির্দেশ। আমার এই দাঁত কয়টি তুমি নিয়ে গিয়ে তোমাদের রাজমহিষীকে দিও, আর তাঁকে বলো—এগুলি তাঁকে উপহার দিয়েছি আমি। আরও বলো, পূর্বজন্মে আমি ইচ্ছাকৃত-ভাবে তাঁর মস্তকে শুষ্ক অরণ্যশাখা নিক্ষেপ করিনি!

বস্তুতঃ, দন্ত-উৎপাটনমাত্র গজরাজের মৃত্যু হল।

সুবর্ণ পাত্রে ঐ অমূল্য গজদন্তগুলি নিয়ে সোনুত্তর উপনীত হল বারাণসীতে। মহারানীর প্রার্থিত গজদন্ত এসেছে শুনে আনন্দের হিন্দোল বয়ে গেল রাজপুরীতে। বাহকের দল গজদন্তগুলি নিয়ে এল রাজান্তঃপুরে। কিন্তু সেগুলি দর্শনমাত্র শিউরে উঠলেন কাশীরাজ-মহিষী।

পূর্ব-জন্ম-স্মৃতি মনে পড়ে গেছে তাঁর। সেই অনিন্দ্যসুন্দর গজদন্তগুলি দর্শনমাত্র কাশীরাজ-মহিষী উপলব্ধি করেছেন যে, পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন ঐ গজরাজের প্রধানা মহিষী। মনে পড়ে গেল তাঁর প্রতিশোধ প্রার্থনার কথা! মনে পড়ে গেল ষড়দন্ত-গজরাজের প্রণয় কথা!

মহাগজের অন্তিম ভাষণ শুনে মহারানী মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

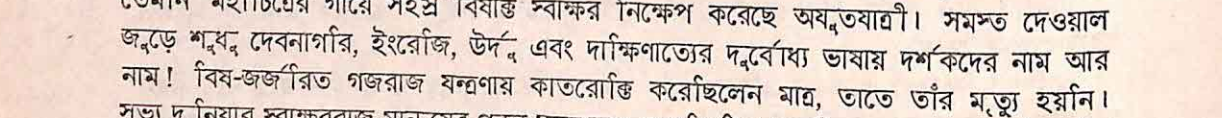
সে মূর্চ্ছা তাঁর আর ভাঙল না। ক্ষোভে দুঃখে মহারানীও প্রাণত্যাগ করলেন।

এ কাহিনী শুধু দশম গুহাতেই নয়, সপ্তদশ গুহাতেও আছে। দশম গুহাতে এই জাতককাহিনী অবলম্বনে যে চিত্রগাথা ছিল, তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

কেমন করে জানেন? গত দেড়শ-দু'শ বছরে নানান্ জাতের মানুষ এসেছে অজন্তায় এবং এই চিত্রপটের উপর ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নিজেদের নাম খোদাই করে গেছে। অসংখ্য স্বাক্ষরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে ষড়দন্ত-গজরাজের এই অপূর্ব চিত্রগুলি! অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলে অসংখ্য স্বাক্ষরের ভিতর থেকে মনে হয়, যেন অল্প অল্প চিত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মহাগজের বিশাল দেহে যেমন সহস্র বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করেছিল শিকারী, এখানেও যেন তেমনি মহাচিত্রের গায়ে সহস্র বিষাক্ত স্বাক্ষর নিক্ষেপ করেছে অযুতযাত্রী। সমস্ত দেওয়াল জুড়ে শুধু দেবনাগরি, ইংরেজি, উর্দু এবং দাক্ষিণাত্যের দুর্বোধ্য ভাষায় দর্শকদের নাম আর নাম! বিষ-জর্জরিত গজরাজ যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করেছিলেন মাত্র, তাতে তাঁর মৃত্যু হয়নি। সভ্য দুনিয়ার স্বাক্ষরবাজ মানুষের গরল-স্বাক্ষরেও তেমনি বিষ-জর্জরিত হয়েছে মহান্ শিল্পীর শিল্পকর্ম। কিন্তু তার মৃত্যু নেই! বার্জেস আর গ্রিফিথের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয়ী চিত্রটি অমর হয়ে আছে পৃথিবীর যাবতীয় গ্রন্থাগারে! দুষ্প্রাপ্য সে চিত্র সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে। তাঁদের এই গ্রন্থকারের অক্ষম প্রচেষ্টাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

এ-চিত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চোখ ফেটে জল এসেছিল আমার। শুধু একমাত্র সান্ত্বনা—স্বাক্ষরের সে হরিহরছত্র-মেলায় 'আ-মরি বাঙলা ভাষা'-র সন্ধান পাইনি আমি।

অজন্তার এই অন্যতম প্রাচীন চিত্রটির বিষয়ে এবার আলোচনা করা যাক। সৈয়দ আহ্মেদ-কৃত অনুলিপি অবলম্বনে আমরা চিত্র—৩৩-এ সর্বপ্রথমে একটি চিত্র-চুম্বকসার দিয়েছি ; তাতে



চিত্র—৩৩

বিভিন্ন খণ্ডচিত্রের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই কাহিনী-চিত্রটিকে একটি তিন-অঙ্কের নাটকরূপে কল্পনা করা যেতে পারে। প্রথম অঙ্কে দুটি দৃশ্য—'A' এবং 'B' চিহ্নিত। দ্বিতীয় অঙ্কে নয়টি দৃশ্য—তাদের 'C' থেকে 'K' অক্ষর দ্বারা সূচীত করেছি। তৃতীয় অঙ্কে একটি

মাত্র দৃশ্য—'L' চিহ্নিত। এ-গ্রন্থে পরবর্তী চারটি চিত্র—চিত্র-৩৪, ৩৫, ৩৬ ও ৩৭-এর অবস্থানও ঐ সাঙ্কেতিক চিত্র—৩৩-এ দেখানো হয়েছে।

প্রথমেই A-চিহ্নিত প্যানেলে দেখছি, কাশীরাজমহিষী (অর্থাৎ যিনি পূর্বজন্মে ছিলেন ফুল্ল-সুভদ্রা) অভিমান করে করলগ্নকপোলে বসে আছেন একটি কারুকার্যখচিত আসনে। কাশীরাজ যেন পূর্বমুহূর্তে বসেছিলেন, এখনই উঠে দাঁড়িয়ে মহারানীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, ষড়দন্ত গজরাজের সন্ধানে তিনি এখনই শিকারীদের পাঠাচ্ছেন। এই খণ্ডচিত্রে রানীই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে ঘিরে আছে আরও চারজন কিঙ্করী। পিছনের চন্দ্রাতপ এবং সম্মুখের কমণ্ডলু জাতীয় পাত্রটি লক্ষণীয়। রাজার পায়ের চটিজোড়া দু-হাজার বছরের পুরানো হতে পারে কিন্তু ঐ জাতীয় হাওয়াই-চপ্পল আজও বাজারে পাওয়া যায় (চিত্র—৩৭)।

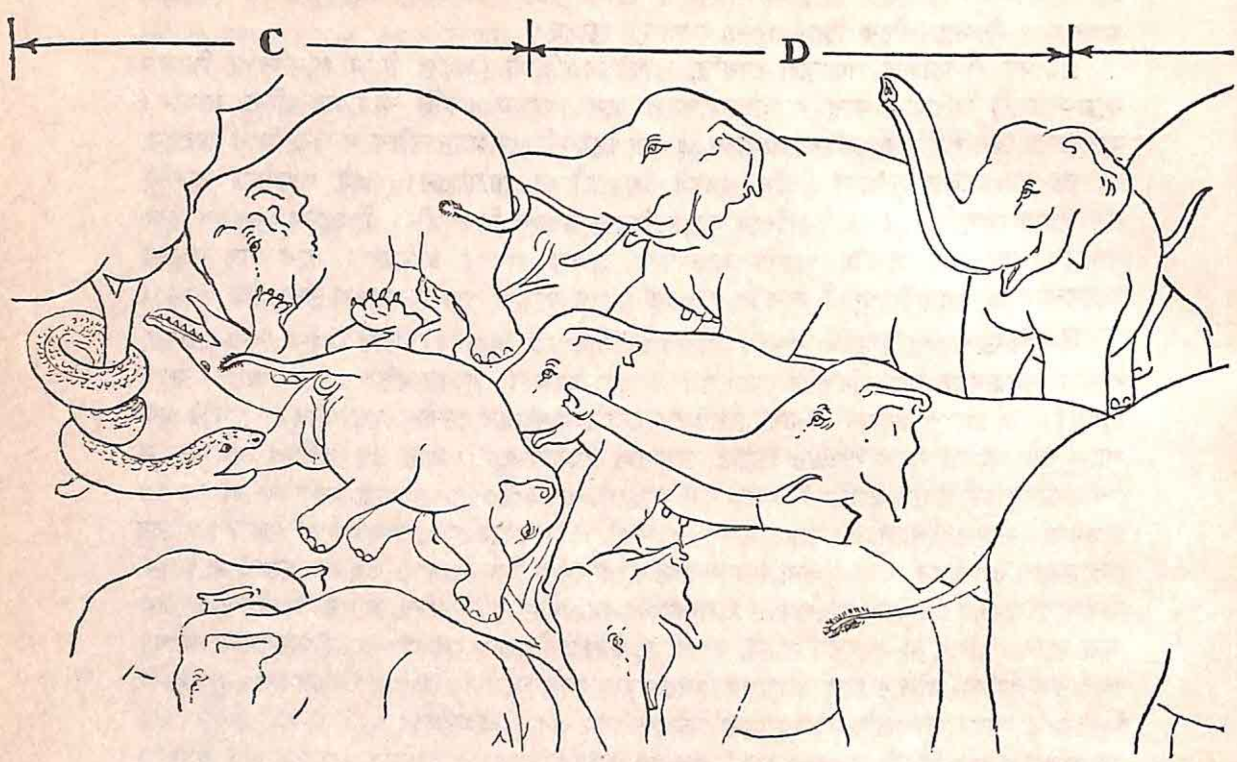
B-চিহ্নিত পরবর্তী দৃশ্যে দেখছি—মহারাজ সিংহাসনে আসীন। তাঁর মাথার উপর রাজছত্র, সামনে বিনয়াবনত মৃগয়াধিপতি সোনুত্তর ও তার সহচর। রাজার দক্ষিণে বসে আছেন রাজ-মহিষী। এ চিত্রেও ছয়জন নরনারী চক্রাকারে মূল চরিত্রদ্বয়কে বেষ্টন করে আছে। রানীর এক পাশে গাছ অপর পাশে রাজছত্র চিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করছে। আর এই প্রসঙ্গে মনে রাখুন সোনুত্তরের হাফহাতা জামার ডিজাইনটা ; তাহলে পরে ওকে সনাক্ত করা সহজ হবে। আরও লক্ষণীয়—রাজার শিরস্ত্রাণ, তাঁর কণ্ঠের শতনরী, তাঁর কোমরবন্ধ, উষ্ণীষ ও রানীর পায়ের মলজোড়া। এগুলির সঙ্গে তুলনা করুন ইতিপূর্বে দেখা চিত্র—৩১ ও ৩২। তাহলেই বুঝবেন, খ্রীষ্টপূর্ব যুগের পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যটুকু। এদের দোশর আপনি অজন্তায় আর খুঁজে পাবেন না—পাবেন সাঁচী, ভারহুত, উদয়গিরিতে। সে কথা পরে আলোচনা করব।

আপাতত কাহিনীর সূত্র ধরে আমাদের দেখতে হবে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক। চিত্র—৩৪ (বাম)-এ C-চিহ্নিত প্যানেলে গভীর অরণ্যদেশে আসতে হবে এবার আমাদের।

সেখানে দেখছি—হিমালয়ের তরাই-অঞ্চলে এক হস্তিযূথ। ভয়ানক রস! একটি হস্তীর পদতলে একটি কুম্ভীর পিষ্ট হতে বসেছে। আবার দেখছি, একটি অজগর হস্তিশাবকের পিছনের বামচরণটি গ্রাস করেছে। বেশ বোঝা যায়, শিল্পী অরণ্যচারী হস্তিযূথের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, কারণ দেখছি—ঐ বিপদগ্রস্ত হস্তিশাবককে সাহায্য করতে যূথের তিন চারটি বড় হাতী শুণ্ড আস্ফালন করতে করতে ছুটে আসছে (D—চিহ্নিত অংশ)।

পরবর্তী দৃশ্যে (চিত্র—৩৪-এর E-চিহ্নিত অংশে) হল নায়কের আবির্ভাব। ষড়দন্ত গজরাজকে ঘিরে আছে অনেকগুলি হাতী। 'F'-চিহ্নিত প্যানেলের কেন্দ্রবিন্দুও ঐ ষড়দন্ত গজরাজ। ডানদিকে ধানুকী সোনুত্তরকে দেখা যাচ্ছে, তার গায়ে সেই পরিচিত কুর্তা। সোনুত্তরের সম্মুখে যে হস্তীটি আছে তাকে সামনের দিক থেকে আঁকা হয়েছে, এক-ঘেয়েমি দূর করতে। এই চিত্রে আরও লক্ষণীয়, শিল্পী একটি বিরাট বটবৃক্ষ এঁকেছেন। ভারতীয় চিত্রে হাতীর সঙ্গে আমরা সচরাচর কদলীবৃক্ষ দেখতে অভ্যস্ত—এ-ক্ষেত্রে একটু যেন ব্যতিক্রম হল। বোধকরি গজরাজ যে বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় অনুচরদের ছায়া ও আশ্রয় দান করেছিলেন এমন একটা ইঙ্গিত শিল্পী দিতে চেয়েছেন।

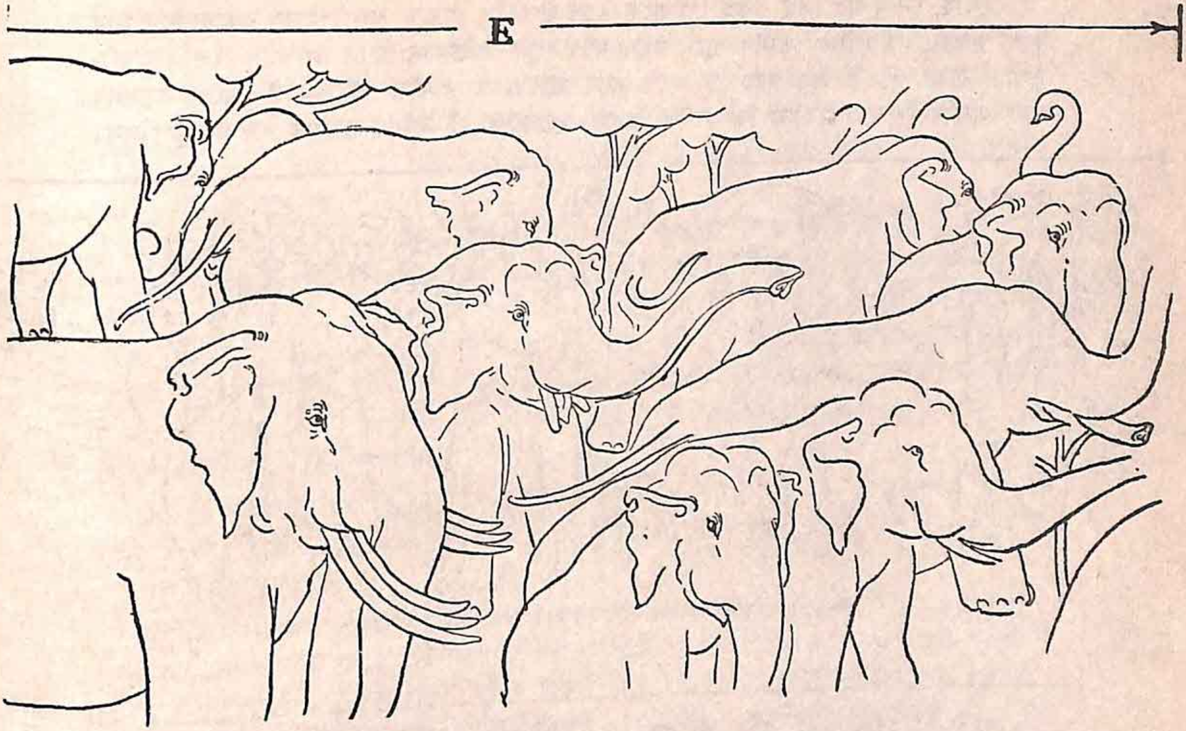
G-চিহ্নিত প্যানেলের কেন্দ্রবিন্দুও ঐ গজরাজ। ছয়টি অনুচর তাঁকে ঘিরে আছে। গজরাজের শুণ্ডে প্রকাণ্ড একটি পদ্মসমন্বিত মৃণালদণ্ড। পার্শ্ববর্তী H-চিহ্নিত প্যানেলে পদ্মসরোবরে হস্তিযূথের জলকেলীর দৃশ্য। গজরাজের কুম্ভের কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণতম প্রান্তে। I-চিহ্নিত প্যানেলে দেখা যাচ্ছে সোনুত্তর করাত দিয়ে গজদন্ত কাটতে উদ্যত ; অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত তিনটি মহাগজ অদূরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে দেখছে এই করুণ দৃশ্য। এর পরেই দেখা যাচ্ছে (J-চিহ্নিত প্যানেল) সোনুত্তর ঐ কর্তিত গজদন্ত বহন করবার আয়োজন করছে। গাছের উপর একটি ময়ূর। কাহিনী তারপর এগিয়ে চলল—K-চিহ্নিত চিত্রে। সেখানে দেখছি, সোনুত্তর বাঁকে করে গজদন্ত নিয়ে কাশীর পথে রওনা হয়েছে। এখানেই দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তি।



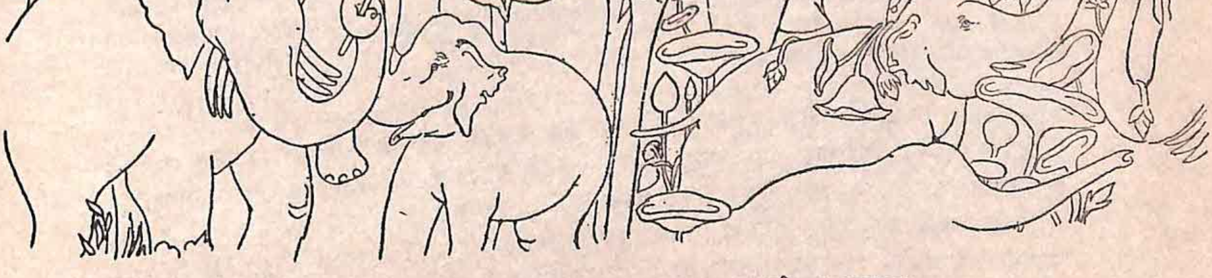
চিত্র—৩৪ ॥ (বাম) ছদ্দন্তজাতক—অরণ্যে হস্তিযূথের জীবন।



চিত্র—৩৫ ॥ (বাম) ছদ্দন্তজাতক—সোনুত্তর-কর্তৃক গজদন্ত সংগ্রহ।



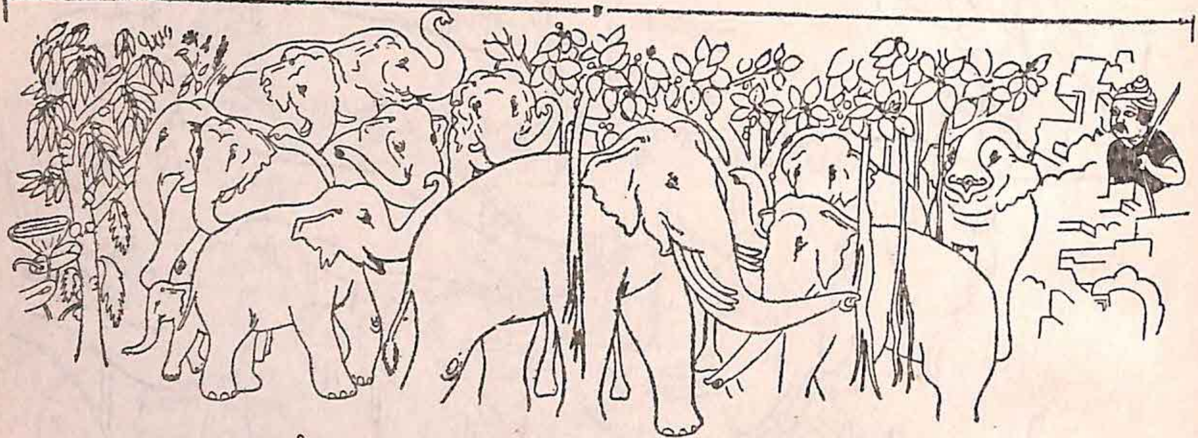
চিত্র—৩৪ ॥ (দক্ষিণ) ছদ্দন্তজাতক—হস্তী-অনুচর বেষ্টিত ষড়দন্ত গজরাজ।



চিত্র—৩৫ ॥ (দক্ষিণ) ছদ্দন্তজাতক—পদ্মসরোবরে জলকেলিরত গজরাজ।

শেষ অঙ্কে একটি মাত্র দৃশ্য—প্যানেল 'L' (চিত্র—৩৭)।

দেখছি, সোনুত্তর সেই একই পোষাকে এসে উপনীত হয়েছে কাশীশ্বরের রাজসভায়। তার কণ্ঠে গজরাজের অন্তিম ভাষণ শুনে মহারানীর পূর্ব-অভিজ্ঞান ফিরে এসেছে। তিনি মূর্ছাতুরা। রাজা বসেছিলেন পাশেই, ঘুরে বসে মূর্ছাহতা রানীর তনুদেহটি ধরতে যাচ্ছেন। রাজা-রানীর পিছনে চারজন কিঙ্করী। তাদের প্রত্যেকে এই নীরব-নাটকের বাঙ্ময় কুশীলব।



চিত্র—৩৬ ॥ ছন্দন্তজাতক—হস্তিযূথমধ্যে গজরাজকে সোনুত্তর দেখছে।



চিত্র—৩৭ ॥ ছন্দন্তজাতক—কাশীরাজের সভাদৃশ্য।

['A'-প্যানেলটি নাটকের প্রথম দৃশ্য এবং 'L'-প্যানেল শেষদৃশ্য, যদিও দুটিই কাশীরাজের দরবারের দৃশ্য। আধুনিক চলচ্চিত্র শিল্পে যেমন এক 'সেট্'-এর দৃশ্যগ্রহণ একই সঙ্গে হয়—নাটকে তাদের অবস্থান যেখানেই হোক—এক্ষেত্রেও যেন শিল্পী সেইভাবে এঁকেছেন। অর্থাৎ চিত্র—৩৭ যেন 'ছন্দন্ত' চলচ্চিত্রের 'র‍্যাশ্-প্রিন্টের' কর্তিতাংশের প্রজেক্শান!]

দক্ষিণতমা যেন একটা আর্ত চীৎকার প্রতিহত করতে মুখে হাত চাপা দিয়েছে। তার পার্শ্ববর্তিনী কোনও ঔষধপাত্র বহন করে আনছে। তার বামে একজন ব্যজনিকা পাখা-সঞ্চালনে মূর্ছাতুরাকে সেবা করছে। বামপ্রান্তের ছত্রধারিণীর বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটেনি—সে এখনও তাকিয়ে আছে গজরাজের কর্তিত দন্তরাজির দিকে। পূর্ববর্তী দৃশ্যে (A এবং B চিহ্নিত) আমরা মহারানীর পদসেবাকারিণী একটি কিশোরীকে দেখেছিলাম—এবারেও সে উপস্থিত। বর্তমানে রানীর বাম চরণখানি কোলে তুলে নিয়ে সে হাত বুলাচ্ছে। রানীর বামে আর একটি কিঙ্করীকে আঁকতে শিল্পী বাধ্য হয়েছেন ভারসাম্য-রক্ষার প্রয়োজনে—ঝুঁকে-থাকা মহারাজের ওজনে না-হলে এই প্রতিসাম্যমূলক কম্পোজিশানটি একপাশে ভারী হয়ে যেত। নিঃসন্দেহে

এই বেদন-বিধুত চিত্রটি এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম—বোধকরি খ্রীষ্টপূর্ব-যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম—অজন্তায়।

একাদশ গুহা

দশমের পরে একাদশ গুহা। এটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। পার্সি ব্রাউনের মতে, এটিও যথেষ্ট প্রাচীন—হীনযান যুগের শেষ পর্যায়ে অথবা মহাযান যুগের ঊষা মুহূর্তে এটির নির্মাণ শুরু হয়। তিনি বলেছেন, সম্ভবতঃ প্রথম শতাব্দীতে এর খনন-কার্য আরম্ভ করা হয়। অথচ অন্যান্য গ্রন্থে দেখছি এটি পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত।

বিহারটি ১১·৩ মি × ৮·৫ মি উচ্চতা ৩ মি। সম্মুখস্থ অলিন্দের স্তম্ভগুলিতে দেখছি চতুষ্কোণ পাদপীঠ, আট-কোণা মধ্যাংশ এবং চওড়া শীর্ষপীঠ। বিহারের ছাদে নানান্ জাতের জ্যামিতিক নক্শা আর ফুল-পাতা আঁকা। অলিন্দের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে বুদ্ধদেবের একটি চিত্র—তার দু-পাশে দুটি বোধিসত্ত্ব। অলিন্দ থেকে বিহারে প্রবেশের জন্য নির্মিত দ্বারের বামদিকে, ভিতরের দিকে সুন্দর একটি বোধিসত্ত্বের আলেখ্য। তাঁর হাতে সেই লীলাপদ্ম—তিনি বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি। বোধিসত্ত্বের বামে দুটি রমণী অর্ঘ্য দান করছে—তার ভিতর একটি নারীচিত্র নিখুঁতভাবে আঁকা।

একাদশ বিহারেও দেখলুম সেই চার হরিণের একমাথার শিল্প-চাতুর্য। আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলুম এই যে, দূরতম প্রান্তে বুদ্ধমূর্তির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ-পথ আছে—যা নাকি অন্য কোন বিহারে নেই।

আগেই বলেছি, এ গুহাটির কাল-নির্ণয় নিয়ে মতানৈক্য ঘটেছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। পার্সি ব্রাউন সাহেবের গ্রন্থটি পূর্বে প্রকাশিত। ফলে, অনুমান করছি, পরবর্তী গ্রন্থকাররা পরবর্তী গবেষণার ফলস্বরূপই এটিকে পঞ্চম শতাব্দীতে চিহ্নিত করেছেন। আর্কিওলজিকাল ডিপার্ট-মেন্টে এ-সব গবেষণার ফলাফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; সহজলভ্য রিপোর্ট থেকে আমি তা বুঝতে পারিনি। সাধারণ দর্শক হিসাবে আমার তো মনে হয়েছে, পার্সি ব্রাউন সাহেবের যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, এই একাদশ গুহাতেও দেখছি নাসিকের অনুকরণে সেই প্রস্তর-শয্যা—যা নাকি ত্রিংশতি, অষ্টম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিহারের বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত পঞ্চদশ, ষোড়শ বা সপ্তদশে তো তা নেই। তাই আমার মনে হয়েছে, এ গুহা-বিহারটি মহাযান যুগের ঊষাকালেই প্রথম খনন করা শুরু হয়েছিল—যদিও গর্ভমন্দিরস্থ প্রদক্ষিণ-পথসমেত বুদ্ধমূর্তি, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি অনেক পরের যুগের যোজনা। অবশ্য বিশেষজ্ঞের নির্দেশে আমার এ নিছক আন্দাজ ভ্রমাত্মক বলে প্রমাণিত হতে পারে।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিহার

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুহার কথা আমরা আগেই বলেছি। পঞ্চদশ গুহার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এটি হীনযান যুগের না-হওয়া সত্ত্বেও এতে কোন স্তম্ভ নেই।

এরপর আমরা ফ্রেস্কো-সমৃদ্ধ ষোড়শ বিহারে পদার্পণ করতে পারি।

এই ষোড়শ বিহারের প্রবেশ-পথে দুটি অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটি হল নাগরাজা ও নাগরানী, দ্বিতীয়টি হল বিশালায়তন দুটি নতজানু হস্তি-মূর্তি। প্রবেশ-পথে বলা অবশ্য ঠিক হল না। যে সমতল পথটি বাগোড়া নদীর চক্রাবর্তনের সমান্তরালে অজন্তা-গুহাগুলিকে সংযুক্ত করেছে, সেই পথ থেকে ষোড়শ বিহারে প্রবেশ করতে হলে আবার কতকগুলি সোপান অতিক্রম করে আসতে হয়। সেই সোপান-শ্রেণীর প্রথম ধাপের কাছে আছে যুগল হস্তী, মধ্যপথে বা ল্যান্ডিঙে আছে নাগরাজা ও রানীর মূর্তি।

নাগ-দম্পতির মূর্তি একটি কুলুঙ্গির মধ্যে খোদিত। বসে আছেন দুজনে একটি প্রস্তরাসনে। রাজার বামপদ প্রলম্বিত, বামহস্তে দেহভার সংরক্ষিত। দক্ষিণহস্তটি ভেঙে গেছে। নাগরানীর মুখটি ঈষৎ ফেরানো, তিনি যেন সোপানবাহী যাত্রীদের দেখছেন। রাজার

দক্ষিণে একজন চামরধারিণী। রাজার মাথায় বিরাটাকার নাগের ফণা। কুলুঙ্গির দুপাশে দুটি স্তম্ভ—গোলাকৃতি, কোন পাদপীঠ নেই ; কিন্তু শীর্ষপীঠে মঙ্গলকলস ও আমলক আছে।

দ্বিতীয় মূর্তি অর্থাৎ নতজানু যুগল হস্তিমূর্তির বিষয়ে মহম্মদ ইস্‌মাইল সাহেব আমাকে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে মহম্মদ মীর্জা ইস্‌মাইলের* পরিচয়টা আপনাদের জানাতে হয়।

অজন্তায় পৌঁছে গুহা-মন্দিরগুলির অবস্থান দেখাবার উদ্দেশ্যে আমি একটি সাইট-প্ল্যান আঁকবার চেষ্টা করি। আমার সে প্রচেষ্টার পরিণাম এ গ্রন্থের চিত্র—১। গাইড বইতে অজন্তার ম্যাপ ছিল না।

অজন্তার বিষয়ে একটি চিত্র-বহুল মোটা বই† সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম। সত্তর টাকা দাম। তাতে অজন্তার কোন ম্যাপ নেই। ইয়াজদানী সাহেবের চার খণ্ডে প্রকাশিত প্রামাণিক গ্রন্থে ম্যাপ আছে, কিন্তু উত্তর-নির্দেশক রেখাটি নেই। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে লেডি হেরিংহ্যাম-সঙ্কলিত যে গ্রন্থটি আছে, তাতেও অজন্তার প্ল্যান পাইনি। সে প্রাচীন গ্রন্থে প্রথম দশটি পৃষ্ঠাই নেই। আমার সঙ্গে এছাড়া ছিল ভারতীয় স্থাপত্যের উপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ§ ; কিন্তু মুশকিল এই যে, সে বইতে প্ল্যানে যে উত্তর-নির্দেশক রেখা আছে, আমার কম্পাস বলছে সেটা দক্ষিণ দিক§। সূর্য তখন মাথার উপর। উত্তর দিকটা সনাক্ত করতে পারছি না। ফলে, রীতিমত মুশকিলে পড়লুম। সূর্য-গবাক্ষের অবস্থানের সঙ্গে উত্তর-নির্দেশক রেখাটির নিবিড় সম্পর্ক—ওটা না হলে চলবে না। জরীপের কাজে বহুবার বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি ; কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থের নির্দেশ এভাবে নস্যাৎ করেনি কখনও আমার দীর্ঘ-দিনের সহচর এই ছোট কম্পাসটি।

শেষ পর্যন্ত কম্পাসটি হাতে নিয়ে হাজির হলাম আর্কিওলজিকাল বিভাগের অফিসে অর্থাৎ টিকিট-ঘরে। অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলি—মাপ করবেন, আপনাদের এখানে উত্তর দিক কোন্‌টা ?

ভদ্রলোক হেসে বলেন—এমন অদ্ভুত কথা তো কখনও শুনিনি। আপনার হাতে কম্পাস, আর আপনি উত্তর দিক খুঁজতে এই অফিসের ভিতরে এসেছেন ?

আমি বলি, কিন্তু মুশকিল কি জানেন, কম্পাস ছাড়াও আমার হাতে রয়েছে ভারতীয় স্থাপত্যের উপরে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

বইটি মেলে ধরি ওঁর সামনে।

ভদ্রলোক অবাক্ হলেন। অফিসের আলমারি থেকে ওঁর নিজস্ব বইটি বার করে দেখে বলেন—আশ্চর্য, এটা তো এতদিন নজরে পড়েনি।

এই সূত্রে আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনে বলেন—আচ্ছা, আপনার একটা সুবিধা করে দিই। ডাঃ ইয়াজদানীর একজন বৃদ্ধ ছাত্র এখনও এখানে আছেন। নিজাম সরকারে পুরাতত্ত্ব-বিভাগে চাকরি করতেন, ডাঃ ইয়াজদানীর শিষ্য হিসাবে দীর্ঘদিন এই গুহা-মন্দিরে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। অবসর নেবার পরও অজন্তা ছেড়ে যেতে পারেননি। তিনকুলে তাঁর কেউ নেই। এই গুহার আকর্ষণে উনি এখানেই পড়ে আছেন, এখন গাইডের জীবিকায় গ্রাসাচ্ছাদন করেন।

---

* "বক্রেশ্বরের একানে বুড়ো" নামে একটি ভ্রমণ-কাহিনী দেশ পত্রিকায় একবার লিখেছিলুম। তাতে এ-জাতীয় একটি কল্পিত নাম ব্যবহার করায় আমাকে পরে বিব্রত হতে হয়েছিল, দণ্ডক-শবরীতে বর্ণিত কয়েকটি চরিত্র সম্বন্ধেও আমার কাছে বহু প্রশ্নবাণ এসেছিল। তাই সবিনয়ে বলে রাখতে চাই—এ নামটি কল্পিত, বাস্তবে যাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁকে যাতে সনাক্ত করা না যায় তাই তাঁর নাম-রূপে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটিয়েছি।

† Ajanta & Ellora—By Gupta & Mahajan, Taraporevala, Bombay.

§ Indian Architecture (Buddhist & Hindu Period)—By Percy Brown, Taraporevala Publication, 2nd Enlarged Edition, Page 28.

উনি খবর পাঠালেন। ভদ্রলোকের আসতে যেটুকু দেরী হল তার মাঝে আমাকে সাবধান করে দিলেন—গুণীলোক, বুঝেছেন, কিন্তু ভারী খামখেয়ালী। জাতকের কাহিনীগুলি ওঁর কণ্ঠস্থ—চোখ বুজে প্রতিটি চিত্রের অবস্থান বলে যেতে পারেন।

তারপর টিকিটবাবুর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে একটু ঝুঁকে পড়েন আমার দিকে। অনুচ্চস্বরে বলেন—আর একটা গোপন কথা! এই গুহা-চিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ একটি সুন্দরীকে নাকি উনি ভালবাসতেন, আর তাই এখান থেকে অন্য কোথাও গিয়ে বেশি-দিন টিকতে পারেন না। দারোয়ানদের অনেকেই বলেছে—যাত্রী না থাকলে উনি সেই নারী-চিত্রটির সামনে নাকি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

প্রচণ্ড কৌতূহল হল, বলি—কোন্ চিত্রটি বলুন তো?

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব শুনবার আগেই দ্বারপ্রান্তে পদধ্বনি শুনতে পেলুম। এসে উপস্থিত হলেন ভদ্রলোক। মহম্মদ মীর্জা ইস্‌মাইল। শীর্ণকায় বৃদ্ধ, মাথায় একমাথা সাদা চুল—গোঁফ-দাড়ি কামানো। গায়ে গলাবন্ধ কোট, মাফলার, পরিধানে পায়জামা। বিশুদ্ধ ইংরেজি বলতে পারেন। আমি অজন্তার বিষয়ে গ্রন্থ-প্রকাশে ইচ্ছুক শুনে সাগ্রহে আমাকে নিয়ে বার হলেন।

অদ্ভুত গুণীলোক। জাতক-কাহিনীগুলি তাঁর কণ্ঠস্থ, এমন দরদ দিয়ে চিত্রগুলির মর্মকথা বর্ণনা করতে থাকেন যে, মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। কিন্তু নবম গুহা পর্যন্ত এসে লক্ষ্য করলুম, ভদ্রলোকের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ক্রমাগত কাশছেন। প্রশ্ন করে জানি, গতরাত্রি থেকে তাঁর সর্দিকাশি হয়েছে। বলি, আমি এখানে দু-একদিন থাকব, কাল না হয় বাকিটা দেখা যাবে।

ভদ্রলোককে তাঁর পারিশ্রমিক দেবার উদ্যোগ করতেই তিনি এক-পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন—মাপ করবেন। আপনার কাছে কিছু নিতে পারব না।

আমি অবাক্ হয়ে বলি—সে কি, কেন?

—ডাক্তারে কি ডাক্তারের কাছে ফি নেয়?

—তার মানে?

—আপনি অজন্তা দেখতে আসেননি, দেখাতে এসেছেন। আপনি টুরিস্ট নন, আপনি গাইড। আমি ও আপনি স্বগোত্র।

অনেক পীড়াপীড়ি করেও যখন কিছু হল না তখন বলি—তাহলে এক কাজ করুন। আপনি বিদেশী যাত্রী যোগাড় করুন। আমি যখন গাইড তখন আপনার সাকরেদি করব। আপনাকে কথা বলতে হবে না—শুধু সঙ্গে থাকবেন। আমি কোথাও কিছু ভুল বললে শুধরে দেবেন শুধু।

—তাতে কার কি লাভ?

—আপনার লাভ আর্থিক, আর আমার লাভ এভাবে ভুল-ত্রুটিগুলি শুধরে নেব। বারে বারে দেখে ও বলে ছবিগুলি মনে গাঁথা হয়ে যাবে।

রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত। ইস্‌মাইল সাহেবের সাকরেদি করে আমিও কম লাভবান হইনি।

যাক সে কথা। যে কথা বলছিলাম। ষোড়শ গুহা-মন্দিরের প্রবেশপথে এই যুগল নতজানু হস্তিমূর্তি দেখিয়ে উনি বলেন,—হিউ এন-ৎসাঙ কখনও অজন্তায় আসেননি ; কিন্তু বৌদ্ধ শ্রমণদের মুখে শুনে তিনি দাক্ষিণাত্যের একসারি অপূর্ব গুহা-মন্দিরের উল্লেখ করেছেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। বলেছেন, দেব-নর-নাগ-গন্ধর্বেরা তো বটেই, এমনকি ঐরাবততুল্য যুগলহস্তী নতজানু হয়ে সেখানে তথাগত বুদ্ধদেবকে শাশ্বতকাল ধরে প্রণাম করছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষোড়শ গুহা-বিহার

ষোড়শ গুহা-বিহারের প্ল্যান ও শিল্প-নিদর্শনগুলির অবস্থান চিত্র—৩৮-এ দেওয়া গেল। প্রথমেই একটি প্রশস্ত অলিন্দ, ২০ মি দীর্ঘ ৩·৩ মি প্রস্থ। সম্মুখে ছটি আট-কোণা স্তম্ভ এবং দুটি অর্ধস্তম্ভ। অলিন্দের বামপ্রান্তে পাহাড়ের গায়ে শিলালিপি থেকে জানতে পারি, বাকাতক রাজবংশের রাজা হরিষেণের আমলে (৪৭৫-৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) এই বিহারটি নির্মিত হয়।

অলিন্দের পর মূল বিহারের প্রায়-চতুষ্কোণ হল্-কামরা। ২০·২ মি × ১৯·৯ মি। অলিন্দ পার হয়ে উপরে তাকালেই নজরে পড়বে ক্ষুদ্রকায় বামনের দল বীম বা কড়িগুলিকে পিঠ দিয়ে ধরে রেখেছে। উপরের চাপে যেন তাদের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে (১৬।১)।

গুহাটির পূর্ব-প্রাচীরে বুদ্ধদেবের জীবনের আদিপর্বের ঘটনাগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজানো নয়। চিত্রের অবস্থান অনুযায়ী বর্ণনা না করে বরং বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাচক্র অনুসারে তা বর্ণনা করা যাক। চিত্র—৩৮-এ লিখিত নির্দেশ অনুসারে পাঠকের পক্ষে চিত্র-গুলি সনাক্তকরণ কঠিন হবে না।

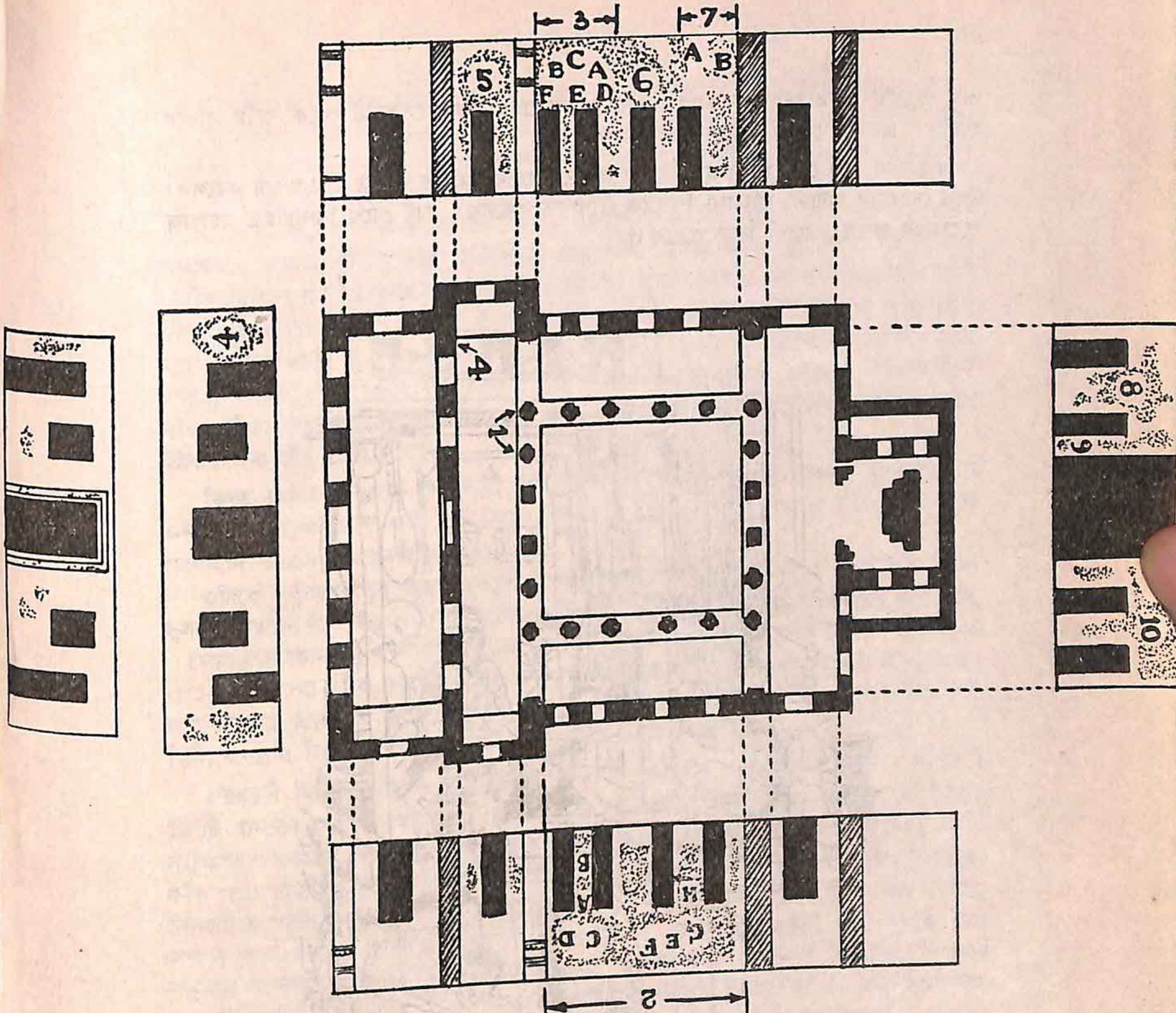
গৌতমবুদ্ধের জন্ম-সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন, তিনি খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৫৬৩-তে জন্মগ্রহণ করেন, কেউ বলেন আরও তিন বছর আগে, অর্থাৎ খৃীঃ পূঃ ৫৬৬-তে। নেপালী শাস্ত্রকারদের মতে, আরও পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে অর্থাৎ ৬২৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। শাক্য সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণের পূর্বে তিনি বিভিন্ন রূপ নিয়ে নানাজন্মে নানান্ রকম লীলাখেলা করে যান। কখনও রাজপুত্র হয়ে, কখনও নাগ, বানর, ষড়দন্ত হস্তীর রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের বুদ্ধরূপে চিহ্নিত করা হয় না—তাঁরা সবাই বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধদেবের অংশ-অবতার।

বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, শুদ্ধোদন-পুত্র সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণের পূর্বেও ছয়জন (কারও মতে, চুয়াত্তর জন) বুদ্ধ—বোধিসত্ত্ব নন—পূর্ণ বুদ্ধরূপেই এ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেকের মতে, এঁদের সংখ্যা বস্তুতঃ চব্বিশ জন। ললিত-বিস্তার ও মহাবাস্তুমতে, গৌতম বুদ্ধ-দীপঙ্করের অধীনে বুদ্ধত্বলাভ করতে মনস্থ করেন। বহু জন্মচক্রপথ অতিক্রম করে অবশেষে তিনি তুষিত-স্বর্গে এসে শেষবারের মতো দেহধারণের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন।

গৌতমবুদ্ধের জীবনালেখ্য

তুষিত-স্বর্গে বসে তিনি চিন্তা করতে থাকেন অতঃপর কোন্ ভূ-ভাগে তিনি অবতীর্ণ হবেন। বুদ্ধদেবের জীবনীর এই অংশটুকু অবলম্বন করে অঙ্কিত কতকগুলি প্রাচীন-চিত্র আমরা দ্বিতীয় বিহারে ইতিপূর্বেই দেখেছি (চিত্র—২।২-ক-চ)। এখানে, এই ষোড়শ বিহারে প্রথম চিত্রটিতে (চিত্র—৩৯) দেখছি, সদ্যোজাত সিদ্ধার্থকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে মহর্ষি অসিত তাঁকে নিরীক্ষণ করছেন। ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, জাতক সংসারে আবদ্ধ থাকলে হবেন ত্রিভুবনজয়ী রাজচক্রবর্তী, আর যদি কোনদিন মুণ্ডিত হয় তাঁর মস্তক, অঙ্গে ওঠে পীত অজীন, তাহ'লে তিনি হবেন জগৎত্রাতা যুগাবতার। শ্মশ্রু-সমন্বিত অসিতের মূর্তিটি অনবদ্য। তাঁর সে মুখে আনন্দ ও বিষাদের অপূর্ব সংমিশ্রণ। কিন্তু বিষাদ কেন? তার জবাব পাচ্ছি ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সংকলিত বুদ্ধদেবের জীবনীতে। ঘোষ-মশাই লিখেছেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করার পর মহর্ষি অসিতের শীর্ণ গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। বিস্মিত মহারাজ শুদ্ধোদন প্রশ্ন করেন—মহর্ষি আপনি রোদন করছেন কেন?

উত্তরে মহর্ষি বলেছিলেন, মহারাজ, এই সদ্যোজাত শিশু যখন পরম সত্যের সন্ধান পাবেন,

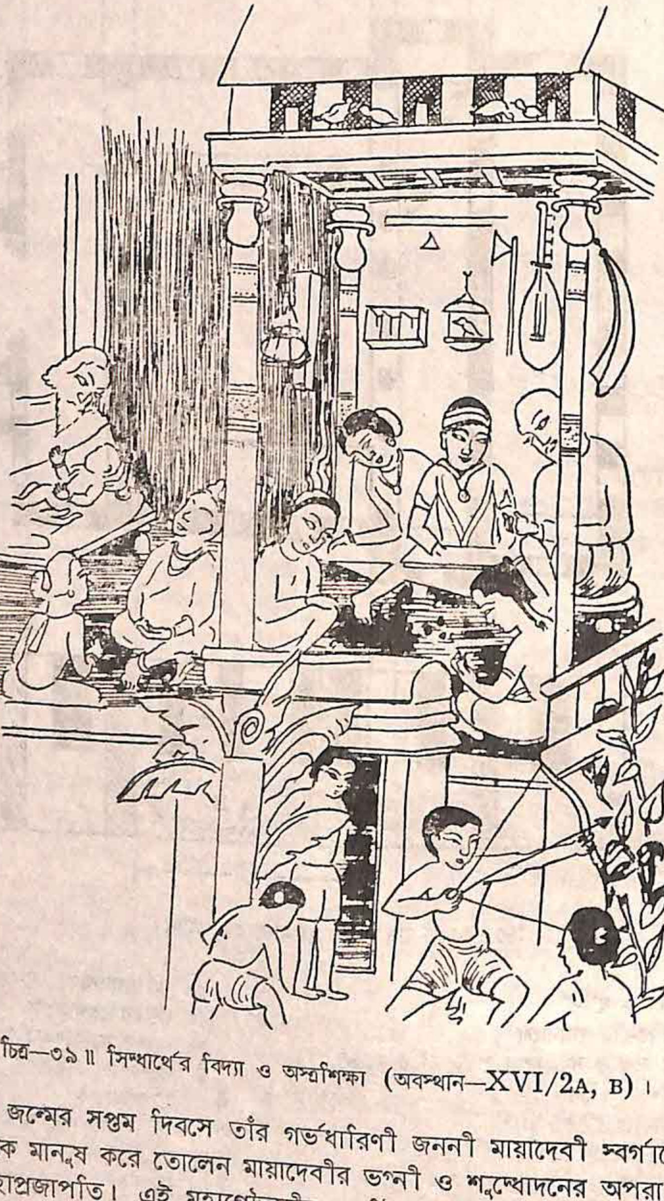


চিত্র—৩৮ ॥ ষোড়শ গুহা-মন্দিরের প্ল্যান।

1 স্তম্ভশীর্ষে বামন মূর্তি
2 বুদ্ধদেবের জীবনীর প্রথমাংশ
A মহর্ষি অসিত কর্তৃক নবজাতক দর্শন (চিত্র—৩৯)
B চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা (চিত্র—৩৯)
C শুদ্ধোদনের সমস্যা (চিত্র—৪০)
D গৃহত্যাগ (চিত্র—৪০)
E উরুবিল্বে উপনীত
F সুজাতার পায়সান্ন রন্ধন
G ত্রপুষ্য ও ভল্লিক
H বিম্বিসারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান
3 নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ
A কালোদায়ীর ঘোষণা
B ন্যগ্রোধারামে বুদ্ধদেব
C কপিলাবস্তুতে বুদ্ধদেব
D নন্দের কেশকর্তন
E নন্দের মনোবেদনা
F মরণাহতা রাজকন্যা, (চিত্র—৪১)
4 হস্তিজাতক
5 চিত্র সনাক্ত করা যায় নি
6 কতিপয় মানুষীবুদ্ধ
7 A মৃগনয়ন
B মীননয়না
8 বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচার
9 অজাতশত্রুর বুদ্ধদর্শনে আগমন
10 বুদ্ধদেবের আলেখ্য

তার পূর্বেই আমি দেহরক্ষা করব। এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি। এজন্যই রোদন করছি শাক্য-অধিপতি।

এই কথা বলে সেই সদ্যোজাত শিশুর সম্মুখে মহর্ষি অসিত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। তখন দেবলাদি অন্যান্য ঋষিরাও শিশুকে প্রণিপাত করলেন। তাই দেখে বিস্ময়াহত মহারাজ শুদ্ধোদন প্রণাম করলেন নিজ পুত্রকে।*



চিত্র—৩৯ ॥ সিদ্ধার্থের বিদ্যা ও অস্ত্রশিক্ষা (অবস্থান—XVI/2A, B)।

সিদ্ধার্থের জন্মের সপ্তম দিবসে তাঁর গর্ভধারিণী জননী মায়াদেবী স্বর্গারোহণ করেন। শিশু সিদ্ধার্থকে মানুষ করে তোলেন মায়াদেবীর ভগ্নী ও শুদ্ধোদনের অপরা মহিষী মহাগৌতমী বা মহাপ্রজাপতি। এই মহাগৌতমীর একটি পুত্র ছিল। তার নাম নন্দ। সিদ্ধার্থ অন্যান্য রাজপুত্রদের সঙ্গে একত্রে বড় হয়ে ওঠেন। যথাসময়ে তাঁদের হাতেখড়ি ও চূড়াকরণ হ'ল। শিক্ষাগুরু আচার্য বিশ্বামিত্রের চতুষ্পাঠীতে তাঁদের বিদ্যাভ্যাসের চিত্রটিতে (চিত্র—৩৯)

* বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, মহারাজ শুদ্ধোদন চারবার স্বীয় পুত্র গৌতমকে প্রণাম করেছিলেন। চারটি ঘটনাই কৌতুকাবহ। সময়মতো তা বলা যাবে। এটি-ই প্রথমবার।

এবার আমরা মনোনিবেশ করতে পারি। দেখছি শিশু সিদ্ধার্থের এ-পাশে মস্যাধার, হাতে লেখনী, সম্মুখে ভূর্জপত্র—ও-পাশে আরও কয়েকজন সহাধ্যায়ী। তাঁরা সকলেই শাক্য রাজ-পরিবারের শিশু—রাজপুত্র ; মহাগৌতমীপুত্র নন্দ, আনন্দ, মহানাম, দেবদত্ত এবং অনুরুদ্ধ। পাঠশালার চার-চালা ঘরটি যেন বাংলা দেশের চার-চালা! শিল্পী এ চিত্রে আরও দুটি জিনিস এঁকেছেন, যা খুঁটিয়ে দেখার অপেক্ষা রাখে। একটি পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী ও একটি বীণাযন্ত্র। পাঠশালার ঘরোয়া পরিবেশে এ দুটি খুবই প্রাসঙ্গিক ; কিন্তু মনে হয়, শিল্পী এ দুটিকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যেই এঁকেছেন। পাঠশালার এ আবেষ্টনীতে মুক্তিকামী সিদ্ধার্থের অবস্থা কি পিঞ্জরাবদ্ধ ঐ পক্ষিশাবকের মতো নয়? মহাজ্ঞানের মুক্ত নীলাকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো ভেসে বেড়াবার জন্য যাঁর জন্ম, পাঠশালার এ পিঞ্জরে ব্যাকরণ আর নানান্ পাঠ্যসূচির শৃঙ্খলে কি তাঁকে বেঁধে রাখেননি গুরুমশাই? আর ঐ বীণাযন্ত্রটি? নীরব বীণাযন্ত্রের তন্ত্রীর মতো ঐ শিশুর অন্তর মহাবীণকারের অঙ্গুলিস্পর্শে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবার জন্য যেন প্রহর গুণ্ছে।

কিন্তু রাজার ছেলেকে তো শুধু বিদ্যাভ্যাস করলেই চলবে না—তাকে শিখতে হবে অশ্বারোহণ, যুদ্ধবিদ্যা। তাই ঠিক নিচের চিত্রটিতেই দেখছি শিশু সিদ্ধার্থ তীর-ধনুক দিয়ে শরসন্ধান অভ্যাস করছেন (চিত্র—৩৯)।

ওদিকে কপিলাবস্তুর রাজান্তঃপুরে কিন্তু রাজার মনে শান্তি নেই। কিছুতেই তিনি ভুলতে পারছেন না সভাপণ্ডিত ও মহর্ষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী। প্রতিজ্ঞা করছেন মনে মনে, এ ছেলে যেন কোনদিন পীতবসনধারী না হয়, ওর ঐ কুঞ্চিত কেশদাম যেন কোনদিন মস্তকচ্যুত না হয়, এ ব্যবস্থা তাঁকে করতেই হবে। সিদ্ধার্থ রাজপুত্রদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ। সেই যুবরাজ। রাজ্যশাসনের ভার তার উপযুক্ত হস্তে সমর্পণ করতে পারলে তবেই তাঁর মুক্তি। তাহ'লেই তিনি বানপ্রস্থ নিয়ে পরমপ্রাপ্তির শেষ লক্ষ্যে যাত্রা করতে পারবেন।

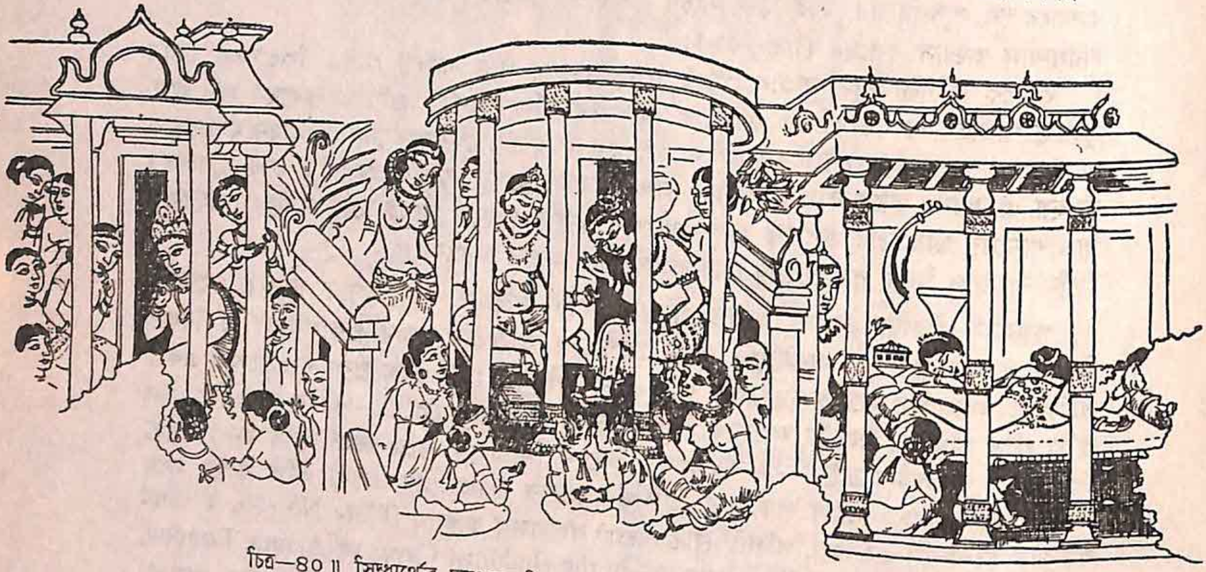
পরবর্তী চিত্রটির প্রসঙ্গে আসার পূর্বে একটি ব্যক্তিগত কথা বলতে হচ্ছে। পরবর্তী চিত্রটি বাস্তবে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত ; আমি 'অপরূপা অজন্তা'র প্রথম প্রকাশকালে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম, কোন ছবি এঁকে দিইনি। সেই প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের একটি কপি পড়ে আমাদের জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার আমাকে লেখেন—'এটির রেখা চিত্র এবং বিস্তারিত আলোচনা চাই।' বলাবাহুল্য এ আদেশ শিরোধার্য করে আজ আমি ধন্য। বহু সন্ধান করে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত গ্রিফিথ-সাহেবের এ্যালবামের একটি কপি সংগ্রহ করে বর্তমান সংস্করণে এই অনুলিপিটি (চিত্র—৪০) সংযোজন করলাম (Plate No. 46, 47 and 48 of Griffith's Album, 'The Painting in the Buddhist Caves of Ajanta, London, 1896)। জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার এটিকে কেন অতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, আসুন, এবার সেটা দেখি :

চিত্রে তিনটি খণ্ড-দৃশ্য। সর্ববামে একটি মণ্ডপে রাজা শুদ্ধোদন এবং মহাগৌতমী মন্ত্রণা করছেন—কী-ভাবে যুবরাজ সিদ্ধার্থকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখা যায়। রাজা-রানীকে ঘিরে আছে একদল নরনারী, কিন্তু লক্ষণীয় কেউই দু-পাশের দুটি স্তম্ভের অন্তর্বর্তী অংশে প্রবেশ করেনি ; অর্থাৎ রাজা-রানীর নিভৃত আলাপে বিঘ্ন সঞ্চার করেনি। তারপর মাঝের মণ্ডপে পুনরায় একজন পুরুষ ও রমণী দাম্পত্য-আলাপনরত। বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলছেন,—এ চিত্র সিদ্ধার্থ ও যশোধরার দাম্পত্য-জীবনের এক খণ্ডচিত্র। তার অর্থ—হয়তো এইটিই ওঁদের দাম্পত্যজীবনের একমাত্র চিত্র যা অজন্তায় আঁকা হয়েছিল, অন্তত অজন্তায় আবিষ্কৃত হয়েছিল। আর তাই তার দাম।

মা যশোধরার বহু আলেখ্য বহুস্থানে দেখেছি—কিন্তু কী আশ্চর্য, যতদূর মনে পড়ছে, সেই মন্দভাগিনীর আলেখ্য দেখেছি মাত্র দুটি পরিবেশে। হয় তিনি নিদ্রাভিভূতা—বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ-রজনীতে, নয় তিনি রাহুলকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই মহাভিক্ষুর সম্মুখে।

সহস্রাব্দীকাল ধরে অজন্তার শিল্পীরা—আর শুধু অজন্তা-শিল্পীকে দোষ দিয়ে কী হবে—সমগ্র বৌদ্ধ জগতের শিল্পীদল মন্দভাগিনী যশোধরাকে যেন অন্য কোন পরিবেশে কল্পনাই করতে পারেননি। সেই নিষ্ঠুর আষাঢ়ী-পূর্ণিমারাত্রির কালঘুমই যেন তাঁর জীবনের একমাত্র সত্য—অথবা সেই মহাকারুণিকের কাছে প্রত্যাখ্যাতা হওয়াই তাঁর একমাত্র নিয়তি। যেন এ দুটি ঘটনা ছাড়া অন্য কোন ঘটনা ঘটেনি তাঁর জীবনে—দীর্ঘ ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্য-জীবনে তিনি হাসেননি, কাঁদেননি, ভালবাসেননি, বাহুবন্ধে বন্দী করেননি পুরুষোত্তম শাক্যসিংহকে!

কিন্তু বৌদ্ধশিল্পীদেরই বা দোষ দিয়ে কী লাভ? মহাপুরুষদের জীবনসঙ্গিনীদের এই বুঝি অনিবার্য নিয়তি। বাল্মীকিও ভুলেছেন, বিরহিণী ঊর্মিলার মনোবেদনার কথা লিপিবদ্ধ করতে, বাণভট্টের পত্রলেখাও হয়েছিল কাব্যে উপেক্ষিতা। বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্মবেদনা নিয়ে কতটুকু রচিত হয়েছে চৈতন্য-সাহিত্যে? গুরুনানকের ধর্মপত্নী, তাঁর দুই সন্তানের জননী সুলক্ষণী অথবা গুরু গোবিন্দের তিন পত্নী—জিতো, সুন্দরী, কিম্বা সহিবদেবীর ত্যাগের কথা কতটা বলতে পেরেছেন শিখধর্মের প্রবক্তারা? সন্ত তুলসীদাসজীর নাম এই হিন্দু-ভারতের প্রতিটি প্রত্যন্তদেশে নিত্য উচ্চারিত, কিন্তু কতজন জানে তাঁর সহধর্মিণী তারক-জননী রত্নাবলীর দুঃখের কথা?



চিত্র—৪০ ॥ সিদ্ধার্থের দাম্পত্যজীবন ও গৃহত্যাগ (অবস্থান—XVI/2c)।

অথচ খোঁজ নিলে দেখবেন, এঁরা কেউই স্বামীর সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াননি, স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধন স্বীকার করে সানন্দে স্বামীকে মৃত্যুঞ্জয়ী হ'তে সাহায্য করেছেন। যশোধরা সেই সীমন্তিনীদের মধ্যে সর্বাগ্যগণ্যা—তিনিও কাব্যে উপেক্ষিতা। সমগ্র এশিয়া-খণ্ডে অযুত-নিযুত বৌদ্ধ শিল্পসম্ভারের মধ্যে আমি তো তাঁর দাম্পত্য-জীবনের দুটি মাত্র নিদর্শন খুঁজে পেয়েছি। প্রথমটি বরবুদরের* একটি ফ্রিজ-এ ; দ্বিতীয়টি অজন্তার এই গুহা চিত্রে। অজন্তায় অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়—অজন্তার জীবন-শিল্পীরা সিদ্ধার্থের বিবাহের কোন চিত্র আঁকেননি ; অথবা কে বলতে পারে, হয়তো এঁকেছিলেন, যা মহাকালের নির্দেশে আজ অবলুপ্ত।

* প্রসঙ্গত বলি : ললিতবিস্তারের কবি একটি অনুচ্ছেদে যুবরাজ সিদ্ধার্থ এবং যশোধরার প্রাক্-বিবাহ অনুরাগের একটি অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। যুবরাজ তাঁর ভাবীপত্নীর সঙ্গে নিভৃতে সামান্যক্ষণ আলাপ করেন এবং সেই সাক্ষাতকালে যুবরাজ যশোধরাকে একটি অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় প্রণয়োপহার দেন। বরবুদর (জাভা দ্বীপে) মন্দির গাত্রে এই বিষয়বস্তু নিয়ে অষ্টম শতাব্দীতে সৃষ্ট একটি সুন্দর ভাস্কর্য আছে। H. Zimmer কৃত The Art of Indian Asia গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 482.b. নং প্লেটে তার আলোকচিত্র দেখতে পাবেন।

(চিত্র—৪০, মধ্যাংশ) দেখ্‌ছি যুবরাজ তাঁর বাম হাতখানি বাড়িয়ে যশোধরার চম্পক-অঙ্গুলি গ্রহণ করছেন। লক্ষণীয় তাঁর পদতলে একটি রত্নমঞ্জুষা। তিনি কি তাঁর ভাবী পত্নীকে অঙ্গুরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন?

চিত্র—৪০-এর দক্ষিণপ্রান্তে যে খণ্ডচিত্র ছিল তার সনাক্তকরণ বিষয়ে মতবিরোধ আছে। কে কী বলেছেন তাই আগে লিপিবন্ধ করি; তারপর আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে আসব।

গোলাম ইয়াজদানী বলছেন, "বার্জেস্‌ এবং ভাউ দাজীর মতে এই খণ্ডচিত্রটি মহানিষ্ক্রমণের। পালঙ্কে শায়িতা রমণীমূর্তি যশোধরার। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে এখানে বুদ্ধদেবের মূর্তি আঁকা হল না কেন? পূর্ববর্তী প্যানেলেও বুদ্ধদেব অনুপস্থিত। ফাউচার পূর্বোক্ত খণ্ডচিত্রটি (চিত্র—৪০, দক্ষিণপ্রান্তস্থ) মায়াদেবীর গর্ভসঞ্চারের চিত্র বলে ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ পালঙ্কে শায়িতা নারীমূর্তিটি মায়াদেবীর এবং দ্বিতীয় চিত্রটি (অর্থাৎ চিত্র—৪০, মধ্যমাংশ) সে-ক্ষেত্রে রাজা শুদ্ধোদনের সভায় স্বপ্ন-মঙ্গলের বিচার বলে ধরে নিতে হবে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধদেবের অনুপস্থিতি-জনিত কারণে ফাউচারের যুক্তিই মেনে নেওয়া উচিত।"

আমি এখানে ইয়াজদানী তথা ফাউচারের সঙ্গে আদৌ একমত হতে পারছি না। আমার মতে তাঁদের পূর্বসূরী বার্জেস্‌ এবং ভাউ দাজীই ঠিকমত সনাক্তকরণ করতে পেরেছিলেন। আমার সিদ্ধান্ত নিম্নোক্ত যুক্তিনির্ভর:

(i) প্রথমতঃ সর্ববামের দম্পতিকে রাজা শুদ্ধোদন ও মহাগৌতমী বলে সকলেই মেনে নিয়েছেন; ফলে ঠিক তার পরের প্যানেলেই পুনরায় কেন একই দৃশ্য আঁকবেন শিল্পী?

(ii) মাঝের প্যানেলে দেখছি নায়ক নায়িকার করাঙ্গুলি গ্রহণ করছেন, ওঁদের ভঙ্গিগমা অনুরাগঘন—প্রৌঢ় রাজা শুদ্ধোদন ও মহাগৌতমীকে ঐ জাতীয় প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে কল্পনা করতে বাধছে।

(iii) বামের প্যানেলে বুদ্ধমূর্তির অনুপস্থিতিই তো স্বাভাবিক; কারণ বার্জেসের মতে—ঐ চিত্রে রাজারানী বুদ্ধদেবের অনুপস্থিতিতে পরামর্শ করছেন, কী-ভাবে যুবরাজকে সংসারে আবদ্ধ রাখা যায়।

(iv) আমি বুঝতে পারিনি—কেন ইয়াজদানী বলেছেন শেষ প্যানেলে বুদ্ধমূর্তি অনুপস্থিত! তাঁরই নিজেরই ফটো এ্যালবামে (প্লেট LXI, তৃতীয় খণ্ড) বুদ্ধদেবকে তো দেখা যাচ্ছে! বার্জেস্‌-এর এ্যালবামে, যেটি আরও ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে আঁকা—বুদ্ধদেবকে অতি সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়।

(v) আমার সবচেয়ে বড় যুক্তি এ-চিত্রে আলোকসম্পাতের চাতুর্য এবং কয়েকটি খুঁটিনাটি দ্রব্য। শিল্পী দেওয়ালে-প্রলম্বিত একটি একতারা এঁকেছেন। একতারা রাজপ্রাসাদে প্রাসঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র নয়, বরং উদাসীন ভ্রাম্যমান ভিক্ষুকের দ্যোতক। এ-ছাড়া দেখছি একটি ধূপদানী—ধূপ আত্মত্যাগের প্রতীক, সে নিজেকে দগ্ধ করে অপরকে সুগন্ধ বিলায়। তৃতীয়তঃ পালঙ্কের নিচে দেখছি একটি নির্বাপিত দীপাধার। সম্ভবতঃ সেটি মন্দভাগিনী যশোধরার ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী বিবাহিত জীবনের অবসান ঘোষণা করছে। মহানিষ্ক্রমণ দৃশ্য বলেই চিত্রটি তমসাচ্ছন্ন; মহা-আবির্ভাব-দৃশ্য স্বতই আলোকোজ্জ্বল দেখতে অভ্যস্ত আমরা।

কপিলাবস্তুতে সে-যুগে মহা-আড়ম্বরে হলকর্ষণ উৎসব হ'ত। পরবর্তী চিত্রে দেখছি, তরুণ সিদ্ধার্থকে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে। উৎসব-মগ্ন নরনারীর মিছিল, তার মাঝখানে কুব্জপৃষ্ঠ বলিবর্দদলের ক্লেশের কথা চিন্তা করে দেখছি বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন রাজপুত্র। প্রসঙ্গতঃ বলি, এখানে একটি আলৌকিক ঘটনায় অভিভূত হয়ে মহারাজ শুদ্ধোদন দ্বিতীয়বার প্রণাম করেন গৌতমকে। মহারাজ লক্ষ্য করেন, উৎসবের আসর থেকে সরে গিয়ে বালক সিদ্ধার্থ একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন, আরও বিস্ময়ের কথা, সমস্ত

দিনে বৃক্ষের ছায়া একটুও সরলো না। ধ্যানস্তিমিত গৌতমকে আতপতাপ থেকে রক্ষা করতে বৃক্ষ তার ছায়াকে সমস্ত দিন অপসারিত হ'তে দিল না। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বিস্ময়াবিষ্ট শুদ্ধোদন পুত্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন, জীবনে দ্বিতীয়বার।

বুদ্ধদেবের জীবনীতে এর পরের ঘটনা হচ্ছে, নগর-ভ্রমণে বেরিয়ে ব্যাধি-জরা-মৃত্যু ও সন্ন্যাসী দর্শন। তখনই তিনি উপলব্ধি করলেন, সন্ন্যাসের পথেই শান্তি পাওয়া সম্ভব। তিনি মনস্থির করেন, অচিরেই সন্ন্যাসগ্রহণ করতে হবে তাঁকে।

আকৈশোর জাগতিক দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণের কথা ভাবছেন তিনি—এখন তিনি ঊনত্রিংশ বর্ষের পূর্ণ যুবাপুরুষ। যৌবনের সেই অত্যুচ্চ শিখরচূড়ার রাজভোগ থেকে অবরোহণ করে সন্ন্যাস নেবেন স্থির করলেন। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে সংবাদ পেলেন রাজবধূ যশোধরা একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। প্রাসাদে সেদিন আনন্দের প্লাবন। রাজপুত্রকে দলে দলে পুরবাসীরা অভিনন্দন জানাতে থাকে ; কিন্তু সিদ্ধার্থের মনে তখন অন্য চিন্তা। তিনি ভাবছেন, পুত্র হয়েছে তাঁর, সংসারের বন্ধন বাড়ছে। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। স্থির করলেন, সেই রাত্রেই গোপনে গৃহত্যাগ করবেন।

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পুণ্য তিথি সেটি। গভীর রাত্রে নিজ শয়নকক্ষ থেকে বার হয়ে এলেন তরুণ সিদ্ধার্থ। দেখেন উৎসব-ক্লান্ত নর্তকীর দল যে যেখানে স্থান পেয়েছে—নিদ্রামগ্ন। মহারাজের মহলে নেমে এসেছে সুপ্তির অন্ধকার। ঘন মেঘজালে পূর্ণচন্দ্র অবলুপ্ত। ধীরপদে সিদ্ধার্থ এগিয়ে এলেন যশোধারার সূতিকাগৃহে। পুত্র রাহুলকে একবার চোখের দেখা দেখে যাবেন। দ্বারী নিদ্রাভিভূত—গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন সিদ্ধার্থ। দেখলেন—যুঁই আর পদ্মফুলে আকীর্ণ পালঙ্কে ক্লান্তিতে নিদ্রামগ্ন যশোধরাকে। ঘরে জ্বলছে নির্বাণোন্মুখ একটি রত্নদীপ। তারই ক্ষীণ আলোয় দেখলেন, যশোধরা পদ্মকোরকতুল্য একটি হাত রেখেছেন সদ্যোজাত শিশুর মস্তকে। পুত্রকে কোলে তুলে নেওয়ার দুরন্ত প্রলোভনকে দমন করলেন সিদ্ধার্থ—তাতে নিদ্রাভঙ্গ হ'তে পারে রাজবধূর। নিঃশব্দচরণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রাজপুত্র। আকাশে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে একবার।

এই অনবদ্য বিষয়-বস্তুটিকে উপেক্ষা করেননি শিল্পী। সে কথা আগেই বলেছি (চিত্র—৪০)।

পরবর্তী প্রাচীর-চিত্রের বিষয়বস্তু উরুবিল্ব গ্রামে। কিন্তু অন্তর্বর্তী কালের ইতিহাসটুকু আলোচনা করে নিয়ে সে দৃশ্যে উপনীত হব আমরা।

সেই নিষ্ঠুর আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সদ্যোজাত শিশুপুত্র ও তার মন্দভাগিনী জননীকে ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে। পদব্রজে নয়—সারথী চন্ন তাঁকে তাঁর প্রিয় রথে করেই পৌঁছে দিল রাজ্যসীমান্তে। আমন নদীর তীরে এসে তিনি রথ থামাতে বললেন। বিশ্বস্ত অনুচর সারথী চন্ন এতক্ষণ কোন প্রশ্ন করেনি, এখনও কোন প্রশ্ন করলো না। গতিবেগ সম্বরণ করলো রথের। নেমে এলেন রাজপুত্র—চন্নকে কাছে ডেকে এনে বললেন তাঁর মনোবাসনার কথা। এইখানে, এই মুহূর্তে, নগরপ্রান্তে এই বিজন বনে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। স্তম্ভিত হয়ে গেল চন্ন। একে একে রাজ-পরিচ্ছদ খুলে ফেললেন সিদ্ধার্থ ; মণিময় মুকুট, কণ্ঠহার, মণিবলয়, কেয়ূর। তুলে দিলেন চন্নের হাতে। তরবারি নিষ্কাশিত করে স্বহস্তে কর্তিত করলেন রাজপুত্রের দীর্ঘ ঘনকুঞ্চিত কেশদাম। পীতবসনে আবৃত করলেন দেবদুর্লভ কান্তি।

চোখের জলে ভেসে গেল চন্ন, বললে—ভগবন, কাল প্রাতে মহারাজ যখন বলবেন, কেন তুমি তাকে যেতে দিলে?

সিদ্ধার্থ বললেন—বলবে, তুমি আজ্ঞাবহমাত্র, তোমাকে আমি আদেশ করেছিলাম এই বিজন অরণ্যে আমাকে পরিত্যাগ করে নগরে প্রত্যাবর্তন করতে।

দুটি হাত জোড় করে চন্ন বলে—আর কি কোনদিন দেখা হবে না প্রভু?

সিদ্ধার্থ বললেন—তোমার সঙ্গে হবে চন্ন, কণ্ঠকের সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ।

কণ্ঠক রাজপুত্রের প্রিয় অশ্ব। আবাল্যের সহচর। রাজপুত্রের এ কথা শুনে কণ্ঠক আর স্থির থাকতে পারল না, সেখানেই শয্যা নিল এবং প্রভুর বিরহে দুঃখে মনোভঙ্গে তখনই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলো।

একাকী প্রত্যাবর্তন করলো চন্ন সরোদনে। একলা চলার দুর্গম পথে যাত্রা করলেন তরুণ পথিক! আষাঢ়ী পূর্ণিমার সে বিচিত্র রাত্রে সে দুর্গম পথে কখনও আলো, কখনও অন্ধকার।

ওদিকে রাজপ্রাসাদে মণিময় পালঙ্কে নিদ্রাভিভূতা যশোধরা একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখছেন। পুত্রজন্মের পর তখনও রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। যশোধরা স্বপ্ন দেখছেন, রাত্রি প্রভাতে যুবরাজ পুত্রদর্শনে এসেছেন সেই সূতিকাগৃহে। বৈতালিকের দল যুবরাজের বন্দনা-গান ধরেছে। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন সেই দেবদুর্লভকান্তি যুবাপুরুষ, সবিস্ময়ে দুটি পদ্মপলাশলোচন বিস্ফারিত করে দেখছেন অতি-ক্ষুদ্র একটি মানব-শিশুকে। এ শিশু যশোধরার, এ শিশু সিদ্ধার্থের। এই আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সার্থক হয়েছে যশোধরার জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা, মহাজনকজায়া সীবলীর তপস্যা।

সহসা বজ্রপাত হ'ল কোথাও অদূরে। স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল যশোধরার। সচকিতে দেখেন নির্বাপিত হয়েছে কখন রত্নদীপ। আষাঢ়-রাত্রির ঘনান্ধকারে ঢেকে গেছে সূতিকাগৃহ।

কপিলাবস্তু থেকে সত্যসন্ধানী ক্রমে এসে উপস্থিত হলেন মগধে—রাজগৃহে। এখানে সন্ন্যাসী আড়ার কালাম-এর আশ্রমে গেলেন প্রথমে। কালাম সিদ্ধার্থকে ধ্যান ও তপস্যার পাঠ দিলেন ; কিন্তু সিদ্ধার্থ তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে তৃপ্ত হ'তে পারলেন না। রাজগৃহের অপর একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী উদ্দক (রুদ্রক) রামপুত্তের কাছেও তিনি সত্যের সন্ধানে গিয়ে-ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধার্থ অনুধাবন করলেন, প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য তাঁকে একক সাধনায় ব্রতী হ'তে হবে। রাজগৃহ ত্যাগ করে তিনি চললেন দক্ষিণাভিমুখে। রুদ্রক ও কালাম-এর অযুত শিষ্যদলের ভিতর পাঁচজন এই তরুণ তাপসের সত্যানুসন্ধানের নিষ্ঠা দেখে তাঁর অনুগমন করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন, এই তরুণ সিদ্ধার্থই প্রকৃত জ্ঞান বা বুদ্ধত্বের অধিকারী হ'তে পারবেন, আর তাহ'লে সে প্রসাদ-কণিকা থেকে তাঁরাও বঞ্চিত হবেন না। এই পাঁচজন শিষ্যের নাম—অন্ন-কোদন্ন, ভাপ্পা, মহানাম, ভদ্দ আর অশ্যপী।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তাঁরা কোন এক অখ্যাত গ্রাম উরুবিল্বে উপনীত হলেন অবশেষে। এই শান্ত নির্জন স্থানটি ভালো লাগলো তাঁর ; স্থির করলেন এখানেই সাধনা শুরু করবেন।

চিত্রে দেখছি (16/2E), চারজন অনুচরসহ (পাঁচজন নয় কেন?) সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়িয়েছেন উরুবিল্ব (বর্তমান বুদ্ধগয়ার দক্ষিণে তদানীন্তন উরইল্) গ্রামপ্রান্তে। এখানেই কঠিন তপস্যা শুরু হ'ল তাঁর।

এর পরের দীর্ঘ ছয়টি বছর আসমুদ্র-হিমাচলে কত মহাজনপদের কত ক্ষমতাদর্পী রাজা-মহারাজা কত প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছিলেন, কত অযুত মিনার-সৌধ-কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস তা অম্লানবদনে ভুলে বসে আছে। অমর হয়ে আছে অখ্যাত উরুবিল্ব গ্রামে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে এক অজ্ঞাত তরুণ সন্ন্যাসীর তপস্যার ফলশ্রুতি। কিন্তু সেদিন কে লক্ষ্য করেছিল সেই একক তাপসের নিরলস সাধনাকে?

না, ভুল বললাম। একজন লক্ষ্য করেছিল। সে ঐ উরুবিল্ব গ্রামের সেনানি-গোপতনয়া সুজাতা। কিশোরী বয়স থেকে মেয়েটি লক্ষ্য করছে ঐ তরুণ তাপসের অদ্ভুত তপশ্চর্যাকে। সে দেখেছে সন্ন্যাসী তিল তিল করে আহার্য-পানীয় ত্যাগ করছেন—শীর্ণ হয়ে পড়েছেন তিনি, দুর্বল হয়ে পড়েছেন। সে অনুভব করেছে—অনাহারক্লিষ্ট তাপস অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। দীর্ঘ ছ' বছরে কিশোরী হয়েছে যুবতী—সে বুঝতে পেরেছে, এ'কে রক্ষা করতে হ'লে তাঁকে আহার্য এনে দিতে হবে। শাস্ত্রকার বলেননি, কিন্তু আমরা কি অনুমান করতে পারি না, যুবতী সুজাতার মনে সঞ্চারিত হয়েছিল সেই কামনাটি যা নিয়ে অপেক্ষা

করেছিলেন মাতঙ্গের আশ্রমে শবরী, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় তাঁর ফল-মূলের থালাখানি সাজিয়ে।

অনাহারক্লিষ্ট সন্ন্যাসী অবশেষে একদিন অনুধাবন করলেন শরীরকে অহেতুক পীড়ন করলে কোন লাভ হয় না। মাত্রাতিরিক্ত আহারে বা নিদ্রায় যেমন ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে যায় মাত্রাতিরিক্ত নিপীড়নেও তেমনি দুর্বল এবং অশক্ত হয়ে যায় শরীর। জাগতিক কামনা-বাসনার হাত থেকে মনকে মুক্ত করতে হ'লে এ দুটি চরম পথ পরিত্যাগ করে পরিমিতির পথে অভ্যস্ত করতে হবে দেহকে। তিনি স্থির করলেন, দেহ-পীড়নের তপস্যা ত্যাগ করবেন এবার। কিন্তু হায়, এ সিদ্ধান্ত যখন নিলেন সিদ্ধার্থ, ততদিনে তাঁর দেহ এতদূর অশক্ত হয়ে পড়েছে যে, আসন ত্যাগ করে আহার্যের কাছে পর্যন্ত তিনি এগিয়ে যেতে পারেন না। সিদ্ধার্থ অনুভব করেন, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাঁকে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ তাঁর ললাট-লিখন নয়! মৃত্যুকে চক্ষের সম্মুখে দেখলেন তিনি। অনাহারক্লিষ্ট তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়ল ভূমিশয্যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস, সংস্কৃতি, তার ধর্ম, তার মর্মবাণী একটি অখ্যাত গোপবালার কাছে একান্তভাবে ঋণী, সে ঐ সুজাতা। সে লক্ষ্য করে, তরুণ তাপসের অনাহার-মৃত্যুর উপক্রম। সুজাতা ছুটে চলে যায় নিজ কুটিরে। প্রণয়ন করে গোশালার শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-ধেনুর দুগ্ধে প্রস্তুত পায়সান্ন। পায়স তো নয়, অমৃত! সে অমৃতের অমিত প্রভাবেই পৃথিবী একদিন শুনতে পেয়েছিল সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী: অহিংসা পরমোধর্মঃ!

চিত্রে দেখছি (16/2F), নিভৃত গৃহকোণে মৃৎপাত্রে পায়সান্ন প্রস্তুত করছে গোপকন্যা সুজাতা। বাহির-দ্বারে বিশ্রামরত তার চারটি ধেনু।

শরৎচন্দ্র বহুবার বলেছেন, নিজের হাতে দুটি রেঁধে সামনে বসিয়ে পুরুষমানুষকে খাওয়াবার সুযোগ পেলে ভারতীয় মেয়েরা আর কিছু চায় না। আমার মনে হয়, তার কারণ ঐ সুজাতা আর শবরীর রক্ত তাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয় বলেই।

পরের প্যানেলটিতে দেখছি, সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে সুজাতা* পায়সান্নের ভাণ্ডটি নামিয়ে রাখছে। দুই হাতে অর্ঘ্যদানের ভঙ্গিতে সে ধরেছে অমৃতভাণ্ড, নতজানু ভঙ্গি তার।

পায়সান্ন আহার করে সুস্থবোধ করলেন সিদ্ধার্থ। সম্পূর্ণ নূতন পথে সাধনা শুরু করলেন এবার। দেহকে নিপীড়ন করা বন্ধ করলেন, ও বিষয়ে পরিমিত আহার-নিদ্রাকে তিনি বরণ করলেন অতঃপর। এই সময়েই সিদ্ধার্থের পাঁচজন অনুচর তাঁকে ত্যাগ করে ঋষিপতনা† অভিমুখে প্রস্থান করেন। সিদ্ধার্থকে কঠোর তপশ্চর্যার পথ ত্যাগ করতে দেখে তাঁরা ভেবেছিলেন, তিনি এতদিনে হলেন ব্রাত্য, ব্রতচ্যুত।

তাতে ভ্রূক্ষেপও করলেন না সিদ্ধার্থ। ধ্যানের জগতে তিনি অভিভূত হয়ে রইলেন চরম সত্যের সন্ধানে। বুদ্ধত্বলাভ করার পথে যখন অল্প মাত্র বাকি, তখন এল সসৈন্য মার। কিন্তু পরাজিত হল সে। প্রথম গুহার চিত্র—১১ বর্ণনা-কালে সে-কাহিনী বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সেই রাত্রেই সিদ্ধার্থ পরমজ্ঞান লাভ করলেন। সিদ্ধার্থ এতদিনে হলেন পরমবুদ্ধ। সেটিও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রি—গুরু পূর্ণিমা। বুদ্ধত্ব লাভ করে শাক্যসিংহ অনুভব করলেন চার প্রকার আর্যসত্য এবং দর্শন করলেন পরমপ্রাপ্তির অষ্টমুখী পথ। তিনি অনুভব করলেন—অজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ করে কামনা, কামনা থেকে দেহজ দুঃখ-কষ্ট—জন্ম-যন্ত্রণা-জরা-মৃত্যু ; তিনি প্রণিধান করলেন জাগতিক যত দুঃখ-দুর্দশার মূল হল অজ্ঞতা এবং কামনা। যদি এই মূল দুটিকে উৎপাটন করা যায়, তবেই হতে পারে পরমমুক্তি—নির্বাণ।

* অশ্বঘোষের মত মানলে এটি সুজাতার আলেখ্য নয়, পূর্ণলক্ষ্মীর চিত্র ; কারণ "বৈশাখী পূর্ণিমায় অবগাহনান্তে পূর্ণলক্ষ্মী দাসীর হস্তে সুজাতা কর্তৃক সুবর্ণপাত্রে প্রেরিত পায়সান্ন ভক্ষণ"।

† বর্তমান কাশীর নিকট।

সিদ্ধার্থ এই পরমজ্ঞান লাভ করায়, বুদ্ধ হওয়ায়, আবার ফিরে এল মার। বললে—তুমি তো মহাপরিনির্বাণের পথের সন্ধান পেয়েছ, তবে আর অহেতুক বিলম্ব করছ কেন—মুক্ত হও এ জাগতিক বন্ধন থেকে।

হেসে বুদ্ধদেব বললেন—তোমার অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি আমি ; কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে না। যতদিন না এ সদ্ধর্মের নিশ্চিত প্রচারের সুবন্দোবস্ত করতে পারছি, যতদিন না এ মরজগতে মুক্তির বাণী প্রচারের আয়োজন হচ্ছে, ততদিন ব্যক্তিগত মুক্তির সন্ধানে আমি নির্বাণ লাভ করব না।

শেষ প্রয়াসে বিফল হয়ে গেল মার।

পরমপ্রাপ্তির পরে বুদ্ধদেব এক সপ্তাহকাল সেই বোধিবৃক্ষের তলাতেই অবস্থান করলেন—দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি বিশ্রাম নিলেন পার্শ্ববর্তী একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষতলে। তৃতীয় সপ্তাহে যখন মুচলিন্দ বৃক্ষতলে তিনি অবস্থান করছেন, তখনও তাঁর দেহ দুর্বল, তখন আকাশ জুড়ে নামল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তখন নাগরাজ মুচলিন্দ আপন ফণা বিস্তার করে রক্ষা করলেন বুদ্ধদেবকে*। দুজন উৎকলী বণিক এই সময় সেখান দিয়ে তাঁদের বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দৈববাণী শুনলেন, পথপার্শ্বে একজন মহামানব অনশনে আছেন। তাঁরা দুজনে অল্প-কিছু অন্বেষণ করেই দেখতে পেলেন ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবকে। পরম শ্রদ্ধাভরে মধুক ও পরমান্নের অর্ঘ্যদান করলেন তাঁরা ঐ মহাসন্ন্যাসীকে। এই উৎকলী বণিকদ্বয় হলেন ত্রপুস্য ও ভল্লিক।

পরের প্যানেলটি এই বিষয়-বস্তু নিয়েই আঁকা (16/2G)।

বুদ্ধদেব তখন চিন্তা করতে থাকেন—কোথায় গিয়ে, কার কাছে উপস্থিত হয়ে সদ্ধর্মের প্রথম প্রচার করবেন তিনি। প্রথমেই তাঁর মনে উদয় হল, রাজগৃহবাসী সন্ন্যাসী আড়ার কালাম ও উদ্দকের কথা ; কিন্তু ধ্যানযোগে তিনি উপলব্ধি করেন ইতিমধ্যেই তাঁরা দুজন দেহরক্ষা করেছেন। ফলে, বুদ্ধদেব স্থির করলেন, রাজগৃহের পরিবর্তে তিনি যাবেন কাশীতে—যেখানে ছিলেন তাঁর সেই পাঁচজন দলত্যাগী অনুচর। বুদ্ধদেব অতঃপর অগ্রসর হলেন কাশী অভিমুখে। তাঁর সেই পাঁচজন অনুচর দেখতে পেয়ে বললেন—বন্ধুবর গৌতম, আমরা জানি কঠিন তপশ্চর্যা করেও তুমি পরমসত্যের সন্ধান পাওনি—শেষ পর্যন্ত তুমি ত্যাগ করেছিলে দেহ-নিপীড়নের পথ। এখন তুমি কী উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে এসেছ?

বুদ্ধদেব প্রত্যুত্তরে বললেন—আমি পরমপ্রাপ্তি লাভ করেছি, আমি আজ তথাগত বুদ্ধ। তোমরা আমাকে আর 'বন্ধু গৌতম' বলে সম্বোধন করো না, এতে আমার কোন ক্ষতি নেই—কিন্তু তোমরাই অধঃপতিত হবে। আমি যে সত্য অনুধাবন করেছি তা তোমাদের কাছে বিবৃত করতেই এসেছি, অবধান কর এবং এই জগৎ-প্রপঞ্চের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি-পথের সন্ধান জেনে নাও।

তিনি সেই সারনাথ মৃগদাবেই প্রথম উচ্চারণ করলেন তাঁর সদ্ধর্মের মূল বাণী। আবর্তিত হল সর্বপ্রথম সেই মহাধর্মচক্র। তিনি বললেন—

: দুটি চরম পথই পরিত্যাজ্য। কী সেই চরম পথ? প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়জ সুখ-সন্ধান, দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়-নিপীড়ন। তোমাদের অবলম্বন করতে হবে মধ্যপথ। কী সেই মধ্যপথ? সে হল জ্ঞানের পথ। অষ্টাঙ্গিক সত্যমার্গ! কী সেই অষ্টমুখী সত্যমার্গ? সম্মা-দিট্ঠি (সত্য-দৃষ্টি), সম্মা-সঙ্কপ্পো (সত্য-সঙ্কল্প), সম্মা-বাচা (সত্য-বাক্য), সম্মা-কম্মন্তো (সৎ-কর্ম), সম্মা-আজীবো (সৎ-জীবিকা), সম্মা-বায়ামো (সৎ-উদ্যোগ), সম্মা-সতি (সৎ-চিন্তা বা সৎ-স্মৃতি) এবং সম্মা-সমাধি (সৎ-ধ্যান)।

* সাঁচির পশ্চিম তোরণে এই বিষয়-বস্তুটি নিয়ে একটি সুন্দর ভাস্কর্যের নিদর্শন আছে।

: হে পঞ্চ সন্ন্যাসী, বন্ধন-দুঃখ কী? অবধান কর ;—জন্ম-ব্যাধি-জরা-মৃত্যুই বন্ধন। অপ্রিয়ের সঙ্গে মিলন দুঃখের, প্রিয়-বিরহ প্রকৃত দুঃখের, পরমসত্যলাভে বঞ্চিত হওয়া চরম দুঃখের!

: হে পঞ্চ সন্ন্যাসী, এই বন্ধন-দুঃখের মূল কারণ কী? অবধান কর ;—কামনা-বাসনাই এ দুঃখের মূল, এ বন্ধনের বনিয়াদ। ইন্দ্রিয়জ সুখের কামনা, আত্ম-তৃপ্তির বাসনা, অহং-বোধ-সম্ভূত যশের অভীপ্সাই এই বন্ধন-দুঃখের মূল!

: হে পঞ্চ সন্ন্যাসী, এই বন্ধন-দুঃখের মূলোৎপাটনের উপায় কী? অবধান কর ;—কামনা-বাসনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করাই এ মূলোচ্ছেদের উপায়! পূর্বোক্ত অন্তর্মুখী সৎ-মার্গে এ মূলোচ্ছেদ সম্ভব!

এই হল তথাগত বুদ্ধের প্রথম বাণী। সারনাথ মৃগদাবে এই ধর্মোপদেশই ধর্মচক্র আবর্তনের সূচনা করল। শ্রবণমাত্র ভিক্ষু কোদন্ন বুদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাত করে বললেন—প্রভু, আমি উপলব্ধি করেছি, আপনিই প্রকৃত বুদ্ধ। আমাকে পব্রজ্যা দান করুন, প্রভু।

তিনিই হলেন বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্য। অল্প পরে অপর চারজনও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সারনাথের আরও কয়েকজন মুমুক্ষু ঐ সময়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে কাশীর বণিকশ্রেষ্ঠ যশদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। যশের জননী এবং স্ত্রীও এই সদ্ধর্ম গ্রহণ করেন। কাশী থেকে বুদ্ধদেব পুনরায় উরুবিল্ব গ্রামে ফিরে আসেন। সেখানে উরুবিল্বকাশ্যপ* এবং গয়াকাশ্যপকে† দীক্ষা দেন। এতদিনে বুদ্ধদেবের পাঁচশতের উপর শিষ্য হয়েছে। এবার তিনি সশিষ্য রাজগৃহে আসেন।

সংবাদ পেয়ে বিম্বিসার নগরপ্রান্তে এসে সশিষ্য বুদ্ধদেবকে অভ্যর্থনা করেন। রাজা তাঁকে সপার্ষদ্ রাজপুরীতে অবস্থানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন ; কিন্তু অসম্মত হলেন বুদ্ধদেব, বললেন—তিনি ভিক্ষু, উন্মুক্ত আকাশতলেই তাঁর আবাস। তখন মহারাজ বিম্বিসার রাজগৃহ-প্রবেশপথে একটি মনোরম উদ্যানে তাঁর বিশ্রামের আয়োজন করেন। বেণুবন নামে এ উদ্যানটি রাজগীরে আজও দেখতে পাওয়া যায়।

ষোড়শ গুহায় যে চিত্রাবলী আমরা দেখছি, তার পরবর্তী প্যানেলটি এই বিষয়-বস্তু অবলম্বনে রচিত। পূর্ব-চিত্রের নীচের প্যানেলে দেখছি প্রস্তরাসনে আসীন (চিত্রটি প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে)। সম্মুখে জোড়হস্তে মহারাজ বিম্বিসার—তিনি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন বুদ্ধদেবকে, প্রাসাদে অতিথি হওয়ার জন্য। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্মত হলেন না। তাই দেখছি (16/2H) বুদ্ধদেব তোরণদ্বার অতিক্রম করে ভিক্ষায় বের হচ্ছেন। পাশেই বাঁধা রয়েছে রাজা বিম্বিসারের শ্বেতবর্ণের অশ্বটি।

এদিকের প্রাচীরে চিত্র-কাহিনীর এখানেই শেষ। মণ্ডপের অপর প্রান্তে নন্দের দীক্ষা ও মরণাহতা রাজকুমারীর অপূর্ব চিত্রাবলী। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আসার আগে আমরা বুদ্ধদেবের জীবনীর পথ ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে যাব।

বুদ্ধদেবের বেণুবনে অবস্থানকালে সন্ন্যাসী সঞ্জয়ের দুই শিষ্য রাজগৃহে এসে বুদ্ধদেবের শরণ নিলেন। তাঁরা হচ্ছেন সারিপুত্র ও মৌদ্গল্ল্যায়ন। এঁরা দুজনেই আবাল্য বন্ধু এবং হরিহরাত্মা। পরবর্তী কালে এঁরা দুজন বুদ্ধদেবের প্রধানতম শিষ্য বলে স্বীকৃত হন এবং এঁদের পূতাস্থিই আবিষ্কৃত হয়েছে সাঁচির তিন নং স্তূপের ভিতর থেকে।

রাজগৃহে তথাগত প্রায় দুই মাসকাল অবস্থান করেন। কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের কাছে এই সময় সংবাদ পেঁছাল যে, তাঁর গৃহত্যাগী পুত্র বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন এবং রাজগৃহে

* বুদ্ধদেব, যে প্রকৃতই মহাজ্ঞানী—একথা কাশ্যপবংশীয় দুই ভ্রাতা অস্বীকার করায় বুদ্ধদেব তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে বাধ্য হন। তিনি নৈরঞ্জনা নদীর জলের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে নদী পার হন। সাঁচির পূর্ব তোরণে এই ঘটনাটি অবলম্বনে একটি অপূর্ব ভাস্কর্যের নমুনা আছে।

† এই গয়াকাশ্যপের নামই বুদ্ধদেবের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উরুবিল্ব গ্রামকে করেছে 'বুদ্ধ-গয়া'।

অবস্থান করছেন। পুত্রদর্শনে ইচ্ছুক রাজা শুদ্ধোদন একজন অমাত্যকে পাঠালেন পুত্রকে আমন্ত্রণ জানাতে, কিন্তু সেই অমাত্য রাজগৃহে এসে বুদ্ধদেবকে দর্শনমাত্র তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়ে সেখানেই বাস করতে থাকেন। শুদ্ধোদন এর পর ক্রমান্বয়ে নয়জন অমাত্যকে পর পর প্রেরণ করেন এবং সকলেই রাজগৃহে এসে রাজকার্য বিস্মৃত হয়ে বৌদ্ধ হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত রাজানুচর কালুদায়ীকে প্রেরণ করলেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। এবার সংবাদ পেলেন বুদ্ধদেব। আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন তিনি। সপার্ষদ্ বুদ্ধদেব অগ্রসর হতে থাকেন কপিলাবস্তুর উদ্দেশ্যে। বিশ্বস্ত শাক্য-অমাত্য কালুদায়ী দ্রুতগতি অশ্বে পূর্বেই সে সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলেন কপিলাবস্তুতে। সুসজ্জিত করা হল কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদসন্নিকটস্থ ন্যগ্রোধারাম বিহার। মহাপুরুষের আগমন-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র রাজা শুদ্ধোদন শাক্য-অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলেন ন্যগ্রোধারাম বিহারের অভিমুখে। কিন্তু একটি প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে। সন্ন্যাসী-দর্শনে যাচ্ছেন তিনি। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সন্ন্যাসীর স্থান নৃপতির উর্ধ্বে। রাজাই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে থাকেন—প্রথা তাই বলে। সামাজিক অনুশাসনের তাই নির্দেশ। কিন্তু এক্ষেত্রে সন্ন্যাসী যে তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র—সেই সিদ্ধার্থ, সেই গৌতম—যাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছেন তিনি! এ-কথা রাজা শুদ্ধোদন কেমন করে ভুলে যাবেন? তাহলে? দীর্ঘ অদর্শনের পর পুত্র পিতাকে প্রণাম করবে, না নৃপতি প্রণাম জানাবেন মহাসন্ন্যাসীকে?

উৎকণ্ঠিত মহারাজ প্রশ্নটি নিবেদন করলেন মহামন্ত্রীকে ; কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর মহামন্ত্রী-ও এ সমস্যার কোন সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পেলেন না। একটি অলৌকিক ঘটনায় এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আপনা থেকেই। শুদ্ধোদন লক্ষ্য করে দেখেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব অগ্রসর হয়ে আসছেন ভূমি স্পর্শ না করেই! বায়ু-তাড়িত মেঘের মত শূন্যে ভেসে আসছেন তিনি। স্তম্ভিত মহারাজ লুটিয়ে পড়লেন সন্ন্যাসীর চরণমূলে।*

সপ্তদিবসকাল বুদ্ধদেব অবস্থান করেছিলেন ন্যগ্রোধারামে। তার প্রতিদিনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত আছে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে। সে একটি অপূর্ব নাটক!

মহারাজ শুদ্ধোদনের জ্যেষ্ঠপুত্র অকালে সন্ন্যাস নিয়েছেন। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় নৃপতি। অশ্রুজলে সান্ত্বনার ব্যবস্থা তাঁর জন্য নয়। তাই এই শোকাবহ দুর্ঘটনাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তিনি। এতদিনে শান্ত করতে পেরেছেন হৃদয়কে। স্থির করেছিলেন, সিদ্ধার্থের অনুজ মহাগৌতমী-তনয় কুমার নন্দকে কপিলাবস্তুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন। রাজ্যভার আর তিনি বইতে পারছেন না—এবার অবসর নেবেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স হয়েছে তাঁর—এবার বানপ্রস্থ গ্রহণ করবেন। এ-সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে পরামর্শও করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এ-সব পার্থিব প্রসঙ্গে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী কোন মতামত প্রকাশ করেননি। শুদ্ধোদন তখন ঘোষণা করলেন, জ্যেষ্ঠপুত্রের কপিলাবস্তু-অবস্থানকালের মধ্যেই তিনি নন্দকে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করবেন। রাজা জানতেন, কপিলাবস্তু জনপদের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা 'জনপদ-কল্যাণী'রা সঙ্গে নন্দের গোপন প্রণয়ের কথা। তাই তিনি আরও ঘোষণা করলেন—অভিষেকের শুভদিনেই এই দুটি মিলন-তৃষিত তরুণ-তরুণীকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করে দেবেন।

দ্রুতগামী ঘোষকের মাধ্যমে এ আনন্দবার্তা বর্ষাগমে মৌসুমী মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত রাজ্যে। দলে দলে প্রজাবৃন্দ আসতে থাকে কপিলাবস্তু অভিমুখে। রাজাদেশে নগরীকে সাজানো হল উৎসব-সাজে। গৃহে গৃহে উড়ল নিশান, পথে পথে নির্মিত হল পুষ্প-তোরণ,

---

* সাঁচির উত্তর তোরণের পশ্চিম দিকস্থ স্তম্ভের সর্বনিম্ন ভাস্কর্য দ্রষ্টব্য। এই কাহিনীটি সেখানে রিলিফ-কাজে খোদাই করা আছে। এই নিয়ে তিনবার শুদ্ধোদন প্রণাম করলেন বুদ্ধদেবকে।

† জনপদ-কল্যাণী—পালি ভাষায় এই নামের অন্ততঃ চারজন রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ যশোধরার নামান্তর, দ্বিতীয়তঃ নন্দের প্রণয়িনী, তৃতীয়তঃ আনন্দের জননী অর্থাৎ সিদ্ধার্থের পিতৃব্য-জায়া এবং একজন বারবনিতা (তৈলপাত্র-জাতক)। সম্ভবতঃ 'জনপদ-কল্যাণী' কোন নাম নয়, রূপবর্ণনাত্মক উপাধিমাত্র।

দীপাবলীতে সজ্জিত হল জনপদ। দূর গ্রামপ্রান্তের উৎসব-বিলাসী প্রজার ভীড়ে জনাকীর্ণ হয়ে গেল রাজধানী। রাজা শুদ্ধোধন বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করলেন, এ কয়দিন তিনি রাজ-প্রাসাদেই অধিষ্ঠিত হন। সম্মত হলেন না বুদ্ধদেব। বললেন—তিনি সন্ন্যাসী, প্রাসাদে তাঁর স্থান হবে না। তবে জানালেন, পরদিন ভিক্ষার্থে তিনি নগর-ভ্রমণে যাবেন এবং রাজপ্রাসাদেও গিয়ে ভিক্ষা চাইবেন। পিতার আগ্রহাতিশয্যে তিনি সেখানে মধ্যাহ্ন-আহারেও স্বীকৃত হলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রকার বলেছেন, রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে শুদ্ধোদন যখন সানন্দে এ-কথা ঘোষণা করলেন, তখন একজন পুরকামিনী আর স্থির থাকতে পারেননি। ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন—রাজপুত্র সামান্য ভিক্ষুকের মতো দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাইবেন—এ দৃশ্য অসহ্য! তাঁর সে প্রতিবাদের কথা বুদ্ধদেবকে জানানোও হয়েছিল ; কিন্তু মহাভিক্ষু নির্বিকার-ভাবে বলেছিলেন—আমি ভিক্ষু, পূর্বাশ্রমে কী ছিলাম সে প্রশ্ন অবান্তর, ভিক্ষালব্ধ অন্নে ক্ষুন্নিবৃত্তিই আমার ধর্ম!

সে কথা শুনে রাজান্তঃপুরে সেই রমণীর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, শাস্ত্রকার তা আর জানাননি। বোধ করি সেই মহিলার অপরিসীম অভিমান, মর্মান্তিক অন্তর্জ্বালার সন্ধানই পাননি শাস্ত্রকার। তিনি শুধু জানিয়েছেন সেই ক্ষুব্ধা মহিলাটির পরিচয়—তিনি স্বামীত্যক্তা সুপ্রবুদ্ধতনয়া 'যশোধরা' (=গোপা, ভদ্রা, বিম্বা)। না, নামটি পর্যন্ত জানাননি, শুধুমাত্র বলেছেন—'রাহুল-মাতা'।

পরদিন রাজপথে সত্যই দেখা গেল এক দেবদুর্লভকান্তি মহাভিক্ষুককে। পুরবাসী ভিক্ষা দেবে কি, লজ্জায় অনুশোচনায় তারা রুদ্ধ করে দেয় বাতায়ন—প্রাক্তন রাজপুত্রকে ভিক্ষা দেবার মত দুর্জয় সাহস কার আছে? শূন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে ধীরপদে এগিয়ে এলেন মহাভিক্ষু রাজপ্রাসাদের সম্মুখে। দ্বারপাল শিহরিত হয়ে মুখ লুকাল লজ্জায়! মুণ্ডিতমস্তক পীত-বসনধারী সন্ন্যাসী অবশেষে এসে উপনীত হলেন অতি-পরিচিত একটি কক্ষের সম্মুখে। তাঁর সঙ্গে আজ তাঁর দুই প্রধান শিষ্য মহাভিক্ষু সারিপুত্র ও মহামৌদ্গল্ল্যায়ন। দীর্ঘদিন পূর্বে এক আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এ গৃহ থেকে তিনি শেষবার বেরিয়ে এসেছিলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রকার বলতে ভুলেছেন, সেই নামহীনা 'রাহুল-মাতা' শূন্য ভিক্ষাপাত্রটি পূর্ণ করে দেবার উদ্দেশ্যে দ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন কি না। অথবা মহান অতিথিকে নিয়ে মহারাজ শুদ্ধোদন যখন ব্যস্ত, তখন সেই প্রাসাদের অপর প্রান্তে নিভৃত ভূমিশয্যায় কেউ অশ্রুর বন্যায় ভেসে গিয়েছিলেন কি না শাস্ত্রকার সে-কথার উল্লেখ করতে ভুলেছেন।

কিন্তু ভোলেননি অজন্তার শিল্পী! সপ্তদশ গুহায় তিনি রঙে ও রেখায় সেই খণ্ড মুহূর্তটিকে মহাকালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শাশ্বত করে রেখে গেছেন। সে-কথা যথাস্থানে।

বুদ্ধদেব রাজপ্রাসাদে সেদিন মধ্যাহ্ন আহার করেছিলেন। আহারান্তে শুদ্ধোদন তাঁর কাছে রাজবধূ যশোধরার কৃচ্ছ্রসাধনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।* উত্তরে মহাভিক্ষু বললেন—শুধু সেই জন্মেই নয়, পূর্ব পূর্ব জন্মেও তিনি বুদ্ধদেবের প্রতি একান্তপ্রণয়ী ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি পূর্বজন্মের চন্দ্রা-কিন্নর-জাতক-কথা পুরবাসীদের শুনিয়েছিলেন। বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্ত কী ভাবে চন্দ্রা-কিন্নরীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার স্বামীকে হত্যা করে, তারপর কী ভাবে সদ্যোবিধবার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং কী ভাবে শক্রের আশীর্বাদে

* "সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলে যশোধরা পতিব্রতা রমণীর ন্যায় প্রোষিত-ভর্তৃকা ধর্ম পালন করেন। তিনি যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন, তখন নিজেও মুণ্ডিতমস্তক হইলেন ; যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ চীরবসন পরিধান করিয়াছেন, তখন নিজেও উৎকৃষ্ট বসন পরিত্যাগ করিয়া চীরধারিণী হইলেন ; সিদ্ধার্থের ন্যায় তিনিও একাহারী, ভূশয্যাশায়িনী হইয়াছিলেন। মৃৎপাত্র ভিন্ন তিনি অন্য কোন পাত্রে আহার্য গ্রহণ করিতেন না। এই সময়ে অনেক রাজকুমার তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন ; কিন্তু সিদ্ধার্থ ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা তিনি কখনও হৃদয়ে স্থান দেন নাই। বৌদ্ধেরা বলেন, অতীত জন্মেও তিনি বরাবর বোধিসত্ত্বের সহধর্মিণী ছিলেন এবং এইরূপে সতীত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।"

—ঈশানচন্দ্র ঘোষ

স্বামী পুনর্জীবিত হলে চন্দ্রা বলে, চলুন প্রভু, এই ঈর্ষা ও কামের বশবর্তী মনুষ্য-সমাজকে ত্যাগ করে আমরা সেই চন্দ্রপর্বতেই ফিরে যাই বলে:

কমলকুমুদে সুশোভিত কত বহে স্রোতস্বতী সেই গিরিবরে
তরুরাজি দুলি মলয় হিল্লোলে জুড়ায় শ্রবণ সুমধুর স্বরে ;—
চল দুইজনে বিহারি সেখানে, মানুষের পথ করিয়া বর্জন,
যাপিব জীবন সুখে অনুক্ষণ করি পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ॥'

রাজপুত্র নন্দ গিয়েছিলেন কপিলাবস্তুর অপর প্রান্তে একটি নিভৃত নিকেতনে জনপদ-কল্যাণীর গৃহে। তাঁকে আসন্ন উৎসবের সংবাদ দিতে। মিলনকামী দুটি তরুণ-তরুণীর সেদিনটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত।

দিবসান্তে নন্দ ফিরে এলেন ন্যগ্রোধারাম বিহারে। প্রচণ্ড কৌতূহল হয়েছিল তাঁর। প্রশ্ন করে বসলেন অগ্রজকে—এই রাজৈশ্বর্যের বিনিময়ে, যশোধরার মতো স্ত্রী, রাহুলের মতো পুত্রের বিনিময়ে কী সম্পদ্ আপনি পেয়েছেন?

বুদ্ধদেব বললেন—শুনতে চাও তা? বস তাহলে ওখানে।

ঘৃতপ্রদীপ-জ্বালা সেই নির্জন সন্ধ্যায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে দুই ভাইয়ে কী কথোপকথন হয়েছিল, তা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হয়নি।

গভীর রাত্রে দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন বুদ্ধদেব। সারিপুত্রকে ডেকে বললেন—নন্দকে প্রব্রজ্যা দান কর! সে সন্ন্যাস নেবে।

পরদিন সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন শুদ্ধোদন, এলেন মহাগৌতমী। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার পূর্ব রাত্রেই হয়ে গেছে। রাজকুমার নন্দের মস্তক মুণ্ডিত—তার দক্ষিণ করে ভিক্ষাপাত্র, অঙ্গে পীত অজিন! মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন মহাগৌতমী। আর বজ্রাহত পর্বত-শিখরের মত এ চরম আঘাত অবিচলচিত্তে গ্রহণ করলেন মহারাজ শুদ্ধোদন। তিনি ক্ষত্রিয়, অশ্রুর সান্ত্বনা তাঁর জন্য নয়—তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল নেই।

ফিরে এলেন নতমস্তকে রাজপ্রাসাদে। হাহাকার উঠল সমস্ত রাজ্যে। নিবিয়ে দেওয়া হল উৎসব-দীপাবলী, ভেঙে ফেলা হল পুষ্পতোরণ। দীর্ঘশ্বাস পড়ে শুদ্ধোদনের—অচিরে অবসরগ্রহণ তাঁর ললাট-লিখন নয়। যতদিন না বালক রাহুল উপযুক্ত হয়, ততদিন তাঁর মুক্তি নেই। এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদে নীরবে নতমস্তকে ফিরে গেল প্রজাবৃন্দ যে যার গ্রামে।

নাটকের চরম মুহূর্ত কিন্তু এখনও আসেনি!

কপিলাবস্তুর অপর প্রান্তে নিভৃত নিকেতনে প্রসাধনদক্ষা জনপদ-কল্যাণীকে সাজিয়ে তুলছিল বধূবেশে। আজ তাঁর বিবাহ এবং আজই হবেন এ রাজ্যের রানী। আকৈশোরের স্বপ্ন আজ সফল হতে বসেছে কল্যাণীর। সেই উৎসবমুখর নিভৃত কুঞ্জে এসে দাঁড়াল একজন ভগ্নদূত, নন্দের অনুচর। তার হস্তে নন্দের প্রত্যাখ্যাত রাজমুকুট। হতভাগ্য সংবাদ বহন করে এনেছে—রাজকুমার নন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন!

এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদ সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না জনপদ-কল্যাণীর! মূর্ছাতুরা মন্দভাগিনী লুটিয়ে পড়ল ভূমিশয্যায়। সে মূর্ছা আর তার ভাঙেনি।

জীবিতাবস্থায় যে মর্যাদা তাকে দেয়নি রাজপুত্র নন্দ, তার শতগুণ মর্যাদা তাকে দান করেছেন অজন্তার শিল্পী—বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রের সে আজ বিষয়-বস্তু! অজন্তার ষোড়শ গুহায় মরণাহতা রাজকন্যার আলেখ্যে শাশ্বত হয়ে আছে সেই হতভাগিনী সৌভাগ্যবতী। সেই বিখ্যাত—The Dying Princess.

এ-ঘটনার পর সপ্তদিবস অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজপ্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে প্রচণ্ড অন্তর্জ্বালায়, দুরন্ত অভিমানে দগ্ধ হচ্ছিলেন রাহুল-জননী যশোধরা। আজ সেই সপ্তম দিবসের চিহ্নিত মুহূর্ত। আজ তথাগত বুদ্ধ ত্যাগ করে যাবেন ন্যগ্রোধারাম বিহার। আজ যেন ক্ষিপ্তা হয়ে গেলেন যশোধরা। স্থির করলেন, আজই তিনি হানবেন চরম আঘাত। যে মানুষটা তাঁর জীবন, তাঁর যৌবন, এ রাজ্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্মমভাবে দলিত, মথিত

করেছে, তার উপর প্রতিশোধ নিতে হবে তাঁকে। বিশ্বস্ত রাজানুচর কালুদায়ীকে ডেকে আদেশ করলেন, পুত্র রাহুলকে একবার ন্যগ্রোধারাম বিহারে নিয়ে যেতে। সপ্তমবর্ষীয় বালককে শিখিয়ে দিলেন, সে যেন ঐ নিষ্ঠুর উদাসীন মানুষটার কাছে পিতৃধন প্রার্থনা করে। পুত্রকে জন্মদান করেই পিতার কর্তব্য শেষ হয় না, তাকে লালন-পালন করাও পিতার কর্তব্য। এই নিষ্করুণ সংসারধামে সাবলম্বী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুত্রকে পথ-চলার পাথেয় তো পিতাকেই যোগাতে হয়। অভিমানক্ষুব্ধা রাজবধূ দেখতে চান সেই নিষ্ঠুর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কী পিতৃধন দিয়ে পুত্রের প্রতি পিতার এই প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পাদন করেন!

অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছেন যশোধরা। আজ তাঁর বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে সদ্যশ্রুত চন্দ্রা-কিন্নর-জাতক-কথা। আশ্চর্য, সে জীবনের কথা আজ তাঁর কিছুই মনে নাই ; কিন্তু ঐ অদ্ভুত মানুষটি নাকি তপস্যাবলে পূর্বনিবাসজ্ঞান* লাভ করেছেন। যশোধরা ভুলে গেলেন, কিন্তু বুদ্ধদেব ভোলেননি চন্দ্রা-কিন্নরীর সেই আকুল আবেদন :

কমলকুমুদে সুশোভিত কত বহে স্রোতস্বতী সেই গিরিবরে
তরুরাজি দুলি মলয় হিল্লোলে জুড়ায় শ্রবণ সুমধুর স্বরে ;—
চল দুইজনে বিহারি সেখানে, মানুষের পথ করিয়া বর্জন,
যাপিব জীবন সুখে অনুক্ষণ করি পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ॥†

অথচ কী আশ্চর্য, সব কথা ভুলেও আজ যশোধরার হৃদয়ে সেই বাণী ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে ; আর সব কথা না ভুলেও এ আহ্বানে বুদ্ধদেবের মনে কোন সাড়া জাগছে না! কেন এমন হয়? অথচ সেদিন কী দরদভরেই তিনি আবৃত্তি করেছিলেন, 'চল দুইজনে বিহারি সেখানে, মানুষের পথ করিয়া বর্জন, যাপিব জীবন সুখে অনুক্ষণ করি পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ!'

কিন্তু এত বিলম্ব হচ্ছে কেন রাহুলের প্রত্যাবর্তনে? ক্রমে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য অস্তাচলগামী হলেন—ঘনায়মান হল সান্ধ্য অন্ধকার। আজ বুঝি অমাবস্যা? বাতায়ন-পথে দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেখেন বাহিরে ঘনান্ধকার। রাজোদ্যানে জোনাকির আলেয়া। চিন্তার ঊর্ণনাভ বুনে চলেন যশোধরা। তবে কি পুত্রের মুখ দেখে মন টলেছে সেই উদাসীন সন্ন্যাসীর? তাকে কি বুকে টেনে নিয়ে আদর করছেন তিনি? তাকে কি পাশে বসিয়ে জাতকের কাহিনী শোনাচ্ছেন? তিনি কি পুত্রের কচি-কিশলয়তুল্য নরম হাতটি ধরে স্বয়ং তাকে পৌঁছে দিতে আসবেন এই কক্ষে? ঐ কি তাঁদের পদধ্বনি!

পদশব্দে ত্রস্তা হরিণীর মতো ছুটে আসেন যশোধরা। দ্বার উন্মোচন করতে গিয়েও হাত ওঠে না। যদি দ্বার খুলে দেখেন, ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন সেই দেবদুর্লভকান্তি মহাপুরুষটি!

না, পিতাপুত্র নয়—দ্বার খুলে যশোধরা দেখলেন, ফিরে এসেছেন সেই বিশ্বস্ত কালুদায়ী। কিন্তু এ কি? তিনি একা কেন? রাহুল কোথায়?

—রাহুল কোথায়? আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করেন রাহুল-জননী।

—ন্যগ্রোধারাম বিহারে। আপনার শিক্ষামত সেই অপাপবিদ্ধ বালক মহাসন্ন্যাসীর কাছে পিতৃধন প্রার্থনা করেছিল। মহাভিক্ষু তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ দান করেছেন তাকে।

—কী সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্?

—প্রব্রজ্যা! বালক রাহুল আজ সন্ন্যাসী!

বজ্রাহতার মত মুহূর্তে ভূমিশয্যায় লুটিয়ে পড়েছিলেন মূর্ছাহতা রাজবধূ যশোধরা—যশোধরা নয়, এবারও নামহীনা সেই মন্দভাগিনী রাহুল-মাতা!

* বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, বুদ্ধত্বলাভ করার সময় বুদ্ধদেব পূর্বনিবাসজ্ঞানও (জাতিস্মর) লাভ করেছিলেন। পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি বোধিসত্ত্বরূপে যে সব লীলা করেছেন, তাঁর স্মরণে আসে। বহুবার কথা-প্রসঙ্গে শিষ্যদের তিনি সেই সব জাতক-কথা বলে গেছেন।

† ফৌস্‌বোল-সম্পাদিত "জাতকার্থবর্ণনা" নামক মূল পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ থেকে শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক ছন্দে অনুবাদ।

না! এ নাটকের চরম মুহূর্ত কিন্তু এখনও আসেনি! এ তো কোন পার্থিব নাট্যকারের নাটক নয়—এ যে মহাকালের স্বহস্ত-লিখিত মহা-নাটক!

সহ্যের শেষ সীমান্ত অতিক্রান্ত হল, ক্ষাত্র নৃপতি শুদ্ধোদনের! এ সংবাদে তিনি বিস্ফোরকের মত জ্বলে উঠলেন। উন্মাদের মত ছুটে গেলেন ন্যগ্রোধারাম বিহারে। দেখলেন, পাশাপাশি বসে আছেন তিনজন ভিক্ষু—পূর্বাশ্রমে যাঁদের পরিচয় ছিল সিদ্ধার্থ, নন্দ ও রাহুল—ওঁর জরাগ্রস্ত বক্ষের তিনটি পঞ্জর!

দেবশিশুর মত ঐ সপ্তমবর্ষীয় বালকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মহারাজ। কচি-কিশলয়ের উপর বালার্কসূর্যের রক্তিমাভার মত দেখতে পেলেন সেই বালকের আননে এক স্বর্গীয় জ্যোতির আভাস। ক্ষাত্র ধর্মের অনুশাসন আর মনে রইল না শুদ্ধোদনের—দুটি নয়নের বাঁধ ভেঙে অন্তরের নিরুদ্ধ অশ্রুর বন্যায় ভেসে যেতে ইচ্ছা হল তাঁর।

কিন্তু না! কাঁদবেন না তিনি। তিনি শাস্তি দিতে এসেছেন তাঁর দুর্বিনীত পুত্র সিদ্ধার্থকে। কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—ঐ বালককে কোন্ অধিকারে প্রব্রজ্যা দান করেছ তুমি?

নির্বিকার বুদ্ধদেব বললেন—সে পিতৃধন প্রার্থনা করতে এসেছিল। আমি ভিক্ষু, এই একটিমাত্র সম্পদই ছিল আমার কাছে। তাই দান করেছি ওকে!

: তুমি তো উদাসীন সন্ন্যাসী! পিতাপুত্রের সম্পর্ক কি স্বীকার কর তুমি?

: এ জগতে যিনি আমাকে এনেছেন, তাঁকে কেমন করে অস্বীকার করি মহারাজ?

: কিন্তু পুত্র কি পিতৃধন গ্রহণে বাধ্য?

: বাধ্য বইকি মহারাজ। পিতৃধন তো কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

ক্ষাত্র তেজে অলাতখণ্ডের মত জ্বলে ওঠে মহারাজের দুটি আয়ত চক্ষু। বজ্রকণ্ঠে বললেন—তাই যদি হবে, তবে শোন মহাসন্ন্যাসী, আমি কপিলাবস্তুর শাক্য-নৃপতি মহারাজ শুদ্ধোদন। আমি জনৈক শাক্য সিদ্ধার্থের জনক! হে উদাসীন নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও : আমার সেই পুত্র সিদ্ধার্থ কি আজ প্রস্তুত আছে তার পিতার হাত থেকে বিনা বিচারে পিতৃধন গ্রহণে?

শিহরিত হয়ে ওঠেন সারিপুত্র, উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন মহামৌদ্‌গল্ল্যায়ন! এ কী কথা!

আসন ত্যাগ করে যুক্তকরে উঠে দাঁড়ান বুদ্ধদেব। অবিচলিতচিত্তে বলেন : আছে বই কি মহারাজ!

এ উত্তরের জন্য বোধকরি প্রস্তুত ছিলেন না শুদ্ধোদন। জগদ্‌ত্রাতা ভগবান বুদ্ধদেব আজ তাঁর সম্মুখে যুক্তকরে দণ্ডায়মান! পিতৃঋণ শোধ করতে উদ্যত তিনি—নিঃসর্তে গ্রহণ করতে চান পিতৃধন! শুদ্ধোদনের মনে পড়ে গেল অনেক—অনেকদিন পূর্বেকার কথা। শিশু গৌতমের কথা, বালক সিদ্ধার্থের কথা। অপরাধী পুত্রকে তিনি কতবার কত শাস্তি দিয়েছেন। আজ আবার তাকে সেই শাস্তি দিতে হবে। হ্যাঁ, কঠোরতম শাস্তি! সেই সিদ্ধার্থ আজ আবার অন্যায় করেছে! অত্যন্ত অন্যায়! সে কেড়ে নিয়েছে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের শেষ যষ্টি! মনে পড়ে গেল, মন্দভাগিনী জনপদ-কল্যাণীর কথা! এই উদাসীন সন্ন্যাসীর নিষ্ঠুর আঘাতেই হত-ভাগিনী ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। মনে পড়ল, সেই দুর্ভাগিনী মহাগোতমীর কথা—সিদ্ধার্থকে যিনি মানুষ করেছিলেন, নন্দকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন—আজ তিনি ভগ্নহৃদয়ে রোগশয্যায় লীনা। মনে পড়ল, সবার উপরে তাঁর কল্যাণময়ী স্বামীত্যক্তা পুত্রবধূর কথা। তার মূর্ছা এখনও ভাঙেনি। এদের সকলের হয়ে কঠিনতম প্রতিশোধ নিতে হবে তাঁকে। কী শাস্তি দেবেন তিনি? কী আদেশ করবেন? বলবেন কি—ফিরিয়ে দাও রাহুলকে? বলবেন কি—গার্হস্থ্যাশ্রমে ফিরে আসতে হবে তোমাকে?

গ্রহণের মুদ্রায় দুটি বাহু মহারাজের সম্মুখে প্রসারিত করে জগদ্‌ত্রাতা বুদ্ধদেব বললেন—আপনি আমাকে পিতৃধন দান করুন পিতা।

সারিপুত্র কি একটা কথা বলতে গেলেন, কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হল না তাঁর।

সংবিৎ ফিরে পান শুদ্ধোদন। কিন্তু নিজের কথা তখন আর তাঁর মনে পড়ল না। বললেন : হ্যাঁ, গ্রহণ কর এই পিতৃধন, এ আমার অনুরোধ নয়, আদেশ! প্রতিজ্ঞা কর, পিতা-মাতার সম্মতি-ব্যতিরেকে কোন নাবালককে আর কখনও প্রব্রজ্যা দান করবে না তুমি!

: এ আদেশ শিরোধার্য করলাম পিতৃদেব!

বুদ্ধত্বলাভ করার পর এই প্রথম এবং এই শেষবার বিশ্বত্রাতা মহামানব গৌতমবুদ্ধ কোন মরমানুষের আদেশ বিনাবিচারে নতমস্তকে শিরোধার্য করেছিলেন।*

নন্দের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের চিত্র প্রথম দৃশ্যে দেখছি, শাক্য-সেনানায়ক কালুদায়ী অশ্বারোহণে কপিলাবস্তুতে আসছেন বুদ্ধদেবের আগমনবার্তা ঘোষণা করতে (১৬।৩-ক)। কপিলাবস্তুর নগর-তোরণ অতিক্রম করছেন তিনি! তোরণদ্বারের পরেই দেখছি একটি অশ্ব ঊর্ধ্বমুখে হ্রেষাধ্বনি করছে। তার পিঠে কোনও সওয়ার নেই। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সওয়ার যখন ঘোড়াকে ছেড়ে দেয়, তখন সে ঠিক যেভাবে আরামে হ্রেষাধ্বনি করে। পাশেই স্তম্ভময় একটি মণ্ডপের নীচে বুদ্ধদেব ; সম্ভবতঃ, তিনি ন্যগ্রোধারাম বিহারে দণ্ডায়মান (১৬।৩-খ)।

নন্দের ধর্মান্তরগ্রহণ

পরে, একটু নীচে দেখছি, বুদ্ধদেব পুনরায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বামহস্তে ভিক্ষাপাত্র, দক্ষিণহস্তে তিনি আশীর্বাদ করছেন একটি নারী ও একটি শিশুকে। একটু সম্মুখে পুনরায় সেই মহাভিক্ষুর আলেখ্য (১৬।৩-গ)। এবার লক্ষণীয়, তাঁর সম্মুখে ও পশ্চাতে একই শিশুর চিত্র দুবার আঁকা হয়েছে। যেন আনন্দের আতিশয্যে কপিলাবস্তুর পথে ভিক্ষারত বুদ্ধদেবকে প্রদক্ষিণ করে নৃত্য করছে একটি শিশু। সম্মুখে আরও সাত-আটজন পুরবাসী। তাদের মুখাকৃতি দক্ষিণ ভারতীয়। সর্বনিম্নে দেখছি দণ্ডায়মান বুদ্ধদেবের পদপ্রান্তে প্রণামরত রাজকুমার নন্দ বলছেন—আপনি আমাকে প্রব্রজ্যা দান করুন!

এর নীচে কিছু পলেস্তারা খসে পড়ছে। তারও নীচের দৃশ্যটিতে (১৬।৩-ঘ) ন্যগ্রোধারামের বিহারে নন্দের মস্তক মুণ্ডন করা হচ্ছে। সম্মুখে সিংহাসনে উপবিষ্ট তথাগত বুদ্ধ, তাঁর পাশে অপর একজন ভিক্ষু—সম্ভবতঃ সারিপুত্র। প্রামাণিকের মুখটি নষ্ট হয়ে গেছে। পরের প্যানেলে মুণ্ডিতমস্তক নন্দ করলগ্নকপোলে উপবিষ্ট—অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট মূর্তি তাঁর (১৬।৩-ঙ)। অদূরে দুজন ভিক্ষু কি যেন জল্পনা করছেন—অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নন্দকে নির্দেশ করছেন। তার পরের প্যানেলে দেখছি, শূন্যপথে বুদ্ধদেব ও নন্দ আকাশপথে উড়ে যাচ্ছেন।

কাহিনীর এ অংশটুকু বলা হয়নি, তাই চিত্রগুলি দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। সে-টুকু বলে নিই এবার।

জনপদ-কল্যাণীর মৃত্যু-সংবাদে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন নন্দ। তখন বুদ্ধদেব তাঁকে প্রশ্ন করেন—কল্যাণীর বিরহে তুমি এভাবে ভেঙে পড়ছ কেন? ধর্মাচরণে তোমার মন নেই কেন?

নন্দ বলেন—এমন নারীরত্ন ত্রিভুবনে আর নেই, আর হবে না!

বুদ্ধদেব বলেন—ভ্রান্ত ধারণা তোমার ; এস আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে সশরীরে

---

* এই প্রসঙ্গে বলে যাই, ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি—মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁর পুত্রকে চারবার প্রণাম করেছিলেন। তিনটি কাহিনী ইতিপূর্বেই বলেছি। তাঁর শেষ প্রণতির কথাটাও বলে যাই—পরিণত বয়সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত শুদ্ধোদনকে দেখে তাঁর অমাত্যরা বুঝতে পারে মহারাজ কিছু একটা চাইছেন—কিন্তু সেটা কী তা বলছেন না। বস্তুতঃ এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে শুদ্ধোদন শেষবারের মত তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের সাক্ষাৎ চাইছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তখন বহু দূর দেশে অবস্থান করছেন, একথা জানা ছিল মহারাজের। তাই তাঁর গোপন মনোবাসনা ব্যক্ত করেননি। অশ্বঘোষের মতে, একেবারে শেষ মুহূর্তে মহারাজ দেখতে পান—সেই মহাপুরুষটি সূক্ষ্ম শরীরে তাঁর শয্যাপার্শ্বে এসে দণ্ডায়মান হয়েছেন। পুলকিততনু মহারাজ তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন বুদ্ধদেবকে। আর ওঠেন না।

স্বর্গে নিয়ে যাব। সেখানে স্বর্গের অপ্সরাদের দেখলে বুঝতে পারবে, ত্রিভুবন সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার চেয়েও বড়।

বিশ্বাস হয় না নন্দের। বুদ্ধদেব তখন অনুজকে নিয়ে যান স্বর্গে। নন্দ মুগ্ধ হয়ে যান সুরললনাদের দেখে! নারীর দেহে যে এত রূপ থাকতে পারে, এ তাঁর কল্পনাই ছিল না। মর্ত্যে ফিরে এলেন ওঁরা। নন্দ বলেন—আপনি যে সব অনুশাসনের কথা বলছেন, তা ঠিক ঠিক মেনে চললে আমি অন্তিমে ঐ রকম একটি নারীরত্ন পাব?

বুদ্ধদেব মৃদু হেসে সংক্ষেপে বললেন—তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

ক্ষুব্ধ হয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল। ওরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। এমন কি ওদের একজন বলে—রাজকুমার নন্দ উন্মাদ হতে পারেন, কিন্তু প্রভু কি করে ঐ রকম প্রতিশ্রুতি দিলেন?

শুনে জ্ঞানবৃদ্ধ সারিপুত্র তাকে ধিক্‌কার দিয়ে বলেন—তোমরা কি প্রভুরও বিচার করতে চাও?

লজ্জিত হয় সেই বৌদ্ধ শ্রমণ; প্রায়শ্চিত্ত করতে বসে সে।

পুনরায় যেদিন নন্দ একই প্রশ্ন করলেন তাঁকে, তখন তিনি বললেন—নন্দ, এতদিন তুমি জনপদ-কল্যাণীর রূপে অন্ধ ছিলে। আজ স্বর্গের অপ্সরাদের দেখে তাকে ভুলেছ! সত্য কি না?

নন্দ লজ্জিত হয়ে স্বীকার করেন সে-কথা।

বুদ্ধদেব বলেন—কিন্তু এ-ও তোমার ভ্রান্তি নন্দ; এর চেয়েও মহৎ সম্পদের সন্ধান যখন পাবে, তখন দেখবে স্বর্গের অপ্সরাদের কথাও ভুলে গেছ তুমি!

মর্মান্তিক লজ্জিত নন্দ। এর পর থেকে কায়মনোবাক্যে ধর্মাচরণে মন দিলেন তিনি। বস্তুতঃ, সেইদিনই তিনি হলেন প্রকৃত অর্হৎ!

আকাশপথে উড্‌ডীয়মান ঐ মূর্তি দুটি এবং বিমর্ষ নন্দের দিকে নির্দেশরত বৌদ্ধ ভিক্ষু, এ-দুটি এই কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত।

এর পরে বলতে হয় মরণাহতা রাজকন্যার চিত্রকথা (১৬।৩-চ):

অজন্তার এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রটি দেখে গ্রীফিথ বলেছিলেন—"The Florentines could have put better drawing, and the Venetians better colour, but neither could have thrown greater expression into it. . . ."

চিত্রে (চিত্র—৪১) সর্ববামে দেখছি দুটি পুরুষচিত্র। একজনের হাতে নন্দের রাজমুকুট, অপরজন জনপদ-কল্যাণীকে কিছু বলতে চায়। কল্যাণী একটি শয্যায় অর্ধ-শায়িতা—মূর্ছাতুরা মূর্তি তার। রাজমুকুটের দিকে বেচারী তাকাতে পারছে না। পতনোন্মুখ কল্যাণীকে পিছনে থেকে একজন ধরে আছে। সম্মুখে আর একজন সেবিকা তার নাড়ির গতি লক্ষ্য করছে।

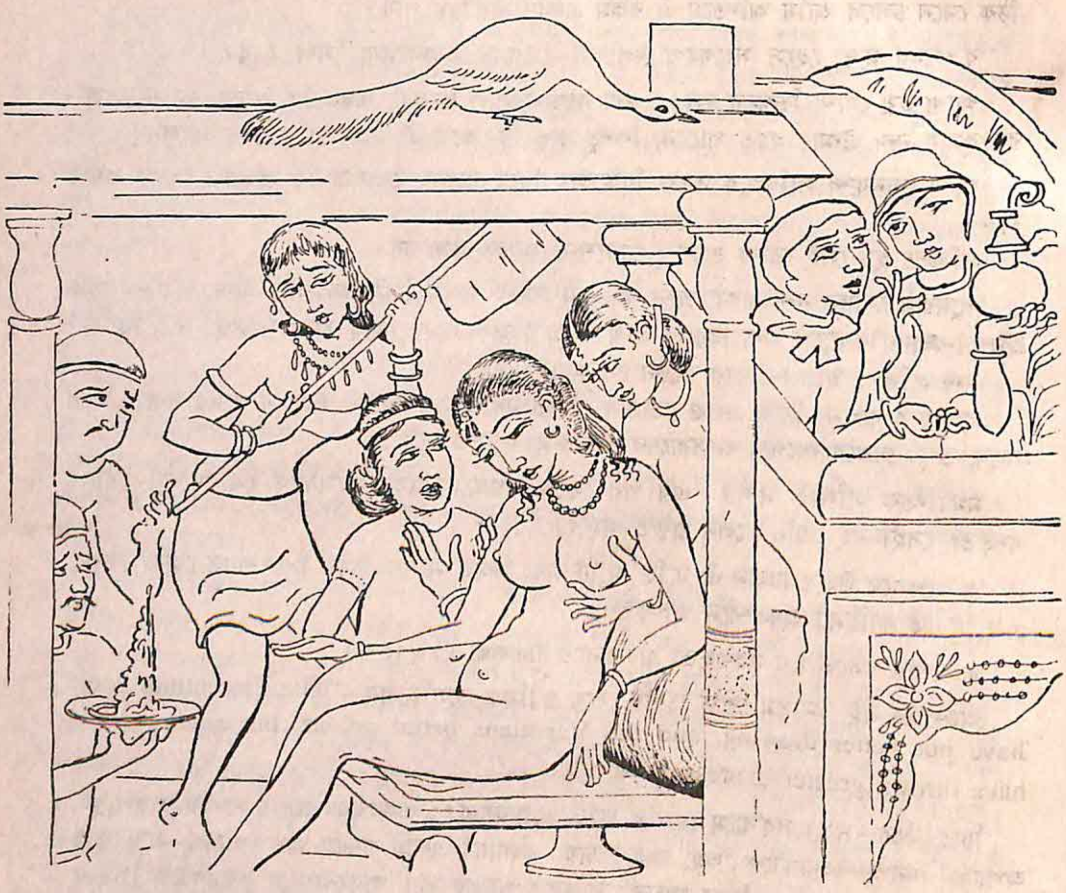
মরণাহতা জনপদ-কল্যাণী

তৃতীয় দণ্ডায়মানা একজন ব্যজনিকা তাকে বাতাস দিচ্ছে। প্রত্যেকের মুখেই উদ্বেগ ও হতাশার ছায়া। গৃহচূড়াই একটি ময়ূরী। লক্ষণীয় সে মাথা নিচু করে যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়। ময়ূর সৌন্দর্যের দ্যোতক। শিল্পী কি বলতে চান ঐ ময়ূরীটি পরাজিতা নায়িকার প্রতীক? স্তম্ভের যতি-চিহ্নের ওপাশে আর একটি খণ্ডদৃশ্য। মণ্ডপের বাহিরে একজন কিঙ্করী (সম্ভবতঃ নিগ্রো) একজন মহিলা চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ চাইতে এসেছে। চিকিৎসকের বামহস্তে ঔষধ-ভৃঙ্গার, দক্ষিণ-হস্তের করাঙ্গুলি দুই-সংখ্যাকে সূচিত করেছে। তিনি হয় বলছেন—আর দুই দণ্ডের ভিতর রোগিনীর যন্ত্রণার চির উপশম হবে; অথবা বলছেন—ঔষধ দুইবার সেব্য।

চিত্রটির বর্ণনাশেষে গ্রীফিথ বলেছেন—"For pathos and sentiment and the unmistakable way of telling its story, this picture, I consider, cannot be surpassed in the history of art."

বোধ করি এ-চিত্রের সমালোচনায় ঐটিই শেষ কথা!

সম্মুখের প্রাচীরে হস্তি-জাতকের একটি কাহিনী ছিল (১৬।৪) : বর্তমানে কিছুই বোঝা যায় না। পাশের প্রাচীরে আর একটি জাতক-কাহিনী (১৬।৫)। চিত্রগুলি অক্ষত ; কিন্তু এটিকে সনাক্ত করা যায়নি। দেখছি, একজন অশ্বারোহী......একটি বালক চারজন লোককে কি বলছে......নীচে দুটি লোক এক শিশুকে ধরে আছে। একজন ধরেছে দুটি হাত, অপরজন



চিত্র—৪১ ॥ মরণাহতা রাজকন্যা (জনপদ-কল্যাণী) (অবস্থান—XVI/3 F.)।

দুটি পা।......তৃতীয় জন তরবারি উত্তোলন করেছে শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করতে। গাইড হয়তো বলবে—এ সেই কাজীর বিচারের গল্প। সেই দুটি নারী একটি শিশুকে নিজের সন্তান বলে দাবি করে এবং কাজী এই বিবাদের মীমাংসা করতে চান শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করে। অন্ততঃ আমাকে গাইড তাই বলেছিল। কিন্তু কাহিনীটি তা নয়—যে দুজন শিশুটিকে ধরে আছে তার একজন রমণী, অপরজন পুরুষ!

নন্দের কাহিনীর পরে কয়েকটি মানুষী-বুদ্ধের চিত্র (১৬।৬)। তারপর প্রাচীরের প্রান্তে দুটি ছোট্ট চৌখুপিতে দুটি অপূর্ব শিল্প-নিদর্শন। একটি পুরুষ (১৬।৭-ক) ও অপরটি নারী-চিত্র (১৬।৭-খ)। মীর্জা ইস্‌মাইল বলেন, তিনি এদের নামকরণ করেছেন মৃগনয়ন ও মীননয়না।

ও-পাশে বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের একটি চিত্র (১৬।৮) নষ্ট হয়ে গেছে। তার পাশে, গ্রীফিথ সাহেব বলছেন, তাঁর আমলে ছিল একটি হস্তি-শোভাযাত্রার দৃশ্য। অজাতশত্রু হস্তিপৃষ্ঠে

বুদ্ধদেবের দর্শনমানসে চলেছেন (১৬।৯)। বর্তমানে কিছুই নেই। অপর প্রান্তে বুদ্ধদেবের আর একটি চিত্রও কালের করাল গ্রাসে অবলুপ্ত (১৬।১০)।

বেরিয়ে এলাম ষোড়শ গুহা-মন্দির থেকে। পথে নেমে ইস্‌মাইল-সাহেবকে প্রশ্ন করি—আপনি তো কলা-রসিক। বলুন তো অজন্তায় কোন্ নারীচিত্রটি সবচেয়ে সুন্দর?

উনি আড়চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে বলেন—নন্দের উপাখ্যানটা মন দিয়ে শোনেননি দেখছি।

অবাক হয়ে বলি—কেন? এ-কথা কেন বলছেন?

—শুনলেন না, মানুষের সৌন্দর্যবোধ আপেক্ষিক। স্বর্গের অপ্সরা না দেখা পর্যন্ত নন্দ মনে করতেন, জনপদ-কল্যাণীই ত্রিভুবনে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা!

আমি বলি—কিন্তু আপনি তো প্রায় পঞ্চাশ বছর আছেন এখানে। অজন্তার-ত্রিভুবনে দেখতে তো আর কিছু বাকি নেই আপনার। আপনার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন্ নারী-চিত্রটি সবচেয়ে সৌন্দর্যের দ্যোতক?

এক টুক্‌রো হাসি খেলে গেল ইস্‌মাইলের বলিরেখাঙ্কিত মুখে। বলেন—শুনতে চান আমার অভিমত? বেশ বলছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রতিপ্রশ্নের জবাব দেবেন?

বুঝতে পারি ওঁর প্রতিপ্রশ্নটা কী। উনি নিশ্চয় জানতে চাইবেন, আমার চোখে কোন্ নারীচিত্রটি সবচেয়ে ভালো লেগেছে। আমি কোন্‌টিকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলব। মনে মনে উপযুক্ত উত্তরটি প্রস্তুত করছিলাম, কিন্তু ওঁর প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

বলেন—আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেছেন ওদের কথায়?

অবাক হয়ে বলি—কাদের কথা?

—ঐ দারোয়ান, গেট-কীপার, কিংবা টিকিটবাবুর কথা?

আম্‌তা আম্‌তা করে বলি—কি কথা বলুন তো?

—যে বুড়ো মীর্জা ইস্‌মাইল একটি ছবির প্রেমে পাগলা মেহেরালি হয়ে গেছে?

লজ্জায় মাথাটা আর তুলতে পারি না।

উনি হেসে বলেন—আপনি লজ্জা পেয়েছেন বাবুজি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওরা বোকার মত ভুল বলে। হ্যাঁ স্বীকার করছি, এখানকার একটি বিশেষ চিত্রকে আমার বিশেষভাবে ভালো লাগে। মাঝে মাঝে একেবারে একা হয়ে পড়লে, ওখানে গিয়ে আমি দাঁড়াই; কিন্তু কেন জানেন? তার কারণ, এ অজন্তা গুহায় ঐ একটিমাত্র চিত্র আমি আজও ভালো করে দেখিনি! দেখবার সুযোগ পাইনি। ওর সামনে দিয়ে যখনই যাই, দেখি দারোয়ানগুলো আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে, গা টেপা-টেপি করছে, হাসছে! ওদের উৎপাতে, বিশ্বাস করুন, আজ ছয় মাসের মধ্যে সেই চিত্রটির দিকে একবারও মুখ তুলে তাকাইনি!

মরমে মরে গেলুম আমি!

কিন্তু এর পরের প্রশ্নটিতে আবার সন্দেহ হল—ভদ্রলোক কি সম্পূর্ণ সুস্থ-মস্তিষ্ক? হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে উনি বলেন—আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন?

জবাব দিতে আমার বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক।

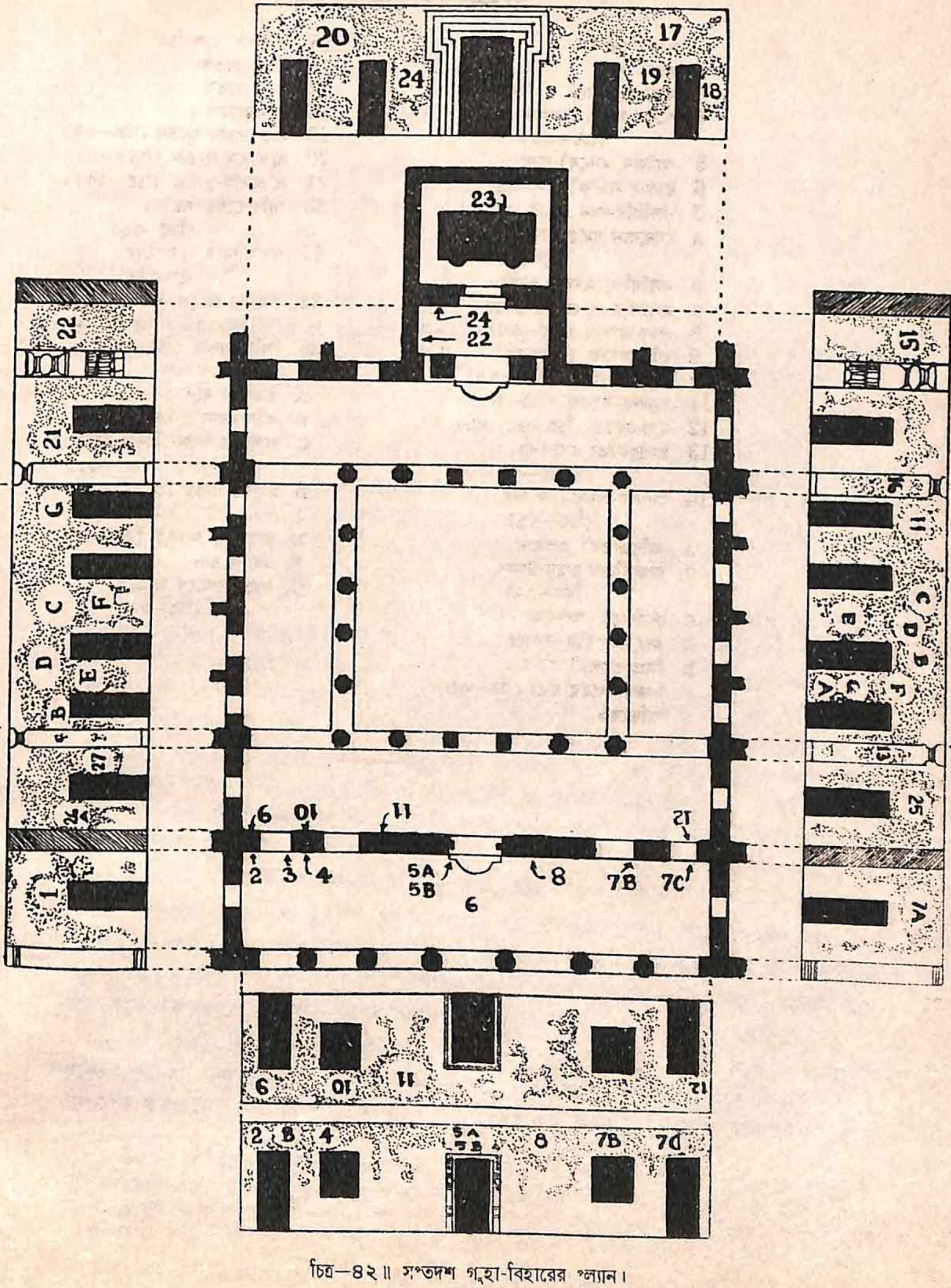
কিন্তু আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই উনি বলতে থাকেন—কিন্তু কেন? তার কারণ, তাঁর সঙ্গে আপনার জীবন অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁকে আপনি নিত্য দেখেন, তাঁর সঙ্গে আপনার অন্তরের ভাব-বিনিময় হয়। এই চিত্রগুলির সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও তাই। এখানে যখন প্রথম আসি, তখন আমার বয়স বাইশ-তেইশ। সংসারে আমার কেউ নেই, চিত্রগুলিই আমার খেলার সাথী! দীর্ঘদিন ওদের মাঝে থাকতে ওদের ভালবেসে ফেলা কি আমার অপরাধ, না সেটা অসম্ভব কিছু?

আমি বলি—আমি তো তা বলিনি।

আমার কথা ও'র কানে যায় না। কেমন যেন একটা ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েন বৃদ্ধ। দূরদিগন্তের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মত আমার হাতটি তুলে নিয়ে বলেন—বাবুজি! আমি বাঙলা ভাষা জানি না—কিন্তু ইংরাজীতে আপনাদের রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি আমি পড়েছি। আচ্ছা, আপনি বিশ্বাস করেন অমন ঘটনা বাস্তবে ঘটতে পারে?

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

ঠিক সেই সময়েই কলরব-মুখরিত কলেজের একদল ছেলেমেয়ে হৈ হৈ করতে করতে এসে হাজির হল বিপরীত দিক থেকে। বোধ হয় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল ও'র। যেন সংবিৎ ফিরে এল ফের। আমার হাতটি ছেড়ে দিয়ে বলেন—লেট্‌স নাউ গো টু কেভ নাম্বার সেভেনটিন—দ্য ট্রেসার হাউস অব অজন্তা ফ্রেস্কোস্‌!



চিত্র—৪২॥ সপ্তদশ গুহা-বিহারের প্ল্যান।

সপ্তদশ গুহা-বিহারের প্ল্যান

1 সংসার-চক্র
2 দানের দৃশ্য
3 মূর্ছাতুরা মাদ্রী ও বিশ্বান্তর
4 শক্রের মর্ত্যে আগমন (চিত্র—৪৩)
5 আটজন মানুষী-বুদ্ধ
6 ছয়জন নর্তকী (সিলিঙে)
7 নলাগিরি-দমন (চিত্র—৪৫)
A বেনুবনে ধর্মপ্রচাররত বুদ্ধদেব
B নলাগিরির মদমত্ত আক্রমণ
C নলাগিরি বুদ্ধকে প্রণামরত
8 কৃষ্ণা-অপ্সরা (চিত্র—৪৪)
9 হস্তিজাতক (অবলুপ্ত)
10 মহাকপি-জাতক (চিত্র—৪৬)
11 ষড়দন্ত-জাতক (চিত্র—৪৭)
12 মৃগ-জাতক (চিত্র—৪৮, ৪৯)
13 প্রসাধনরতা রাজকন্যা (চিত্র—৫০)
14 সিংহল-অবদান জাতক (চিত্র—৫১)
A বাণিজ্যতরী জলমগ্ন
B রাক্ষসীদের হত্যা-উৎসব (চিত্র—৫২)
C বোধিসত্ত্ব অশ্বরাজ
D সিংহ-কেশরীর দরবার
E সিংহ-কেশরী হত্যা
F বিজয়সিংহের যাত্রা (চিত্র—৫৪)
G অভিষেক

15 কতিপয় বুদ্ধ-চিত্র
16 মহিষ-জাতক
17 শরভ-জাতক
18 শ্যাম-জাতক
19 মাতৃ-পোষক জাতক (চিত্র—৬৭)
20 সুতসোম-জাতক (চিত্র—৫৫)
21 সুতসোম-জাতক (চিত্র—৫৫)
22 সারিপুত্রের পরীক্ষা (চিত্র—৫৬)
23 গর্ভমন্দিরে মৃগদাবের বুদ্ধমূর্তি
24 গোপা, রাহুল ও বুদ্ধদেব (চিত্র—৫৭ ও চিত্র—৫৮)
25 শিবি-জাতক (চিত্র—৫৯)
26 বিশ্বান্তর-জাতক
A তরবারি দান
B কলিঙ্গবাসীর ভিক্ষা প্রার্থনা
C পৃষতীর নিকট বিদায় যাচ্ঞা (চিত্র—৬১)
D মাদ্রীর নিকট বিদায় যাচ্ঞা (চিত্র—৬৩)
E রাজপথে রথারূঢ় বিশ্বান্তর
F রথাশ্ব দান
G সঞ্জয় সম্মুখে জুজুক (চিত্র—৬৬)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশগুহা-বিহার

মীর্জা ইস্‌মাইল কিছু অত্যুক্তি করেননি। সপ্তদশ গুহা-বিহারটি অজন্তা-চিত্রের স্বর্ণ-ভাণ্ডার! অসংখ্য জাতক-কাহিনী থরে থরে সাজানো—যেন আর্ট গ্যালারি।

দাক্ষিণাত্যের রাজ ঋষিক তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্মৃতিরক্ষার্থে নাকি এই বৌদ্ধ বিহারটি খনন করান এবং নানান্‌ চিত্র-সম্ভারে এটিকে সাজিয়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। ষোড়শ বিহারে দেখেছিলাম গৌতমবুদ্ধের জীবনের নানান্‌ কাহিনী অবলম্বনে চিত্র-সম্ভার সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সপ্তদশ বিহারে জাতক-কাহিনীর প্রাবল্য লক্ষ্য হল। কেন্দ্রস্থ হল্‌-কামরাটি একটি পূর্ণ চতুষ্কোণ। ১৯·৫ মিঃ দীর্ঘ ও প্রস্থ। কুঁড়িটি স্তম্ভে এই কেন্দ্রস্থ হল্‌-কামরাটি সুশোভিত। সম্মুখের অলিন্দে দাঁড়িয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে সুবৃহৎ সংসার-চক্রটিকে (১৭।১)। আট-দশ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্ত, অনেকটা প্রকাণ্ড ঘড়ির মত। নীচের দিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। চক্রের বিভিন্ন খোপে গ্রামীণ ও নগরজীবনের ছোট ছোট খণ্ডচিত্র বিধৃত। বিষয়-বস্তু কী কী ছিল আজ আর তা বোঝা যায় না* ; মনে হয়, একটি খোপে বলদ দিয়ে চাষ করানো হচ্ছে, আর একটি খোপে নরনারীর মিথুন-মূর্তি। চিত্রের বিষয়-বস্তু সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও অনুভব করা যায়। এ সংসার-চক্রের পাকে পাকে তোমাকে আমাকেও ঘুরতে হচ্ছে। এই ঘূর্ণ্যমান চক্রের অনুবর্তন যে করে না—বোধ করি 'মোঘং পার্থ স জীবতি'। উপরে দেখতে পাচ্ছি, দুটি সবুজ রঙের করাঙ্গুলির আভাস। অনেকক্ষণ ভাল করে নজর করলে তা দেখতে পাওয়া যায়। শিল্পীর বক্তব্য—যিনি এ চক্রের চক্রধারী, যন্ত্রের যন্ত্রী, তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়, তাঁর করাঙ্গুলির স্পর্শ। তার পাশেই একজন রাজা দান করছেন। খুব সম্ভবতঃ এটি বিশ্বান্তর জাতক-কাহিনীর অংশ (১৭।২)। দেখছি, রাজার পাশে চারজন অমাত্য......ভিক্ষুকের দল দান গ্রহণ করছে।......একজন অন্ধ ভিক্ষুক...... শিশুক্রোড়ে জননী......রাজা একটি তোরণদ্বার অতিক্রম করেছেন...একটি সভামণ্ডপে রাজা ও মূর্ছাতুরা তাঁর রানী (১৭।৩)। এ চিত্রগুলি বিশ্বান্তর-জাতকের অংশ, সেই জাতক-কাহিনীটি যখন বলব, তখন এ চিত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। চিত্রের মিছিল চলেছে একটানা...স্বর্গ থেকে সপার্ষদ্‌ শক্র (ইন্দ্র) নেমে আসছেন পৃথিবীতে, বিশ্বান্তরকে পরীক্ষা করতে (১৭।৪)......গতিবেগে উড়ছে তাঁর উত্তরীয়, তাঁর কণ্ঠের শতনরী।

এই চিত্রটির প্রসঙ্গে একটু সাহিত্য আলোচনা করতে ইচ্ছা করছে। চিত্রে দেখছি, ঘন নীল আকাশের পশ্চাৎপটে আষাঢ়সঘন জলদ-স্তবক, একেবারে থরে থরে সাজানো।...মেঘ চলেছে ভেসে...আর মেঘের সম্মুখে নভোচারী সিদ্ধাচার্য গন্ধর্বের দল তাঁদের বীণা, বংশী, বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে দ্রুতগতি ভেসে চলেছেন মেঘের আগে আগে (চিত্র—৪৩)।

এ খণ্ডদৃশ্যটি ইন্দ্রের স্বর্গ থেকে নেমে আসার দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত—ফলে, মূল বিষয়-বস্তুর সঙ্গে বেমানান একটুও নয়। ইন্দ্র আকাশপথে নেমে আসছেন, তাঁর সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র-ধারী গন্ধর্বের দলও আসবেন বইকি। তা যেন হল, কিন্তু এই খণ্ডদৃশ্যটি দেখে আমার মনে পড়ে

---

* ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে সার জেম্‌স্‌ ফার্গুসন বলেছিলেন : "১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেক এই সংসারচক্রে সর্বসমেত ৭৩টি ফিগার দেখেছিলেন। সেগুলি ছিল পাঁচ ইঞ্চি থেকে সাত ইঞ্চি মাপের। চক্রের দুই-তৃতীয়াংশ তখন দেখা যেত। পরে অনুমান হয়, ডঃ বার্ড এখান থেকে ছুরি দিয়ে চেঁচে ছবি চুরি করবার চেষ্টা করেন—এখন এ চক্রটির অতি সামান্যই পরিদৃশ্যমান।" (বর্তমানে এক-দশমাংশও অবশিষ্ট নেই।)

—*Cave Temples of India* by Fergusson & Burgess, London, 1880.

গেল কালিদাসের মেঘদূতের একটি বিখ্যাত চরণ—'সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ'। অর্থাৎ, দলে দলে মেঘ ধেয়ে আসছে দেখে সিদ্ধদম্পতি বীণা হাতে ছুটে পালাচ্ছে, তাদের ভয় হয়েছে জলকণায় তাদের বাদ্যযন্ত্র ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে।

আমার কেমন জানি মনে হল, অজন্তা-শিল্পীর মনে মেঘদূতের ঐ বর্ণনাটি নিশ্চয়ই জাগরূক ছিল এ-পরিকল্পনার সময়। কিন্তু তা কি সম্ভব?



চিত্র—৪৩ ॥ সপার্ষদ্ ইন্দ্রের মর্ত্যে আগমন (অবস্থান—XVII/4)।

এই সপ্তদশ বিহারটির নির্মাণকাল ৪৭০—৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ। কালিদাসের কাল নিয়ে পণ্ডিতরা একমত হতে পারেননি—কিন্তু মান্দাসোরের সূর্যমন্দিরে বৎসভট্টি-লিখিত একটি লিপি পাওয়া গেছে, যার সময় হল ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। তার মধ্যে একটি শ্লোকে কালিদাসের "বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ..." শ্লোকের প্রভাব অত্যন্ত স্থূলভাবে পড়েছে। তাই দেখে ইতিহাস-বেত্তা বেরীডেল কীথ বলেছেন, "সুতরাং কালিদাস জীবিত ছিলেন খ্রীষ্টীয় ৪৭২ অব্দের পূর্বে, কাজেই তাঁর কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্দিষ্ট করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।"

ফলে, এই খণ্ডচিত্রটিতে আমি যদি মেঘদূতের প্রভাব লক্ষ্য করে থাকি, তাহলে আমার যুক্তিকেও উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। মান্দাসোরে-উৎকীর্ণ ঐ শ্লোক আর অজন্তার এই গুহা একই শতাব্দীর, একই দশকের সম্পদ্। আর এই সময়কালের প্রায় সত্তর-আশি বৎসর পূর্বে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য স্বীয় কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার সঙ্গে বাকাতক-নৃপতি রুদ্রসেনের বিবাহ দিয়েছিলেন। অজন্তার ঐ যুগের শিল্পীরা বাকাতকী রাজাদের

অনুগ্রহভাজন ছিলেন এ-কথা মনে করা স্বাভাবিক, আর প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে গুপ্তসম্রাটের রাজসভার কয়েকজন বিশিষ্ট সভাসদ্ যে বাকাতক রাজসভায় এসেছিলেন, তারও ঐতিহাসিক নজির আছে। সুতরাং যদি বলি যে-শিল্পী ঐ দৃশ্যটি এঁকেছিলেন তিনি মহাকবি কালিদাসের স্বমুখেই এই শ্লোকটি শুনেছেন তাহলে অন্তত 'এ্যানাক্রনিসম্' দোষে সে উক্তিটি দুষ্ট হবে না।



চিত্র—৪৪ ॥ কৃষ্ণা-অপ্সরা (অবস্থান—XVII/8)।

প্রবেশপথে তোরণের উপর আটজন মানুষী-বুদ্ধের (১৭।৫) আলেখ্য। তার নীচে আটটি ছোট ছোট চৌখুপিতে আট জোড়া মিথুন-চিত্র। প্রবেশপথের দুপাশে দুটি মর্মর মূর্তি—শালভঞ্জিকা নারীমূর্তি। অলিন্দের সিলিঙে কেন্দ্রস্থলে ছয়জন নর্তকী (১৭।৬) হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষণীয়, তাদের ছয়জনের সর্বসমেত ছয়টি হাত আছে—বারোটি নয়।

দ্বারের দুই প্রান্তে বুদ্ধদেবের জীবনের একটি স্মরণীয় অলৌকিক ঘটনা—নলগিরিদমন (১৭।৭)। কিন্তু তার পূর্বে বলতে হয়, এই প্রাচীরেই আছে অজন্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী-চিত্র—বিখ্যাত কৃষ্ণা-অপ্সরা (১৭।৮)। এই কৃষ্ণা-অপ্সরাও বায়ুভরে ভেসে চলেছে আকাশপথে—

গতির জন্য তার কণ্ঠের ইন্দ্রকান্তমণিখচিত শতনরী একদিকে বেঁকে গেছে। মাথায় টায়রা ও ও মকুটে মুক্তার ঝালরগুলিও সব একদিকে হেলে আছে। কিন্তু এ চিত্রের আসল আবেদন কৃষ্ণা-অপ্সরার ভাবস্তিমিত মদবিহ্বল অর্ধ-নিমীলিত দুটি নয়নের দৃষ্টিতে (চিত্র—৪৪)।

নলাগিরি-দমন কাহিনীটি 'বিনয়-পিটক' থেকে সংগৃহীত। বিম্বিসারের পর অজাতশত্রু তখন মগধের সিংহাসনে। পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে মুছে ফেলে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। সিদ্ধার্থের জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্ত গোপনে ষড়যন্ত্র করলেন—বুদ্ধদেব যখন শহরে প্রবেশ করবেন তখন রাজহস্তী নলাগিরিকে মদোন্মত্ত করে তাঁর দিকে ধাবিত করে দেওয়া হবে। রাজা অজাতশত্রু বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা ছাড়া আর কোন কিছুকেই পূজনীয় মনে করেন না, তিনি সম্মত হলেন এ ষড়যন্ত্রে। ঘটনাচক্রে এই ষড়যন্ত্রের কথা বুদ্ধদেবের অনুচরদের কানে যায়। তাঁরা মহাভিক্ষুকে অনুরোধ করলেন—এ অবস্থায় তিনি শহরে প্রবেশ করার পরিকল্পনা ত্যাগ করুন ; কিন্তু তথাগত কর্ণপাত করলেন না। সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্ল্যায়নকে নিয়ে তিনি যথারীতি বেনুবন থেকে শহরে এলেন ভিক্ষাব্রতে। পরিকল্পনামত হস্তিশালার মাহুত নলাগিরিকে তাড়না করল। রাজপথে ত্রাসের সঞ্চার করে প্রভঞ্জনগতিতে নলাগিরি এগিয়ে এল বুদ্ধদেবের দিকে। কিন্তু বুদ্ধের সমীপবর্তী হয়ে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই হচ্ছে সংক্ষেপে নলাগিরি-দমন কাহিনী।

এই কাহিনী-চিত্রের অংশ-বিশেষ আমরা এখানে সন্নিবেশিত করেছি (চিত্র—৪৫)। নিম্নাংশে রাজপথের দৃশ্য, উপরাংশে দ্বিতল-প্রাসাদের গবাক্ষ ও অলিন্দ। যদি ঐ অলিন্দবাসিনীদের নাম হয় শ্রীমতী ও মালতী, তাহলে মহারানী লোকেশ্বরীর অন্তঃপুরে ওরা কি বলাবলি করছে তা সহজেই অনুমেয়। রাজপথে বামপ্রান্তে দেখছি অশ্বারোহী প্রহরীরা সাবধানবাণী উচ্চারণ করছে। শিল্পী গজরাজকে দু-বার এঁকেছেন। প্রথমবার সে মদমত্ত, ক্ষিপ্ত। শুঁড়ে করে জড়িয়ে ধরেছে এক হতভাগ্যকে। দ্বিতীয়বার দেখছি সে সামনের দু-পা মুড়ে বসে পড়েছে। হাতীর দুটি চিত্রে শুধুমাত্র চোখ দুটি লক্ষ্য করলেই নলাগিরি চরিত্রের পরিবর্তনটা বোঝা যায়। দক্ষিণপ্রান্তে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর তথাগত দণ্ডায়মান, তিনি নলাগিরি গজকুম্ভে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন সারিপুত্র।

এই চিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গেও আমি ডঃ ইয়াজদানীর সঙ্গে একমত হতে পারিনি। ইয়াজদানী বলছেন, "অলিন্দে অবস্থিত পুরকামিনীদের রূপায়নে শিল্পী কল্পনার প্রসার ও বর্ণিকাভঙ্গের দক্ষতা দেখিয়েছেন স্বীকার করি, তবু বলব—সম্পূর্ণ চিত্রটির বিন্যাস শিল্পরসের রসিকের ততটা ভাল লাগবে না, যতটা লাগবে ছবিতে-গল্প দেখতে অভ্যস্ত দর্শকের। কারণ হস্তিপ্রবরকে অস্বাভাবিকভাবে প্রকাণ্ড করে আঁকা হয়েছে, হস্তীই যেন গোটা চিত্রের সিংহভাগ দখল করেছে।"

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য : প্রথমতঃ অজন্তার চিত্র-জগতে কোন কোন প্রধান-চরিত্রকে অস্বাভাবিকভাবে প্রকাণ্ড করে আঁকতে দেখেছি ; এ কোনও নতুন কথা নয়। এ জন্য আপত্তির কোন কারণ দেখি না। প্রথম গুহার 'অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি', (চিত্র—৮), সপ্তদশ-গুহায় গোপা-রাহুলের তুলনায় বুদ্ধদেব (চিত্র—৫৭) অথবা পূর্ণ অবদান চিত্রে পূর্ণ (চিত্র—২২) 'অস্বাভাবিকভাবে প্রকাণ্ড' করে আঁকা—তাতে কোন রসাভাস ঘটেছে বলে তো মনে হয়নি। বস্তুতঃ প্রধান চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য দেওয়ার এ একটা প্রচলিত রীতি—অন্ততঃ অজন্তার জগতে। প্রশ্ন হতে পারে, সে ক্ষেত্রে চিত্রের সিংহভাগ কেন দখল করল নলাগিরি, কেন নন স্বয়ং বুদ্ধদেব? জবাবে প্রতিপ্রশ্ন করব : তাহলে আদি কবি বাল্মীকি কেন রাবণের ত্রিভুবন জয়ের বর্ণনা দিলেন, কেন নয় বানর-কাঠবিড়ালী দলের অধিনায়ক রামচন্দ্রের? রাম কর্তৃক রাবণবধ লঙ্কাকাণ্ডে লিখতে হবে বলেই ইন্দ্রজিত-কুম্ভকর্ণ-রাবণের বিক্রম তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন। এখানেও ঠিক সেইভাবে শিল্পী অনায়াসে চিত্রপটের সিংহভাগ ছেড়ে দিয়েছেন মদমত্ত গজরাজকে।

দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্য ছাড়া কোনও সংক্ষিপ্ত শিল্পকর্মে নবরসের এমন সুচারু সংস্থাপন আর কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। নবরসের সঞ্চার হয়েছে :

আদি...রাজান্তঃপুরে মিথুনমূর্তি (চিত্র—৪৫-এর বাহিরে)।

রৌদ্র...নলাগিরির উন্মত্ত আক্রমণ।

বীভৎস...হস্তিপিষ্ট হতভাগ্য ও শুণ্ডে জড়িত ব্যক্তির মৃত্যু।

অদ্ভুত...হিংসার দ্বারা অহিংসার মূলোচ্ছেদনের দেবদত্তকৃত পরিকল্পনা।

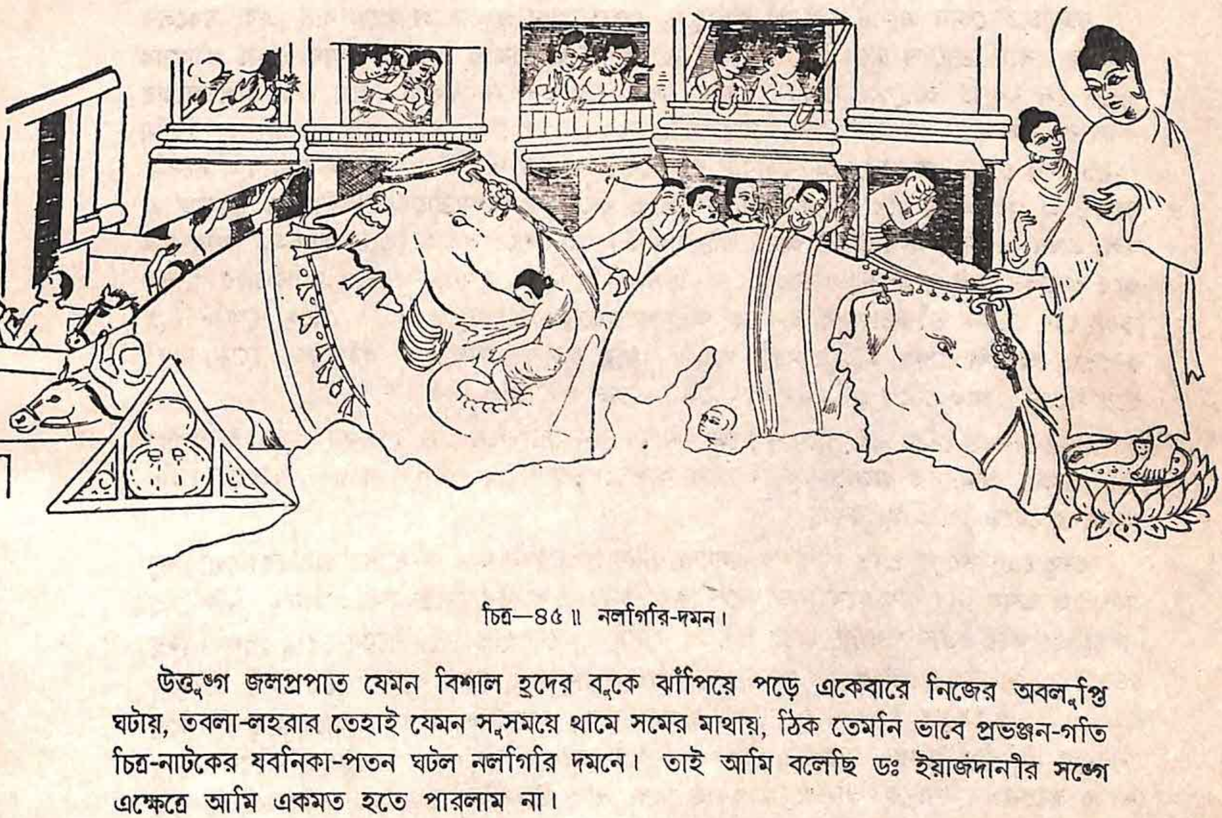
ভয়ানক...ক্ষিপ্ত গজরাজ।

বীর...অশ্বারোহী সৈনিকের পক্ষে পথচারীদের বাঁচানোর প্রচেষ্টা।

হাস্য...হস্তীর সম্মুখ থেকে পলায়ন'পর বামন (চিত্র—৪৫-এর বাহিরে)।

কারুণ্য...বেণুবন-বিহারে বুদ্ধদেবের মূর্তি (ঐ)।

শান্ত...নলাগিরির সম্মুখে স্বয়ং বুদ্ধদেব।



চিত্র—৪৫ ॥ নলাগিরি-দমন।

উত্তুঙ্গ জলপ্রপাত যেমন বিশাল হ্রদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে নিজের অবলুপ্তি ঘটায়, তবলা-লহরার তেহাই যেমন সুসময়ে থামে সমের মাথায়, ঠিক তেমনি ভাবে প্রভঞ্জন-গতি চিত্র-নাটকের যবনিকা-পতন ঘটল নলাগিরি দমনে। তাই আমি বলেছি ডঃ ইয়াজদানীর সঙ্গে এক্ষেত্রে আমি একমত হতে পারলাম না।

অলিন্দ অতিক্রম করে মণ্ডলের ভিতরে আসি। এবারে প্রবেশদ্বারের দিকে মুখ করে A. B.-চিহ্নিত প্রাচীরের ফ্রেস্কোগুলি একে একে দেখতে থাকি। বামপ্রান্তে হস্তি-জাতকের কাহিনীটিকে উদ্ধার করা গেল না (১৭।৯) ; কিন্তু তার পাশে মহাকপিজাতকের প্রথম কাহিনীটি আছে অক্ষত (১৭।১০)।

পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব বারাণসীর উপকণ্ঠে এক মহাকপিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি হন সেই অঞ্চলের বানররাজ্যের প্রধান। তাঁর অধীনে তখন ছিল আশি সহস্র বানর। বারাণসীর

দক্ষিণে গঙ্গাতীরে ছিল একটি অতি বিশাল আম্রবৃক্ষ। সে বৃক্ষে ফল হত যেমন অস্বাভাবিক রকমের বড়, তার স্বাদও ছিল তেমনি অতুলনীয়। গঙ্গাতীরে এক বিজন অরণ্যের একান্তে এই ফলবান বৃক্ষটির সন্ধান পায়নি নিকটস্থ গ্রামের মানুষ ; তাই কপিরাজ এই নির্জন আম্র-বৃক্ষটিতে সপার্ষদ্ বসবাস করতেন। শান্তিপ্রিয় কপিরাজ এভাবেই মানব-সমাজকে এড়িয়ে নিরুপদ্রবে বানরকুলকে প্রতিপালন করতেন—তিনি বারে বারে অনুচরদের বলতেন, যেন এই গোপন সংবাদটি নিকটস্থ গ্রামে জানাজানি না হয়ে যায়। যেরুসালেমের মহামানবের দ্বাদশ শিষের মধ্যে যেমন আত্ম-গোপন করে ছিল যুদাস্, বানররাজের অনুচরদলে তেমনি লুকিয়ে ছিল এক বিশ্বাসঘাতক। শুধু তফাৎ এই যে, যুদাস্ একবারই বিশ্বাসঘাতকতা করবার সুযোগ পেয়েছিল, আর এই বিশ্বাসহন্তা প্রতি জন্মে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছে এই ধরাধামে, আর প্রতিবারেই উপকারের বিনিময়ে বোধিসত্ত্বের সর্বনাশ করবার চেষ্টা করেছে এবং প্রতি জন্মেই বোধিসত্ত্ব তাকে ক্ষমা করেছেন। শেষজন্মে বোধিসত্ত্ব যখন আবির্ভূত হলেন শাক্যসিংহ গোতমবুদ্ধরূপে, তখন সে-ও জন্মগ্রহণ করেছিল ঐ কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদেই—সিদ্ধার্থের অনুজ* দেবদত্তরূপে। কপিরাজের ভয় ছিল সেই কপি-দেবদত্তের মাধ্যমে যেন না জানাজানি হয়ে যায় এই আম্রবৃক্ষের অস্তিত্বের কথা।

মহাকপি-জাতক

ঘটনাচক্রে কোন একটি বানরের হস্তচ্যুত একটি আম গঙ্গাজলে পড়ে যায়, এবং সকলের অলক্ষ্যে সেটি স্রোতের টানে ভেসে যায় উত্তর দিকে—বারাণসীর দিকে। কোন একটি ধীবরের জালে সে ফলটি আট্‌কে যায়। ধীবর সেই দুর্লভদর্শন ফলটি নিয়ে যায় কাশীরাজের দরবারে—সসম্মানে উপহার দেয় বারাণসীরাজকে। মহারাজ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি অনুচরদের ডেকে বললেন, এই ফলবান বৃক্ষটির অবস্থান খুঁজে বার করতেই হবে। সসৈন্য কাশীরাজ গঙ্গাতীর ধরে দক্ষিণাভিমুখে চলতে থাকেন ; গঙ্গাস্রোতে যখন ভেসে এসেছে এ ফল, তখন নিশ্চয়ই গঙ্গাতীরে আছে এই বৃক্ষটি। অবশেষে সত্যই তিনি একসময় আবিষ্কার করে ফেলেন সেই রসাল বৃক্ষটিকে। বানর-সমাকীর্ণ সেই বৃক্ষটিকে দেখে মহারাজের দুরন্ত ক্রোধ হল, তিনি তীরন্দাজ বাহিনীকে আদেশ করলেন, কপিকুলের হাত থেকে বৃক্ষটি মুক্ত করতে। অসংখ্য সৈন্য মুহূর্তমধ্যে গাছটি ঘিরে ফেলে ; সপার্ষদ্ কপিরাজ বৃক্ষে বন্দী হয়ে পড়েন ; গাছ থেকে নেমে যে পালাবেন, তারও পথ রইল না।

বানর-দেবদত্ত দেখে এই সুযোগ ; সে অন্যান্য বানরদের বলে—বানররাজের জন্যই এ বিপদ। এস, আমরা আমাদের রাজাকে বন্দী করে কাশীরাজের কাছে সমর্পণ করি। তাহলে তিনি আমাদের ছেড়ে দিতে পারেন।

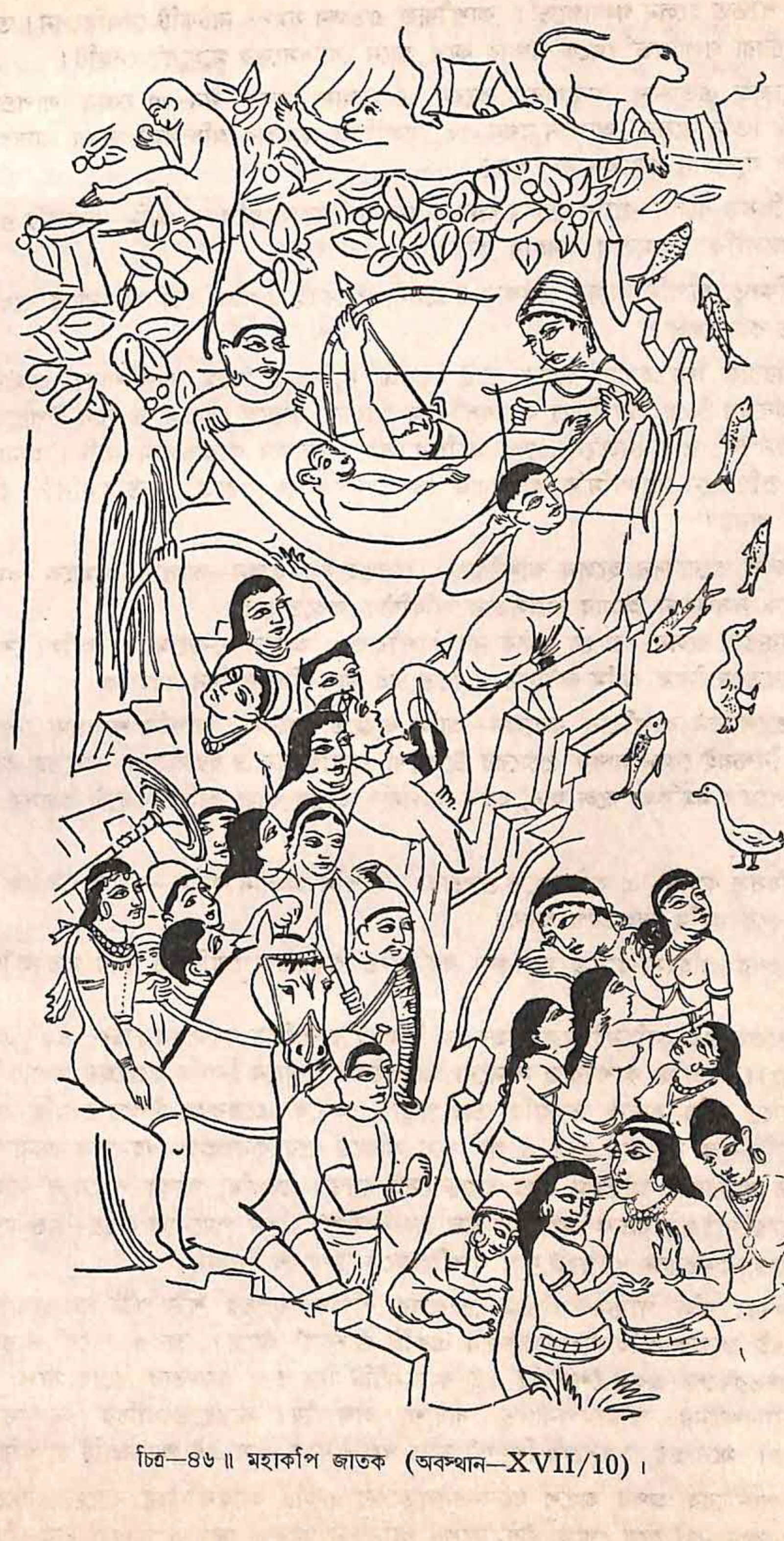
কিন্তু বোধিসত্ত্বের প্রতি বিশ্বস্ত অন্যান্য বানর প্রত্যাখ্যান করে এ ঘৃণিত প্রস্তাব। বোধিসত্ত্ব বানররাজ তখন নিরুপায় হয়ে নিজ অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে বাধ্য হলেন। নিজ দেহ বিস্তারিত করে তিনি গঙ্গার অপর তীরের একটি বৃক্ষকে হাত দিয়ে ধরেন—তাঁর বিশাল দেহ এভাবে লছমণঝুলার সেতুর মত গঙ্গার দুই প্রান্তে যোগসূত্র রচনা করল। বোধিসত্ত্ব বলেন—আমার এই দেহ-সেতুর উপর দিয়ে তোমরা গঙ্গার অপর পারে পলায়ন কর। আদেশমাত্র দলে দলে বানরকুল ঐ পথে গঙ্গার পরপারে পলায়ন করতে থাকে। বিস্মিত কাশীরাজ তীরন্দাজদের নিরস্ত্র করেন—বৃক্ষটিকে বানরশূন্য করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য ; তাছাড়া, তিনি এই অদ্ভুত ও অলৌকিক কাণ্ডের শেষ দেখতে কৌতূহলী হয়ে পড়েন।

একে একে আশি সহস্র বানর বিপন্মুক্ত হবার পর সর্বশেষে এগিয়ে আসে দেবদত্ত। সে-ও নিরাপদে ওপারে অতিক্রান্ত হয় ; কিন্তু দেহ-সেতু থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে উল্লম্ফনের সময় সেই বিশ্বাসঘাতক প্রবল পদাঘাতে বোধিসত্ত্বের মেরুদণ্ডের অস্থি স্থানচ্যুত করে দিয়ে যায়।

আশি সহস্র বানরের দেহভারে ক্লান্ততনু বোধিসত্ত্ব এ পদাঘাত সহ্য করতে পারলেন না—

---

* মতান্তরে, দেবদত্ত ছিলেন যশোধরার ভ্রাতা।



চিত্র—৪৬ ॥ মহাকপি জাতক (অবস্থান—XVII/10)।

সশব্দে পতিত হলেন গঙ্গাগর্ভে। কাশীরাজ এতক্ষণ সমস্ত নাটকটি দেখছিলেন। তাঁর আদেশে রাজানুচররা গঙ্গাগর্ভ থেকে উদ্ধার করে আনে বোধিসত্ত্বের মুমূর্ষু দেহটি।

মহারাজ এতক্ষণে অনুধাবন করেন, এ সামান্য বানর নন—এ কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা। সসম্ভ্রমে তিনি বলেন—আপনি যখন এত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তখন আমার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধদান করলেন না কেন?

বোধিসত্ত্ব বলেন—প্রাণি-হত্যার জন্য এ ক্ষমতা প্রয়োগ করি না আমি—আর্তের ত্রাণের জন্যই শুধু অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহার করি।

—কিন্তু আপনি যাদের উপকার করলেন, তাদেরই একজন তো আপনাকে বধের উদ্দেশ্যে পদাঘাত করে গেল?

বানররাজ স্মিতহাস্যে বলেন—তাই তো এ দুনিয়ার নিয়ম কাশীশ্বর! আমার এ আশি সহস্র অনুচর নিয়ে যদি নিত্য বারাণসীধামে আহার্য সংগ্রহে যেতাম, তাহলে উপদ্রুত হত সেই শান্ত জনপদ। তাই নির্জনে এদের ক্ষুন্নিবৃত্তির আয়োজন করেছিলাম আমি। আমার সে উপকারের প্রতিদানে মহাধার্মিক কাশীরাজ কি আমাকে বধ করতে উদ্যত হননি? দেবদত্ত তো সামান্য বানর!

লজ্জায় অধোবদন হলেন কাশীরাজ। জোড়হস্তে বলেন—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—আপনাকে সসম্মানে আমার রাজসভায় অধিষ্ঠিত করতে চাই।

বানররাজ বলেন—তা যে হবার নয় কাশীরাজ। আমার এ-জন্মের ভবলীলা শেষ হয়েছে। ভগ্ন মেরুদণ্ড নিয়ে আমি জীবিত থাকতে চাই না। বিদায় দিন আমাকে।

সাশ্রুলোচনে কাশীরাজ বললেন—আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি শাপভ্রষ্ট কোন দেবতা। আপনি নিশ্চয়ই কোন সদ্ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন এ ধরাধামে। অনুগ্রহ করে আমাকে সেই সদ্ধর্মের মর্মকথা বলে যান, যাতে আপনার আরব্ধ কাজ আমি কিছুটা অগ্রসর করে দিতে পারি।

বোধিসত্ত্ব বলেন—এ অতি শুভ প্রস্তাব। আপনি অবধান করুন—ধর্মের মূলকথা আপনাকে জ্ঞাপন করে আমি দেহত্যাগ করব।

অতঃপর অহিংসা-ধর্মের মূলকথা বর্ণনান্তে বানররাজ বোধিসত্ত্ব তাঁর মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন।

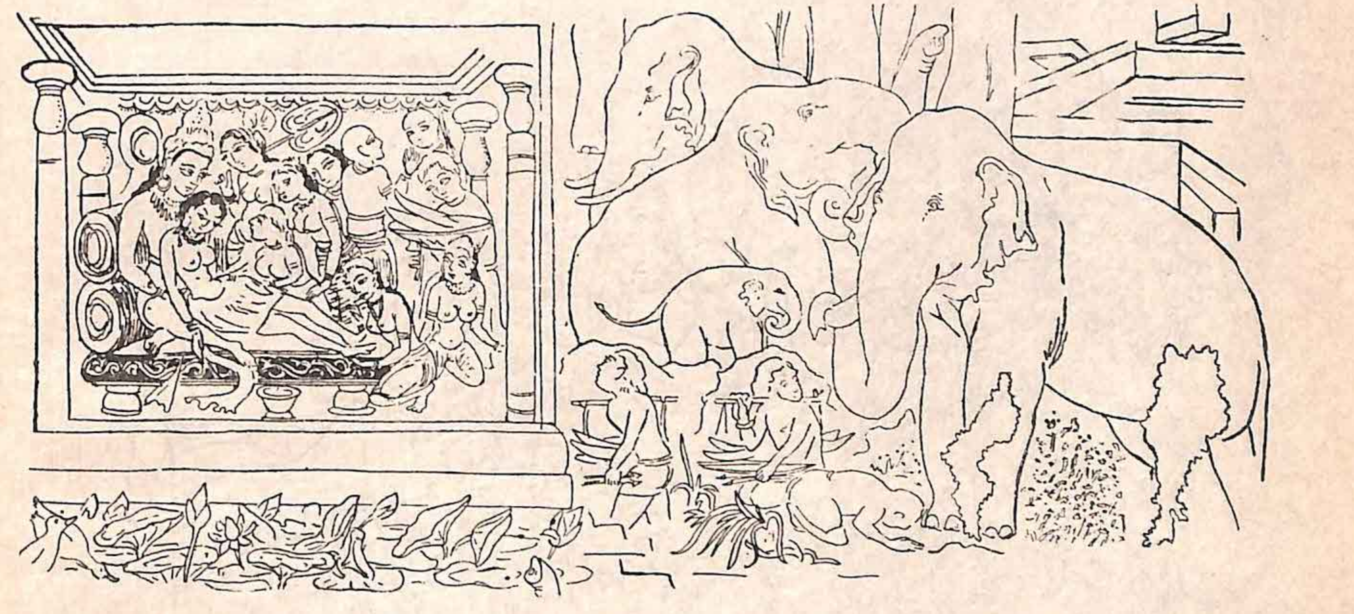
জাতকের এই কাহিনীটিকে অজন্তার শিল্পী রূপায়িত করেছেন (চিত্র—৪৬) এই প্রাচীরে (১৭।১০)। দেখছি, কাশীরাজ সসৈন্যে আম্রবৃক্ষের সন্ধানে নির্গত হয়েছেন গঙ্গাতীরে, সৈন্যদলের হাতে তীর, ধনুক, তরবারি, ভল্ল প্রভৃতি আয়ুধ...একেবারে উপরে দেখছি, গঙ্গার দুই তীরে দুটি বৃক্ষ যথাক্রমে হাত ও পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে বানররাজ দেহ-সেতু রচনা করেছেন—ভীতত্রস্ত বানরকুল অতিক্রম করে যাচ্ছে সেই সেতু।...দেখছি, পরের প্যানেলে আহত বানররাজের দেহ দুইজন বাহক নিয়ে আসছে রাজসকাশে।...শেষ প্যানেলে (চিত্র—৪৬-এর বাহিরে) দেখা যাচ্ছে, বানররাজ ধর্মচক্রমুদ্রায় কাশীরাজকে উপদেশ দিচ্ছেন।

প্রসঙ্গতঃ বলি, সাঁচির পশ্চিম তোরণের দক্ষিণ-স্তম্ভের শীর্ষপীঠ বা আবাকসের ঠিক নীচেই এই জাতক-কাহিনী অবলম্বনে একটি ভাস্কর্য আছে। তারও পূর্বে ভারহুতে-প্রাপ্ত একটি প্রস্তরখণ্ডে একই শৈলীতে এই কাহিনীটি বিধৃত। অজন্তার চিত্রের সঙ্গে সেই দুটি ভাস্কর্য-নিদর্শনের পরিকল্পনাগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ভারহুত-সাঁচির ভাস্কর্যই বয়সে প্রাচীনতর। মনে হয়, অজন্তার শিল্পী সাঁচি দর্শন করে এসে এই প্যানেলটি রূপায়িত করেন।

এই প্রাচীরের অপর অংশে ষড়দন্ত-জাতকের একটি কাহিনী-চিত্র আছে। চিত্রের নীচের অংশ অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে, ঊর্ধ্বাংশের খানিকটা আজও দেখতে পাওয়া যায় (চিত্র—৪৭)।

ষড়দন্ত-জাতক কাহিনীটি দশম গুহার অবলুপ্ত চিত্রাবলী বর্ণনা করার সময়েই বলেছি। এখানে চিত্রে দেখছি নীচে একটি পদ্মবনের আভাস। এ অংশটি প্রায় সম্পূর্ণ অবলুপ্ত—দু' একটি পদ্মফুল ও পদ্মপাতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গজরাজের উৎক্ষিপ্ত শুন্ডের প্রান্তভাগও নিম্নাংশে দেখা যাচ্ছে। উপরে দক্ষিণাংশে দেখছি, কাশী-রাজের মৃগয়াধিপতি শরসন্ধান করছে...দেখছি, বিশালকায় শ্বেতবর্ণের গজরাজ নিজ শুন্ডে আলিঙ্গন করে গজদন্ত বিচূর্ণ করছেন। মৃগয়াধিপতিকে পর পর চারবার আঁকা হয়েছে। প্রথমবার সে শরসন্ধানরত, দ্বিতীয়বার সে গজদন্ত-কাঁধে ফিরে যাচ্ছে—কিন্তু তার দৃষ্টি গমন-পথের বিপরীত দিকে, সে যেন ফিরে ফিরে দেখছে। তৃতীয়বার দেখছি, মৃগয়াধিপতি ফিরে এসে গজরাজের চরণপ্রান্তে প্রণাম করছে ; চতুর্থ চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, সে এসে উপস্থিত হয়েছে স্তম্ভশোভিত এক মন্ডপের সম্মুখে। অর্থাৎ এই চতুর্থ আলেখ্যে আমরা দৃশ্যান্তরে এসে পড়ছি। দুই দৃশ্যের মাঝখানে রয়েছে মন্ডপের একটি শোভাস্তম্ভের যতি-চিহ্ন। মন্ডপের ভিতরে দৃশ্যান্তরে দেখছি, অনুচর একটি স্বর্ণ-থালিকায় গজদন্ত নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে রাজা-রানীর সম্মুখে।

ষড়দন্ত-জাতক



চিত্র—৪৭ ॥ ষড়দন্ত-জাতক (অবস্থান—XVII/11)।

কাশীরাজ ও রানী বসে আছেন একটি অনুচ্চ পালঙ্কে। রাজার পিছনে নক্শা-কাটা উপাধান। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, গজদন্ত দেখে রানীর পূর্ব-অভিজ্ঞান ফিরে এসেছে—তিনি মূর্ছাতুরা। কাশীরাজ পতনোন্মুখ রানীর দেহবল্লরীকে আলিঙ্গনবন্ধ করেছেন। মন্ডপে আরও আটজন নরনারীর আলেখ্য—সকলেই ভীত চকিত সন্ত্রস্ত।

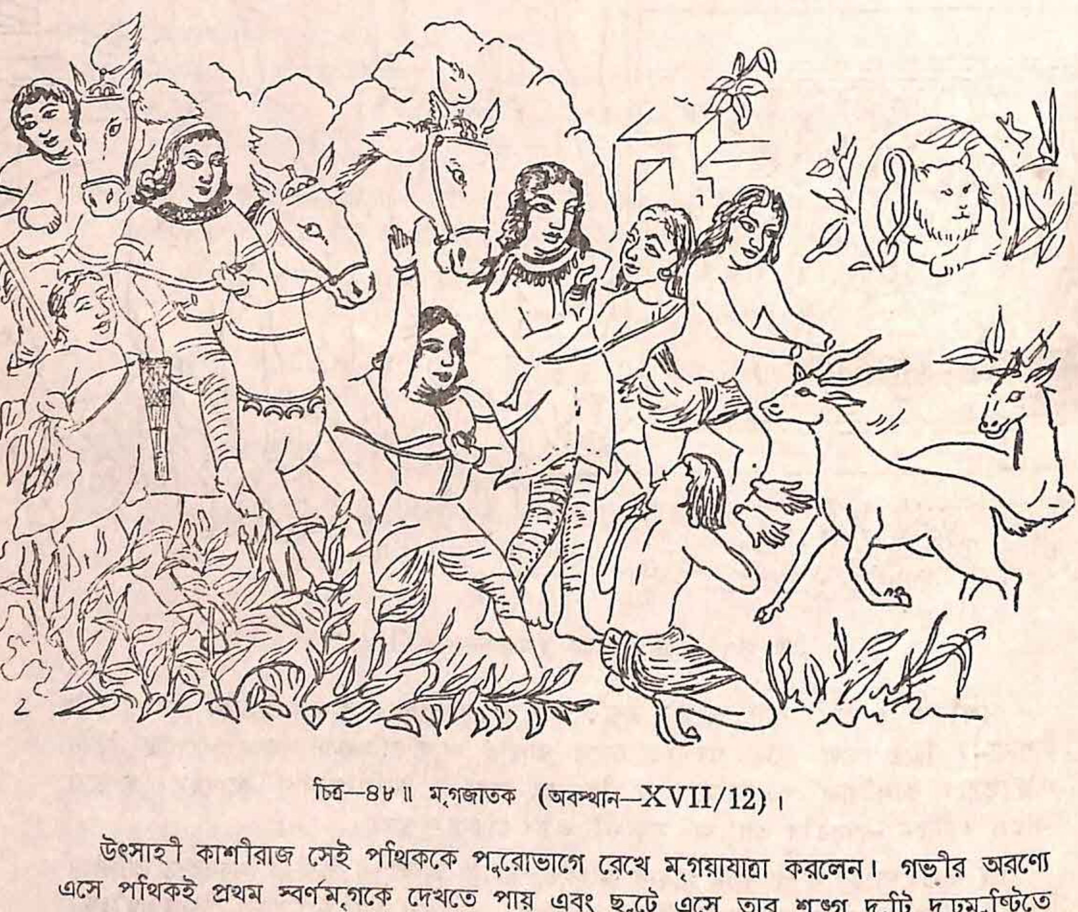
এই খন্ডদৃশ্যটির সঙ্গে দশম গুহায় অঙ্কিত, অধুনা অবলুপ্ত চিত্রটির বিষয়বস্তু অভিন্ন। কিন্তু দুটি চিত্রের পরিকল্পনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। সেখানে রানী উপবিষ্টা—তিনি মর্মাহতা মাত্র, তখনও তিনি মূর্ছাহতা হন্‌নি। এখানে দেখছি, তাঁর দেহভার রক্ষা করছেন কাশীরাজ—রানী পতনোন্মুখ। বরং এই চিত্রটির সঙ্গে পরিকল্পনার দিক থেকে অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ষোড়শ বিহারে অঙ্কিত জনপদ-কল্যাণীর মৃত্যুদৃশ্যের সঙ্গে (চিত্র—৪১)। এছাড়া, এই বিহারেরই অলিন্দে বিশ্বান্তর ও মাদ্রীর যে যুগলচিত্রটি আছে (১৭।৩), তার সঙ্গে রাজা-

রানীর বসবার ভঙ্গি, পারিষদ্‌দের ভীতচকিত দৃষ্টি এবং মণ্ডপের বহিরঙ্গের পরিকল্পনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কেন্দ্রস্থিত দ্বারের অপর পার্শ্বে ছিল মৃগ-জাতকের একটি কাহিনী (১৭।১২) এটিও প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে—আভাসমাত্র দেখা যায়। প্রাচীন একটি অনুলিপির সাহায্যে দু'টি চিত্র এখানে সন্নিবেশিত করে দিলাম। প্রথমে কাহিনীটা বলি : সেবার বোধিসত্ত্ব এক স্বর্ণমৃগের রূপ ধরে ধরাধামে অবতীর্ণ। গভীর অরণ্যচারী তিনি, সদা-শঙ্কিত—কোন

মৃগজাতক

শিকারী যেন তাঁর সন্ধান না পায়। একদিন এক পথিক পথ হারিয়ে অরণ্য-রোদন করছে দেখে দয়া-পরবশ হয়ে বোধিসত্ত্ব তাকে উদ্ধার করে দিলেন। অরণ্যের সীমান্তে এনে গ্রামের পথ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার কথা যেন কাউকে বল না'। ইতিমধ্যে কাশীরাজ-মহিষী ক্ষেমা স্বপ্ন দেখলেন যে, অরণ্যে একটি স্বর্ণমৃগ বিচরণ করছে। তিনি রাজাকে বললেন, সেই স্বর্ণমৃগ তাঁর চাই। যথারীতি কাশীরাজ ঘোষণা করলেন—স্বর্ণমৃগের সন্ধান যে দিতে পারবে তাকে তিনি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। কৃতঘ্ন পথিকটি লোভ সামলাতে পারল না। কাশীরাজকে তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা জানালো, এবং সেই মৃগ কোন অরণ্যে অবস্থান করে তা স্বয়ং দেখিয়ে দিতে রাজী হল।



চিত্র—৪৮॥ মৃগজাতক (অবস্থান—XVII/12)।

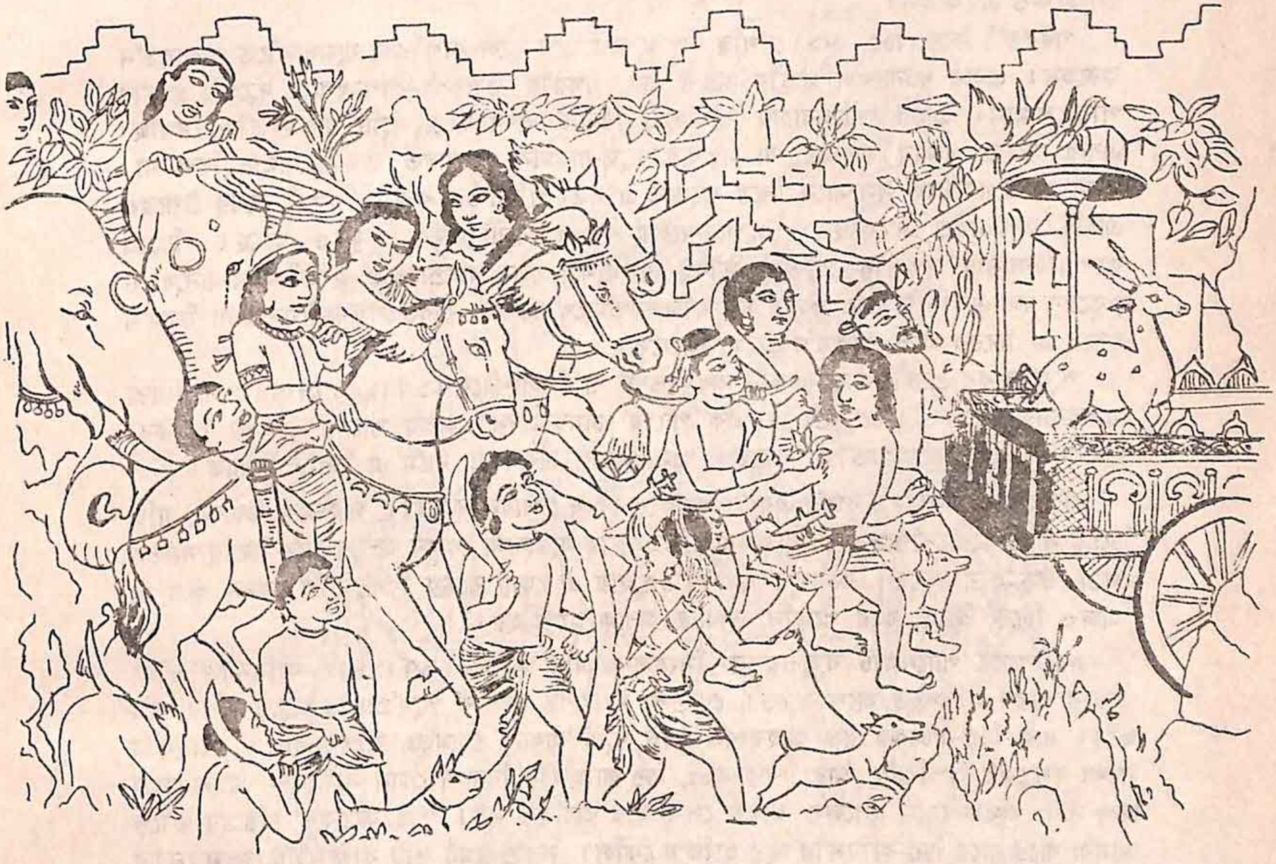
উৎসাহী কাশীরাজ সেই পথিককে পুরোভাগে রেখে মৃগয়াযাত্রা করলেন। গভীর অরণ্যে এসে পথিকই প্রথম স্বর্ণমৃগকে দেখতে পায় এবং ছুটে এসে তার শৃঙ্গ দুটি দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে। তৎক্ষণাৎ মণিবন্ধ থেকে তার হাত দুটি খসে পড়ে। যন্ত্রণায় পথিক আর্তনাদ করে ওঠে। স্তম্ভিত রাজা তখন স্বর্ণমৃগকে প্রশ্ন করেন, সে কেমন করে এমন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হল। স্বর্ণমৃগ বললে, মহারাজ, আমি সামান্য মৃগ, এই অরণ্যের একান্ত আবাসে আপনমনে সাধন-ভজন করি। ঐ কৃতঘ্ন পথিকের হস্তদ্বয় দেহচ্যুত হওয়ার ব্যাপারে

আমার কোন ভূমিকা নাই। যে বনদেবী আমাকে রক্ষা করেন তিনিই ওর এই শাস্তি বিধান করেছেন।

কৌতূহলী কাশীরাজ প্রশ্ন করেন, স্বর্ণমৃগ কেন ঐ লোকটাকে কৃতঘ্ন বলছেন।

প্রত্যুত্তরে মৃগরাজ পূর্ববৃত্তান্ত সমস্ত খুলে বলেন। তখন মহারাজ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সেই অকৃতজ্ঞ পথিককে হত্যা করতে স্বয়ং শরসন্ধান করেন। মৃগরাজই তাঁকে প্রতিহত করে বলেন, মহারাজ ও ইন্দ্রিয়ের দাস। ওকে এভাবে হত্যা না করে বরং কী-ভাবে ইন্দ্রিয়-সংযম করতে হয় তাই আপনি ওকে শেখান। সদ্ধর্মের বাণী ওকে শোনান।

রাজা সবিস্ময়ে বলেন, সেটা কী-রকম?



চিত্র—৪৯ ॥ মৃগজাতক (অবস্থান—XVII/12)।

অতঃপর মৃগরাজ অহিংসা-ধর্মের মর্মকথা বলতে থাকেন। আদ্যন্ত শুনে মহারাজ বলেন, মহাভাগ! এ ধর্মের ব্যাখ্যা আপনাকে আমার রাজসভায় এসে পুনরায় করতে হবে। কাশীরাজ-মহিষী স্বয়ং আপনার মুখে সদ্ধর্মের মর্মকথা শুনতে চান। মৃগরাজ সম্মত হলেন। তখন মহারাজ সুবর্ণমণ্ডিত রথে মৃগরাজকে সগৌরবে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। ক্ষেমাদেবীর মনোবাসনা পূর্ণ হল। সদ্ধর্মের প্রচার হল।

এই জাতক-কাহিনীটি শিল্পী কি-ভাবে রূপায়িত করেছেন এবার আমরা তাই দেখব। প্রথম দৃশ্যে (চিত্র—৪৮) দেখছি কাশীরাজ সসৈন্য অরণ্যে প্রবেশ করছেন। চিত্রের বামপ্রান্তে তিনজন অশ্বারোহী ও একজন পদাতিক। তারপর দেখছি ভূতলে দণ্ডায়মান পথিক তার দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করে সৈন্যদলকে থামতে বলছে—সে যেন বলছে যে, স্বর্ণমৃগকে সে

দেখতে পেয়েছে। চিত্রের দক্ষিণার্ধ হচ্ছে পরবর্তী দৃশ্য। দেখছি মৃগরাজের শৃঙ্গদ্বয় দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরতে পথিক দুই বাহু প্রসারিত করেছে, কিন্তু মণিবন্ধ থেকে তার হাত দুটি কর্তিত। লক্ষ্য করলে দেখবেন তার পায়ের কাছে দুটি কাটা হাত পড়ে আছে। শিল্পী মৃগরাজের পিছনে তাঁর নায়িকা মৃগীকেও এঁকেছেন—লক্ষণীয় মৃগী কিন্তু সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ, তিনি জানেন বনদেবী তাঁদের রক্ষা করবেন। এই দৃশ্যে দেখছি কাশীরাজ (চিত্রের কেন্দ্রস্থলে) অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে ভূতলে দণ্ডায়মান। তাঁর দক্ষিণহস্তের মুদ্রা বিস্ময়সূচক, তাঁর দৃষ্টিতেও একই ব্যঞ্জনা। রাজার পদতলে পথিককে পুনরায় দেখতে পাচ্ছি—এবার সে যন্ত্রণায় নতজানু হয়েছে। অকুস্থল যে গভীর অরণ্য তার প্রমাণস্বরূপ শিল্পী গুহাভ্যন্তরে এক সিংহকেও এঁকেছেন।

পরবর্তী চিত্রে (চিত্র—৪৯) দেখছি স্বর্ণমৃগকে রথে তুলে কাশীরাজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করছেন। এবার ঘটনাস্থল গভীর অরণ্য নয়, নগরীর উপকণ্ঠ—পশ্চাৎপটে দুর্গের প্রাচীর পরিদৃশ্যমান। এবার শোভাযাত্রায় পূর্বদৃষ্ট তিনটি অশ্ব ছাড়া দুটি রাজহস্তীও দেখছি। এবার রাজার মাথায় রাজছত্র, যা গতবার দ্রুত-ধাবমান মৃগয়ারত রাজার মাথায় ছিল না। রাজা যে মৃগরাজকে সসম্মানে নিয়ে যাচ্ছেন এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে শিল্পী রথের উপরেও একটি সম্মানছত্র এঁকেছেন। মৃগয়া-দলের সঙ্গে দুটি-চারেক কুকুরও আছে। চিত্রের কম্পোজিসানটি লক্ষণীয়—প্রতিটি জীবই একমুখী, যেন বামপ্রান্তের হস্তী-অশ্ব-মানুষ ও কুকুরের দল একটি তীরের ফলার মত দক্ষিণাভিমুখে চলেছে—এবং সেই তীরের ফলা নির্দেশ করছে এ চিত্রের মূল আকর্ষণ ঐ মৃগরাজকে।

পূর্বদিকের প্রাচীর-গাত্রে একটি অর্ধ-স্তম্ভ বা পিলাস্টারে (১৭।১৩) দেখছি প্রসাধনরতা রাজকন্যার আলেখ্য (চিত্র—৫০)। এক পার্শ্বে চামরবাদিনী অপর পার্শ্বে একজন কিঙ্করী প্রসাধন সামগ্রী নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। 'প্রসাধনরতা রাজকন্যা' নামে এ চিত্রটি বিখ্যাত।

রাজকন্যার বামহস্তে দর্পণ এবং দক্ষিণকরে কোন প্রসাধন সামগ্রী। গাইডকে বলবেন, বাতি চিত্রের নীচে ধরে দেখিয়ে দেবে রাজকন্যার শতনরীর মুক্তাদানা কেমন অদ্ভুতভাবে চিত্রের সমতল থেকে উঁচু হয়ে আছে। অনাদৃত এ পর্বতগুহায় ঐ ছোট্ট রঙের বিন্দুগুলি কেমন করে যে আজও টিকে আছে, ঝরে পড়েনি, ভাবলে অবাক হতে হয়।

এর পরের প্যানেলটি বৃহদায়তন—সিংহল-অবদান জাতক (১৭।১৪)। কাহিনীও দীর্ঘ, তার রূপায়ণও বিস্তৃত অংশ জুড়ে। কেন্দ্রস্থ মণ্ডপের সম্পূর্ণ পূর্বপ্রাচীর জুড়ে ছবির পরে ছবি। এই চিত্র-নাটকের রস আহরণেও সেই দুটি বাধা ; প্রথমতঃ, জাতক-বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে দর্শকের অপরিচয়, আর দ্বিতীয়তঃ, চিত্র-কাহিনীর বিন্যাস কোন সুসংবদ্ধ আইন মেনে চলে না। অথবা মেনে চললেও আমরা সে-বিষয়ে অবহিত নই। তাই কয়েকশ' চরিত্রের ভীড়ে আমরা বারে বারে চিত্র-কাহিনীর সূত্র হারিয়ে ফেলি। সর্বপ্রথমেই তাই কাহিনীটি জেনে নেবার চেষ্টা করা যাক :

জম্বুদ্বীপে সিংহকল্প মহাজনপদে মহারাজ সিংহকেশরীর রাজত্বে বাস করতেন একজন ধনী বণিক, সিংহক। তাঁর একটি পুত্রসন্তান হল ; সিংহক নবজাতকের নাম রাখলেন সিংহল। শিশু সিংহল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, নানা বিদ্যায় সে অচিরে পারদর্শী হয়ে উঠল। পুত্রের বিবাহ দিতে চাইলেন পিতা—কিন্তু সিংহলের ইচ্ছা, সে প্রথমে বাণিজ্যযাত্রায় যাবে। বণিকপুত্র অন্ততঃ একবার সমুদ্রযাত্রা না করে কি ঘর-সংসারে মন দিতে পারে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিংহককে অনুমতি দিতে হল। নানা পণ্যে বাণিজ্যতরী সাজিয়ে সিংহল মধুকর ডিঙায় রওনা হয়ে পড়ল—দূর দেশের সন্ধানে, সমুদ্রপথে।

সিংহল-অবদান

নানা দেশে বাণিজ্যের লেন-দেন করে লাভবান হল বণিক। দেশ-বিদেশের বাণিজ্যসম্পদে পূর্ণ হল পণ্যপোত। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে একটি অ-পূর্বজ্ঞাত দ্বীপে অবতরণ করল বণিক সম্প্রদায়। দ্বীপটির নাম তাম্রদ্বীপ—ইতিপূর্বে জম্বুদ্বীপের বণিক কখনও আসেনি

এ দ্বীপে। সমুদ্রমেখলা এই দ্বীপে কোন পুরুষমানুষ নেই। বণিকদল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে দেখে—এ এক প্রমীলারাজ্য! অপূর্ব-সুন্দরী নারীর দল স্বাগত সম্ভাষণ জানাল ওদের। স্তম্ভিত বিস্মিত বণিকের দল সে নারী-রাজ্যে আতিথ্য গ্রহণ করল। এক-একজন গৃহস্বামিনীর ভবনে স্থান লাভ করল এক-একজন বণিক। শুধু সুখাদ্য ও সুপেয়ই নয়, দীর্ঘদিন সমুদ্র-যাত্রায় ক্লান্ত এই নাবিকদের শয্যাসঙ্গিনী হতেও আপত্তি নেই তাদের—এ-ও যে আতিথ্য-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত! একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায় জম্বুদ্বীপের বণিকদল।



চিত্র—৫০ ॥ প্রসাধনরতা রাজকন্যা (অবস্থান—XVII/13)।

শুধু কি জানি, কোন অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে সচেতন হয়ে ওঠে সিংহল। কিসের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে যেন অস্বস্তি অনুভব করতে থাকে ক্রমাগত। দলপতি সিংহলকে সাদরে আমন্ত্রণ করে নিজ প্রাসাদে নিয়ে এসেছিল তাম্রদ্বীপের অনিন্দ্যকান্তি রাজকুমারী স্বয়ং। মণি-দীপিত প্রমোদ-কক্ষে আহার-পানীয়-ব্যসনে আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই; লাস্যময়ী নর্তকীর দল, বাদ্যযন্ত্রীর দল বণিক-পুত্রের আনন্দদানে কার্পণ্য করে না—স্বয়ং রাজকুমারী তার যৌবনোদ্ধত

রূপের পসরা সাজিয়ে ইঙ্গিত করে বারে বারে ; কিন্তু বণিক-পুত্রের হৃদয়ে কেমন যেন সাড়া জাগে না। তার কেবলই মনে হয়—এ কেমন রাজ্য? পুরুষমানুষ এখানে একেবারেই নেই কেন? কেমন করে তাহলে এরা প্রজননের পথে জনসংখ্যা বজায় রাখে? রাজ্যে একটিও অসুন্দরী মেয়ে নজরে পড়ল না কেন? সমস্ত আয়োজন এত কৃত্রিম মনে হচ্ছে কেন? জম্বুদ্বীপের এতাবৎ কালের বণিককুল এই লোভনীয় দ্বীপটিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন কেন? কেন-কেন-কেন? রাজকুমারীর মদন-মন্দিরে পূজারাতির সমস্ত আয়োজনের উপরে ক্রমাগত প্রশ্নবোধক চিহ্নের বৃষ্টিতে বণিক-পুত্র মুগ্ধ হল যতটা, সতর্ক হল তার চতুর্গুণ।

আর এই সতর্কতাই রক্ষা করল তাকে—একমাত্র তাকেই। পাঁচশ, অনুচরকে হারিয়ে রিক্ত বণিক একেবারে একাই ফিরে আসতে পেরেছিল সেই তাম্রদ্বীপ থেকে।

তাম্রদ্বীপের অধিবাসিনীরা বস্তুতঃ রাক্ষসী—মোহময়ী নারীর রূপ ধরে তারা বণিকদের নিয়ে যেত স্বগৃহে। রাত্রে তাদের হত্যা করে নরমাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। তাম্রদ্বীপবাসিনী রাজকুমারীকে ত্যাগ করে কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এল সিংহল নিজদেশে। কুহকময়ী রাজ-কুমারী কিন্তু তবু তার আশা ছাড়ে না। সদ্যোবিবাহিতা এক নারীর রূপ ধরে পথে-পাওয়া একটি শিশুপুত্র-ক্রোড়ে সে এসে উপনীত হল সিংহকল্প মহাজনপদে। সিংহলের পিতার কাছে সে আবেদন জানায় যে, সিংহল তাকে বিবাহ করেছে, তার পুত্রসন্তানও হয়েছে ; কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে ঝড় হওয়ায়, অমঙ্গলময়ী-জ্ঞানে তাকে ত্যাগ করে এসেছে। এই অসহায়া নারীর করুণ আবেদনে সিংহক পুত্রকে ডেকে আদেশ করলেন তাকে গ্রহণ করতে ; কিন্তু সিংহল যখন সমস্ত গোপন কথা ব্যক্ত করে দিল, তখন ঐ ছদ্মবেশী রাক্ষসীকে তিনি গৃহ থেকে দূর করে দিলেন। সরোদনে রাক্ষসী এসে আবেদন করল রাজদরবারে' এখানেও মহারাজ সিংহকেশরী মুগ্ধ হলেন তার করুণ কাহিনী শুনে ; ডেকে পাঠালেন বণিক-তনয়কে। এবারও সিংহল ব্যক্ত করল তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, কিন্তু মহারাজ সিংহকেশরী বিশ্বাস করলেন না তার কথা। প্রত্যাখ্যাতা ছদ্মবেশিনী সুন্দরীকে স্থান দিলেন নিজ রাজ-অন্তঃপুরে।

সেই রাত্রে রাক্ষসী হত্যা করল রাজাকে। আর সেই রাত্রেই আকাশপথে তাম্রদ্বীপ থেকে উড়ে এসেছিল রাক্ষসী রাজকুমারীর শত সহচরী। দুর্গদ্বার খুলে দিল দুর্গান্তরবাসিনী রাজকন্যা ; সমস্ত রাত্রিব্যাপী হত্যার উৎসব চলল রাজ-অন্তঃপুরে।

পরদিন সকালে সংবাদ পেয়ে সিংহল আক্রমণ করল সে দুর্গ। যুদ্ধ হল সিংহলের অনুচর-দলের সঙ্গে রাক্ষসীদের। শেষ পর্যন্ত পরাজিত রাক্ষসীদল আকাশপথে পলায়ন করল তাম্রদ্বীপে।

শোকসন্তপ্ত সিংহকল্প অধিবাসীরা তখন সিংহলকেই তাদের অধিপতি করতে চাইল। বণিকপুত্র সিংহল বললে—সে শাসনদণ্ড গ্রহণ করতে অসম্মত নয়, কিন্তু একটি শর্ত আছে। সিংহকল্প অধিবাসীরা সানন্দে জানায় তারা সিংহলের আরোপিত সকল শর্তই মেনে নিতে রাজী। তখন সিংহল বলে—তাম্রদ্বীপবাসিনী রাক্ষসীদের উপর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে সিংহাসনে বসতে রাজী নয়। যদি সিংহকল্প অধিবাসীরা তার সঙ্গে তাম্রদ্বীপে যুদ্ধযাত্রা করতে সম্মত হয়, তবেই সে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সম্মত।

তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল ওরা। বিরাটাকার অর্ণবপোতে সৈন্যদলকে সাজানো হল। সিংহল স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করে সে অভিযানে। সদলবলে সিংহল এল তাম্রদ্বীপে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল দুই পক্ষে ; কিন্তু অমিতবিক্রম সিংহলের শৌর্যবীর্যের কাছে নিঃশেষে পরাভূত হল রাক্ষসীকুল। সিংহল হলেন 'বিজয়-সিংহল'। রাক্ষসীদের বিতাড়িত করে তাম্রদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করল আর্য জম্বুদ্বীপবাসীরা। দ্বীপের নূতন নামকরণ করা হল 'সিংহল'। মহা আড়ম্বরে অভিষেক-উৎসব উৎযাপিত হল বিজয়-সিংহলের।

বিস্তৃত পূর্বপ্রাচীর জুড়ে এই কাহিনীটিকে রূপায়িত করেছেন শিল্পী। প্রথমেই দেখছি সিংহলের প্রথম সমুদ্রযাত্রায় বাণিজ্যতরী জলমগ্ন হচ্ছে (১৭।১৪)। বিষয়-বস্তু ও কম্পোজিসনের

দিক থেকে এই খণ্ডচিত্রটি পূর্ণ-অবদান জাতকের নৌকাডুবি দৃশ্যের সঙ্গে তুলনীয়। আমার তো মনে হল, পূর্ণ-অবদান দৃশ্যটিতেই উন্নততর শিল্পশৈলী বিদ্যমান। সেই শ্রেণীগত ছান্দ্যসিক কম্পোজিসনে চৈনিক প্রভাব লক্ষ্য করেছিলাম—এখানে নৌকাডুবি চিত্রটি আরও বাস্তব, কিন্তু এতে যেন বীভৎসরসের বাহুল্য। বোধ করি সম্পূর্ণ কাহিনীটির বীভৎস ও রুদ্র রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়েই শিল্পী এভাবে রূপায়িত করেছেন এই দৃশ্যটি। দেখছি, অনেক নাবিক জলে পড়ে গেছে, অনেকে মৃত্যু ভয়াতুর।

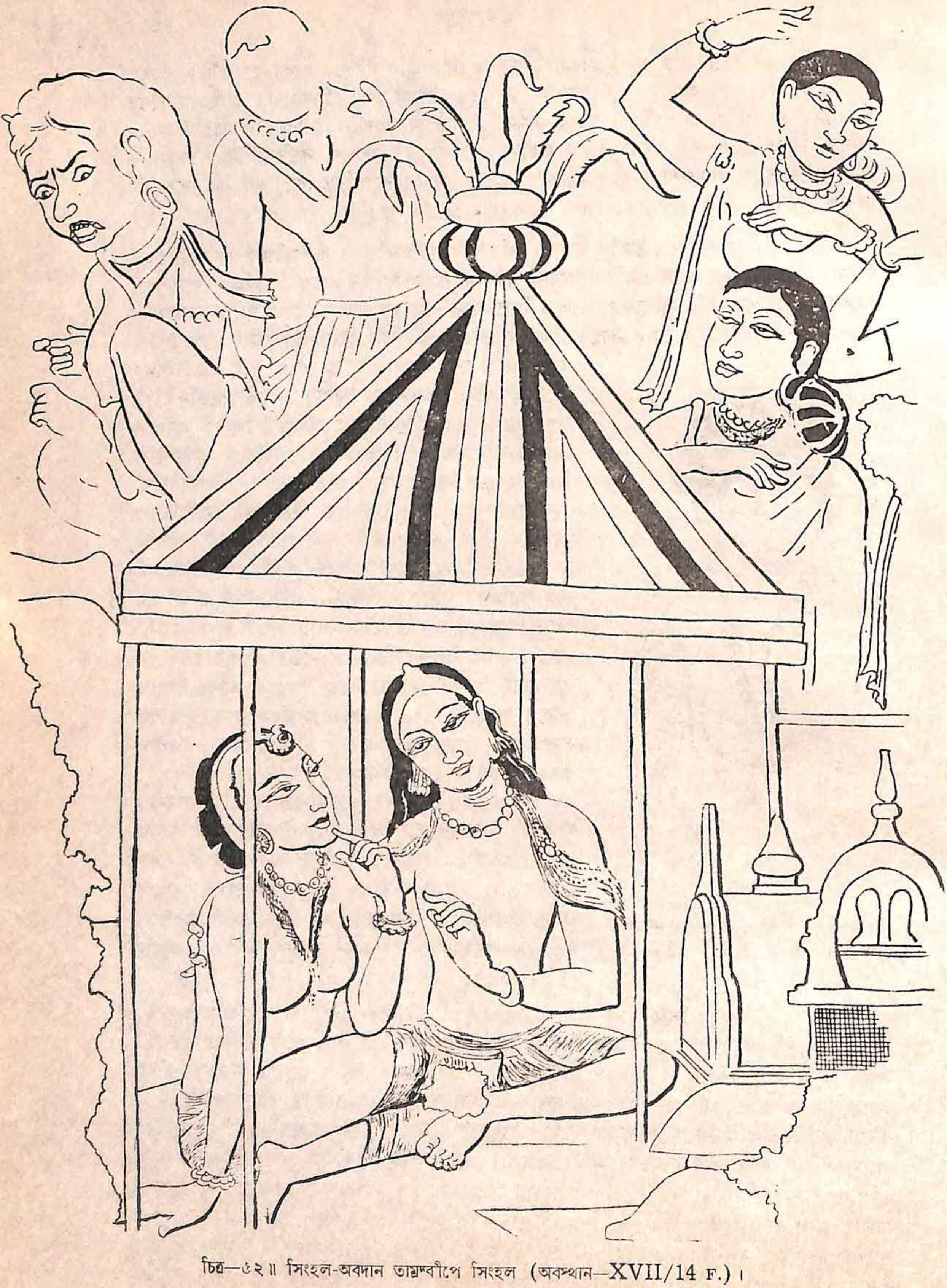
পরের দৃশ্য তাম্রদ্বীপের প্রমীলারাজ্য। নাবিকেরা মোহিনীরূপা রাক্ষসীদের আতিথ্য গ্রহণ করছে। চিত্র—৫১-এ অমন একটি ছদ্মবেশী মদালসা রাক্ষসীর চিত্র এঁকে দিয়েছি। খসে-পড়া পলেস্তারা-অংশে একটি নাবিকের আলেখ্য ছিল, তার বামহস্তটি শুধু দেখা যাচ্ছে—রাক্ষসীর বামস্কন্ধের উপর দিয়ে ঘুরে এসেছে। রমণীমূর্তির কবরীবন্ধন রীতি লক্ষণীয়, আরও দ্রষ্টব্য ওর কর্ণাভরণ। আর্য নারীর কর্ণে দুই ডিজাইনের দুটি অলঙ্কার অজন্তায় আমার নজরে পড়েনি। ঐ কর্ণাভরণের সূক্ষ্ম ডিজাইনের মাধ্যমেই শিল্পী বুঝিয়ে দিয়েছেন মেয়েটি বিজাতীয়া।...দেখছি, পাশাপাশি তিনটি খোপে তিন জোড়া মিথুন-মূর্তি। শিল্পী তাঁবু ও সামিয়ানা এঁকে বোঝাতে চেয়েছেন নাবিকদের সাময়িক স্থান-সঙ্কুলানের জন্য প্রমীলারানী ব্যাপক ব্যবস্থা করেছেন। একটি তাঁবুতে দেখছি, আশ্লেষশয়না এক মোহিনী জনৈক নাবিককে চষকপূর্ণ সুরা এগিয়ে দিচ্ছে। এমনই একটি মিলন-মধুর তাঁবুর দৃশ্য নমুনা-স্বরূপ এঁকে ছিলাম চিত্র—৫২-তে। তাঁবুর ভিতরের লাস্যময়ী সুন্দরী নারীর প্রকৃত-স্বরূপ আঁকা হয়েছে তাঁবুর বাহিরে—উপর অংশে। সেখানে তারা ছদ্মবেশ ত্যাগ করে রাক্ষসীবেশে হত্যার উৎসবে মগ্ন,—রক্তপান করছে, নরমাংস ভক্ষণ করছে (১৭।১৪-খ)।



চিত্র—৫১॥ সিংহল-অবদান ছদ্মবেশী রাক্ষসী (অবস্থান—XVII/12 G.)।

এর পরে একটি শ্বেতবর্ণের অশ্বকে দেখা যাচ্ছে। বস্তুতঃ, জাতকমতে, সিংহলের উদ্ধারকার্যের মূলে ছিলেন একজন শ্বেতবর্ণের পক্ষিরাজ অশ্ব—তিনি স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। চিত্রে দেখা যাচ্ছে অশ্বরাজের পিঠে সিংহল ফিরে এসেছে সিংহকল্প জনপদে।...অশ্ব থেকে অবতরণ করে সে উপকারী বোধিসত্ত্ব-অশ্বরাজকে প্রণাম করছে (১৭।১৪-গ)।

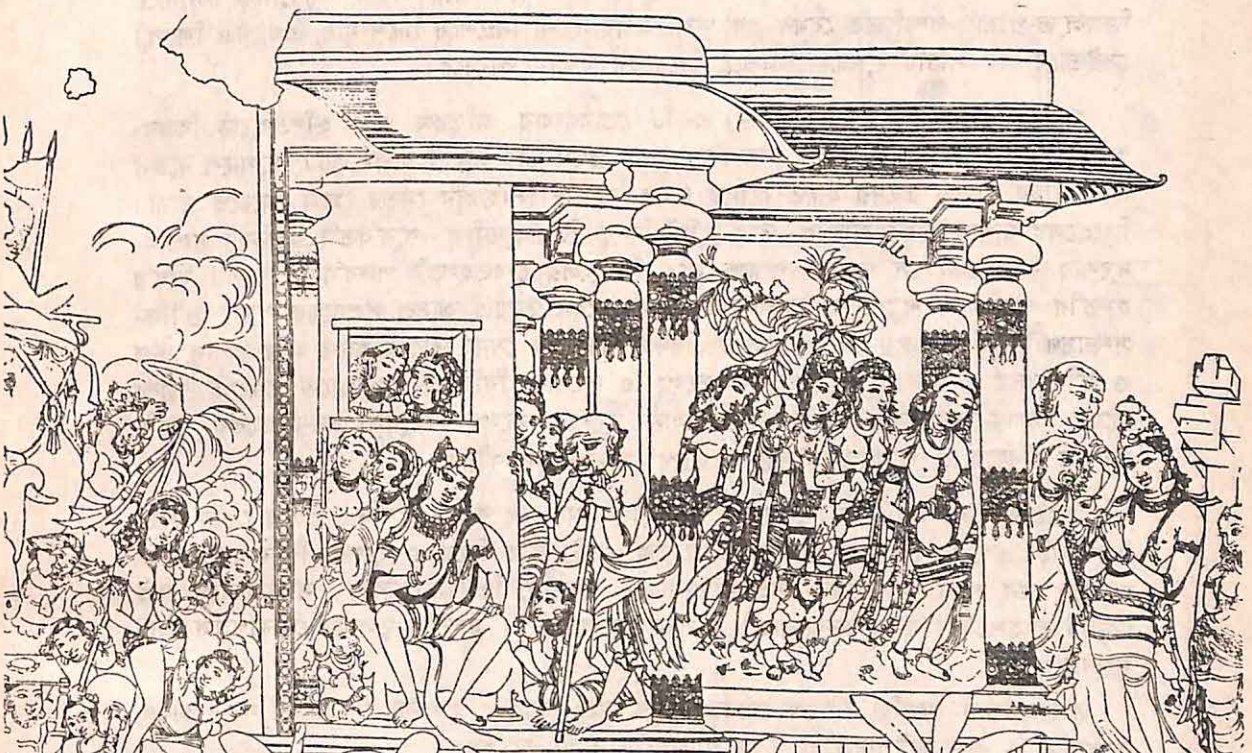
এই দৃশ্যের দক্ষিণে সিংহকেশরীর দরবারদৃশ্য (১৭।১৪-ঘ)। এই অবলুপ্ত-প্রায় অপূর্ব চিত্রটির একটি অনুলিপি করেছিলেন শিল্পী সৈয়দ আহ্‌মেদ, এই শতাব্দীর প্রারম্ভে। তারই একটি অনুলিপি এখানে সংযোজিত হল (চিত্র—৫৩)। বাম প্রান্তে দেখছি রাক্ষসী-রানী সিংহলের স্ত্রীর পরিচয় বহন করে রাজসভায় এগিয়ে আসছে। অপরূপা এই নারীমূর্তি—বত্তিচেল্লির ভেনাস অথবা আঁগরের লা-সুর্সের সঙ্গে তুলনীয়। দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর, যেন তার দেহভার নাই। বামন কিঙ্কর-কিঙ্করী নানান গন্ধপাত্র বহন করে এগিয়ে আসছে—নিশান, পতাকা ও পুষ্পমাল্য নিয়ে সে এক আশ্চর্য শোভাযাত্রা। ডানদিকে দেখছি সম্মুখভাগে বসে আছেন রাজা সিংহকেশরী, তিনি আগন্তুকার রূপে মুগ্ধ। তাঁর পাশেই মহামন্ত্রী যষ্টিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, তিনি চিন্তান্বিত, আতঙ্কগ্রস্ত। গবাক্ষে দেখছি দুজন রাজমহিষীকে—তাঁরা নবাগতার আবির্ভাবে মর্মাহতা। আরও দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে



চিত্র—৫২ ॥ সিংহল-অবদান তাম্রদ্বীপে সিংহল (অবস্থান—XVII/14 F.)।

সিংহকেশরী নবাগতাকে গ্রহণ করেছেন—নবাগতা একটি অনাথ বালকের হাত ধরে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও সেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মহামন্ত্রীকে আবার আঁকা হয়েছে।

কাহিনীর পারম্পর্য অনুসারে এর পরবর্তী দৃশ্যটি অনেকটা দূরে আঁকা (১৭।১৪-ঙ)। এ ঘটনা সেইদিন রাত্রের। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দুটি নগর-তোরণের মাঝখানে দুর্গের প্রবেশপথ। বামদিকে ত্রিতলে মহারাজ সিংহকেশরীকে হত্যা করেছে তাম্রদ্বীপবাসিনী রাক্ষসী। এখানকার চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে ; কিন্তু দ্বিতলে যে ধ্বংসলীলা চলেছে, তা এখনও স্পষ্ট দেখা যায়।... পাশাপাশি তিনটি গবাক্ষ। প্রত্যেকটিতেই একটি করে রাক্ষসী ও তিন-চারটি জম্বুদ্বীপবাসী। মহানন্দে রাজান্তঃপুরবাসী নরনারীকে হত্যা করে রাক্ষসীরা আহার করছে। শিল্পী এই রক্তক্ষয়ী দৃশ্যে পশ্চাৎপটের আকাশকে এঁকেছেন গাঢ় লাল রঙে। অজন্তার অন্য কোথাও এত



চিত্র—৫৩ ॥ সিংহকেশরীর দরবারে রাক্ষসীর আগমন সিংহল-অবদান (অবস্থান—XVII/14 D.)।

গাঢ় লাল রঙের পশ্চাৎপট দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।...নীচে দেখা যাচ্ছে রাত্রি প্রভাতের দৃশ্য। রুদ্ধদ্বার দুর্গের তোরণে মই লাগিয়ে উঠে আসছে সিংহল...দেখছি, একতলার ছাদে মুক্ত কৃপাণহাতে সে আক্রমণ করেছে রাক্ষসীদের...রাক্ষসীরা শূন্যে উঠে গেছে, তাদের হাতে নরমাংসের টুকরো।...তোরণের উপরে একটি শকুন...দুর্গ-চত্বরের মাঝখানেও একটি মাংসভুক্ পাখী মহানন্দে আহার করছে।...অল্প কয়েকটি কালো রঙের রেখার টানে শিল্পী যেভাবে কয়েকটি উড়ন্ত কাকের চিত্র এঁকেছেন, তা দেখে মনে পড়ে জয়নুল আবেদীন অথবা গোপাল ঘোষের আঁকা ছবি।

...নীচে দেখা যাচ্ছে শূন্য সিংহাসন।

পরবর্তী ঘটনার জন্য আবার চলে যেতে হবে ও-প্রান্তে ; চিত্র গ-ঘ-এর নিম্নাংশে। দুটি গর্ভগৃহার অভ্যন্তরস্থ বৃহৎ প্যানেলে সিংহলের দ্বিতীয়বারের সমুদ্রযাত্রা ও সিংহল-বিজয়-কাহিনী (১৭।১৪-চ)।

চিত্রটির পাঁচটি অংশ। প্রথম, সিংহকল্প রাজপ্রাসাদ থেকে বিজয়সিংহলের সদলবলে স্থলপথে যাত্রা। দ্বিতীয়, সিংহলদ্বীপে নৌকাযোগে অবতরণ। তৃতীয়, যুদ্ধদৃশ্য। চতুর্থ, রাক্ষসীদের পরাজয় ও আত্ম-সমর্পণ, এবং পঞ্চম, বিজয়ী বিজয়সিংহলের অভিষেক। এই পাঁচটি দৃশ্যের স্থান-কাল বিভিন্ন—কিন্তু শিল্পী কোন যতি-চিহ্নের ব্যবহারে দৃশ্যগুলি বিচ্ছিন্ন করেননি। এই পঞ্চ দৃশ্যের কম্পোজিশনের মাধ্যমে কম্পোজিসন একটি মালার আকারে গড়েছেন তিনি। যেন শেষ অঙ্কের বিজয়মালা তিনি পরিয়ে দিতে চান বিজয়ী সিংহলের কণ্ঠে। মেঘে মেঘে যেমন মিলে যায়, স্বপ্নে স্বপ্নে যেমন মিলে যায়, অথবা আধুনিক চলচ্চিত্রে ডিজল্ভ-প্রয়োগ-পদ্ধতিতে যেমন এক দৃশ্য অপর দৃশ্যে নিঃশেষে মিশে যায়, এখানেও শিল্পী সেইভাবে এই পাঁচটি দৃশ্যকে মিশিয়ে দিয়েছেন মালার আকারে।

প্রথমে উপরে দেখছি (চিত্র—৫৪) একটি তোরণদ্বার অতিক্রম করে হস্তিপৃষ্ঠে বিজয়-অভিযানে যাত্রা করছে সিংহল। লক্ষণীয়, এবার প্রথম তার মাথায় রাজমুকুট। দুপাশে দুজন সমর-সচিব, কিন্তু তাদের হাতে রয়েছে চামর--অর্থাৎ সিংহলের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে তারা। সিংহলের মাথার উপর রাজছত্র—তার দৃষ্টি কিন্তু তির্যক্‌ভঙ্গি—পূর্ববর্তী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম-দৃশ্যের কথা যেন সে ভুলতে পারছে না। সিংহলের শ্বেতহস্তী পার্শ্ববর্তী ধূসর বর্ণের হস্তীর শুঁড় নিজ শুন্ডে আলিঙ্গনবন্ধ করেছে—যেন তারাও আসন্ন সংগ্রামের পূর্বে প্রীতি-সম্ভাষণ বিনিময় করছে...সঙ্গে চলেছে একদল পদাতিক সৈন্য, তাদের হাতে মুক্ত কৃপাণ, ভল্ল ও দীর্ঘাকার ঢালিকা। পূর্বদৃশ্যের সঙ্গে এ দৃশ্যের বিভিন্নতা বোঝাতে প্রথমেই আঁকা হয়েছে নগর-তোরণদ্বার। এই সমরাভিযান দৃশ্যের সঙ্গে বিধুরপণ্ডিত-জাতকের একটি দৃশ্যের (বিধুর ও পুণ্যকের ইন্দ্রপ্র থ ত্যাগ) সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য ওর নীচে—সৈন্যদল তাম্রদ্বীপে অবতরণ করছে। যদিও প্রচ্ছন্ন কোন যতি-চিহ্ন নেই, তবু পূর্বদৃশ্যের ফিগরগুলি থেকে একটু ফাঁক দিয়ে এ দৃশ্যের বিষয়-বস্তু আঁকা হয়েছে, যেন শূন্য স্থানটুকুই সেই যতি-চিহ্ন। দেখছি, তিনটি নৌকা। সম্মুখভাগে সেই তিনটি রণহস্তী, পিছনে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। হস্তীর তুলনায় নৌকাগুলি ছোট সন্দেহ নেই।

তৃতীয় দৃশ্যে দেখছি, দুপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেছে। এ ঘটনা অবতরণের পর ; কারণ, রাক্ষসীরা ও জম্বুদ্বীপবাসীরা তখন হাতাহাতি যুদ্ধ করছে।

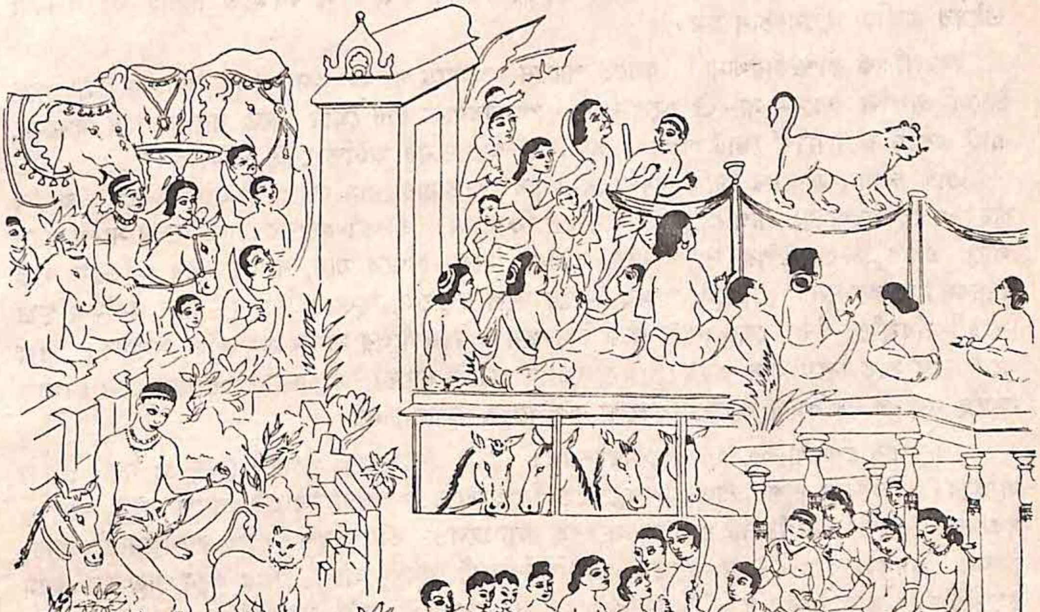
কালানুক্রমিকভাবে চতুর্থ দৃশ্য একেবারে নীচে। সেখানে দেখছি, রাক্ষসীরা যুক্তকরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছে অথবা অস্ত্রত্যাগ করে দুই হাত ভূমিতে রেখেছে।

পঞ্চম ও শেষ দৃশ্য মালার আকারে সাজানো কম্পোজিসনটির একেবারে অপর পারে। এ দৃশ্যটির পরিকল্পনার সময় শিল্পী একটি যতি-চিহ্নের প্রয়োজন অনিবার্যভাবে উপলব্ধি করেছেন। কারণ, শুধু স্থান-কাল নয়, রুদ্র ও বীভৎস রস থেকে এবার অন্য রসের পরিবেশন করতে হবে তাঁকে। তাই রাক্ষসীপুরীর একসার তাঁবুর (অভিযানকারী সৈন্যদলের আগমন-সংবাদে যা সমুদ্রতীরে নির্মাণ করিয়েছিল রাক্ষসীরা) যতি-চিহ্ন এঁকে তার ওপারে চিত্রিত করেছেন বিজয়সিংহলের অভিষেক দৃশ্যটি। সিংহল সিংহাসনে উপবিষ্ট। পুরবাসীরা গান গাইছে, বাজাচ্ছে, পুরকামিনীরা অভিষেক-বারিতে স্নান করাচ্ছে বিজয়সিংহলকে (১৭।১৪-ছ)।

এরপর পুনরায় একটি দীর্ঘ জাতক-কাহিনী : সুতসোম জাতক। এই অবলুপ্ত প্রাচীর-চিত্রটির একটি অংশ এখানে চিত্র—৫৫-তে সন্নিবেশিত করা গেল। কাহিনীর শুরু হচ্ছে

সর্বনিম্ন অংশে। দক্ষিণ দিকে প্রথমেই একটি প্রাসাদ-তোরণ। দেখছি, বারানসীরাজ সুদাস চলেছেন একটি শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে, মৃগয়ায়। সঙ্গে একজন অশ্বারোহী দেহরক্ষী এবং দশজন পদাতিক। রাজার মাথায় ছত্রধারী রাজছত্রটি ধরে আছে। কিছু শিকারী কুকুরও আছে দলে। ঐ মৃগয়াদলের সম্মুখে একটি বন্য শূকর এবং একটি হরিণকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।...নিচের সারির বামপ্রান্তে এগিয়ে এসে দেখছি, এবার

সুতসোম জাতক



চিত্র—৫৫ ॥ সুতসোম জাতক (অবস্থান—XVII/20)।

রাজা একাকী চলেছেন শিকারে। অশ্বের দ্রুত আস্কন্দিত ছন্দ বা 'গ্যালপিং-পোজ' প্রমাণ দেয় কেন এবার তিনি একা। এবার তাঁর মাথায় রাজছত্র নাই—কারণ ছত্রধারী দ্রুত-ধাবমান অশ্বের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। রাজার সম্মুখে একটি চিত্রিত হরিণ।

কাহিনীর সূত্র ধরে এবার উপরের দিকে উঠ্‌তে হবে। দেখছি, মৃগয়া-ক্লান্ত রাজা ভূশয্যায় নিদ্রিত, একটি সিংহী রাজার পদলেহন করছে, রাজার শ্বেত অশ্বটির আতঙ্কতাড়িত দৃষ্টি লক্ষ্য করবার মতো।...তার উপরের প্যানেলে দেখছি, রাজা উঠে বসেছেন, সিংহী পিছন ফিরে আছে বটে, কিন্তু ঘাড় বাঁকিয়ে রাজাকে দেখছে—যাকে বলে 'বিহসি পালটি নেহারি'। বস্তুতঃ জাতক-কাহিনী অনুসারে, অমিতবিক্রম কাশীরাজকে দেখে বনচারিণী সিংহীর মনে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল, রাজা তাকে সেই বিজন অরণ্যে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন এবং তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়।

অলৌকিক কান্ডকারখানা। বলতে পারেন—আষাঢ়ে গল্প। তবু বলব, 'গল্পের-গরু' গাছে উঠলে আপত্তি করবেন না—ঐ অলৌকিক কান্ডকারখানা যদি মেনে নিতে পারেন তবে দেখবেন, এটি একটি রসোত্তীর্ণ ছোট গল্প। মানবিক আবেদনের ঘাটতি নেই এ কাহিনীতে।

এগিয়ে যান উপরের দিকে, দেখবেন এবার শোভাযাত্রা বাম থেকে দক্ষিণে চলেছে ; অর্থাৎ রাজা এবার অরণ্যভূম ত্যাগ করে রাজধানীতে ফিরছেন। হস্তী-অশ্বের শোভাযাত্রার সংগে পায়ে পায়ে এবার চিত্রের উপর সারি ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যান, নগর-তোরণ অতিক্রম করে বারাণসীতে আসুন। দেখুন, পথের উপরে ফুল ছড়ানো, দুধারে নিশান—রাজা নববিবাহিতা সিংহী-মহিষীকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে ফিরছেন। রাজপথের মানুষজন ভীত, সন্ত্রস্ত। ওরা মনে হচ্ছে সার দিয়ে বসে আছে পথের দুধারে বাড়ির ছাদে। দু-একটি পত্রপল্লব যেন ইঙ্গিত করছে সন্ত্রস্ত দর্শকদল আছে দ্বিতলে, রাজপথের সমতলে নয়।

এ দৃশ্যের শেষপ্রান্তে একটি তোরণদ্বার। সেই যতিচিহ্নের ওপারে (বস্তুতঃ চিত্র—৫৫-র বাহিরে) রাজসভার দৃশ্য...রাজা শিশুক্রোড়ে সিংহাসনে...পদতলে সিংহী...পাশে মন্ত্রী, সভাস্থ সকলেই সন্ত্রস্ত। এ চিত্রটি প্রায় অবলুপ্তই বলা চলে।- তার পাশে দেখছি রাজকুমারকে শস্ত্র-বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। একটি কদলী বৃক্ষে লক্ষ্য স্থির করে রাজপুত্র বল্লম ছুঁড়ছেন। তার পরের দৃশ্যটি রাজকুমারের পাঠশালার। সেটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট।

সুদাসের পুত্র সৌদাস। যুবরাজ ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন। রাজা সুদাসের স্বর্গারোহণের পর সৌদাসই হলেন কাশীশ্বর। বিধির বিধানে তাঁর মিশ্র চরিত্র, দ্বৈত সত্ত্বা। তাঁর আকৃতি মানুষের, কিন্তু অন্তরের সংগোপনে লুক্কায়িত আছে বন্য সিংহীর প্রভাব। সর্ববিদ্যা-পারংগম হয়ে উঠ্‌লেন তিনি, তবু রাজার মনে হয়—তাঁর জন্মরহস্যের কথা যারা জানে তারা আড়ালে হাসে, গোপনে বুঝি কানাকানি করে—হাজার হোক, লোকটা জানোয়ার তো! সৌদাস সর্বদা এসব হীনমন্যতার ঊর্ধ্বে উঠ্‌বার চেষ্টা করতেন, ছোট কথা কানে নিতেন না।

একদিন মহারাজ রাজসভায় তাঁর মনোবাসনার কথা ঘোষণা করলেন, বয়স্যদের বললেন, চল, সবাই মিলে মৃগয়ায় যাই।

একজন রাজ-আমত্য বললে, উত্তম প্রস্তাব মহারাজ! কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ অঞ্চলে শিকারে যাব আমরা? যেখানে হরিণ, শশক বা বরাহ পাওয়া যায়—নাকি মহারাজ তাঁর পূজ্যপাদ পিতার মত গভীর অরণ্যে সিংহীর সন্ধানে যেতে ইচ্ছুক?

আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নটি সরল ; কিন্তু সৌদাসের নজর হল সভাস্থ সকলের চোখে-মুখে কৌতুক উপ্‌চে পড়বে। তাঁর স্মরণ হল, সর্বগুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও কোনও মানবী তাঁর প্রতি আজও আকৃষ্ট হয়নি! মহারাজ বিনা বাক্যব্যয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করে গেলেন।

এইভাবে অন্তর্দ্বন্দ্বে সৌদাস যখন নিত্য পীড়ন সহ্য করছেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। শিশুকাল থেকেই সৌদাস আমিষ-খাদ্য পছন্দ করেন। ছাগ-মৃগ-বরাহ প্রভৃতির মাংস তাঁকে নিত্য পরিবেশন করা হত। সেদিন রাজ-পাচকের অনবধানতায় রাজার আহার্য প্রাসাদের কয়েকটা পালিত কুকুর খেয়ে ফেলে। ভীত পাচক তৎক্ষণাৎ বাজারে দৌড়ে যায়, কিন্তু বহু আয়াসেও মাংস সংগ্রহ করতে পারে না। আতঙ্কতাড়িত পাচক নিরুপায় হয়ে বধ্যভূমে সদ্যনিহত একটি

বন্দীর মৃতদেহের জঙ্ঘা থেকে কিছু মাংস কেটে নিয়ে এসে সেদিন মহারাজকে খেতে দিল। সৌদাস আহারান্তে অতি পরিতৃপ্ত হয়ে পাচককে প্রশ্ন করলেন, এটা কিসের মাংস। পাচক প্রথমটা কিছুতেই স্বীকার করবে না। শেষে মহারাজের কাছে অভয়বাণী পেয়ে সে সব কথা স্বীকার করে ফেলল। সৌদাস আদ্যন্ত শুনে বললেন, এ কথা যেন গোপন থাকে ; আর শোন, কাল থেকে আমাকে ঐ মাংসই রেঁধে খাইও।

এর পর শুরু হল নূতন অধ্যায়। গোপনে। বলাবাহুল্য নরমাংসের নিত্য জোগান দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ল। ফলে রাজানুগ্রহকামীরা নানান পন্থায় সরবরাহ বজায় রাখার চেষ্টা করতে থাকে। সুস্থ সবল মানুষ অন্তর্হিত হয়ে যাবার অদ্ভুত সংবাদ নিত্যই শোনা যায়। গুজব রটে গেল, প্রাসাদের ভিতর একটি নরমাংসভুক রাক্ষসের আবির্ভাব হয়েছে। মহারাজ নিত্য এ অভিযোগ শোনেন, প্রজাদের প্রতিশ্রুতি দেন ঐ রাক্ষসটিকে তিনি খুঁজে বার করবেন —কিন্তু কোন কিছুরই সুরাহা হয় না।

চিত্র—৫৫-তে সর্বনিম্ন সারির ঠিক উপরেই দেখা যাচ্ছে কী-ভাবে রাজভৃত্যরা নরমাংসের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতো। তিনজন প্রহরী একজন হতভাগ্যকে হত্যা করছে,—তার পাশে দুজন ভৃত্য একজন মানুষকে বধ্যভূমে নিয়ে যাচ্ছে।...ঐ চিত্রের উপরেই দেখা যাচ্ছে রাজদরবারের দৃশ্য। মহারাজ সৌদাস সিংহাসনে আসীন। তাঁর সম্মুখে নিম্ন-আসনে সেনাপতি কালাহারি বসে আছেন। প্রজাবৃন্দ সদলবলে এসেছে রাজার কাছে নালিশ জানাতে। রাজসভার পিছন দিকে অশ্বাবাস। সেখানে সারি সারি চারটি ঘোড়া।

কিন্তু পাপ চিরকাল চাপা থাকে না। কালাহারি শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করে ফেলল রাজপুরীর সেই নরমাংসভুক রাক্ষসটিকে।

ফলে, রাজায়-প্রজায় যুদ্ধ বেধে গেল—সৌদাস একটি সোপানের উপর দাঁড়িয়ে মুক্তকৃপাণে আত্মরক্ষা করছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাকে রাজ্য ত্যাগ করে বনে চলে যেতে হল।

এর পর সৌদাসের জীবন শুরু হল নূতনভাবে। ভয়ঙ্কর নরমাংসভুক্ রাক্ষসের মতো এক গভীর অরণ্যে সে বাস করতে থাকে। পথচারীদের হত্যা করে নির্বিচারে। সে যেন মনুষ্য-সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

ঘটনাচক্রের ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা সুতসোম ঐ গভীর অরণ্যপথে চলেছিলেন সন্ন্যাসী নন্দের আশ্রমে। রাজা সুতসোম বস্তুতঃ বোধিসত্ত্ব, ধার্মিক রাজর্ষি তিনি। শিল্পী তাঁকে অনুসরণ করছেন ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে। সভাসদ্‌রা সকলে তাঁকে জানিয়েছিল—ঐ অরণ্যে বাস করে একজন নরমাংসভুক্ রাক্ষস। কিন্তু কারও নিষেধ কানে তোলেননি সুতসোম। তিনি বেরিয়েছিলেন ভিক্ষু নন্দের আশ্রমের উদ্দেশ্যে। ভিক্ষু নন্দের গুরু ছিলেন মহামতি বুদ্ধ-কশ্যপ। সুতসোম জানতেন যে, মহাকশ্যপের মুখ-নিঃসৃত চারিটি শ্লোক একমাত্র নন্দই জানতেন। সেই মন্ত্র স্বকর্ণে শুনবার উদ্দেশ্যে চলেছিলেন তিনি, কারও নিষেধ শোনেননি।

যথারীতি গভীর অরণ্যে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ায় সৌদাস। সুতসোম বুঝতে পারেন, এই সেই রাক্ষস : বুঝতে পারেন এর হাতে নিস্তার নেই। সৌদাস বলে : বড় অশুভক্ষণে যাত্রা শুরু করেছিলে পথিকবর। আজ তোমার জীবনের শেষদিন।

সুতসোমের দু চোখ অশ্রু-আর্দ্র হয়ে ওঠে।

নিষ্করুণ সৌদাস বলে—অশ্রুপাতে কোন লাভ নেই পথিক, প্রাণভয়ে ভীত অনেক লোকেরই চোখের জল দেখা অভ্যাস আছে আমার।

চক্ষু মার্জনা করে সুতসোম এবার হেসেই বলেন :

কান্দি না নিজের তরে কিংবা দারাসুত হেতু
ধনরাজ্য নাশ ভয়ে করি না ক্রন্দন ;
সাধুজন-প্রদর্শিত সুচরিত মার্গে আমি
অনুক্ষণ সাবধানে করি বিচরণ।

স্নানান্তে ফিরিয়া ঘরে
শুনিব কশ্যপ মন্ত্র
ব্রাহ্মণের কাছে এই ছিল অঙ্গীকার,
হল সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ
পড়িয়া তোমার হাতে
এই দুঃখে ঝরে অশ্রুধার ॥ ৩০ ॥*

সৌদাস কৌতুকবোধ করে, বলে—তাই নাকি? মন্ত্রগুলি শুনলে আর মৃত্যুসময়ে কাঁদবে না তুমি?

সুতসোম বলেন, না!

বস্তুতঃ, রাক্ষসের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আত্মদানে তাঁর আপত্তি নেই ; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি ঐ অশ্রুতপূর্ব মন্ত্রচতুষ্টয় শুনে যেতে পারলেন না বলেই ক্ষুব্ধ। সৌদাসকে তিনি অনুরোধ করলেন, তাঁকে সাময়িক মুক্তি দেবার জন্য। প্রতিশ্রুতি দিলেন, মন্ত্রচতুষ্টয় শ্রবণ করে তিনি আবার ফিরে আসবেন সৌদাসের আরণ্যক আবাসে, তার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য।

হা-হা করে হেসে ওঠে সৌদাস। বলে, একবার পালাবার সুযোগ পেলে কি কেউ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আবার ফিরে আসে?

সুতসোম অবাক্ হয়ে বলেন—কী বলছ তুমি? সামান্য প্রাণের চেয়ে মুখের কথা বড় নয়?

সৌদাস বলে—নিশ্চয় নয়! মানুষকে চিনতে বাকি নেই আমার।

সুতসোম গম্ভীরকণ্ঠে বলেন—নরমাংসভোজী বলে তোমাকে আমি ঘৃণা করিনি সিংহী-তনয় সৌদাস , কারণ, আমি জানি সেজন্য দায়ী তোমার জন্ম-ইতিহাস। হিংস্র আরণ্যক প্রাণীর রক্ত তোমার ধমনীতে বইছে বলেই তোমার চরিত্রের এই বিকার—তোমার ও ব্যবহার সিংহীপুত্রের উপযুক্ত ব্যবহার ; কিন্তু হে কাশীরাজতনয় সৌদাস, এইমাত্র তুমি যে কথা বললে—সত্যের চেয়ে মানুষের প্রাণ বড়, এ তো তোমার কাশীরাজতনয়ের মতো কথা হল না। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তো তুমি আজও পাওনি তাহলে।

কেমন যেন খট্‌কা লাগে সৌদাসের। নরমাংসে তার আসক্তির কথা জানতে পেরে সমগ্র কাশীবাসী প্রজাবৃন্দ তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল—তাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে তারা। গোটা মনুষ্য-সমাজের বিরুদ্ধেই প্রচণ্ড অভিমান তার ; অরণ্যচারী নরমাংসভোজীরূপে সে এইজন্যই প্রতিশোধ নিতে উদ্যত। কিন্তু এ-লোকটি যে আজ নূতন কথা শোনাচ্ছে। এ বলছে, সেজন্য সৌদাসকে সে ঘৃণা করে না। প্রচণ্ড কৌতূহল হল সৌদাসের। বললে—বেশ, মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার জন্য না হয় একটু মূর্খামিই করা যাক। যাও, মুক্ত তুমি!

সুতসোম চলে গেলেন ভিক্ষু নন্দের কুটিরে। মহানন্দে ইন্দ্রপ্রস্থরাজকে আশ্রমে স্থান দিলেন ভিক্ষু নন্দ। তাঁকে শোনালেন বুদ্ধ-কশ্যপের সেই অশ্রুতপূর্ব মন্ত্রচতুষ্টয়। পরম তৃপ্তি পেলেন সুতসোম, মৃত্যুর জন্য আর খেদ রইল না তাঁর। যথাপ্রতিশ্রুত একাকী ফিরে এলেন সৌদাসের অরণ্য-আবাসে। তাঁকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সৌদাস ; বললে—আশ্চর্য! তুমি প্রাণ দিতে ফিরে এসেছ?

মহাধার্মিক সুতসোম হেসে বললেন—আশা করি, এতদিনে মানুষের প্রকৃত পরিচয়টা বুঝতে পেরেছ তুমি, সিংহীতনয় সৌদাস! নরমাংস ভক্ষণ যদি সিংহীপুত্রের জন্মগত সংস্কার হয়, তবে সত্যধর্ম রক্ষার্থে প্রাণদানে মানুষীতনয়েরও আছে জন্মগত অধিকার।

ইন্দ্রপ্রস্থরাজের মহানুভবতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে সৌদাস। সে-ও রাজার পুত্র, সে-ও একদিন বসত সিংহাসনে, মাথায় পরত রাজমুকুট। সুতসোমের হাত দুটি ধরে বললে—ইন্দ্রপ্রস্থ-অধিপতি! জীবমাত্রেই মহত্ত্বে অধিকার আছে। মহত্ত্বের পরিচয় হয়তো আমিও দেখাতে পারতাম একদিন, কিন্তু তোমরা আমার জন্মের ইতিহাসটা যে ভুলতে পারলে না—শুধু ঘৃণাই করলে আমাকে। তাই আমি আজ নরমাংসভুক্ রাক্ষস।

সুতসোম বলেন—জন্মের জন্য কেউ দায়ী নয়। কর্মেই তার অধিকার। তুমি ক্ষুন্নিবৃত্তি কর সিংহীতনয়, আমি প্রস্তুত।

---

* মূল পালি-জাতকের শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ-কৃত অনুবাদ।

সৌদাস বলে—মানুষীতনয় ইন্দ্রপ্রস্থরাজ, তুমিও এতদিন জানতে না সিংহীশিশুর প্রকৃত পরিচয়। আশা করি, তুমিও এবার সিংহীতনয়ের প্রকৃত পরিচয়টা পাবে। তোমাকে হত্যা করব না আমি। তার প্রতিদানে আমাকে শুধু জানিয়ে দাও বুদ্ধ-কশ্যপের কী বাণী শুনে এসে মৃত্যুভয়কেও তুচ্ছ করেছ তুমি!

সেই বাণী শ্রবণ করে সৌদাস সদ্ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়ে।

শিষ্যত্ব গ্রহণ করে রাজর্ষি সুতসোমের!

তাই বলছিলাম—মানুষের ঔরসে সিংহীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের অলৌকিক কাণ্ডটা যদি গল্পের খাতিরে একবার মেনে নিতে পারেন তাহলে এ ছোট গল্পটিকে রসোত্তীর্ণরূপেই পাবেন। জাতককার তাঁর রচনাশৈলীতে এমন বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন যে, পাঠককে বারে বারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে—ভাবতে হচ্ছে সৌদাসের চরিত্রের ক্রমাবনতির জন্য বস্তুতঃ কে দায়ী? সে কি শুধু ঘটনা পরম্পরার শিকার? নায়কের চরিত্রটি তিনি ঘড়ির দোলকের মত দুলিয়েছেন—একদিকে তাঁর পিতার বীর্য, মহত্ব, শিক্ষালব্ধ দৃঢ় চরিত্র, অপরদিকে তার রক্ত ধারার প্রভাব। সবচেয়ে বড় কথা—যবনিকাপাতের পূর্বমুহূর্তে জাতককার দেখিয়েছেন কীভাবে সদ্ধর্ম পাশবিকতার ভিতর থেকে মানবিকতাকে উদ্ধার করতে পারে।

অন্তরালের পশ্চিমে প্রাচীরে আছে বৃহদায়তন একটি সমাপিকা-চিত্র (চিত্র—৫৬)। ঠিক সমাপিকাচিত্র অবশ্য এ-কে বলা উচিত নয় ; কারণ, এতেও আছে তিনটি অংশ। অথবা তিনটি স্তর। এ চিত্রটি কয়েকটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, অজন্তায় অতি অল্পসংখ্যক চিত্রই অবশিষ্ট আছে, যাতে রঙ রয়েছে অটুট। এটি তার একটি। সহস্র বছর পরেও প্রায় প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, যদিও রঙের ঔজ্জ্বল্য অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। তবু রেখার কারিগরী, যাকে বলে 'পেনসিলিং'—তার চরম ঔৎকর্ষ এখানে দেখতে পাবেন। দ্বিতীয়তঃ, এই চিত্রটিতে শিল্পী বৃহত্তর ভারতের, বস্তুতঃ এ প্রাচ্যখণ্ডের, বিভিন্ন জাতির চিত্র এঁকেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম যে সমস্ত প্রাচ্যজগতের সম্পদ্, সে সত্য এ-চিত্রে সোচ্চার। 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'-র বৃহত্তর মহামানবের সাগরতীরে তরঙ্গোচ্ছ্বাস এ আলেখ্যে কান পাতলে শুনতে পাবেন। তৃতীয়তঃ মিলানের একটি মনাস্টারির নীচু স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে আঁকা লেওনার্দো-র বিখ্যাত চিত্র 'লাস্টসাপার'-এর কল্যাণে যেমন যীশুখ্রীষ্টের সবকয়টি শিষ্যসমেত প্রভুকে দেখতে পায় খ্রীষ্টান-জগৎ—এ চিত্রটিতে তেমনি বুদ্ধদেবের যাবতীয় প্রিয় শিষ্যসমেত তথাগত বুদ্ধকে দেখতে পান বৌদ্ধরা।

বুদ্ধদেবের জীবনীতে আমরা জেনেছি যে, তিনি যখন তাঁর অভিধর্মের প্রচারে ভূ-ভারত প্রদক্ষিণ করছেন, তখন স্বর্গবাসিনী তাঁর গর্ভধারিণী জননী মায়াদেবীর মনে দুঃখ হয়েছিল তিনি পুত্রের মুখ-নিঃসৃত বাণী শুনে যেতে পারেননি বলে। বুদ্ধ-জননীর এই মনোবেদনার কথা জানতে পেরে স্বর্গ থেকে দেবরাজ শক্র (ইন্দ্র), ব্রহ্মা প্রভৃতি মর্ত্যে নেমে আসেন বুদ্ধদেবকে স্বর্গে আমন্ত্রণ জানাতে। গৌতমবুদ্ধ সশরীরে স্বর্গে গিয়ে অভিধর্মের বাণী প্রচার করতে সম্মত হলেন। সেখানে তিনি যাবতীয় দেবদেবীর উপস্থিতিতে জননীকে স্বধর্মের মূলকথা শুনিয়ে আসেন।

স্বর্গ থেকে অবরোহণ করে বুদ্ধদেব দেখতে পেলেন, যাবতীয় পার্থিব নৃপতি এবং বৌদ্ধ-প্রধানরা সমবেত হয়েছেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে। সেই সভায় মহাভিক্ষু সারিপুত্রকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে মহাঅর্হৎরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তিনি জানতেন, মহাজ্ঞানী সারিপুত্র এ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবেন। তাঁর প্রথম প্রশ্নটি ছিল—বস্তুর সংজ্ঞা কি? সারিপুত্র নির্ভুল উত্তর দিলেন। তখন আরও কঠিন প্রশ্ন করতে থাকেন বুদ্ধদেব। একে একে সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দান করে এই দিনই সারিপুত্র মহাঅর্হৎরূপে বৌদ্ধ ধর্মে স্বীকৃতি পান।

শিল্পী এই ঘটনাটি অবলম্বনে এখানে একটি বৃহৎ চিত্র এঁকেছেন। আগেই বলেছি, তার তিনটি স্তর। উপরে স্বর্গে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচার করছেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন। তৃতীয় ও শেষ স্তরে তিনি সারিপুত্রকে পরীক্ষা করছেন (১৭।২২)।

প্রথম স্তরে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব একটি সিংহাসনে আসীন। তাঁর বামদিকে বসে আছেন দেবগণ এবং স্বর্গগত মহাত্মা পুণ্যাত্মার দল। তাঁর দক্ষিণে মায়াদেবীসমেত দেবীরা বসেছেন। এখানে স্বর্গত পুণ্যাত্মাদের মধ্যে একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে না পেয়ে আমি কিন্তু হতাশ হয়েছিলুম। আমার খুব আশা ছিল, শিল্পী শ্মশ্রু-সমন্বিত একটি বৃদ্ধের মুখাকৃতি এখানে এঁকে দেবেন, ষোড়শ গুহার ১৬।২-ক চিত্রটি স্মরণ করে। না, স্বর্গত ঋষি অসিতের আকৃতি আমি খুঁজে পাইনি বুদ্ধদেবের বামে (চিত্র—৫৬-এ এই অংশটি আঁকা হয়নি)।

মাঝখানে দেখছি, তুষিত স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন বুদ্ধদেব। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও কয়েকজন স্বর্গীয় সহচর। বোধ করি, স্বর্গ থেকে বিদায়ের মুহূর্তে ওঁরা এসে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। এখানে লক্ষণীয়, সবকয়টি ফিগর-ই যেন ভারহীন—যেন এ তাঁদের স্থূল শরীর নয়, যেন বাতাসে ভাসছেন তাঁরা। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালীয় চিত্রকর পেরুজীনো-র বিখ্যাত চিত্র 'খ্রীষ্টের শিষ্যচতুষ্টয়'-এ যেমন মনে হয়, ফিগরগুলি মনুষ্যাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন অপার্থিব, ভারহীন—এখানেও বুদ্ধদেব ও তাঁর সহচরদের তেমনই মনে হয়। স্বর্গ থেকে বুদ্ধদেবের অবতরণের এই বিষয়-বস্তুটি নিয়ে সাঁচির উত্তর-তোরণপথের পশ্চিম দিকস্থ স্তম্ভের সর্বোচ্চ প্যানেলে একটি ভাস্কর্য আছে। সেখানে শিল্পী ত্রিশটি ধাপ এঁকেছিলেন—এখানে দেখেছি মাত্র পাঁচটি ধাপ দেখিয়েই ইঙ্গিতে ত্রিংশ-সোপান বোঝানো হয়েছে। লক্ষণীয়, পাঁচটি ধাপের মধ্যে একমাত্র যেটিতে বুদ্ধদেব পদার্পণ করে আছেন, সেটিতেই নক্‌শা-কাটা আছে। কিন্তু তা তো হয় না। সিঁড়ির সব ধাপেই তো একই অলঙ্করণ থাকার কথা। প্রশ্নটি সঙ্গত—বাস্তুবিদ-হিসাবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে—এমন হওয়ার কথা নয়। সব কয়টি ধাপেই একই রকম অলঙ্করণ থাকার কথা। এই আপাত-বৈসাম্যের ব্যাখ্যা দিতে গেলে আপনাদের একটি গল্প শোনাতে হয়:

নামটা ঠিক মনে পড়ছে না—বোধকরি ইংরাজ-কবি গোল্ডস্মিথের জীবনের একটি ঘটনা। কবি তখন স্কুলের ছাত্র। পাঠ্যপুস্তকে বাইবেল-এর একটি অংশ ছিল। প্রভু যীশু এসেছেন মার্থার কাছে, সায়মাশের নিমন্ত্রণ রাখতে। হঠাৎ প্রভু লক্ষ্য করলেন, গৃহস্বামিনী যেন কিছু অন্যমনা, বিচলিতা। প্রশ্ন করে জানতে পারলেন—ভাঁড়ারে মদ ফুরিয়ে গেছে, অথচ নিমন্ত্রিতরা তখনও পানীয় চাইছেন। প্রভু মার্থাকে বললেন, মদ ফুরিয়ে যাবে কেন? ঐ তো এক জালা ভর্তি মদ রয়েছে। মার্থা জবাবে বলেন, আজ্ঞে না প্রভু, ঐ জালায় মদ নেই, আছে জল। প্রভু বলেন, কই, ঢাক্‌নাটা খোল তো। মার্থা জলপাত্রের ঢাকনাটা খুলে দিলেন। যীশু উঁকি মেরে দেখে বললেন, যা ভেবেছি! ওটা জল নয়, মদ! দেখ তুমি—

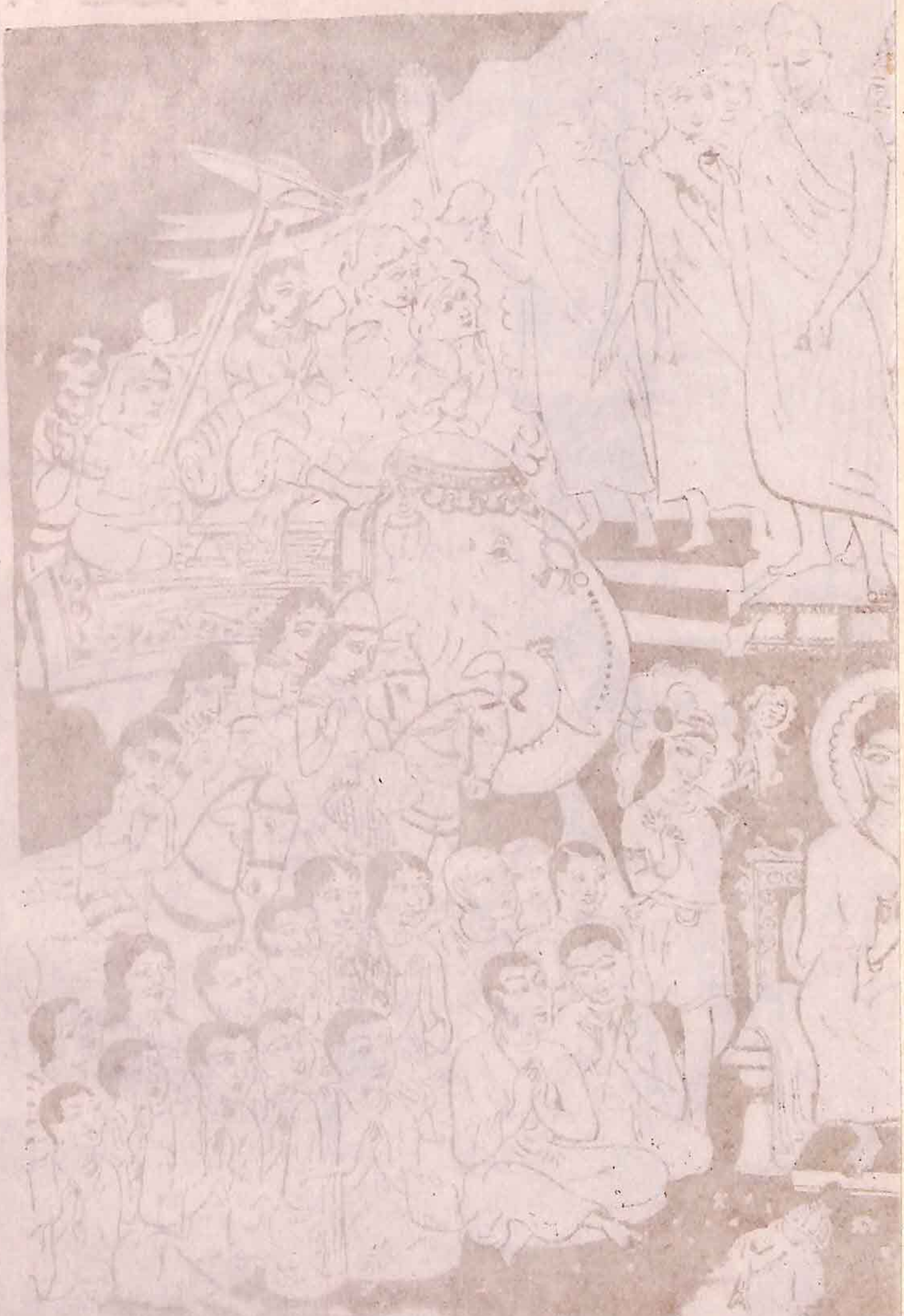
মার্থা সবিস্ময়ে দেখেন জলপূর্ণ প্রকাণ্ড পাত্রটায় রয়েছে উৎকৃষ্ট মদ্য!

কবি গোল্ডস্মিথের মাস্টার-মশাই ছাত্রদের প্রশ্ন দিলেন—ঐ অলৌকিক কাণ্ডটার ব্যাখ্যা করতে হবে। জল কেন, কীভাবে উৎকৃষ্ট আসবে রূপান্তরিত হল। গোল্ডস্মিথের সহপাঠীরা দেড়-দু পাতা ধরে ব্যাখ্যা লিখল—প্রভু যীশুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা, মার্থার প্রতি তাঁর স্নেহ, প্রভুর উপস্থিত বুদ্ধি ও মার্থাকে অপমান থেকে বাঁচাবার প্রয়াস—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ঐ প্রশ্নের জবাবে গোল্ডস্মিথ একটি মাত্র পংক্তিতে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলেন, প্রকৃত কবি-সাহিত্যিকের মত। তাঁর সেই এক লাইনের জবাবেই তিনি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিলেন। বালক গোল্ডস্মিথ জবাবে লিখেছেন "—The Water saw its Master, and blushed!"

'Blush'-এর বাঙলা নেই, তাই ওটা অনুবাদ করা যায় না!

বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হলে এখানেও বলতে হবে—ঐ সোপানশ্রেণীর কোনটিতেই বাস্তবে





কোন অলঙ্করণ ছিল না, প্রভুর চরণপদ্মপাতে ঐ বিশেষ ধাপটি রোমাঞ্চিত-আলিম্পনে শিহরিত হয়েছে মাত্র! তিনি যখন পরবর্তী ধাপে পদার্পণ করবেন তখন সেটিও বোধকরি রোমাঞ্চিত-তনু হয়ে যাবে। অর্থাৎ কবি গোল্ডস্মিথের ভাষায়—"The Step saw its Master, and blushed!"

বুদ্ধদেবের দুপাশে দুজনের হাতে আছে চামর—পিছনে একজনের মাথায় অদ্ভুতদর্শন রাজমুকুট। বুদ্ধদেবের মাথার উপর সম্মানছত্র।

এবার নীচের অংশটি দেখি। সোপান-শ্রেণী ও হাতীর পিঠে হাওদার নক্শা অর্ধ-চন্দ্রাকারে একটি যতি-চিহ্ন-রেখারূপে এই নীচের অংশটিকে স্বর্গাবতরণ খণ্ডচিত্র থেকে পৃথক করেছে। নীচে দেখছি, একটি রত্ন-সিংহাসনে বুদ্ধদেব আসীন। প্রলম্বিতপদ ধর্মচক্র মুদ্রায়। সামনের জমি পুষ্পাকীর্ণ। বুদ্ধদেবের পিছনে একটি জ্যোতিঃপ্রভা। প্রভার দুপাশে দুটি গন্ধর্বশিশু—তাদের পিছনে ছোট ছোট মেঘস্তূপ—গন্ধর্বশিশু দুটি যেন উড়ে আসছে। বুদ্ধদেবের দুপাশে দুই বোধিসত্ত্ব। বামে বজ্রপাণি, দক্ষিণে পদ্মপাণি। তাঁর দক্ষিণে রাজেন্দ্রবৃন্দ ও বামে শিষ্যদল। এ অংশে পঞ্চাশটির বেশী মূর্তি আছে, তিনটি হস্তী ও ছয়টি অশ্ব (চিত্র—৫৬-তে সম্পূর্ণ মূল চিত্রটি আঁকা হয়নি; ফলে, পাঁচটি অশ্ব) লেওনার্দো-র "শেষ সায়মাশ" (Cena Ultima, চেনা উল্‌তিমা, যার ইংরাজি নাম Last Supper) চিত্রটিও এমনি প্রতিসাম্যমূলক। কেন্দ্রস্থলে যীশুখ্রীষ্ট, তাঁর এক এক দিকে ছয়জন শিষ্য। খ্রীষ্ট ধর্মের গ্রন্থ আলোচনা করে এই দ্বাদশজন শিষ্যকেই নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করেছেন বিশারদের দল। বুদ্ধদেবের অন্যূন চৌত্রিশজন প্রধান শিষ্যের নাম পাওয়া যায়, এ চিত্রে বুদ্ধদেবের বামে আঠারজন শিষ্যকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার ভিতর মাত্র দুটিকে সনাক্ত করতে পেরেছেন বিশেষজ্ঞরা। বস্তুতঃ, এ চিত্রের পঞ্চাশোর্ধ্ব চরিত্রের ভিতর মাত্র সাতজনকে সনাক্ত করতে পেরেছেন অজন্তা-বিশারদ্ ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী। বুদ্ধদেব, পদ্মপাণি ও বজ্রপাণির কথা আগেই বলেছি। বাকি চারজন হচ্ছেন এঁরা: বুদ্ধদেবের দক্ষিণ-পদের সমীপবর্তী ভূতলে উপবিষ্ট যুক্তকর রাজা হচ্ছেন মগধ সম্রাট বিম্বিসার, তাঁর অতি সন্নিকটে কিশোর রাজকুমারটি হচ্ছেন তাঁর যুবরাজ অজাতশত্রু। বুদ্ধদেবের বামে শিষ্যদলের মধ্যে প্রথম সারিতে দ্বিতীয় মূর্তিটি হচ্ছে জ্ঞানবৃদ্ধ সারিপুত্রের। তাঁর পিছনেই যুক্তকর (গোঁফ-ওয়ালা) মূর্তিটি মহামৌদ্গল্লায়নের। ব্যস, এছাড়া আর কাউকে চেনা যায় না।

সারিপুত্রের পরীক্ষা

ডাঃ ইয়াজদানীর একটা অসুবিধা ছিল, যা আমার বা আপনার নাই। তিনি বিশেষজ্ঞ—তিনি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আপনি-আমি রসপিপাসু দর্শক—এসেছি অজন্তা দেখে মনপ্রাণ ভরে নিয়ে যেতে। আমরা যদি কল্পনার রাশ একটু আল্গা করে দিই—এবং ভাবরাজ্যে যদি একটু বেশী আনন্দরস আহরণ করতে পারি 'তাহে কিবা কার ক্ষতি?' আসুন, আমরা পরামর্শ করে আরও কয়েকটি চরিত্রকে সনাক্ত করি। যাতে বিশেষজ্ঞের দল নেহাৎ হাঁ-হাঁ করে প্রতিবাদ করতে ছুটে না আসেন, তাই কিছুটা যুক্তিও দেখাব আমরা।

প্রথমতঃ বলব, রাজা বিম্বিসারের বামে মুকুটধারী নৃপতি হচ্ছেন কোশলরাজ প্রসেনজিত। যুক্তি? ডাঃ ইয়াজদানী বিম্বিসারকে সনাক্ত করেছেন কোন্ যুক্তিতে? চিত্রে এই অজানা x-নৃপতিটিকে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে—বুদ্ধদেবের নিকট যে সব মহাজনপদ-নৃপতি অভিধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, বিম্বিসার তাঁদের মধ্যে প্রধান। এই দুটি সহ-সমীকরণের সমাধান করে ইয়াজদানী বলেছেন, x=বিম্বিসার। অনুরূপভাবে আমরা বলব—বিম্বিসারের পাশে এই অজানা y-নৃপতির অবস্থান প্রাধান্যের দিক থেকে দ্বিতীয় এবং প্রসেনজিতের স্থান প্রথম যুগের বৌদ্ধ-নৃপতিদের মধ্যে বিম্বিসারের পরেই। অতএব, y=প্রসেনজিত।

এবার বুদ্ধদেবের বামচরণ-প্রান্তের সর্বনিকটতম মূর্তিটি। শিল্পী এঁকে সারিপুত্রের চেয়েও বুদ্ধদেবের নিকটতর করে এঁকেছেন। এঁর মুখে দেখছি ফুটিয়েছেন এক বিচিত্র

হাস্যরেখা, বয়সে ইনি তরুণ। তবু কেন যে এঁকে ইয়াজদানী সনাক্ত করেননি, আমি জানি না। আমার মতামত ব্যক্ত করার আগে বুদ্ধদেবের জীবনের একটা ঘটনার কথা বলি :

মহাপণ্ডিত সারিপুত্র একবার বলেছিলেন : আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ধরাধামে তথাগত বুদ্ধদেবের মত মহাজ্ঞানী ইতিপূর্বে কখনও জন্মগ্রহণ করেননি, আজও নেই, এবং ভবিষ্যতেও কখনও অবতীর্ণ হবেন না।

বুদ্ধদেব সে-কথা শুনতে পেয়ে বলেছিলেন—তোমার বাণী অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, কিন্তু হে পণ্ডিতাগ্রগণ্য সারিপুত্র, তুমি এ-কথা বলার পূর্বে এতাবৎকাল যে সব মহাপুরুষ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের জীবনী ও বাণী নিশ্চয়ই জেনে নিয়েছ?

সারিপুত্র সলজ্জে বলেন : কাল অনাদি—দূর অতীতের সকলের সকল কথা আমি কেমন করে জানব প্রভু?

: তা বটে! অন্ততঃ ভবিষ্যতে এ ধরাধামে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের কথা নিশ্চয়ই তুমি দিব্যদৃষ্টিতে জানতে পেরেছ?

আরও লজ্জা পেয়ে সারিপুত্র বলেন : আজ্ঞে না। কাল শুধু অনাদি নয়, সে যে অনন্তও। সুদূর ভবিষ্যতের কথা আমি কেমন করে জানব প্রভু?

: তাও তো ঠিক! তাহলে অন্ততঃ আজ এই ধরাধামের বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে যত মহাপুরুষ মরদেহ ধারণ করে বিচরণ করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে তোমার সম্যক্ ধারণা হয়েছে নিশ্চয়।

মরমে মরে গিয়ে সারিপুত্র বলেন—কাল যেমন অনাদি-অনন্ত, পৃথিবীও তেমনি বিপুলা! এই বিপুলা পৃথিবীর সকল প্রত্যন্তদেশের সংবাদ আমি কেমন করে জানব প্রভু?

বুদ্ধদেব শুধু বললেন : তাও তো বটে! এ তো খুব ভাবনার কথা দেখি!

তখন বুদ্ধদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে সারিপুত্র বললেন : আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি প্রভু!

বুদ্ধদেব তখন শিষ্যদের বলেছিলেন : জ্ঞানমার্গে সারিপুত্র সর্বাগ্রগণ্য ; কিন্তু সে আমাকে এত ভক্তি করে যে, বর্ষণ-উন্মুখ ভক্তির মেঘে তার জ্ঞানসূর্য কখনও কখনও আচ্ছন্ন হয়ে যায়। জ্ঞান ও ভক্তি দু-নৌকায় পা দিয়ে সারিপুত্র অগ্রসর হতে বাধা পায়। অথচ তোমরা আনন্দকে দেখ, সে শুধু সেবার মাধ্যমেই এগিয়ে চলেছে। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির এলোমেলো হাওয়ায় তার নৌকা একটুও দোলে না।

আনন্দ ছিলেন সিদ্ধার্থের পিতৃব্যপুত্র। বোধ করি সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ছিলেন তিনি। মহানির্বাণের সময় বুদ্ধদেব তাঁরই হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন নিজের ভিক্ষাপাত্রটি। এই সব কথা যখন ভাবি, তখন বুদ্ধদেবের বামচরণবর্তী বিচিত্র হাস্যরেখায় সমুজ্জ্বল ঐ তরুণটিকে সনাক্ত করতে আমার তো কই বাধছে না? বুদ্ধদেবের কঠিন ও কূট প্রশ্নে এবং সারিপুত্রের জ্ঞানগর্ভ প্রত্যুত্তরে সবাই যখন অভিভূত, ও তখন মনে মনে বলছে : জ্ঞানমার্গের ও-নৌকায় আমার কি প্রয়োজন? আমি আছি তোমার চরণসেবা করতে—তাই বসেছি তোমার চরণমূলে। আমার নির্বাণ ঠেকায় কে?

যেন এ-কথা ভেবেই ওর মুখে ফুটে উঠেছে ঐ মোনালিসা-মার্কা বিচিত্র হাসিটি।

প্রাচীরের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে সপ্তদশ গুহায় আঁকা এই সুবৃহৎ চিত্রটি অজন্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র তো বটেই, বোধ করি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফ্রেস্কো!

বুদ্ধদেবের বামপার্শ্বে আছে একটিমাত্র হস্তী। তার পিঠে একজন মহিলা, সঙ্গে সহচরীর দল। নারীমূর্তি এ-চিত্রে আর নেই। এই মহিলাটি তাহলে কে? আম্রপালীর* ঘটনা পরবর্তী কালের, বুদ্ধদেবের বিমাতা মহাগৌতমী ভিক্ষুণী হয়েছিলেন একেবারে শেষ পর্যায়ে। আমি তো মনে করেছি, এই মহিলাটি হচ্ছেন কাশীর বণিকশ্রেষ্ঠ যশের সহধর্মিণী। সারনাথ মৃগদাবে

* যে বৎসর বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ হয়, সেই বৎসরই কুশীনগর যাবার পথে বৈশালী নগরীর উপকণ্ঠে আম্রপালীর সঙ্গে বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ হয়।

প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের অনতিকাল পরেই কাশীধামের শ্রেষ্ঠ ধনী বণিকপ্রবর যশদেব সস্ত্রীক ও সমাতা বুদ্ধদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। যশ-জায়াই হচ্ছেন গৌতমবুদ্ধের প্রথমা শিষ্যা। আমার ধারণা, হস্তিপৃষ্ঠে ঐ মহিলাটি যশোদেব-জায়া। একটিমাত্র সংশয় আছে। শিল্পী এঁর মাথায় মুকুট পরিয়েছেন। রাজা ও রানী ছাড়া অজন্তা-শিল্পী মুকুট ব্যবহার করতে চান না সচরাচর।*

পাঠক যাতে অন্যান্য চরিত্রগুলির সনাক্তকরণে নিজেই সচেষ্ট হতে পারেন, তাই বুদ্ধদেব যে ক্রমপর্যায়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন, সেইভাবে তাঁর প্রধান ও প্রত্যক্ষ শিষ্যদের কয়েকজনের নাম এখানে দিলাম :

ধ্যান-কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিত, ভাস্প, মহানাম, ভদ্রিক, যশোদেব (স্ত্রী ও মাতা), বিমল, সুবহু, পূর্ণ, উরুবেল-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ, গয়া-কাশ্যপ, সারিপুত্র, মহামৌদ্‌গল্ল্যায়ন, চন্দ, অনিরুদ্ধ, নন্দিন, সুভূতি, রেবত, অমোঘরাজ, মহাপারাণক, ভক্‌কুল, নন্দ, রাহুল, স্বাগত ও আনন্দ।

মূল গর্ভ-মন্দিরে মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তনরত বুদ্ধদেবের বিরাটায়তন মর্মরমূর্তি (১৭।২৩)। ধ্যানস্তিমিত ধর্মচক্র মুদ্রা। প্রলম্বিতপদ—অর্থাৎ পূর্ব-বর্ণিত চিত্রে যা দেখেছি। পদতলে মৃগদাবের প্রতীক দুটি হরিণ-শিশু। মূল গর্ভ-মন্দিরের প্রবেশপথে বামদিকে অন্তরালের উত্তর প্রাচীরে সপ্তদশ গুহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রটি। সেই গোপা-রাহুল ও বুদ্ধদেব (১৭।২৪)।

চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে দর্শককে কাঁদতে দেখেছি। উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠকের চোখের পাতা ভিজে উঠতে দেখেছি। কিন্তু কোন একটি স্থিরচিত্র দেখতে দেখতেও যে দর্শকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতে পারে, এই চিত্রটি দেখবার আগে তা জানা ছিল না। একক চিত্র তো নয়, ওর ভিতরেই যে দেখতে পাচ্ছি মন্দভাগিনী যশোধরার সমস্ত জীবনটাকে। ওর চোখের তারায়, ওর দুটি হাতের মুদ্রায় যে অনেক কথা ও বলছে—নির্বাক্ চিত্র তো এ নয়।

গোপা-রাহুল ও বুদ্ধদেব

দেখছি, অতি বিশালায়তন বুদ্ধদেবের সম্মুখে দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী (চিত্র—৫৭)। বুদ্ধদেবের পরিধানে পীত অজিন, তাঁর মাথার পিছনে জ্যোতিঃপ্রভা ; তাঁর হাতে ভিক্ষাপাত্র। বিশাল করে আঁকলেও শিল্পী কিন্তু বুদ্ধদেবকে স্পষ্ট করে আঁকেননি। পশ্চাদ্‌পটের উপর তাঁর দেহাবয়বকে সুস্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত করেননি। যেন মনে হয়, এ কোন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়—এ যেন এক পীতাভ অপার্থিব সত্ত্বা। তিনি অতি বিশাল, তিনি মহিমময়, কিন্তু তিনি রঙ ও রেখার বন্ধনে ধরা দিতে নারাজ। অপরপক্ষে, গোপা ও রাহুল আয়তনে ছোট হতে পারে, কিন্তু তাদের দেহের প্রতিটি রেখা, অলঙ্কার, পরিধেয়ের প্রতিটি পরিচয় সুস্পষ্ট!

যশোধরার পিছনে একটি তোরণদ্বার—মহামানবের পিছনে রেখাহীন রঙহীন কালো আকাশ। যশোধরার পরিধেয় শুভ্র, বুদ্ধদেবের পশ্চাদ্‌পট কৃষ্ণবর্ণ। শিল্পী কি জানতেন এ বৈজ্ঞানিক সত্য—যে সাতটা রঙ যেখানে ঘন হয়ে আসে সেখানে দেখা দেয় শুভ্রতা, আর সব রঙ যাঁকে ত্যাগ করে যায়, তাঁকেই অভিভূত করে কৃষ্ণবর্ণ? জানি, ঐ বৃহৎ তোরণদ্বারটি

---

* "অপরূপা অজন্তা প্রথম সংস্করণ পড়ে জাতীয় অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অংশটির প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, তুমি যখন কল্পনার রাশ আল্‌গা করে দিতেই রাজী আছ, তখন ঐ মহিলাটিকে যশোদেব-জায়া মনে না করে মহাগৌতমীও তো মনে করতে পার। সেক্ষেত্রে তাঁর পিছনের বিস্ফারিতনয়না মহিলাটিকে যশোধরা এবং গজকুম্ভের উপরে যুক্তকর শিশুমূর্তিটিকে রাহুলের চিত্র মনে করা চলবে।"

বৌদ্ধ শাস্ত্রকার বলছেন, গৌতমের বিমাতা মহাগৌতমী এবং যশোধরা ভিক্ষুণী হবার অনুমতিপ্রার্থিণী হিসাবে বুদ্ধদেবের অনুসরণ করেছিলেন দীর্ঘকাল। একেবারে শেষ পর্যায়ে সে অনুমতি দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এ-চিত্রে বুদ্ধদেবের বামদিকে একমাত্র হস্তীর পৃষ্ঠে শাক্যপুরকামিনীদেরই হয়তো এঁকেছেন অজন্তা-শিল্পী। রাজছত্রটির ব্যঞ্জনা সেক্ষেত্রে বোঝা যায়। আমি শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে তাঁর এ-মত মেনে নিয়েছি।

হাস্যরেখা, বয়সে ইনি তরুণ। তবু কেন যে এ'কে ইয়াজদানী সনাক্ত করেননি, আমি জানি না। আমার মতামত ব্যক্ত করার আগে বুদ্ধদেবের জীবনের একটা ঘটনার কথা বলি :

মহাপণ্ডিত সারিপুত্র একবার বলেছিলেন : আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ধরাধামে তথাগত বুদ্ধদেবের মত মহাজ্ঞানী ইতিপূর্বে কখনও জন্মগ্রহণ করেননি, আজও নেই, এবং ভবিষ্যতেও কখনও অবতীর্ণ হবেন না।

বুদ্ধদেব সে-কথা শুনতে পেয়ে বলেছিলেন—তোমার বাণী অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, কিন্তু হে পণ্ডিতাগ্রগণ্য সারিপুত্র, তুমি এ-কথা বলার পূর্বে এতাবৎকাল যে সব মহাপুরুষ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের জীবনী ও বাণী নিশ্চয়ই জেনে নিয়েছ?

সারিপুত্র সলজ্জে বলেন : কাল অনাদি—দূর অতীতের সকলের সকল কথা আমি কেমন করে জানব প্রভু?

: তা বটে! অন্ততঃ ভবিষ্যতে এ ধরাধামে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের কথা নিশ্চয়ই তুমি দিব্যদৃষ্টিতে জানতে পেরেছ?

আরও লজ্জা পেয়ে সারিপুত্র বলেন : আজ্ঞে না। কাল শুধু অনাদি নয়, সে যে অনন্তও। সুদূর ভবিষ্যতের কথা আমি কেমন করে জানব প্রভু?

: তাও তো ঠিক! তাহলে অন্ততঃ আজ এই ধরাধামের বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে যত মহাপুরুষ মরদেহ ধারণ করে বিচরণ করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে তোমার সম্যক্ ধারণা হয়েছে নিশ্চয়।

মরমে মরে গিয়ে সারিপুত্র বলেন—কাল যেমন অনাদি-অনন্ত, পৃথিবীও তেমনি বিপুলা! এই বিপুলা পৃথিবীর সকল প্রত্যন্তদেশের সংবাদ আমি কেমন করে জানব প্রভু?

বুদ্ধদেব শুধু বললেন : তাও তো বটে! এ তো খুব ভাবনার কথা দেখি!

তখন বুদ্ধদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে সারিপুত্র বললেন : আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি প্রভু!

বুদ্ধদেব তখন শিষ্যদের বলেছিলেন : জ্ঞানমার্গে সারিপুত্র সর্বাগ্রগণ্য ; কিন্তু সে আমাকে এত ভক্তি করে যে, বর্ষণ-উন্মুখ ভক্তির মেঘে তার জ্ঞানসূর্য কখনও কখনও আচ্ছন্ন হয়ে যায়। জ্ঞান ও ভক্তি দু-নৌকায় পা দিয়ে সারিপুত্র অগ্রসর হতে বাধা পায়। অথচ তোমরা আনন্দকে দেখ, সে শুধু সেবার মাধ্যমেই এগিয়ে চলেছে। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির এলোমেলো হাওয়ায় তার নৌকা একটুও দোলে না।

আনন্দ ছিলেন সিদ্ধার্থের পিতৃব্যপুত্র। বোধ করি সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ছিলেন তিনি। মহানির্বাণের সময় বুদ্ধদেব তাঁরই হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন নিজের ভিক্ষাপাত্রটি। এই সব কথা যখন ভাবি, তখন বুদ্ধদেবের বামচরণবর্তী বিচিত্র হাস্যরেখায় সমুজ্জ্বল ঐ তরুণটিকে সনাক্ত করতে আমার তো কই বাধছে না? বুদ্ধদেবের কঠিন ও কূট প্রশ্নে এবং সারিপুত্রের জ্ঞানগর্ভ প্রত্যুত্তরে সবাই যখন অভিভূত, ও তখন মনে মনে বলছে : জ্ঞানমার্গের ও-নৌকায় আমার কি প্রয়োজন? আমি আছি তোমার চরণসেবা করতে—তাই বসেছি তোমার চরণমূলে। আমার নির্বাণ ঠেকায় কে?

যেন এ-কথা ভেবেই ওর মুখে ফুটে উঠেছে ঐ মোনালিসা-মার্কা বিচিত্র হাসিটি।

প্রাচীরের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে সপ্তদশ গুহায় আঁকা এই সুবৃহৎ চিত্রটি অজন্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র তো বটেই, বোধ করি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফ্রেস্কো!

বুদ্ধদেবের বামপার্শ্বে আছে একটিমাত্র হস্তী। তার পিঠে একজন মহিলা, সঙ্গে সহচরীর দল। নারীমূর্তি এ-চিত্রে আর নেই। এই মহিলাটি তাহলে কে? আম্রপালীর* ঘটনা পরবর্তী কালের, বুদ্ধদেবের বিমাতা মহাগোতমী ভিক্ষুণী হয়েছিলেন একেবারে শেষ পর্যায়ে। আমি তো মনে করেছি, এই মহিলাটি হচ্ছেন কাশীর বণিকশ্রেষ্ঠ যশের সহধর্মিণী। সারনাথ মৃগদাবে

* যে বৎসর বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ হয়, সেই বৎসরই কুশীনগর যাবার পথে বৈশালী নগরীর উপকণ্ঠে আম্রপালীর সঙ্গে বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ হয়।

প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের অনতিকাল পরেই কাশীধামের শ্রেষ্ঠ ধনী বণিকপ্রবর যশদেব সস্ত্রীক ও সমাতা বুদ্ধদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। যশ-জায়াই হচ্ছেন গৌতমবুদ্ধের প্রথমা শিষ্যা। আমার ধারণা, হস্তিপৃষ্ঠে ঐ মহিলাটি যশোদেব-জায়া। একটিমাত্র সংশয় আছে। শিল্পী এঁর মাথায় মুকুট পরিয়েছেন। রাজা ও রানী ছাড়া অজন্তা-শিল্পী মুকুট ব্যবহার করতে চান না সচরাচর।*

পাঠক যাতে অন্যান্য চরিত্রগুলির সনাক্তকরণে নিজেই সচেষ্ট হতে পারেন, তাই বুদ্ধদেব যে ক্রমপর্যায়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন, সেইভাবে তাঁর প্রধান ও প্রত্যক্ষ শিষ্যদের কয়েকজনের নাম এখানে দিলাম :

ধ্যান-কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিত, ভাস্প, মহানাম, ভদ্রিক, যশোদেব (স্ত্রী ও মাতা), বিমল, সুবহু, পূর্ণ, উরুবেল-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ, গয়া-কাশ্যপ, সারিপুত্র, মহামৌদ্গল্ল্যায়ন, চন্দ, অনিরুদ্ধ, নন্দিন, সুভূতি, রেবত, অমোঘরাজ, মহাপারাণক, ভক্কুল, নন্দ, রাহুল, স্বাগত ও আনন্দ।

মূল গর্ভ-মন্দিরে মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তনরত বুদ্ধদেবের বিরাটায়তন মর্মরমূর্তি (১৭।২৩)। ধ্যানস্তিমিত ধর্মচক্র মুদ্রা। প্রলম্বিতপদ—অর্থাৎ পূর্ব-বর্ণিত চিত্রে যা দেখেছি। পদতলে মৃগদাবের প্রতীক দুটি হরিণ-শিশু। মূল গর্ভ-মন্দিরের প্রবেশপথে বামদিকে অন্তরালের উত্তর প্রাচীরে সপ্তদশ গুহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রটি। সেই গোপা-রাহুল ও বুদ্ধদেব (১৭।২৪)।

গোপা-রাহুল ও বুদ্ধদেব

চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে দর্শককে কাঁদতে দেখেছি। উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠকের চোখের পাতা ভিজে উঠতে দেখেছি। কিন্তু কোন একটি স্থিরচিত্র দেখতে দেখতেও যে দর্শকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতে পারে, এই চিত্রটি দেখবার আগে তা জানা ছিল না। একক চিত্র তো নয়, ওর ভিতরেই যে দেখতে পাচ্ছি মন্দভাগিনী যশোধরার সমস্ত জীবনটাকে। ওর চোখের তারায়, ওর দুটি হাতের মুদ্রায় যে অনেক কথা ও বলছে—নির্বাক্ চিত্র তো এ নয়।

দেখছি, অতি বিশালায়তন বুদ্ধদেবের সম্মুখে দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী (চিত্র—৫৭)। বুদ্ধদেবের পরিধানে পীত অজিন, তাঁর মাথার পিছনে জ্যোতিঃপ্রভা ; তাঁর হাতে ভিক্ষাপাত্র। বিশাল করে আঁকলেও শিল্পী কিন্তু বুদ্ধদেবকে স্পষ্ট করে আঁকেননি। পশ্চাদ্পটের উপর তাঁর দেহাবয়বকে সুস্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত করেননি। যেন মনে হয়, এ কোন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়—এ যেন এক পীতাভ অপার্থিব সত্ত্বা। তিনি অতি বিশাল, তিনি মহিমময়, কিন্তু তিনি রঙ ও রেখার বন্ধনে ধরা দিতে নারাজ। অপরপক্ষে, গোপা ও রাহুল আয়তনে ছোট হতে পারে, কিন্তু তাদের দেহের প্রতিটি রেখা, অলঙ্কার, পরিধেয়ের প্রতিটি পরিচয় সুস্পষ্ট!

যশোধরার পিছনে একটি তোরণদ্বার—মহামানবের পিছনে রেখাহীন রঙহীন কালো আকাশ। যশোধরার পরিধেয় শুভ্র, বুদ্ধদেবের পশ্চাদ্পট কৃষ্ণবর্ণ। শিল্পী কি জানতেন এ বৈজ্ঞানিক সত্য—যে সাতটা রঙ যেখানে ঘন হয়ে আসে সেখানে দেখা দেয় শুভ্রতা, আর সব রঙ যাঁকে ত্যাগ করে যায়, তাঁকেই অভিভূত করে কৃষ্ণবর্ণ? জানি, ঐ বৃহৎ তোরণদ্বারটি

---

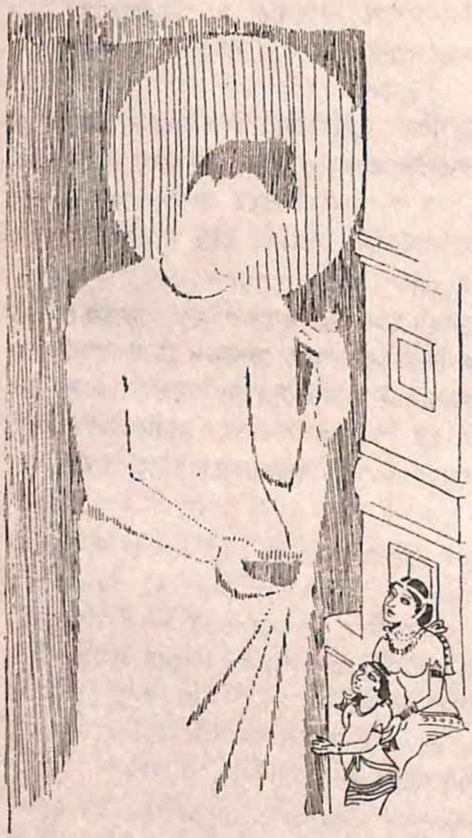
* "অপরূপা অজন্তা প্রথম সংস্করণ পড়ে জাতীয় অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অংশটির প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, তুমি যখন কল্পনার রাশ আল্গা করে দিতেই রাজী আছ, তখন ঐ মহিলাটিকে যশোদেব-জায়া মনে না করে মহাগৌতমীও তো মনে করতে পার। সেক্ষেত্রে তাঁর পিছনের বিস্ফারিতনয়না মহিলাটিকে যশোধরা এবং গজকুম্ভের উপরে যুক্তকর শিশুমূর্তিটিকে রাহুলের চিত্র মনে করা চলবে।"

বৌদ্ধ শাস্ত্রকার বলছেন, গৌতমের বিমাতা মহাগৌতমী এবং যশোধরা ভিক্ষুণী হবার অনুমতিপ্রার্থিণী হিসাবে বুদ্ধদেবের অনুসরণ করেছিলেন দীর্ঘকাল। একেবারে শেষ পর্যায়ে সে অনুমতি দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এ-চিত্রে বুদ্ধদেবের বামদিকে একমাত্র হস্তীর পৃষ্ঠে শাক্যপুরকামিনীদেরই হয়তো এঁকেছেন অজন্তা-শিল্পী। রাজছত্রটির ব্যঞ্জনা সেক্ষেত্রে বোঝা যায়। আমি শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে তাঁর এ-মত মেনে নিয়েছি।

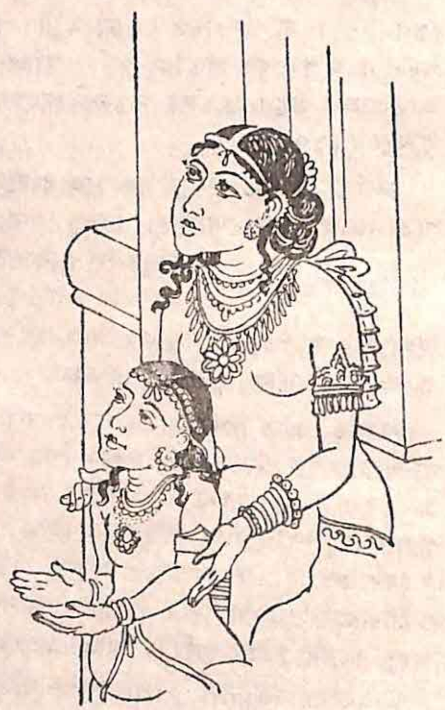
ভারসাম্যের খাতিরে আঁকা। বিশালায়তন বুদ্ধদেবের তুলনায় নারী ও শিশু দুটির আকার বা 'ম্যাস্' ঘাট্‌তি হয়ে যাচ্ছে বলে ঐ তোরণদ্বারটি আঁকতে বাধ্য হয়েছেন তিনি; কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে সেজন্য নয়—শিল্পী যেন বলতে চান যশোধরার পশ্চাদ্‌পটে জীবনের তোরণদ্বার আজ রুদ্ধ ; আর তুলনায় মহামানবের পশ্চাতে শুধুই মহাশূন্য!

এই চিত্রটির প্রসঙ্গে এসে প্রাচ্য-শিল্প-বিশারদ্ লরেন্স বিনিয়ন বলেছেন :*

মহিমময় বুদ্ধদেবের সম্মুখে ভিক্ষাদানরত নারী ও শিশুপুত্রের চিত্রটি অবিস্মরণীয়।...মিঃ গ্রিফিথের গ্রন্থে এবং ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত এ্যালবামে শুধু নারী ও শিশুকেই আঁকা হয়েছে—আশ্চর্যের কথা, কেউই তার সঙ্গে বুদ্ধদেবের চিত্রটি আঁকেননি। ফলে, মাতাপুত্রের ঐ বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকার যিনি মূল উৎস, তাঁকে পাঠক অনুমান করতে বাধ্য হন।



চিত্র—৫৭ ॥ বুদ্ধদেব, গোপা ও রাহুল
(অবস্থান—XVII/24)।



চিত্র—৫৮ ॥ গোপা ও রাহুল
(অবস্থান—XVII/24)।

কিন্তু আর একটা কথা। তিনটি চরিত্রকে ক্ষুদ্র গ্রন্থের পৃষ্ঠায় একসঙ্গে দেখাতে গেলে, মাতাপুত্রের দেহাবয়ব এত ক্ষুদ্র হয়ে যায় যে, তার সূক্ষ্ম কাজ দেখানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এখানে মাতাপুত্রকে কিছু বড় করে আবার এঁকে দেখাতে হল (চিত্র—৫৮)। এবার চেয়ে দেখুন রাহুলের দিকে ; কী অপার বিস্ময়, কী অপূর্ব আবেদন ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী ওর শিশু-মুখে! দেখুন মন্দভাগিনী যশোধরাকেও। লক্ষ্য করুন ওঁর করাঙ্গুলির মুদ্রা!

* *Introduction of Lawrance Binyon to "My Pilgrimages to Ajanta & Bagh", London 1925, by Mukul Dey.*

গ্রিফিথ বলেছেন * Hands are put in with a pretty *maniere* grace and truth of expression which, to those acquainted with Indian life, is full of suggestiveness. It is precisely this that, to this day, supple wrists, palms, and fingers beseech, explain, deprecate and caress.

যশোধরার দুটি হাতের করাঙ্গুলি যেন তাঁর হয়ে কথা বলছে। কে বলে এ ছবি নির্বাক্? একটু কান পাতলেই শুনতে পাবেন, ওর বামহস্ত বলছে : দ্যাখ্‌রে পাগলা, ঐ তোর বাপ! যা ওর কাছে, ও তোকে পৃথিবীর রাজা করে দিতে পারে। এই বেলা চেয়ে নে তোর পিতৃধন!

কিন্তু এই তো যশোধরার শেষ কথা নয়! সে যে তার জীবন দিয়ে চিনে নিয়েছে ঐ 'দয়ার অবতার' নিষ্ঠুর উদাসীন মানুষটিকে! তাই ওর অবচেতন মনে আছে শংকা ; তাই বাঁ-হাতে ছেলেকে ঠেলে দিয়েও ডান হাতে আবার তাকে আগলে রাখছে মন্দভাগিনী! তাই ওর ডান হাতের করাঙ্গুলি বলছে : যাস্‌নে রে, যাস্‌নে! ও বড় নিষ্ঠুর! ও কেড়ে নিয়েছে আমার স্বামীকে—সুযোগ পেলে ও কেড়ে নেবে আমার সন্তানকেও! ও যে দয়ার অবতার!

বিনিয়ন বলেছেন :

আমার শিল্পান্বেষণের জীবনে এর চেয়ে মহিমময়, এবং এমন করুণায় আপ্লুত মর্মস্পর্শী কোন চিত্র দেখছি বলে তো মনে করতে পারছি না!

এ-চিত্র প্রসঙ্গে এইটিই শেষ কথা নয় কি?

এবার আমরা দেখব আর একটি সুদীর্ঘ জাতক-কাহিনী—বিশ্বান্তর-জাতক। কিন্তু চালচিত্র ছাড়া যেমন প্রতিমার স্বরূপ ফোটে না, পশ্চাদ্‌পট ছাড়া যেমন ছবি খোলে না, তেমনি বিশ্বান্তর-জাতকের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য বোধিসত্ত্ব বিশ্বান্তরের বংশ-পরিচয়টি জানা থাকা দরকার। বিশ্বান্তরের পিতামহ হচ্ছেন স্বনামধন্য মহারাজ শিবি। মহাভারতে† সত্যনিষ্ঠ শিবিরাজার উপাখ্যান আমরা পড়েছি ; সে কাহিনী প্রথম গুহায় আঁকা আছে, তা-ও দেখে এসেছি আমরা (১।৩)। জাতকমতে শিবিরাজার কহিনীটি অন্যরকম। একজন অন্ধ ভিখারী তাঁর কাছে একটি চক্ষু ভিক্ষা করেছিল, দানশীল শিবিরাজা তাকে প্রার্থনার অতিরিক্ত নিজের দুটি চক্ষুই দান করেন। মহাভারত-বর্ণিত কাহিনীর মত এখানেও দেবরাজ শক্র শিবিরাজকে দুটি চক্ষুই প্রত্যর্পণ করেন। সেই কাহিনী অবলম্বনেও অজন্তা-শিল্পী এই সপ্তদশ গুহাতে একটি অনবদ্য চিত্র এঁকে রেখে গেছেন। সেই শিবিরাজার পুত্র হচ্ছেন মহামতি সঞ্জয় এবং তাঁর পুত্রবধূ হচ্ছেন মহারানী পৃষতী। যুবরাজ বিশ্বান্তর এঁদেরই সন্তান। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল পিতামহের বাণী :

বিশ্বান্তর-জাতক

> অতি প্রিয় ভাব যারে যাহা তব অতি আদরের
> তাহাও চাহিলে দিবে তুষিবারে মন যাচকের॥§

বিশ্বান্তরের জন্মের পূর্বেই রাজমহিষীর করকোষ্ঠী বিচার করে গ্রহাচার্য বলেছিলেন, জাতক হবেন ভুবন-বিখ্যাত দানবীর এবং এঁকে রাজৈশ্বর্যের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যাবে না ; ইনি যৌবনেই বনবাসী হবেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে মহারাজ সঞ্জয় এবং মহারানী প্রতিজ্ঞা করলেন, এ অঘটন কিছুতেই ঘটতে দেবেন না ওঁরা।

জন্মমাত্র জাতক মাকে বলেছিল—মা, আমি কিছু দান করতে চাই, ঘরে কিছু আছে?

শিশুকাল থেকেই বিশ্বান্তর সংসারে অনাসক্ত, সব-কিছুকেই সে দান করে দেয়—আহার্য, বস্ত্র, অলঙ্কার—যা পায়।

---

* *Guide to Ajanta Frescoes*, Dept. of Archaeology, H. E. H. the Nizam's Govt., Hydrabad, 1935.

† কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারতে বনপর্বে (১৩১ম অধ্যায়) ও অনুশাসন পর্বে (৩২ অধ্যায়) শিবিরাজার কাহিনী দ্রষ্টব্য। সেখানে শিবিরাজা শরণার্ত কবুতরের জন্য দেহের মাংস দান করেছিলেন।

§ ঈশানচন্দ্র ঘোষ।

সঞ্জয় আর পৃষতী লক্ষ্য করেন দানশীল বালকের মনের গতি। বাধা দেন না তাঁরা! পিতামহের দানশীলতা পৌত্রের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে।

অষ্টবর্ষ বয়সকালে বালক মাকে বলে—আমি এমন কিছু দান করতে চাই, যা হবে মহাদান! না হলে তৃপ্ত হবে না আমার অশান্ত হৃদয়।

জননী বলেন—কি দান করতে চাও তুমি?

—আমার দেহের কোন অংগ। মাংস, চক্ষু অথবা হৃদয়!

—পিতামহের দানশীলতাকে অতিক্রম করতে চাও তুমি?

বালক বলে—পিতামহের কাছে অন্ধ একটি চক্ষু প্রার্থনা করেছিল, তিনি তাকে দুটি চক্ষুই দান করেছিলেন। তাঁকে অতিক্রম করব কেমন করে মা, আমার তো দুটি বই চক্ষু নাই।

ভাবিতা হলেন জননী, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন মহারাজ। কিন্তু না, কিছুতেই তাঁরা যুবরাজকে বনবাসী হতে দেবেন না! মহারাজ সমস্ত রাজ্য অন্বেষণ করে এক অপরূপা সুন্দরীকে নিয়ে এলেন পুত্রবধূ করে। বিশ্বান্তর-জননী সদ্যোবিবাহিতা পুত্রবধূকে জনান্তিকে নিয়ে এসে বলেন—গ্রহাচার্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তোমার স্বামী যৌবনকালেই তোমাকে ত্যাগ করে বনবাসী হবে। সে ললাটলিখন ব্যর্থ করতে হবে তোমাকে। কেমন, পারবে?

নববধূ সলজ্জে গ্রীবাভঙ্গি করে জানায়, সে পারবে।

বিশ্বান্তর-জায়া মাদ্রী বিদুষী ছিল না মহাজনক-পত্নী সীবলীর মত ; কিন্তু তার সংসারজ্ঞান ছিল প্রখর। সীবলীর মত সে রূপে ভোলাবার চেষ্টা করেনি, ভালবাসা দিয়েও নয়—সে ঠিকই চিনতে পেরেছিল রাজপুত্রকে। সে জানত, কী রোগের কী ঔষধ!

বিবাহ-উৎসবশেষে পুষ্পস্তবক-সজ্জিত পালংকে নববিবাহিত দম্পতির বাসরশয্যায় মাদ্রীকে হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে গেল নর্মসহচরীর দল। সংগীত, হাস্য-পরিহাস শেষ হলে অর্গলবদ্ধ ঘরে নবদম্পতিকে রেখে বিদায় নিল তারা। মাদ্রী তখন বিশ্বান্তরের পদপ্রান্তে নামিয়ে রাখে একটি সলজ্জ প্রণাম। বাহুমূল ধরে বিশ্বান্তর ওকে তুলে ধরেন। পদ্ম-কোরকতুল্য দুটি হাত জোড় করে মাদ্রী বলে—প্রভু, এই আনন্দের দিনে একটি ভিক্ষা আছে।

উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন বিশ্বান্তর। দান করতে পারলে আর কিছু চান না তিনি। বলেন—বল সুচরিতে, কী দান পেলে সুখী হবে তুমি?

—প্রতিশ্রুতি দিন, আমাকে ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নিয়ে কোনদিন বনবাসী হবেন না?

বিশ্বান্তরের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে ক্ষীণ হাস্যরেখা, বলেন—কঠিন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলে তুমি। কিন্তু প্রার্থীকে আমি কখনও বিমুখ করি না। দিলাম প্রতিশ্রুতি, শুচিস্মিতে!

মিলন-রাত্রিশেষে দ্বার খুলে বাহিরে এসে মাদ্রী দেখে, অলিন্দের একান্তে প্রভাতের প্রতীক্ষায় জেগে বসে আছেন বিশ্বান্তর-জননী। পুত্রবধূকে দেখতে পেয়ে নিকটে এসে বলেন—মনে আছে?

সলজ্জে মাদ্রী বলে—আছে মা, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবেন না।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে সঞ্জয়-জায়ার।

সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়েন ক্রমে বিশ্বান্তর। দুটি সন্তান হয়েছে তাঁর! দেবশিশুর মত দিব্যকান্তি দুটি নিষ্পাপ শিশু শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার মত দিন দিন রাজপ্রাসাদকে উজ্জ্বলতর করে তোলে। মাদ্রীর দুটি নয়নের মণি যেন—পুত্র জালী আর কন্যা কৃষ্ণাজিন। মহারাজ সঞ্জয় আশ্বস্ত হন, পৃষতী নিশ্চিন্ত হন—গ্রহাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁরা ব্যর্থ করতে পেরেছেন।

এদিকে দানবীর বিশ্বান্তরের জীবনযাত্রায় কোনও পরিবর্তন নেই। ক্রমাগত দু'হাতে দান করে চলেছেন তিনি—তাঁর বৈভব, তাঁর সম্পদ, রাজপুত্রের ব্যক্তিগত যা-কিছু—অলংকার, পরিধেয়, আহার্য, তৈজসপত্র। রাজা-রানী ভ্রূক্ষেপ করেন না—অতুল রাজ-সম্পদের কতটুকু ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে এতে?

প্রমাদের সূত্রপাত প্রথম দেখা দিল, যেদিন যুবরাজ একজন প্রার্থীকে দান করে বসলেন নিজ তরবারি। অসন্তুষ্ট হলেন অমাত্যবর্গ, আহত হলেন মহামন্ত্রী, ক্ষুব্ধ হলেন প্রধান সেনাপতি। এ কী অনাচার! ক্ষত্রিয় রাজপুত্র যদি আত্মরক্ষার অস্ত্র পর্যন্ত নির্দ্বিধায় দান করে বসেন, তবে প্রজাবৃন্দ কোন্ ভরসায় তাঁর হাতে তুলে দেবে শাসনদণ্ড?

মহারাজ সঞ্জয়ও মর্মাহত হয়েছিলেন ; কিন্তু পুত্রের দানকার্যে তিনি কখনও বাধা দিতেন না, তাই স্বীকার করে নিলেন যুবরাজের এই অক্ষত্রিয় আচার!

কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়। এর কিছুদিন পরে কলিঙ্গ দেশে দেখা দিল অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষ। নিরন্ন প্রজার দল ভিক্ষার্থে এল রাজপ্রাসাদে ; কিন্তু তারা রাজদরবারে না গিয়ে এসে দাঁড়াল যুবরাজের গৃহে। ওদের দুর্দশায় বিগলিত হয়ে গেলেন বিশ্বান্তর—ওদের দান করে দিলেন রাজহস্তীটিকে।

এই রাজহস্তীটি ছিল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বৃংহিত-ধ্বনি করে সে নির্মেঘ আকাশে আষাঢ়সঘন জলদ সঞ্চার করতে পারত। উৎফুল্ল কলিঙ্গবাসীরা রাজহস্তী নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ; কিন্তু এদিকে সঞ্জয়ের রাজ্যে ঘনীভূত হয়ে ওঠে প্রচণ্ড অসন্তোষ। রাজ-পুত্রের কোনো অধিকার নেই রাজসম্পদ এভাবে পররাজ্যে বিলিয়ে দেবার। অসন্তুষ্ট প্রজাবৃন্দ প্রকাশ্যে অভিযোগ আনল রাজদরবারে—তারা রাজপুত্রের বিচার চায়।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহারাজ।

মহামন্ত্রী তাঁর কর্ণমূলে নিবেদন করেন, প্রজাবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে—অবিলম্বে যুব-রাজকে স্থানান্তরে প্রেরণ করুন। নচেৎ হয়তো ওরা গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করে বসবে!

মহারানী বলেন—কিছুদিনের জন্য ওকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করুন মহারাজ।

মহারাজ সঞ্জয়ের মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাস্যরেখা। তাঁর সেই অস্বাভাবিক মূর্তি দেখে শিহরিত হলেন রানী। মহারাজ বলেন, মন্ত্রীমহোদয়ের পরামর্শও শুনেছি, মহারানীর সুযুক্তিও শুনলাম—কিন্তু তোমরা একটা কথা ভুলে গেছ, তা হচ্ছে এই যে, আমি যে সিংহাসনে বসে আছি, সেই সিংহাসনেই একদিন উপবেশন করতেন সত্যনিষ্ঠ মহারাজ শিবি!

মন্ত্রী বলেন—সে কথা কেন বলছেন মহারাজ?

দৃঢ়কণ্ঠে সঞ্জয় বলেন—ন্যায়ের বিচারে পিতাপুত্রের সম্পর্ক নেই! রাজ-শাসনের বিধানে রাজসম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার একটিমাত্র শাস্তি নির্দিষ্ট আছে! তাই দিতে হবে আমাকে।

আর্তকণ্ঠে পৃষতী বলেন—কী সেই শাস্তি?

সঞ্জয় বলেন—তুমি অন্তঃপুরে যাও রানী, এ তুমি সহ্য করতে পারবে না! আমি ক্ষত্রিয় নৃপতি, আমাকে সব সহ্য করতে হয়! যে দুর্দৈবকে এতদিন প্রতিরোধ করে এসেছি সর্বপ্রকারে, সেই দণ্ডাদেশই দিতে হবে আমাকে!

শিহরিত মন্ত্রী বলেন—মহারাজ?

—হ্যাঁ, তাই—পুত্রকে নির্বাসন-দণ্ড দিলাম।

সে দণ্ডাদেশ শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়েন বিশ্বান্তর-জননী। কিন্তু অপরাধী স্বয়ং নির্বিকার। দণ্ডাদেশ শুনে তিনি বলেন—রাজাদেশ শিরোধার্য, তবে আমি একটি দিনের জন্য সময় চাইছি মহারাজ! আগামীকাল আমি একবস্ত্রে বনবাসে যাব।

উদ্গত অশ্রু গোপন করে সঞ্জয় বলেন—কেন? একদিন সময় চাইছ কেন?

—নির্বাসনে যাত্রা করার পূর্বে আমার যা-কিছু সম্পত্তি আমি প্রজাবর্গকে দান করে যেতে চাই। আপনি শতদান উৎসবের আয়োজন করুন, পিতা!

শুনে অভিভূত হয়ে গেল প্রজাবৃন্দ ; কিন্তু রাজাদেশ অমোঘ। সমস্ত দিন ধরে যুবরাজ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ মুক্তহস্তে দান করে দিলেন। দিবসান্তে রিক্তহস্তে ফিরে এলেন রাজ-প্রাসাদে। প্রণাম করলেন পিতাকে, জননীর পদপ্রান্তে জানান প্রণতি, রাজপুরীর প্রতিটি

কর্মচারী, প্রতিটি ভৃত্যের কাছে বিদায় গ্রহণ করলেন। অবশেষে এসে উপনীত হলেন নিজ নিকেতনে মাদ্রীর কাছে বিদায় নিতে। রাজাদেশের কথা এখনও কেউ তাঁকে জ্ঞাপন করতে সহসী হয়নি। তখন,

সর্বাঙ্গসুন্দরী মদ্রসুতাকে সম্বোধি
বলিলেন বিশ্বান্তর, "যাহা কিছু আমি
ধন-ধান্য, স্বর্ণ-মুক্তা বৈদূর্য প্রভৃতি
দিয়াছি তোমায় প্রিয়ে, পৈতৃক যে ধন
পাইয়াছ আর তুমি—সমস্ত এখন
করহ স্থাপন কোন নিরাপদ স্থানে।"
সর্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী বলেন তখন
"কোথায় এসব, প্রভো, করিব স্থাপন?" ॥ ৬৩-৬৪ ॥*

বিশ্বান্তর তখন প্রত্যুত্তর করেন :

শীলবান্ ব্যক্তি যাঁরা, তাঁহাদের মাঝে
যিনি যা পাইতে যোগ্য, দাও তাহা তাঁকে
দান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রাণিগণ
নিরাপদে রক্ষিতে না পারে নিজ ধন।
পুত্রগণে কর সেবা, ভর্তা যিনি তব
হইবেন অতঃপর,† পরিচর্যা তাঁর
করিও যতনে, মাদ্রি, কায়ে বাক্যে মনে।

এ রাজ্য হইতে আমি করিলে প্রস্থান
যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত না হয়ে কোন জন
চান তব ভর্তা হতে, ভর্তা মনোমত
নিজেই খুঁজিয়া লবে। বিরহে আমার
না যেন শুকায়ে যায় ও বরাঙ্গ তব ॥ ৬৭-৬৮ ॥

স্তম্ভিতা মাদ্রী বলেন—আপনি এ-সব কী বলছেন প্রভু? কী হয়েছে?

আর সত্যগোপনের প্রচেষ্টা নিরর্থক বুঝে বিশ্বান্তর বলেন—সকলের কাছেই আমি বিদায় নিয়ে এসেছি, প্রিয়তমে! রাত্রি প্রভাতে আমি রাজাদেশে নির্বাসনে চলে যাব। তুমি প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দাও, শুচিস্মিতে!

মাদ্রী এতক্ষণে আত্মস্থ হলেন, অতি দুঃখেও তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে বিচিত্র এক হাস্যরেখা, বলেন—আমি তো দানবীর নই যুবরাজ, যে প্রার্থনামাত্রেই প্রার্থীকে বিদায় 'দান' করব।

রাজপুত্র ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বলেন—কিন্তু বিচ্ছেদ যখন অমোঘ, তখন প্রসন্নমনে বিদায় দেওয়াই তো বিধেয়?

মাদ্রী বলেন—না! আমি আপনাকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করতে পারব না। আপনার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করুন যুবরাজ! আপনি সত্যবন্ধ, বলেছিলেন আমাকে ত্যাগ করে বনে চলে যাবেন না।

বিস্মিত রাজপুত্র বলেন—তুমি ভুল করছ মাদ্রী! আমি তো স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস নিয়ে বনে যেতে চাইছি না। এ যে রাজদণ্ড!

যুক্তকরে মাদ্রী বলেন—সত্যরক্ষা করেও সে দণ্ডাদেশ পালন করতে পারেন আপনি, যুবরাজ! সেই দণ্ডের ভাগ আমাকেও গ্রহণ করবার অধিকার প্রদান করুন। স্বামীর সমস্ত কিছুরই অর্ধাংশ স্ত্রীর! আমিও আপনার সঙ্গে নির্বাসনে যাব।

—কিন্তু আরণ্যক জীবন যে দুর্বিসহ দুঃখের!

—না! আপনার বিরহ-যন্ত্রণা ভোগের অপেক্ষা নয়।§

---

* ফৌস্‌বোল-সম্পাদিত 'জাতকার্থবর্ণনা' নামক মূল পালিভাষায় লিখিত গ্রন্থ থেকে শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক আক্ষরিক অনুবাদ।

† পরাশর-সংহিতার "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে—"শ্লোক স্মর্তব্য।

§ জাতকের কবি এখানে মাদ্রীর মুখে হিমালয়ের অতিদীর্ঘ বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। যক্ষ যেমন 'মার্গং তাবচ্ছৃণু' বলে দীর্ঘ পথের বর্ণনা দিয়েছিল 'সন্দেশং মে তদনু' করে, মাদ্রীও তেমনি জাতক-কবিকে এখানে হিমালয় বর্ণনার সুযোগ দিয়েছেন।

—কিন্তু আমাদের নাবালক সন্তান দুটি? তোমার দুটি নয়নের মণি? জালী এবং কৃষ্ণাজিন?

—তারাও অনুগমন করবে তাদের জননীকে।

—ওরা যে দুগ্ধপোষ্য শিশু, মাদ্রী!

অচঞ্চল দীপশিখার মত যুক্তকরে উঠে দাঁড়ান মাদ্রী, স্থির সংযতকণ্ঠে বলেন—সত্যনিষ্ঠ যুবরাজ, আপনার ধর্মাচরণে আমি কখনও প্রতিবন্ধক হইনি। আমাকেও স্বধর্ম অনুসরণে আপনি বাধা দেবেন না, এই আমার একান্ত মিনতি।

—কী তোমার সেই ধর্ম, মাদ্রী?

—স্বামীপুত্রের সেবা।

সত্যাশ্রয়ী বিশ্বান্তর আর বাধা দেননি।

পরদিন অশ্বচতুষ্টয়-যোজিত রাজরথে যুবরাজ সস্ত্রীক ও সপুত্রকন্যা নিষ্ক্রান্ত হলেন রাজপুরী থেকে। অর্গলবদ্ধগৃহে মূর্ছাতুরা পৃষতী জানতেও পারলেন না, দ্বারপ্রান্তে প্রণাম করে গেল কারা। অনুতপ্ত প্রজাবৃন্দ সারি সারি দাঁড়িয়েছে রাজপথে। এই মুহূর্তটিতে ওরা ভুলে গেছে, পূর্বদিন এঁরই বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজদরবারে অভিযোগ এনেছিল ওরাই।

নগরসীমান্তে বাধা পেয়ে বিশ্বান্তর রথ রক্ষা করেন। চারজন ব্রাহ্মণ অগ্রসর হয়ে এসে বলেন—শতদানের সংবাদ পেয়ে ওঁরা দূর দেশ থেকে আসছেন। বিশ্বান্তর সখেদে বলেন—আজ আমি যে নিঃস্ব ভাই! কি দিতে পারি বল, তোমাদের?

প্রার্থীদের মুখপাত্র অগ্রসর হয়ে এসে বলেন—আমাদের চারজনকে আপনার রথের চারটি অশ্ব দান করুন।

উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন বিশ্বান্তর। ঠিক কথা! এ-কথা তো মনে ছিল না।

অতঃপর পদব্রজে যাত্রা। মহাসত্ত্ব বিশ্বান্তর রাজবধূ মাদ্রীকে তখন বলেন :

> তুমি কোলে লও কৃষ্ণাজিনারে এখন ;
> ছোট সেই লঘুভার ; জালী বড় তার,
> সেহেতু তাহার আমি লইলাম ভার ॥ ২১৮ ॥

পুত্রকন্যাকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে দুর্গম পথে যাত্রা শুরু হল সেই দুজন ভাগ্যহতের, রাজবৈভবের প্রাচুর্যের মধ্যে অতিযত্নে এতকাল যাঁরা বাস করে এসেছেন।

অবশেষে হিমালয়ের পাদদেশে বঙ্ক পর্বত! এখানেই বনবাসে কালাতিপাত করবেন মহাসত্ত্ব। অবাক্ বিস্ময়ে মাদ্রী দেখতে থাকেন সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যকে। শ্বাপদসঙ্কুল এ গহন অরণ্যে কেমন করে মানুষ করে তুলবেন তাঁর সেই নয়নের দুটি মণিকে? কেমন করে বাঁচিয়ে রাখবেন ধর্মনিষ্ঠ স্বামীকে? তবু দুর্ভাগ্যের কাছে নতিস্বীকার করেন না মাদ্রী। বোধিসত্ত্ব দিবারাত্র ধ্যানমগ্ন, আর অতন্দ্র সাধনায়, দুটি শিশুর সাহায্যে সেই গভীর অরণ্যে একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করেন রাজবধূ মাদ্রী। বিশ্বান্তর উদাসীন, নিস্পৃহ—আহার্য তাঁর হাতে তুলে দিলেও তিনি আহার করতে ভুলে যান, দান করে দেন খাদ্য। অবশ্য, এ গহন অরণ্যে প্রার্থীর ভীড় নেই, তবু আহার্য তো সংগ্রহ করে আনতে হবে। বিশ্বান্তর উপাসনা করেন, ধ্যান করেন, শিশু-সন্তান দুটি খেলা করে বন-কুরঙ্গের সঙ্গে, আর নিরলস পরিশ্রমে রাজবধূ মাদ্রী উদয়াস্ত আহার্য সংগ্রহ করেন। পার্বত্য স্রোতস্বিনী থেকে নিয়ে আসেন পানীয় জল, ফলবান বৃক্ষ থেকে আহরণ করে আনেন বনজ ফল। দিবসান্তে কুটিরে প্রত্যাবর্তন করে দেখেন ধ্যানমগ্ন বিশ্বান্তর বসে আছেন নিবাত-নিষ্কম্প-দীপশিখার মত, আর শিশু-সন্তান দুটি খেলা করছে পর্ণকুটিরের অদূরে। মাদ্রীর পদশব্দে খেলা ফেলে ছুটে আসে জালী ও কৃষ্ণাজিন। সমস্ত দিন অদর্শনের পরে জননীর সান্নিধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ওরা। আর কোন বাধা মানে না, আর কোন কাজ করতে দেয় না মাদ্রীকে। মাদ্রীও সমস্ত দিনের পরিশ্রমের কথা ভুলে যান—এই অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত সান্ধ্য মুহূর্তটিই ওঁর দিবারাত্রির নিরলস পরিশ্রমের ফলশ্রুতি। শিশুসন্তান দুটিকে বুকে টেনে নেন, হাত বুলিয়ে দেন মাথায়, গল্প বলেন।

ক্রমে গভীর হয়ে আসে আরণ্যক রাত্রি। নিশাচর প্রাণীর পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়

তখন। মাদ্রী আহার্য বণ্টন করেন। স্বামীপুত্রের আহারান্তে অবশিষ্ট কিছু থাকলে মুখে দেন।

কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা মন্দভাগিনী রাজবধূর ললাটে এটুকু সুখও লেখেননি। একদিন দিবসান্তে বনান্তর থেকে আহার্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে মাদ্রী দেখেন—কুটিরের সম্মুখে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন বিশ্বান্তর, তাঁর চরণপ্রান্তে হরিণ-শিশু দুটি সাথীর অভাবে নিদ্রামগ্ন।

চিন্তান্বিতা হলেন মাদ্রী, কুটিরের চতুষ্পার্শ্বে অন্বেষণ করতে থাকেন ; কিন্তু শিশু দুটির কলকণ্ঠ শুনতে পেলেন না কোথাও। প্রথমে মনে হয়েছিল এ বুঝি শিশুসুলভ কোন খেলার ছল। জননীকে চমকিত করে দেবার উদ্দেশ্যে ওরা বুঝি কোন পত্রান্তরালে লুকিয়ে আছে। উৎকণ্ঠিতা মাদ্রীর মনের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন জাতককার :

ধূলাবালি সর্ব অঙ্গে মাখিয়া বাছারা
ছুটিয়া আনন্দে মোরে বেষ্টি এ সময়।
আজ কেন তাহাদের দেখা নাহি পাই ?
অরণ্য হইতে যবে আসিতাম ফিরি
দূর হতে দেখি মোরে ছুটে আসি ত্বরা
ধরিত জড়ায়ে।...তবে, আজ কোথা তারা ?
দুগ্ধে পূর্ণ হইয়াছে স্তনদ্বয় মোর ;
বিপত্তি শঙ্কায় মোর বুক ফাটি যায়
জালী, কৃষ্ণা, অভাগীর নয়নের ধন,
দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ ? ॥ ৫৫২ ॥

বারংবার নাম ধরে ডাকার পরেও যখন কেউ সাড়া দিল না, তখন এক অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিতা হলেন মাদ্রী। সহসা তাঁর লক্ষ্য হয় নিদ্রিত হরিণ-শিশুর মুদ্রিত চক্ষুপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু। যা কখনও করেননি তাই করে বসেন মাদ্রী ; অকালে ধ্যানভঙ্গ করলেন যুবরাজের, বলেন—ওরা কোথায় ?

শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে বিশ্বান্তর বলেন—ওরা তো নেই !

—নেই ! সে কি ! কোথায় তারা !

—আজ একজন ব্রাহ্মণ এসেছিল। ভিক্ষা চাইল সে। আমি তাকে বললাম, আমি নিঃস্ব বনবাসী তপস্বী, কি দিতে পারি তোমাকে ? ব্রাহ্মণ তখন জালী আর কৃষ্ণাজিনকে নির্দেশ করে বললে—ঐ দুটি শিশুকে আপনি দান করে দিন, ক্রীতদাসরূপে ওদের বিক্রি করলে—

চীৎকার করে ওঠেন মাদ্রী—ক্ষান্ত হন যুবরাজ ! আর বলবেন না। বাকিটুকু আমাকে অনুমান করে নিতে দিন !

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিলেন মাদ্রী, সে নিষ্ঠুর কাহিনীর বর্ণনা পাঠ করা যায় না :

জালী ও কৃষ্ণাজিনার
দিলেন তাহাই তিনি
সুতসুতা উভয়কে
হেরি এ অদ্ভুত ত্যাগ
হাত ধরি বিশ্বান্তর
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহা
ব্রাহ্মণের দান যবে
শিহরিল সর্বলোক
ব্রাহ্মণেরে করিলেন দান
ছিল তাঁর যে দুটি সন্তান।
করিলেন হৃষ্টমনে তিনি
দানতেজে কাঁপিল মেদিনী ॥ ৪৬৫ ॥

নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ আনিল তখন
লতার আঘাতে দুজনে তাড়ায়
বান্ধি রজ্জুপাশে দণ্ডের আঘাতে
এ দারুণ দৃশ্য অবিকৃতমনে
দাঁত দিয়া লতা করিয়া ছেদন।
কান্দিল তাহাতে শিশু দুটি হায়।
শিশু দুটি সেই যায় তাড়াইয়া
লাগিলা দেখিতে রাজা দাঁড়াইয়া ॥ ৪৬৮ ॥

ঈশানচন্দ্র ঘোষ মশাই লিখেছেন :

অতঃপর কুমার ও কুমারীর দেহে যে যে স্থানে আঘাত লাগিল, সেই সেই স্থানেই চর্ম ছিঁড়িয়া গেল ও রক্ত বাহির হইল। প্রহারের তাড়নায় তাহারা ভয় পাইয়া পিঠাপিঠি হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অতঃপর এক বিষম স্থান দিয়া যাইবার কালে ব্রাহ্মণের পদস্খলন হইল এবং সে আছাড় খাইয়া পড়িল। অমনি শিশু দুইটির কোমল হস্ত হইতে সে কঠিন লতাপাতা খুলিয়া গেল। তাহারা কান্দিতে কান্দিতে সেই মহাসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল :

ব্রাহ্মণের হস্ত হতে মুক্তিলাভ করি
শিশু দুটি ফিরি গিয়া সাশ্রুনেত্রে, হায়,
পিতার নিকটে তাঁর মুখপানে চায়।
অশ্বত্থপত্রের মত কাঁপিতে কাঁপিতে
পিতার চরণ তারা করিল বন্দন।
প্রণমি কহিল জালী এতেক বচন :
"মা নাই আশ্রমে এবে, তবু বাবা তুমি
দিতেছ এ ব্রাহ্মণেরে আমা দুইজনে।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর, মা আসুন ফিরি,
দেখি তাঁকে একবার জনমের মত।

ক'র শেষে ব্রাহ্মণেরে, অতঃপর দান।
এ মহানিষ্ঠুর ধনপিপাসু ব্রাহ্মণ
বান্দিয়া প্রহার করে সন্তানে তোমার,
বান্দি লয়ে যায় লোকে গরুকে যেমন,
তথাপি মধ্যস্থভাবে তুমি উদাসীন!

কৃষ্ণা তো নিতান্ত শিশু, দুঃখ সে জানে না;
যূথভ্রষ্টা হরিণ পোতিক যেরূপ
স্তন্যতরে কান্দে, বাবা, কৃষ্ণাও তেমনি
কান্দিতেছে; মরিবে সে না পাইলে মাকে।
তারে শুধু থাকিবারে দাও অনুমতি। ॥ ৪৭০—৪৭৯ ॥

তাই ভাবছি, ঠিকই বলেছিলেন মাদ্রী: ক্ষান্ত হন যুবরাজ! আর বলবেন না, বাকিটুকু আমাকে অনুমান করে নিতে দিন!

ধূলায় লুটিয়ে পড়েন মহারাজ সঞ্জয়ের আদরিণী পুত্রবধূ।

সান্ত্বনা দেবার জন্য এগিয়ে আসেন বিশ্বান্তর। ভূমিশয্যা থেকে মন্দভাগিনীকে উত্তোলন করবার জন্য বাড়িয়ে দেন দুটি হাত। মাদ্রী বিদ্যুদ্‌স্পৃষ্টার মত উঠে বসেন, বলেন: আমাকে সান্তনা দেবার কোন চেষ্টা করবেন না যুবরাজ! স্পর্শ করবেন না আমাকে! আমার সান্ত্বনা আমি নিজেই খুঁজে নেব।

মহাসত্ত্ব সখেদে বলেন: আজ তোমার বড় দুঃখের দিন, মাদ্রী!

বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মাদ্রীর বিশীর্ণ ওষ্ঠে। বলেন—কিন্তু আজই যে আপনার বড় সুখের দিন, প্রভু! আজই যে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ উচ্চাভিলাষ, পূর্ণ হয়েছে!

বিস্মিত বিশ্বান্তর বলেন: কী সেই উচ্চাভিলাষ, মাদ্রী?

—মহানুভবতায় আপনার পিতামহকে অতিক্রম করা। মহারাজ শিবি শুধু নিজের দুটি চক্ষুই দান করেছিলেন। আপনি তাঁকে হারিয়ে দিয়েছেন! দানের উন্মাদনায় ইতিপূর্বেই অন্ধ হয়েছিলেন আপনি, আজ তদুপরি উৎপাটন করেছেন আপনার ধর্মপত্নীর দুটি নয়নের মণি!*



চিত্র—৫৯ ॥ শিবি-জাতক—মহারাজের চক্ষু উৎপাটনের পরের দৃশ্য (অবস্থান—XVII/25)।

কাহিনী-চিত্র এর পর এগিয়ে গেছে জালী ও কৃষ্ণাজিনের পথরেখা ধরে। এবার সেই কাহিনী-চিত্রের প্রসঙ্গে আসা যাক:

কিন্তু কাহিনী-চিত্রের ক্ষেত্রেও বিশ্বান্তরের পিতামহের চিত্রটির কথাই প্রথমে বলে নিতে হয়। এই চিত্রটিতে (১৭।২৫) দেখতে পাচ্ছি ব্রাহ্মণকে চক্ষু দান করার পরে শিবিরাজার অবস্থা। মহারাজা বসে আছেন একটি চন্দ্রাতপের নীচে। অসীম যন্ত্রণায় তিনি বাম হাতে চেপে ধরেছেন নিজের চোখ; কিন্তু তাঁর উপবেশনের ভঙ্গিমায় রাজোচিত মর্যাদার অভাব নেই।

* শাস্তা অর্থাৎ বুদ্ধদেব এই জাতক-কাহিনী বর্ণনা করার পর শ্রোতৃবৃন্দ তাঁকে প্রশ্ন করে—ভগবন্, কাহিনীতে আপনি ছিলেন বোধিসত্ত্ব বিশ্বান্তর, অন্য সকলে কে? বুদ্ধদেব উত্তরে সেই 'সমবধান' এইভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন: দেবদত্ত সেজন্মে ছিল জুজুক, রাজা শুদ্ধোদন ছিলেন রাজা সঞ্জয়, মহামায়া ছিলেন পুষতী, রাহুল ছিলেন জালী, অগ্রশ্রাবিকা উৎপলবর্ণা ছিলেন কৃষ্ণাজিন এবং রাহুল-জননী ছিলেন মাদ্রী।

মহারাজের সন্নিকটে রয়েছেন রানী, একজন সভাসদ্ এবং আরও একজন পুরকামিনী। মন্ত্রীর হস্তের মুদ্রাটি লক্ষণীয়। চিত্রটি বাস্তবে লুপ্তপ্রায়, তবু অল্পসংখ্যক রেখার ভগ্নাংশ থেকেই চেনা যায় শিল্পীর দরদ-ভরা তুলিকে। এই অনবদ্য চিত্রটি শিল্পী মিস্ ডরোথি লার্চারের অনুসরণে এখানে সংযোজিত করলাম (চিত্র—৫৯)।

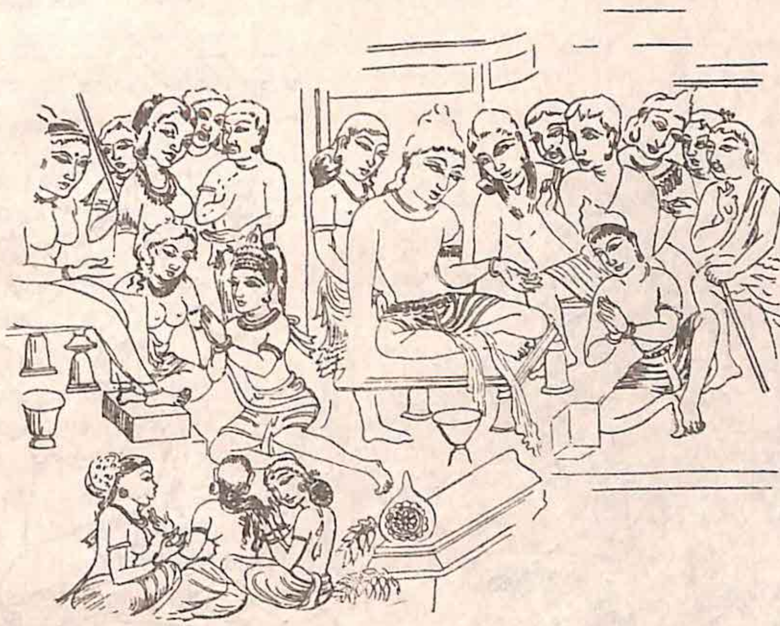
বিশ্বান্তর জাতকের শুরু বাহিরের অলিন্দের বামপার্শ্বে—সেখানে দেখছি (চিত্র—৬০) একটি মণ্ডপে মূর্ছাতুরা মাদ্রীকে যুবরাজ সান্ত্বনা দিচ্ছেন। দুজনে বসেছেন একটি পালঙ্কে। একটি ভৃত্য ভৃঙ্গার বাড়িয়ে ধরেছে যুবরাজের দিকে। যুবরাজের হাতে একটি চষক, তাতে কোন ঔষধ অথবা সুরা। বর্তমানে যুবরাজের আলেখ্যটি বিকৃত হয়ে গেছে, কিন্তু মাদ্রীর মুখসৌন্দর্য প্রায় অটুটই আছে। তারপর দেখছি, বিশ্বান্তর ও মাদ্রী রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে যাচ্ছেন। একজন ছত্রধারিণী মাদ্রীর মাথার উপর ছত্র ধরে আছে। শতদান উৎসবে একজন ভিক্ষুক এসেছে—তার হাতে একটি বঙ্কিম যষ্টি। পিছনের গবাক্ষে দেখতে পাচ্ছি মহারাজ সঞ্জয় ও রানী পৃষতীকে। পুত্র ও পুত্রবধূর বিদায়-যাত্রা দেখলেন তাঁরা।



চিত্র—৬০॥ বিশ্বান্তরের বিদায় দৃশ্য (অবস্থান—XVII/26)।

বিহারের ভিতরে (১৭।২১ এবং ১৭।২৬-ক) দেখছি শতদানের দৃশ্য। রাজপুত্র একজন প্রার্থীকে নিজ তরবারি দান করছেন।...উপরে কলিঙ্গ দেশ থেকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাবৃন্দ এসেছে যুবরাজের কাছে (১৭।২৬-খ)। তাদের চুল-বাঁধার রীতি উৎকলদেশীয়।...নীচে দেখছি, নির্বাসন-দণ্ডলাভের পর যুবরাজ রাজা ও রানীর কাছে বিদায় নিতে এসেছেন (চিত্র—৬১)। শিল্পী পাশাপাশি দুটি কক্ষে পৃথকভাবে এ বিদায় দৃশ্য দুটি এঁকেছেন। দক্ষিণ দিকে দেখছি মহারাজ সঞ্জয় বসে আছেন কাষ্ঠাসনে, তাঁর দক্ষিণ হস্তটি অক্ষত নেই কিন্তু ভঙ্গিতে রাজোচিত মর্যাদার ব্যঞ্জনা। তবু চিত্রকর ওঁর দেহভঙ্গিমার মধ্যেই তাঁর

অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। চিত্র—৬৬-তে মহারাজ সঞ্জয়ের বসার ভঙ্গির সঙ্গে এই চিত্রে তাঁর উপবেশনের ভঙ্গিটি তুলনা করলেই বুঝবেন। চিত্র—৬৬-তে মহারাজের 'সমং কায়শিরোগ্রীবং' ভঙ্গি ; চিত্র—৬১-তে তিনি যেন দক্ষিণহস্তে পতনোন্মুখ দেহভার রক্ষা



চিত্র—৬১ ॥ যুবরাজ পিতা ও মাতার কাছে বিদায়প্রার্থী (অবস্থান—XVII/26c)।

করছেন! মহারাজের দুটি নয়নে বিগলিত করুণা! সাতজন সভাসদ যেন পশ্চাৎপট রচনা করেছে এ অংশে।...বাম দিকের অংশে দেখছি, জননীর মহালে এসেছেন বিশ্বান্তর। পূর্ব দৃশ্যের মত এখানেও তিনি নতজানু, যুক্ত কর। এই অংশের নিম্নভাগে দেখছি তিনজন পুরললনাকে, তাদের মধ্যে একজন অপরজনের কবরীবন্ধনরত।

বামপ্রান্তের অর্ধ-স্তম্ভে (পিলাস্টারে) রাজবধূ মাদ্রীর কাছে বিদায় নিতে এসেছেন বিশ্বান্তর।

এখানে একটি শিল্প-চাতুর্য লক্ষণীয়। মাদ্রী ও বিশ্বান্তর একই সভামণ্ডপে আছেন ; কিন্তু ওঁদের আলেখ্য দুটি গুহা-প্রাচীরের একই সমতলে আঁকা নয়। পিলাস্টারের খাঁজে মাদ্রী ও প্রাচীরগাত্রে বিশ্বান্তর যেন মুখোমুখি বসেছেন। অথচ দুজনের মাঝখানে যেন আসন্ন-বিচ্ছেদের এক সমকোণ (১৭।২৬-ঘ)। চিত্র—৬২-তে রাজবধূ মাদ্রীর এবং চিত্র—৬৩-তে বিশ্বান্তরের চিত্র দুটি পরিবেশিত হল। লক্ষণীয় বিশ্বান্তরের বসার ভঙ্গি পূর্বদৃশ্যে রাজা সঞ্জয়ের ভঙ্গির মত। মাদ্রীর চিত্রটি তো অনবদ্য এবং মাদ্রীর পিছন দিয়ে যে মেয়েটি মুখ বার করেছে তার চিত্রটিও অনিন্দ্যনীয়। মাদ্রীর সম্মুখে একটি জলপূর্ণ ভৃঙ্গার, তার মাথায় পদ্মপাতা চাপা দেওয়া। মাদ্রী সে সন্ধ্যায় কবরীপাশ ঘননিবদ্ধ করতে ভুলেছে—তার কাঁধের উপর কুন্তলচূর্ণ কুণ্ডলায়িত।

এর পাশে অথবা নীচে সম্ভবতঃ শতদানের একটি দৃশ্য ছিল—সেটি নষ্ট হয়ে গেছে...পরের দৃশ্যে দেখছি, রথারূঢ় রাজপুত্র চলেছেন সস্ত্রীক রাজপথ দিয়ে। পিছনের আসনে দুটি শিশু-সন্তান।...রথ চলেছে বাজারের মাঝখান দিয়ে (১৭।২৬-ঙ)। পাশাপাশি তিনটি দোকান। দুগ্ধ-বিক্রেতা তার পাত্রটি রেখে বিদায়ী যুবরাজকে যুক্তকরে নমস্কার করছে। পরের দোকানটিতে একজন তৈল-ব্যবসায়ী পাত্রে তেল ঢালছে ; তৃতীয় বিপণীতে দোকানদার দাঁড়িপাল্লায় কিছু

পণ্যদ্রব্য ওজন করছে। দোকানগুলি দ্বিতল-গৃহের একতলায়। উপরে বাতায়নে এবং অলিন্দে পুরকামিনীদের ভীড়। রথের সম্মুখে চারজন প্রার্থী ; তাদের পোশাক, শিরস্ত্রাণ ও দেহাকৃতি বিভিন্ন। একজন সম্ভবতঃ মঙ্গোলীয়।...পরের দৃশ্যে দেখছি, রাজপুত্র সপরিবারে ভূতলে দণ্ডায়মান (১৭।২৬-চ)। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে তিনি অশ্ব দান করছেন। রাজপুত্রের হস্তে



চিত্র—৬২ ॥ মাদ্রী, বিশ্বান্তরের সম্মুখে (অবস্থান—XVII/26D)।



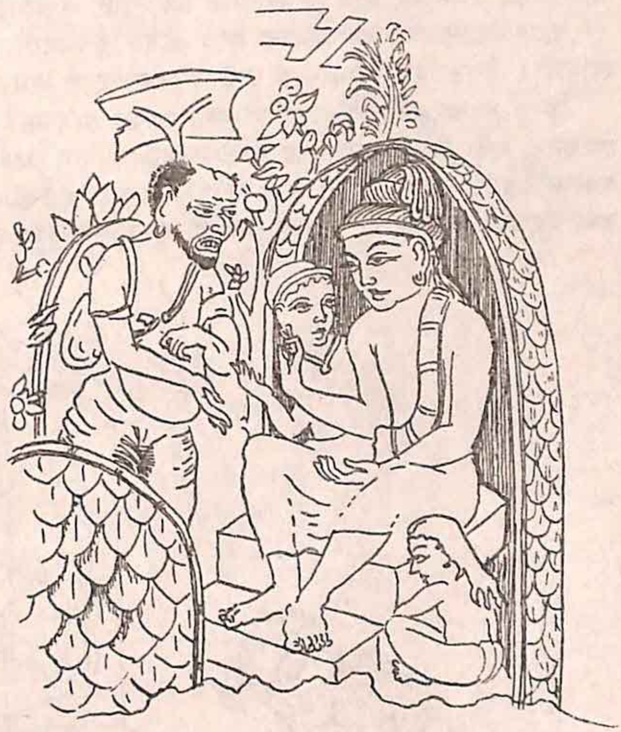
চিত্র—৬৩ ॥ বিশ্বান্তর, মাদ্রীর কাছে বিদায় চাইছেন (অবস্থান—XVII/26D)।

কমণ্ডলু—সম্ভবতঃ, তিল-গঙ্গোদক। শাস্ত্রসম্মত দান করছেন তিনি। এ দৃশ্যেও চারজন পথিক। তাদের কেউ দুঃখিত, কেউ আনন্দিত।

উপরি-লিখিত বৃহৎ প্যানেলের নীচে বঙ্ক পর্বতে রাজপুত্রের আরণ্যক জীবনের তিনটি অনবদ্য চিত্র ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ চিত্রগুলি প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। অতি আবছায়াভাবে দেখা যায়। প্রথম চিত্রে ছিল, মাদ্রী অরণ্যে ফল আহরণ করছেন। মাদ্রীকে পাশাপাশি কয়েকবার আঁকা হয়েছে ; অর্থাৎ শিল্পীর বক্তব্য রাজবধূর এ কাজটি হয়ে পড়েছিল নিত্যকর্ম-পদ্ধতির অন্তর্ভূত। দ্বিতীয় চিত্রে জুজুক নামে একজন লোভী নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ পর্ণকুটিরের দ্বারপ্রান্তে এসেছে জালী ও কৃষ্ণাজিনকে ভিক্ষা চাইতে (চিত্র—৬৪)। তৃতীয় চিত্রে দেখছি, সেই নিদারুণ দুঃখময় সন্ধ্যাকালের দৃশ্য। শূন্য কুটিরের সম্মুখে ভূমিতলে বসেছেন মাদ্রী, আর প্রস্তরাসনে তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট বিশ্বান্তর (চিত্র—৬৫)। এই তিনখানি চিত্র যেন তিনটি কবিতা ; রঙে ও রেখায় রসের অমৃতকুম্ভ পূর্ণ করেছেন শিল্পী। নিষ্পাপ দেবশিশুর অবাক্ চাহনিতে, মর্মাহতা জননীর অন্তর্দাহের ভাবব্যঞ্জনায়, বিশ্বান্তরের অনাসক্তিতে, চিত্রগুলি ছিল অবনদ্য। রাজবধূর প্রথম চিত্রের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, বনবাসিনী মাদ্রী শীর্ণা, সম্পূর্ণ নিরাভরণা, যেন

বিষাদের প্রতিমা। অপরপক্ষে, জুজুককে কয়েকটি রেখার টানে শিল্পী করেছেন নিষ্ঠুর, লোভী আর কুচক্রী! পরম আপসোসের কথা, এ চিত্রগুলি আর অজন্তায় গেলে দেখতে পাবেন না আপনি। এ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিস্ ডরোথি লার্চার এই চিত্রগুলিকে অক্ষত অবস্থায় দেখেছিলেন, তাঁর স্কেচ বইয়ের* অনুসরণে বর্তমান লেখক কিছু ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন মাত্র।

কাব্যে-উপেক্ষিতা মাদ্রীকে ত্যাগ করে এর পর চিত্রের মিছিল এগিয়ে চলেছে জুজুক-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে আসে। শ্বাপদ-ভীত নিষ্ঠুর জুজুক স্বয়ং বৃক্ষে আরোহণ করে, অথচ অসহায় শিশুদুটিকে ফেলে রাখে ভয়ঙ্কর অরণ্যে, ভূতলেই।... প্রাণভয়ে ভীত দুটি শিশু অরণ্যে রোদন করছে। দেবরাজ ইন্দ্র কৃপাপরবশ হয়ে বিশ্বান্তরের রূপ ধরে আবির্ভূত হয়েছেন ওদের সম্মুখে। পিতাকে দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয় শিশু দুটি। নিশ্চিন্তে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে পিতৃরূপী ইন্দ্রের ক্রোড়ে।...নিশাবসানে বৃক্ষচূড় থেকে অবরোহণ করে জুজুক। শিশুদের কাছে শোনে, রাত্রে তাদের পিতা এসেছিলেন। ভয় হয় লোভী ব্রাহ্মণের—কি জানি যদি পিতৃস্নেহে সে পুত্রকন্যাকে ফিরিয়ে নিতে চায়?...অচিরে বঙ্ক পর্বতের এলাকা পার হয়ে জুজুক অন্যত্র চলে যায়। উপযুক্ত মূল্য পেলে সে শিশু দুটিকে বিক্রী করে দিতে চায়, কিন্তু এতটুকু শিশুকে কে ক্রীতদাস করতে চাইবে?...পথে পথে ফিরছে ব্রাহ্মণ...দেশ-দেশান্তরে, তার সঙ্গে ফিরছে দুটি হতভাগ্য রাজার সন্তান।...বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী, কিন্তু জুজুক-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী মূল্য দিতে কেউই স্বীকৃত হয় না। চিত্র-নাটকের শেষ অঙ্কে দেখছি, এক মহাজনপদে প্রবেশের তোরণদ্বারে নগরপাল তাকে আট্‌কেছে, বলছে—এই দেবশিশু দুটি তো তোমার সন্তান নয়, কোথা থেকে চুরি করেছ এদের?



চিত্র—৬৪ ॥ জুজুক কর্তৃক জালী ও কৃষ্ণাজিনকে প্রার্থনা (অবস্থান—XVII/26)।

জুজুক অনেক কাকুতি-মিনতি করছে, কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করে না নগরপাল; জুজুককে সে নিয়ে যায় রাজদরবারে।...দেখছি, শিশু দুটিকে সভার বাহিরে রেখে নগরপাল ব্রাহ্মণকে হাজির করেছে মহারাজের সম্মুখে। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে মহারাজ জুজুককে বলছেন,—সত্য করে বল, তুমি চুরি করনি?

---

* মিস্ লার্চারের স্কেচ লোর্ড হ্যারিংহ্যাম কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটিতে প্রাপ্তব্য।

ভীত জুজুক যুক্তকরে শপথ করে :

পঞ্চদশ দিন পূর্বে দাতা একজন
করেছেন হৃষ্টমনে দান, মহারাজ,
এই দুই শিশু, এরা এবে মোর দাস। ॥ ৭৫৪ ॥

: কে দান করেছে তোমাকে?

: নাম জানি না, তবে সে লোকটি এই দুটি সন্তানের পিতা।

শুনে সভাস্থ সকলে অট্টহাস্য করে ওঠে! একবাক্যে সকলে বলে,—এ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য কাহিনী। পিতা হয়ে সন্তানকে কেউ ক্রীতদাসরূপে দান করতে পারে?

কিন্তু মহারাজের কর্ণকুহরে সে-কথা প্রবেশ করে না। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেছেন। সত্য বটে, পিতা হয়ে কেউ সন্তানকে দান করে না, কিন্তু এ সসাগরা পৃথিবীতে কখনও কখনও ব্যতিক্রমই যে নিয়মের পরিচায়ক! এ বিচিত্র দুনিয়ায় অন্ততঃ একটি মানুষের কথা মহারাজ মর্মে মর্মে জানেন, যার পক্ষে এ অসম্ভবও সম্ভব!



চিত্র—৬৫ ॥ বিশ্বান্তর মাদ্রীকে মহাদানের কথা জানাচ্ছেন (অবস্থান—XVII/26)।

অমাত্যবর্গ একবাক্যে বলে—মিথ্যাচারী প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণকে শাস্তি দিন মহারাজ!

সে-কথায় কর্ণপাত না করে মহারাজ নগরপালকে বলেন—সেই শিশু দুটিকে সভায় নিয়ে এস প্রথমে। তাদের কথা না শুনে আমি তো একে শাস্তি দিতে পারি না।

রাজাদেশে ধূলিমলিন দুটি দেবশিশু প্রবেশ করে মণি-দীপিত সভাকক্ষে। দর্শনমাত্র সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন সত্যনিষ্ঠ মহারাজ সঞ্জয় :

তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় মুখখানি শোভা পায়
কে ঐ আসিছে হেথা? দেহের বরণ
স্বর্ণ নিষ্কসমোজ্জ্বল উল্কামুখবৎ দীপ্ত
জান কি তোমার কেহ, ও কার নন্দন?
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোভা উভয়েরই মনোলোভা
উভয়েরই এক রূপ আকারে প্রকারে,
একটি জালীর মত অপরটি কৃষ্ণা যেন
এল কি বাছারা ফিরে এতদিন পরে? ॥ ৬৫০-৬৫১ ॥

অন্তঃপুর থেকে ছুটে আসেন মহারানী। এ যে তাঁদেরই হারানো মাণিক! শিশু দুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রুতে ভেসে যান মহারাজাধিরাজ সঞ্জয় আর মহারানী পৃষতী (১৭।২৬-ছ)।

চিত্রের পর চিত্র এঁকে সর্বশেষে এই অনবদ্য মিলনদৃশ্যে জাতক কাহিনীকে শাশ্বত করে রেখে গেছেন অজন্তা-শিল্পী—এই সপ্তদশ গুহায়। দেখছি (চিত্র—৬৬), মহারাজ সঞ্জয় বসে আছেন সিংহাসনে—তাঁর দক্ষিণহস্তে একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প। তাঁর পাশে সিংহাসনে উপাধানের



চিত্র—৬৬ ॥ বামে নীচে—নগরপাল জুজুক-এর পথরোধ করেছে। দক্ষিণে, উপরে—রাজসভায় জুজুক-এর কাছ থেকে স্বর্ণমূল্যে মহারাজ জালী ও কৃষ্ণাজিনকে ক্রয় করছেন (অবস্থান—XVII/26G)।

কাছে কৃষ্ণাজিন। ও-পাশে পৃষতী, তাঁর বামে (চিত্র—৬৬-এর বাহিরে) জালী। রাজাদেশে ধনাগার-রক্ষক জুজুক-এর প্রসারিত অঞ্চলে স্বর্ণকলস উজাড় করে দিচ্ছে। ন্যায়নিষ্ঠ মহারাজ স্বর্ণমূল্যে ক্রয় করছেন নিজ পৌত্র-পৌত্রীকে।

পরবর্তী চিত্রে দেখছি, মহারাজের আদেশে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হচ্ছে যুবরাজ বিশ্বান্তর এবং মাদ্রীকে। ইতিমধ্যে নির্বাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে তাঁদের। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যুবরাজের অভিষেক।

জাতকের অধিকাংশ চিত্র-কাহিনীই বিয়োগান্তক। মাতৃপোষক-জাতক, চম্পেয়্য-জাতক প্রভৃতি যে কয়টি মিলনান্তক কাহিনী আছে, সে কয়টি তাই বিশেষভাবে ভালো লাগে। সে

হিসাবে বিশ্বান্তর-জাতকেও কাহিনী শেষে দর্শক স্বস্তির একটি নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ পান।

এ নাটক যদি কখনও মঞ্চস্থ করেন, তবে প্রয়োজনবোধে কিছু যোগ ও বিয়োগ আপনি করতে পারেন। শুধু একটি বিষয়ে অজন্তা-শিল্পীর নির্দেশ অতিক্রম করতে পারবেন না। সে হচ্ছে ঐ নিষ্ঠুর লোভী জুজুক-এর রূপসজ্জা! ওর ঐ শকুনি-নাসা, ছাগলাদ্য দাড়ি, ছিন্ন ছত্র আর লুব্ধ দৃষ্টি এ নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংগ! তাই আমার একান্ত অনুরোধ, এমন কোন অভিনেতাকে ঐ ভূমিকাটি রূপায়ণের অধিকার দেবেন না—স্বর্ণমুদ্রার দর্শনে যাঁর বিরলকেশ মস্তকে সজারুর কাঁটার মত চুলগুলি খাড়া হয়ে না ওঠে!

এর পর কয়েকটি বুদ্ধমূর্তির আলেখ্য (১৭।১৫) এবং তারপর মহিষ-জাতকের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী (১৭।১৬)। বোধিসত্ত্ব সেবার এক ভীমকান্তি মহিষের রূপে অবতীর্ণ। কিন্তু করুণার অবতার তিনি। যে অরণ্যে তিনি বাস করতেন, সেখানেই থাকত একটি অর্বাচীন বানর। সময়ে-অসময়ে সে বোধিসত্ত্ব-মহিষের পিঠে চড়ে বসত—নানাভাবে উত্যক্ত করত তাঁকে। দয়ার অবতার মহিষ কোন প্রতিবাদ করতেন না। এইভাবে অত্যাচারে বানরটি এতই অভ্যস্ত হয়েছিল যে, তাঁকে দেখলেই সে ছুটে আসত। একদিন বোধিসত্ত্বের বদলে অন্য একটি আরণ্যক মহিষ সেই অরণ্যে বিচরণ করছিল। অর্বাচীন বানরটি লক্ষ্য করেনি পরিবর্তনটুকু—সে যথারীতি মহিষের পিঠের উপর চড়ে বসে আঁচড়াতে থাকে।

মহিষ-জাতক

বন্য মহিষ তৎক্ষণাৎ তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয় এবং শিঙ দিয়ে তার উদর ভেদ করে হত্যা করে বানরটিকে! দুটি চিত্রে এই ক্ষুদ্র কাহিনীটি এঁকেছেন অজন্তার শিল্পী! নীচে দেখছি, দয়ার অবতার বোধিসত্ত্ব-মহিষের পিঠের উপর উঠে বসেছে বানর, দুহাতে মহিষের দুই চোখ টিপে ধরেছে। আর তার উপরের দৃশ্যে দেখছি, বন্য মহিষ পদদলিত করতে যাচ্ছে বানরটিকে। জাতককার তথা শিল্পীর বক্তব্য এই দুই দৃশ্যের নাটকে সোচ্চার। অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত এই নির্জন গুহাবাসী বৌদ্ধ শ্রমণদের উপর কোনভাবে অত্যাচার করলে তাঁরা হয়তো প্রতিশোধ নেবেন না—কিন্তু যাঁর বিধানে চন্দ্র-সূর্য উঠছে, যাঁর অংগুলিহেলনে এ গুহা-বিহারের সম্মুখস্থ সংসার-চক্র ঘুরে চলে অবারিত গতিতে—তাঁর বিচারের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় নেই।

একটা কথা ভেবে দেখতে হবে—এই মহিষ-জাতক কাহিনীর স্থান-নির্বাচন! এটি সিংহল-অবদানের ঠিক পরেই আঁকা। সিংহল-অবদানের বিশালায়তন প্যানেলটি শেষ করে কি বৌদ্ধ শিল্পীর মনে হয়েছিল, বৈরী নির্যাতনের এ কাহিনীটি বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা তো কই ব্যক্ত করছে না? মৃত্যুর বদলে মৃত্যু, হত্যার বদলে হত্যা—এই কি বুদ্ধদেবের বাণী? বুদ্ধদেব তো তা বলেন নি, বলেছেন—যে তোমাকে ভালবাসবে তাকে ভালবেস—যে তোমার প্রতি শত্রুতা সাধন করবে তাকেও ভালবেস। তাই কি শিল্পী ঐ সিংহল-অবদান জাতকের পরে এই ক্ষুদ্র চিত্রটি এঁকে মনের ভার লাঘব করতে চান?

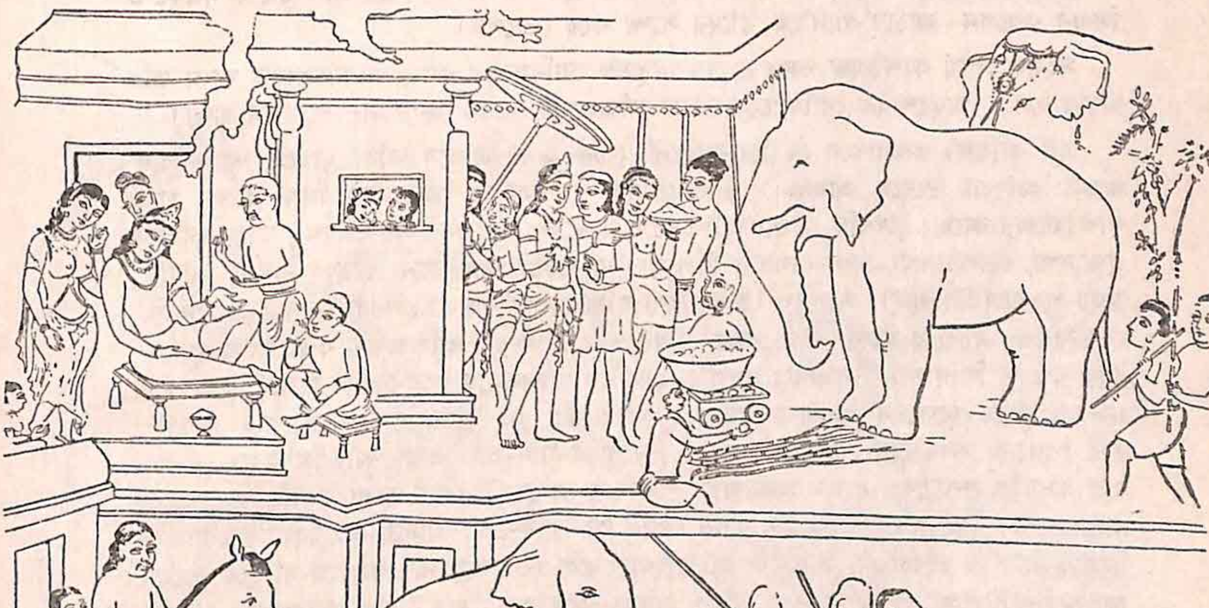
উত্তর প্রাচীরের পূর্বপ্রান্তেও দুটি জাতক-কাহিনী। উপরে শরভ-জাতক (১৭।১৭) এবং নীচে শ্যাম-জাতক (১৭।১৮)। শরভ জাতকের চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে—সে কাহিনী ফলে অবান্তর। শ্যাম-জাতকের কাহিনীটি ইতিপূর্বেই বলেছি।

শ্যাম-জাতকের নীচের অংশে আছে আরেকটি জাতক-কাহিনী। এটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আছে। এটির নাম মাতৃপোষক-জাতক (১৭।১৯)।

বোধিসত্ত্ব সেবার এক শ্বেতবর্ণের মহাগজরূপে হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই অন্ধ। কিশোর শ্যামের মতোই তিনি অন্ধ পিতামাতার জন্য বন-বনান্তর থেকে আহার্য সংগ্রহ করে আনেন। পিতামাতার আহারান্তে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। একদিন বোধিসত্ত্ব গজরাজ দেখতে পেলেন, একটি কাঠুরিয়া সেই গহন অরণ্যে পথ হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের

মতো বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। করুণার অবতার বোধিসত্ত্ব সেই কাঠুরিয়াকে পিঠে করে বনপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। কাঠুরিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হয়ে শুনতে পেল যে, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজহস্তীটি পূর্বরাত্রে মারা গেছে। সে রাজসকাশে উপনীত হয়ে বলল, অরণ্য অভ্যন্তরের অধিবাসী এক মহাকায় গজের সন্ধান সে দিতে পারে। রাজনির্দেশে সেই কৃতঘ্ন কাঠুরিয়া শিকারীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সেই গভীর অরণ্যে। সুকৌশলে শিকারীর দল শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলে বোধিসত্ত্ব

মাতৃপোষক-জাতক



চিত্র—৬৭ ॥ মাতৃপোষক জাতক (অবস্থান—XVII/10)।

গজরাজকে। করুণার অবতার বোধিসত্ত্ব কোন বাধা দিলেন না। গজরাজকে নিয়ে আসা হল রাজার হাতিশালে। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই হস্তিশালার রক্ষক এসে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের কাছে নিবেদন করে, ধৃত হস্তী রাজবাটীতে আসার পর থেকে জলগ্রহণ করেনি—উপবাসে সে

প্রাণ দিতে উদ্যত। কাশীরাজ কৌতূহলী হয়ে স্বয়ং এলেন হাতিশালে। সত্যই থরে থরে আহার্য সাজানো আছে অথচ কণামাত্র গ্রহণ করছে না সেই অনিন্দ্যকান্তি শ্বেতহস্তী। মহারাজের মনে হল, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। তিনি অনুচরদের আদেশ দিলেন হস্তীর শৃঙ্খল মোচন করে দিতে—এবং বন্ধনমুক্ত হস্তী কোথায় যায়, কি করে তার সন্ধান রাখার জন্য দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের নিযুক্ত করলেন। মুক্তিপ্রাপ্তিমাত্র গজরাজ ফিরে গেলেন নিজের নিভৃত অরণ্যাবাসে। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর অন্ধ পিতামাতা সাতদিন উপবাসে মরণোন্মুখ। গজরাজ তৎক্ষণাৎ শুন্ডে করে জল নিয়ে এসে তাঁদের গজকুম্ভে সিঞ্চন করলেন—আহার্য-পানীয়ে তাঁদের সুস্থ করে তোলেন।

সংবাদ পেয়ে কাশীরাজ স্বয়ং এলেন মাতৃভক্ত বোধিসত্ত্বের কাছে। বোধিসত্ত্বের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হল। মাতৃপোষক বোধিসত্ত্বের কাছে অভিধর্মের অনেক অনুশাসন শুনলেন রাজা।

এই কাহিনী অবলম্বনে যে চিত্র-কাহিনী (চিত্র—৬৭) এখানে আঁকা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে আজও। চিত্রে দেখছি, শৃঙ্খলাবন্ধ গজরাজকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাশীরাজের কাছে।...দেখছি, রাজার হস্তিশালে রজ্জুবন্ধ উপবাসী গজরাজকে ; তাঁর চতুর্দিকে ইক্ষুদন্ড, কদলীকান্ড, চাকা-লাগানো ট্রলি-জাতীয় শকটে করে আনা হয়েছে নানান্ আহার্য, অথচ গজরাজ উপবাসী। সম্মুখে বিস্ময়াবিষ্ট হস্তিশালার রক্ষক।...পরবর্তী প্যানেলে দেখছি, কাশীরাজের দরবারে হস্তিশালার রক্ষক যুক্তকরে তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছে। রাজা ব্রহ্মদত্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট।...দেখছি, হাতীকে শৃঙ্খলমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, রুদ্ধশ্বাসে গজরাজ ছুটে চলেছেন অরণ্য-অভিমুখে। গজরাজের এই দ্রুতগতি গমনভঙ্গিটি অপূর্ব ; তাঁর পিছনেই অশ্বপৃষ্ঠে দুজন রাজানুচর ; তারা একটি নগর-তোরণ অতিক্রম করছে। বন্ধন-মুক্ত হস্তীর সম্মুখেও দুজন বল্লমধারী পদাতিক অনুচর।...শেষ দৃশ্যে দেখছি মাতাপুত্রের মিলন-দৃশ্য। এই খন্ডচিত্রটির মাধুর্যরস বর্ণনা করা অসম্ভব। মানুষ নয়, কোন জানোয়ারের চিত্রে এ-জাতীয় ভাবব্যঞ্জনা অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। গজরাজ দাঁড়িয়ে আছেন, আবেশে দুটি চক্ষু বুজে এসেছে তাঁর। শুন্ডে করে জল নিয়ে তিনি আবেগভরে ঢালছেন অন্ধ পিতার গজকুম্ভে। তাঁর সম্মুখে অন্ধ পিতা শুন্ড উত্তোলিত করে আঘ্রাণ করছেন পুত্রের দেহ-সৌগন্ধ্য। মাতা তাঁর শুন্ড বুলিয়ে দিচ্ছেন পুত্রের অঙ্গে। শিল্পী অন্ধ পিতামাতার চোখ আঁকেননি—কিন্তু অন্ধ মানুষ যেভাবে দৃষ্টিহীনতার পরিপূরক হিসাবে প্রিয়জনের গায়ে হাত বুলিয়ে স্নেহ-ভালবাসা জ্ঞাপন করে, এক্ষেত্রে শিল্পী সেই কৌশল প্রয়োগ করে ওঁর পিতামাতার মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শ্যাম-জাতকে যে-কথা বলেছি, এবারও তাই বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। এখানে কৃতঘ্ন কাঠুরিয়াকে ক্ষমা করেছিলেন বোধিসত্ত্ব—দৈবনির্দেশে মুক্ত হয়েছিলেন তিনি। সিংহল-অবদানে রক্তক্ষয়ী বৈরী নির্যাতনের চিত্রটি আঁকার পর শিল্পী যেন অনুতপ্ত ক্লান্ত হয়েই এই সব অহিংসা, ক্ষমা, মহানুভবতার জাতক কাহিনীগুলি দিয়ে ভরিয়ে তুলেছেন এ গুহা-বিহারের পার্শ্ববর্তী প্যানেলগুলি।

সপ্তদশ গুহায় আর একটি জাতক-কাহিনী দেখেই এ পর্যায় শেষ করব আমরা। এ কাহিনীটি —হংস-জাতক। দ্বিতীয় গুহাতেই এ কাহিনীটি আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু সে গুহায়-আঁকা ছবিটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা আমরা সংযোজন করিনি। এবার এই সপ্তদশ গুহার সামনের বারান্দার বামপ্রান্তে এ চিত্রটিকে অনেকটা ভালো অবস্থায় পেয়েছি, আর তাই সেটি এখানে সংযোজন করে দিলাম (চিত্র—৬৮)।

চিত্রের দক্ষিণদিকে দেখছি, রাজ-শিকারী দু'হাতে দুটি স্বর্ণহংস ধরে আনছে। তার মাথার উপর অন্যান্য পলায়নপর হংসবলাকা। বামদিকে রাজদরবার। কাশীরাজ বসে আছেন সিংহাসনে, ঠিক তাঁর পিছনেই রানী ক্ষেমাদেবী। তাঁর মাথায় রাজছত্র। ক্ষেমার পাশেই একজন চামর-বাদিনী। রাজার সম্মুখে একজন অমাত্য এবং আশেপাশে আরও কয়েকজন নরনারী। রাজ-

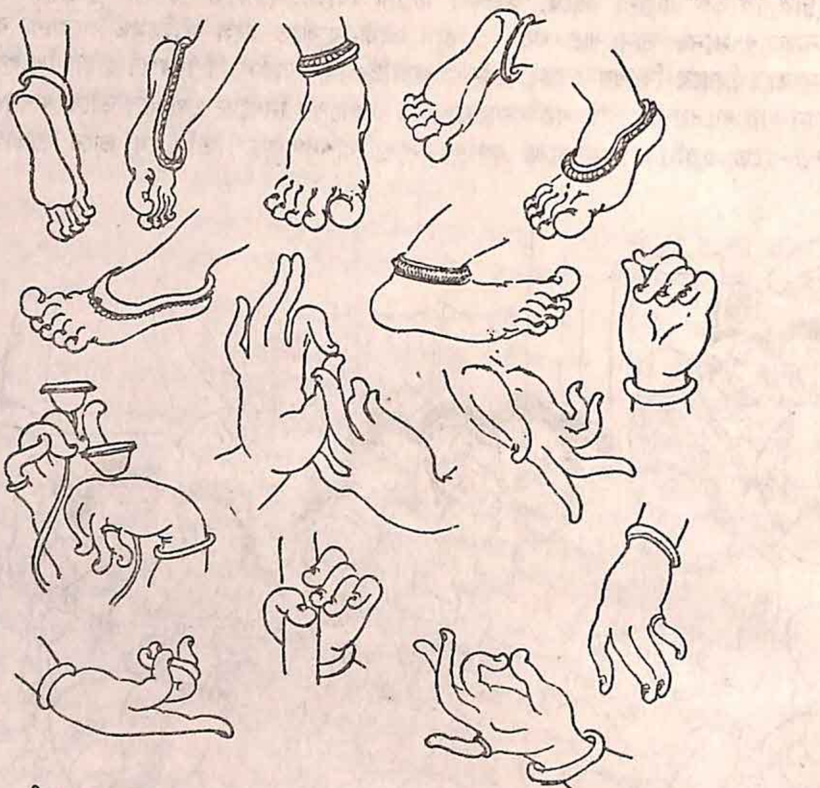
দম্পতির সম্মুখে দুটি আসনে দুটি রাজহংস। বোধিসত্ত্ব এবং তাঁর প্রধান সেনাপতি। রাজা ও রানীর হাতের মুদ্রাগুলি লক্ষণীয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, নৃত্যশিল্পে যেমন বিভিন্ন মুদ্রার বিভিন্ন ব্যঞ্জনা আছে, অজন্তা চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রও তেমনি শুধুমাত্র হাতের মুদ্রায় নানাভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করে। তার ভাষা বুঝতে হলে রীতিমত গবেষণা করতে হবে। অজন্তার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জন গ্রিফিথ বলেছিলেন, "অজন্তার শিল্পী গ্রীক শিল্পের আদর্শের কোন ধার ধারেন না, তাই শরীর-সংক্রান্ত মাপজোপের নিখুঁত রূপায়ণে তাঁকে কখনও দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হতে হয়নি। মানসচক্ষে বাস্তব দৃশ্য বা বস্তুকে তিনি যে ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন,



চিত্র—৬৮ ॥ হংস-জাতক (অবস্থান—XVII/11)।

অনায়াসভঙ্গিতে তাই রূপায়িত করেছেন। টানা টানা নয়নযুগলকে আরও দীর্ঘায়ত করার প্রচেষ্টা যেন সব শিল্পীরই একটা সাধারণ বাতিক; যদিও কোন ইংরাজ দর্শকের চোখে প্রাচ্যখণ্ডের মানুষদের ঐ আসন-পিঁড়ি হয়ে বসার বিচিত্র ভঙ্গিটাকেই বোধ করি আরও বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে। হাতের মুদ্রায় আভিজাত্যের ব্যঞ্জনা বিমূর্ত হয়ে ওঠে। ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তার কাছেই ঐ অঙ্গুলিমুদ্রার বক্তব্য সোচ্চার। সংক্ষেপে বলতে পারি, ব্যঞ্জনাময় মণিবন্ধ, হাতের তালু ও করাঙ্গুলি আজও ঐভাবেই মনের ভাব ব্যক্ত করে—কখনও প্রার্থনায়, কখনও বাধাদানে, কখনও আমন্ত্রণে, কখনও সান্ত্বনায়, কখনও বা সোহাগ জানাতে।

অজন্তার বিভিন্ন চিত্র থেকে কয়েকটি হাত-পায়ের মুদ্রা এখানে সংযোজিত করেছি চিত্র—৬৯-এ।

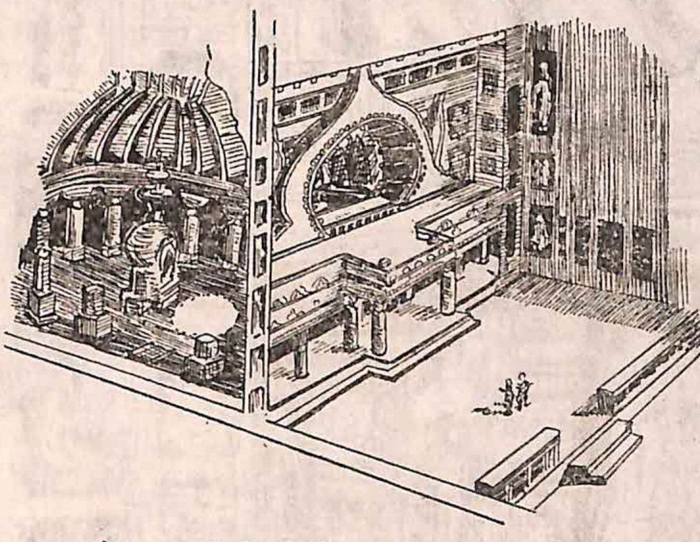


চিত্র—৬৯ ॥ ব্যঞ্জনাময় হাত-পায়ের মুদ্রা [বিভিন্ন চিত্র থেকে সংকলিত]।

অষ্টাদশ—ত্রিংশতি বিহার

ঊনবিংশতি গুহা-চৈত্যের দুটি চিত্র এখানে সন্নিবেশিত করা গেল। চিত্র—৭০-এ সম্মুখের অংশ (ফাসাদ) এবং কিছুটা ভিতরের অংশ দেখা যাচ্ছে। এ-জন্য কল্পনায় পর্বতগাত্রের খানিকটা অংশ অপসারিত করে নিতে হয়েছে। সূর্যগবাক্ষ-পথে রবিরশ্মি কেমনভাবে ভিতরে প্রবেশ করে, তাও দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তিভরের হল্-কামরার বামদিকস্থ স্তম্ভগুলিকে জমির সমান্তরালে কল্পনায় কেটে ফেলা হয়েছে। তাতে দুটি সুবিধা হয়েছে। প্রথমতঃ, পিছনদিকে অবস্থিত স্তূপটিকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ; দ্বিতীয়তঃ, স্তম্ভগুলি বিভিন্ন উচ্চতায় কর্তিত হওয়ায় স্তম্ভের গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সহজে ধারণা করা যাচ্ছে। অর্থাৎ, কোন্ অংশ চৌকোণা ; কোন্ অংশ গোলাকৃতি, কোথায় আটকোণা তা দেখা যাচ্ছে। স্তম্ভশীর্ষগুলিকে সংযুক্ত করে যে বীম বা কড়ি (আর্কিট্রেভ) আছে, সেটিকেও দেখা যাচ্ছে। আর সেই বীমের উপর অবস্থিত সারি সারি খিলান-আকারের বীম কিভাবে ছাদের ভার বহনের ভান করছে, তাও অনুমান করা যায়। আগেই বলেছি,

ঊনবিংশতি বিহার



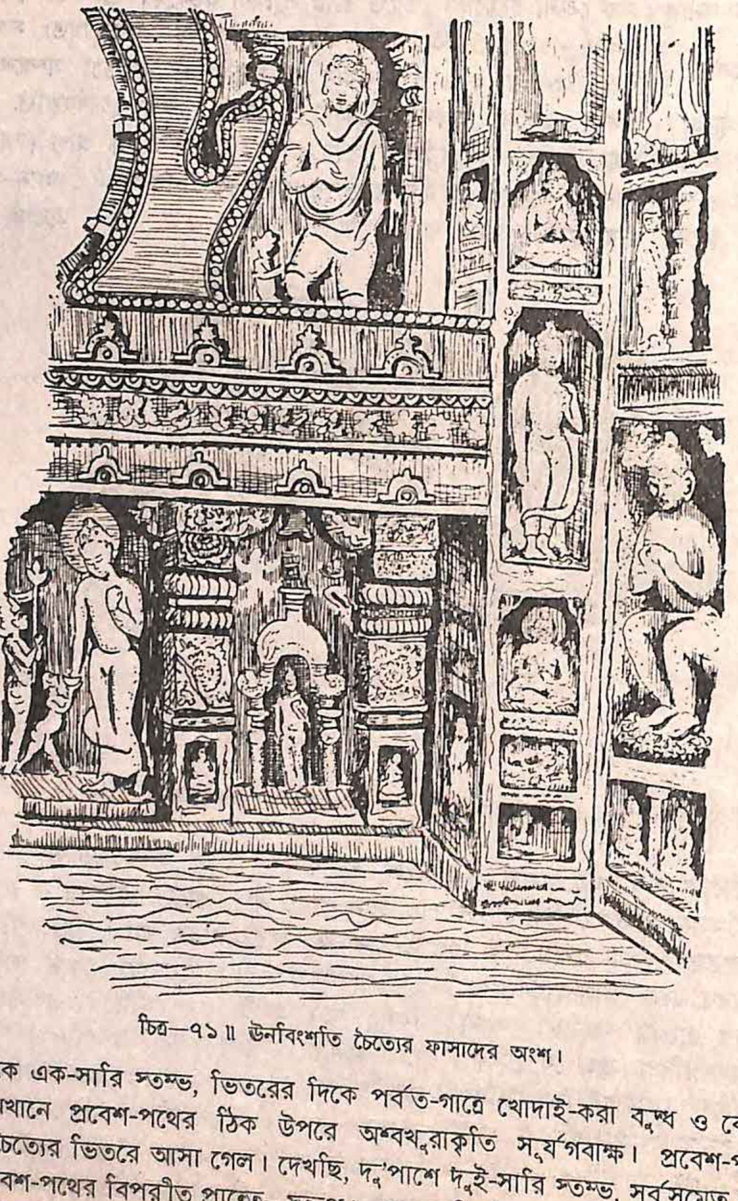
চিত্র—৭০ ॥ ঊনবিংশতি চৈত্যের ফাসাদ ও অভ্যন্তরভাগ।

স্তম্ভগুলি ছাদের ভার বহন করছে না। ফলে, স্তম্ভের উপর ঐ আর্কিট্রেভ এবং তার উপর অবস্থিত ঐ খিলানগুলির কেউই ছাদের ভার বহন করছে না। কাঠের কাঠামো বা রুফ ট্রাসের অনুকরণে প্রস্তর-শিল্পী প্রথামাফিক এগুলি খোদাই করে গেছেন মাত্র। মিঃ পার্সি ব্রাউন বলেছেন, 'ওদের হাত ছেনি-হাতুড়িতে নিযুক্ত থাকলেও ওদের মনে রয়ে গেছে সেই আদিম করাত-বাটালির যুগের স্মৃতি।' আমার কিন্তু মনে হয়নি যে, সেইটিই একমাত্র কারণ। আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যা বলে যে, কোন স্থাপত্য-কর্মের (engineering structure) ভারবহনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলেই স্থপতিবিদের কর্তব্য শেষ হয় না ;—তাঁকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গৃহবাসীর মনে হয় যে, সেটি ভেঙে পড়বে না। গৃহবাসীর মানসিক শান্তির জন্য অনেক স্থপতিবিদ্ আধুনিক বাড়ীর ক্যান্টিলিভার বারান্দার নীচে বীমের (ভারবাহী নয়) আভাস দেখান। আমার মনে হয়, অজন্তার স্থাপত্য-শিল্পী এই কারণেও ঐ স্তম্ভ ও বীমগুলি খোদাই করেছিলেন।

সে যাই হোক, আশা করি, প্ল্যান ও এলিভেসানের বদলে অথবা নিছক ফটোগ্রাফের পরিবর্তে এই কাল্পনিক চিত্রটির মাধ্যমে ঐ গুহা-মন্দিরের স্বরূপটা ভাল বোঝা যাচ্ছে।

প্রবেশ-পথের আংশিক সম্মুখ-চিত্র দেওয়া হয়েছে চিত্র—৭১-এ। আধখানা আঁকা হয়েছে ভাস্কর্যের খুঁটিনাটি ভাল করে বোঝাবার উদ্দেশ্যে। সূর্যগবাক্ষের একটু ইঙ্গিত রয়েছে উপরের দিকে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, চিত্র—৭০-এর কোন্ অংশটি চিত্র—৭১-এ বড় করে দেখানো হয়েছে।

ঊনবিংশতি চৈত্যর সম্মুখে যে প্রশস্ত চত্বর, সেখানে সম্ভবতঃ পূর্বে আর একটি প্রবেশ-তোরণ ছিল। বর্তমানে যেটি প্রবেশ-তোরণ তার সম্মুখে আছে একটি ছোট বারান্দা, ইংরেজীতে যাকে বলে 'পোর্টিকো'। তার দু'পাশে দুটি স্তম্ভ। পোর্টিকোর পরে একটি অলিন্দ, তার



চিত্র—৭১ ॥ ঊনবিংশতি চৈত্যের ফাসাদের অংশ।

বাহিরের দিকে এক-সারি স্তম্ভ, ভিতরের দিকে পর্বত-গাত্রে খোদাই-করা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি। মাঝখানে প্রবেশ-পথের ঠিক উপরে অশ্বখুরাকৃতি সূর্যগবাক্ষ। প্রবেশ-পথ দিয়ে এবার গুহা-চৈত্যের ভিতরে আসা গেল। দেখছি, দু'পাশে দুই-সারি স্তম্ভ, সর্বসমেত পনেরটি। মাঝখানে, প্রবেশ-পথের বিপরীত প্রান্তে—স্তূপ। স্তম্ভশীর্ষে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, নাগ ও গন্ধর্বের মূর্তি খোদাই করা। এ চৈত্যেও কিছু কিছু চিত্র এক সময়ে ছিল, বর্তমানে কিছুই দেখা যায় না।

এবার প্রবেশ-পথের সম্মুখ-দৃশ্যটির, যাকে বলে গুহা-চৈত্যের 'ফাসাদ', তার বর্ণনা করি। সূর্যগবাক্ষের দু'পাশে দুটি গন্ধর্ব-মূর্তি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মূর্তি দুটি ভারসাম্য বা 'সিমেট্রি' রক্ষা করছে বটে, কিন্তু একটি অপরটির ঠিক বিপরীত ভঙ্গি (mirror image) নয়। যে-কোন সাধারণ শিল্পী প্রতিসাম্যের খাতিরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থাপন একই রকম করতেন, এ-মূর্তি ডানদিকে হেলে থাকলে ও-মূর্তি বাঁদিকে হেলে থাকত ; কিন্তু অজন্তার জাত-শিল্পী তা করেননি। আরও লক্ষণীয়, বাঁদিকের মূর্তিটি নারীমূর্তি, অথচ ডানদিকের মূর্তিটি (যেটি চিত্র—৭১-এ দেখা যাচ্ছে) পুরুষের। এই গন্ধর্ব-মূর্তিদ্বয়ের উপরে ও নীচে জমির সমান্তরাল দুটি কাড় (frieze)। সেখানে ছোট ছোট সূর্যগবাক্ষ-অনুসরণে অলঙ্করণ। তার নীচে, দক্ষিণদিকে (চিত্র—৭১) দেখছি, একটি স্তূপের ভিতর দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি। চৈত্য-অভ্যন্তরস্থ মূল স্তূপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুব বেশী। বৈসাদৃশ্যও বড় কম নয়। ভিতরের স্তূপে বুদ্ধমূর্তি সম্পূর্ণ প্রতিসাম্য-মূলক (চিত্র—৮৭), অথচ এখানে তাঁর দক্ষিণহস্তে বরদানের ভঙ্গি, বামহস্ত বুকের কাছে। হর্মিকার পরিকল্পনাতেও বৈপরীত্য আছে। এই স্তূপ-বুদ্ধের দু'পাশে দুটি অলঙ্কৃত অর্ধ-স্তম্ভ বা পিলাস্টার। অর্ধ-স্তম্ভের ওপাশের কুলুঙ্গিতে দেখছি, বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিচ্ছেন যশোধরা ও রাহুল। সপ্তদশ গুহার শ্রেষ্ঠ চিত্র গোপা-রাহুল ও বুদ্ধদেবের (চিত্র—৫৭) সঙ্গে এই ভাস্কর্যটি তুলনীয়।

বস্তুতঃ সমগ্র ফাসাদটি বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, নাগ, গন্ধর্ব, কিন্নর মূর্তিতে আগাগোড়া মোড়া। ফুল-লতা-পাতার বাহারই বা কত! সমস্ত কারুকার্যই পাথর-কেটে করা—ছেনি-হাতুড়ির চাতুর্য, রঙ-তুলির নয়। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখতে দেখতে শ্রদ্ধায় আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। শেষ গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন এই ফাসাদটি।

বিংশতি বিহার

বিংশতি বিহারটির সম্মুখেও দুটি স্তম্ভ ও দুটি অর্ধ-স্তম্ভ। অলিন্দের ছাদে কাঠের কড়ি-বরগার অনুকরণ। এই গুহায় বারোটি গর্ভ-গুহা আছে। মূল গর্ভ-গুহায় আছে বুদ্ধমূর্তি। ধর্মচক্রমুদ্রা, চরণতলে হরিণ-শিশু। গর্ভ-গুহার দক্ষিণে একটি খোদাইকরা মূর্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজা ও রানীর মূর্তি। রানীর হাতে চতুষ্কোণ একটি পাখা, রাজার উপর তিনি দেহভার ন্যস্ত করতে উদ্যতা। তাঁর চুল-বাঁধার কায়দাটি লক্ষ্য করবার মত।

একবিংশতি বিহার

একবিংশতি বিহারের সম্মুখস্থ অলিন্দটি ভেঙে পড়েছে। তবু যে দুটি স্তম্ভ এখনও দাঁড়িয়ে আছে, তাতে অতি সুন্দর নক্‌শা-কাটা কল্‌কার কাজ দেখতে পাওয়া যায়। উপরের 'ফ্রিজে' নাগরাজা ও রানীর মূর্তি খোদাই করা। হল্‌কামরাটি প্রায় বর্গক্ষেত্র। সর্বসমেত দ্বাদশটি স্তম্ভ, সেগুলির অলঙ্করণ দ্বিতীয় বিহারের অনুরূপ। এই গুহাটিও খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ শতাব্দীতে খোদিত। গুহার ভিতর চোদ্দটি গর্ভ-গুহা আছে ; কেন্দ্রীয় গর্ভমন্দিরে বুদ্ধমূর্তি—পদ্মাসন, ধর্মচক্রমুদ্রা।

দ্বাবিংশতি বিহার

দ্বাবিংশতি বিহারটি ষষ্ঠ শতাব্দীর, সম্মুখবর্তী অলিন্দটি ভেঙে পড়েছে। দু'পাশে দুটি অর্ধ-সমাপ্ত গর্ভ-গুহা। কেন্দ্রীয় গর্ভ-গুহায় প্রলম্বিতপদ উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। এই গুহার দক্ষিণ প্রাচীরে পুনরায় একটি বুদ্ধমূর্তি—পদ্মাসন, ধর্মচক্রমুদ্রা। উপরে একসারি মানুষীবুদ্ধ। এই গুহায় কিছু কিছু প্রাচীর-চিত্রের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে তার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব।

ত্রয়োবিংশতি বিহার

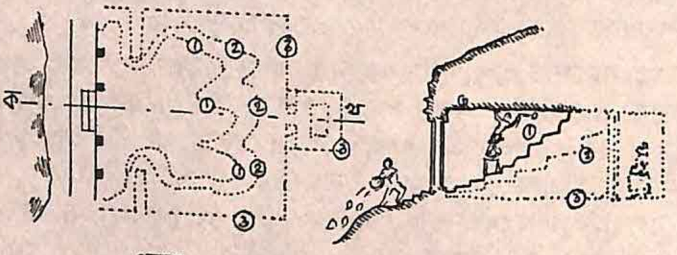
ত্রয়োবিংশতি বিহারটিও সমসাময়িক। অলিন্দে কারুকার্যখচিত চারটি পূর্ণকায় এবং দুটি অর্ধকায় স্তম্ভ। সেগুলির স্তম্ভমূল চতুষ্কোণ, মধ্য অংশ গোলাকার, উপরে আমলক ও এ্যাবাকাস। আকারে এটি একবিংশতি বিহারের প্রায় সমান। এখানেও গুহার অভ্যন্তরে দ্বাদশটি স্তম্ভ। বিহারটি অসমাপ্ত। মূল গর্ভ-মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। সম্ভবতঃ, অসমাপ্ত অবস্থায় এটি পরিত্যক্ত হয়েছিল, মূর্তিটিকে রূপায়িত করার পূর্বে।

আপনি যদি ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক বা ঐ জাতীয় কিছু হন, তাহলে চতুর্বিংশতি বিহারটিকে আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন। বস্তুতঃ, এ অসমাপ্ত বিহারে দর্শনীয় কিছুই নেই।

চতুর্বিংশতি বিহার

কিন্তু বাস্তুবিদ্যা অথবা স্থপতির দিকে যদি আপনার ঝোঁক থাকে, তবে বলব চতুর্বিংশতি বিহারটি আপনার পক্ষে অবশ্য দ্রষ্টব্য। কারণ, এটিকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে আপনি বুঝতে পারবেন, কিভাবে বৌদ্ধ শ্রমণের দল এই সারি সারি গুহামন্দিরগুলিকে রূপায়িত করেছিলেন। এই বিহারটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত ; কিন্তু শেষ হলে এটি হত অজন্তার সর্ববৃহৎ বিহার—২৩ মিঃ × ২৩ মিঃ।

কেমন করে এই গুহা-মন্দিরগুলি ক্রমশঃ খনন করা হত, তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে চিত্র—৭২-এ। সাধারণ বাড়ীতে কাজ শুরু হয় বনিয়াদ থেকে, শেষ হয় ছাদে। কিন্তু কৃত্রিম গুহার কাজ শুরু হয় উপরদিকে এবং ক্রমশঃ শেষ হয় নীচে এসে। ইট-কাঠ-পাথরের বাড়ী ক্রমশঃ গড়ে ওঠে ; সে হিসাবে কৃত্রিম গুহার কাজ গড়ে 'নামে'! প্রথমেই খনন করা হয় স্তম্ভ-গুলির শীর্ষদেশ, কৃত্রিম থাম ও সিলিঙ! চিত্র—৭২-তে সেক্‌সানাল এলিভেসনে দেখছি ১-১-১ রেখায় খনন করা হয়েছে। বস্ততঃ, এই অবস্থাতেই কাজটি পরিত্যক্ত হয়। দেখা



প্ল্যান

ক. খ. রেখায় কাটা সেক্‌শন

চিত্র—৭২॥ গুহাগুলি কিভাবে খনন করা হয়েছিল।

যাচ্ছে, কিভাবে সিলিঙে খোদাইয়ের নক্‌শা করা হচ্ছে। ক্রমশঃ উপরের অংশে, স্তম্ভশীর্ষে, সিলিঙে যাবতীয় নক্‌শার অলঙ্করণ খোদাই করা হয়ে গেলে, তখন গুহার গভীরতা বাড়ানো হত। অর্থাৎ, কাজটি পরিত্যক্ত না হলে, পরে ২-২-২ রেখায় খনন করা হত। এইভাবে ক্রমশঃ উপর থেকে নীচের দিকে খনন করতে করতে ক্রমশঃ ৩-৩-৩ রেখায় একদিন গুহার মেজের সমতলে কাজ শেষ করা হত।

এবার চিত্র—৭২-এ অঙ্কিত প্ল্যানটিকে দেখা যাক। যে অবস্থায় গুহাটি পরিত্যক্ত হয়েছে, তার প্ল্যান মোটা কালিতে আঁকা হয়েছে, ১-১-১ রেখায়। শেষ হলে গুহাটির প্ল্যান হত ৩-৩-৩ রেখায়। এখানে লক্ষণীয়, অসমাপ্ত অবস্থায় সরু লম্বাটে কতকগুলি প্রাচীর খোদাই করতে বাকী রয়ে গেছে। প্রথম অবস্থায় এগুলি ইচ্ছা করেই খনন করা হত না। শেষ পর্যায়ে এই প্রাচীরগুলি ভেঙে ফেলা হত। চতুর্বিংশতি গুহা অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় যখন পরিত্যক্ত হয়, তখনও এই প্রস্তর-প্রাচীরগুলি ভেঙে ফেলা হয়নি। প্রথম অবস্থায় এই প্রাচীরগুলি ছেড়ে যাওয়ার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বিভিন্ন গলিপথে যখন শিল্পীর দল কাজ করতেন, তখন একজন কারিগরের ছেনি-হাতুড়ির আঘাতে ছিট্‌কে-যাওয়া পাথরের টুক্‌রোয় যাতে পার্শ্ববর্তী শিল্পী আহত না হন, তাই এ ব্যবস্থা।

পঞ্চবিংশতি বিহারটিতে এখন যাওয়ার রাস্তা নেই। এটি বর্গক্ষেত্র। সম্মুখ-ভাগে তিনটি

পঞ্চবিংশতি বিহার

প্রবেশ-দ্বার ছিল। এটিও অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত।

ষড়বিংশতি গুহাটি খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতাব্দীতে অজন্তায় নির্মিত শেষ চৈত্য। ফাসাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ চত্বর। সম্মুখস্থ অলিন্দ ও পোর্টিকো-টি ভেঙে গেছে। ভিত বা প্লিন্থ

অংশে এক-সারি বামন-মূর্তি খোদাই করা। ফাসাদের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি খোদিত। চৈত্য-গবাক্ষের দু'পাশে দুটি উপবিষ্ট যক্ষমূর্তি। তাদের দু'পাশে দুটি বুদ্ধমূর্তি—বরদামুদ্রা। তাদের দুই প্রান্তে পুনরায় দুটি বৃহদায়তন বুদ্ধমূর্তি—প্রায় ৬ মিঃ দীর্ঘ। চৈত্য-অভ্যন্তরে সর্বসমেত আঠারটি স্তম্ভ আছে। প্রবেশ-পথে দুটি অলঙ্করণ-বহুল আট্‌কোনা স্তম্ভ। স্তম্ভশীর্ষের ব্র্যাকেটে সুন্দর দুটি নারীমূর্তি। অন্যান্য স্তম্ভগুলি একই জাতের, মধ্যভাগ গোলাকৃতি, নক্‌শা-কাটা ও পল-তোলা। শীর্ষদেশে আমলক, অর্ধ-পদ্ম এবং সর্বোপরি দু-মুখো ব্র্যাকেট। স্তম্ভের উপরের কড়িটিতে (যাকে পাশ্চাত্য ভাষায় বলে triforium) বুদ্ধমূর্তি ও নানান্ জাতের নক্‌শা।

ষড়বিংশতি বিহার

প্রবেশ-পথের বিপরীত দিকে অবস্থিত মূল স্তূপটির বর্ণনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে করা হবে। (চিত্র—৮৭)। চৈত্যের বাম প্রাচীরে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের মহান্ দৃশ্যপট পর্বতগাত্রে খোদিত। দ্বিতীয় গুহায় যে জন্মদৃশ্যটি চিত্রে দেখে এসেছি, এখানে সেটি বাম-রিলিফে খোদিত। অজন্তার বিশালতম ভাস্কর্যনিদর্শন বুদ্ধদেব তাঁর দক্ষিণপার্শ্বে মুখ করে শায়িত। তাঁর দক্ষিণহস্ত মাথার নীচে। মাথার ভারে উপাধানটি যেন অল্প বসে গেছে। দুই প্রান্তে দুটি শালবৃক্ষ। উপরে এক-সারি দেবতার মূর্তি ; তাঁরা আনন্দ করছেন, বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন, মহামানবকে সসম্মানে স্বর্গে আহ্বান জানাতে যেন নেমে এসেছেন আকাশপথে। বুদ্ধদেবের সম্মুখে দর্শকের দিকে পিছন ফিরে ভূমিশয্যায় বসে আছেন এক-সারি ভক্ত। তাঁরা বেদনায় আপ্লুত, রোরুদ্যমান, শোকাহত। যে পালঙ্কে তিনি শয়ন করেছেন তার কাছে নির্বাপিত-শিখা দীপ-সমন্বিত একটি দীপাধার এবং কিছু ফুল ছড়ানো। মহামানবের পদপ্রান্তে ভিক্ষু আনন্দ। বুদ্ধদেবের কাছ থেকে শেষদান নিতে হচ্ছে তাঁকে—তাঁর ভিক্ষাপাত্র ও যষ্টি। দক্ষিণহস্তের তালুতে ভিক্ষু আনন্দ মাথা রেখেছেন, বিষাদখিন্ন মর্মাহত মূর্তি তাঁর।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ

অত্যন্ত যত্ন নিয়ে অজন্তা-শিল্পী এই মহান্ দৃশ্যপটটি রূপায়িত করেছেন। বুদ্ধদেবের পায়ের নখ থেকে দীপাধারটি পর্যন্ত সজীব ও সুন্দর। কিন্তু এ ভাস্কর্যের মূল আবেদন সামগ্রিক মহানুভবতায়।

ফা-হিয়ান তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে গৌতমবুদ্ধের মহানির্বাণ প্রসঙ্গে বলেছেন :

কুশীনগরের উত্তরে দুইটি শালবৃক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে হিরণ্যবতী (গণ্ডক ?) নদীতীরে উত্তর দিকে মুখ করে এই যুগাবতার মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

এখানে দেখছি দুটি শালবৃক্ষ, দেখছি তিনি উত্তর দিকে মুখ করেই শুয়ে আছেন বটে।

এই চৈত্যে আরও একটি প্রাচীর-ভাস্কর্য লক্ষণীয়। মার কর্তৃক বুদ্ধদেবের তপস্যা-ভঙ্গের প্রচেষ্টা ও মারের পরাজয়। একই বিষয়-বস্তু নিয়ে একটি ফ্রেস্কো (অবস্থান ১।১০) আমরা প্রথম গুহায় দেখে এসেছি। এখানে সেই দৃশ্যটি রঙ-তুলির পরিবর্তে ছেনি-হাতুড়িতে উৎকীর্ণ। তপস্যারত বুদ্ধদেব বসে আছেন কেন্দ্রস্থলে, ভূমিস্পর্শমুদ্রায়, বোধিবৃক্ষতলে। তার নীচে মারের তিন কন্যা—তৃষ্ণা, রতী ও রঙ্গ তাঁকে প্রলোভিত করছে। তাদের বসনের স্বল্পতা ও ভূষণের প্রাচুর্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। তাদের সঙ্গে এসেছে আরও দুজন সহচরী। মার দক্ষিণে দণ্ডায়মান। মহাসন্ন্যাসীকে শত্রুসৈন্য চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, তাদের মধ্যে দুজন আবার হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধ করছে। শিল্পী হয়তো ওদের মধ্যে গিরিমেখলবাহনকে পুনরায় দেখাতে চেয়েছেন। কারণ, আবার মারকে দেখা যাচ্ছে একই দৃশ্যে, দক্ষিণদিকে—বুদ্ধদেবের পদতলে—পরাভূত মার।

বুদ্ধ ও মার

এই গুহা-চৈত্যের ভাস্কর্য প্রসঙ্গে ফার্গুসন বলছেন*—বরভুদরের বৃহদায়তন মন্দিরের ভাস্কর্যের সঙ্গে এই ষড়বিংশতি গুহা-চৈত্যে অবস্থিত ভাস্কর্য-নিদর্শনের সাদৃশ্য এত বেশী যে, বেশ নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়, পশ্চিম-ভারতের শিল্পীরাই সেখানে গিয়ে কাজ করেছিলেন।

সপ্তবিংশতি
ঊনত্রিংশতি বিহার

এই গুহার পর আরও চারটি গুহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। সপ্তবিংশতি বিহারটিও অসমাপ্ত। অষ্টবিংশতি গুহায় বর্তমানে যাওয়া যায় না। এটিও অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। হয়তো শেষ হলে এটিও একটি চৈত্যের রূপ নিত। ঊনত্রিংশতি বিহারটিও দুর্গম। সেটি আমার দেখা হয়নি।

ত্রিংশতি গুহা-মন্দিরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার একটি কারণ আছে। অজন্তার বিষয়ে যত প্রামাণিক গ্রন্থ আছে, তাতে এই গুহাটির উল্লেখ নেই। ফার্গুসন, বার্জেস, গ্রিফিথ, হ্যারিংহ্যাম এ-বিষয়ে নীরব, পার্সি ব্রাউন-সাহেব তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে অজন্তাগুহার যে কাল-নির্দেশক সূচী দিয়েছেন, সেখানেও এ গুহাটির নামোল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, এই গুহাটি আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র বছর দশেক আগে এবং নিতান্ত ঘটনাচক্রে।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে একদিন প্রবল বর্ষণে ষোড়শ বিহারের সম্মুখস্থ পথটিতে একটি ধ্বস নামার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই পার্বত্য পথটিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে অতঃপর পুরাতত্ত্ববিভাগ একটি ধ্বস-রোধী প্রাচীর (retaining wall) গেঁথে দেবার ব্যবস্থা করেন। এল ইট-বালি-সিমেন্ট। এই প্রাচীরের বনিয়াদ খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ অতর্কিতে বেরিয়ে পড়ল একটা ফাঁপা অংশ। কুলির সর্দার গিয়ে ধরে পড়ল পুরাতত্ত্ব-বিভাগের কর্মচারীকে—রেট বাড়িয়ে দিতে হবে, না হলে ওদের পড়তায় পোষাচ্ছে না।

ধমকে ওঠেন কর্মচারী—এই দুদিন আগে তুমি রেট মেনে নিয়ে সই দিয়েছ, আজ রেটে পোষাচ্ছে না বললে শুনব কেন?

হাত দুটি কচলে কুলি-সর্দার বলে—তখন কি জানতাম হুজুর, ভিতরে অতবড় ফোকর? অতখানি ভরাট করতে হবে!

আঁৎকে ওঠেন কর্মচারী—কি বললে? ফোকর? কোথায়?

অকুস্থলে ছুটে গেলেন তিনি—খবর গেল বড়কর্তার কাছে। হেড-অফিস থেকে ছুটে এলেন সবাই। রইল পড়ে কুলি-সর্দারের দেওয়াল গাঁথার কাজ! শুরু হয়ে গেল খনন-কার্য! একে একে বের হয়ে পড়ল একটি গুহা, একটি স্তূপ এবং সর্বশেষে আবিষ্কৃত হল একটি অপূর্ব হীনযানী গুহা! এখানে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, আজও যার পাঠোদ্ধার করা যায়নি।

ত্রিংশতি বিহার

গুহার কাছে হীনযানী কায়দায় খোদিত দুটি প্রস্তর-শয্যা। সম্মুখ-ভাগে একটি অলিন্দও এককালে ছিল বলে অনুমান করা যায়। এটি বিহার না চৈত্য? স্তূপের অস্তিত্ব বলে এটি চৈত্য; কিন্তু চতুষ্কোণ পরিকল্পনা ও প্রস্তর-শয্যা ইঙ্গিত করে এটি বিহার। সম্মুখ-ভাগে একটি স্তম্ভের গায়ে নবম চৈত্যের অনুরূপ কয়েকটি অক্ষর খোদাই করা।

---

* "One of the most interesting results obtained from studying of the sculptures in this cave is the almost absolute certainty that the Great Temple of Boro-Buddor in Java was designed by artists from the West of India . . . The style of execution of the figure sculptures in the two temples resemble each other so nearly that we might almost fancy that they were carved by the same individual." —*Cave Temples of India*—by Fergusson & Burgess, London, 1880.

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই গুহার প্রবেশ-পথটি ৪৮০ মিঃ মিঃ লম্বা ইট দিয়ে বন্ধ করা ছিল। কবে এটি বন্ধ করা হয়েছিল? কেন? নিঃসন্দেহে এটি হীনযানী যুগের। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর, অর্থাৎ অজন্তার প্রাচীনতম গুহাদলের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে এর ঠিক উপরেই ষোড়শ বিহারটি খনন করা হয়েছিল বলেই কি মহাযানী বৌদ্ধরা এর প্রবেশ-পথটি ইট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন? কিন্তু তাহলে সমস্ত ফোকরটাই বা বন্ধ করেননি কেন? ভিতরে ফাঁপা অংশ রেখে শুধু প্রবেশ-পথটাই বা বন্ধ করলেন কেন?

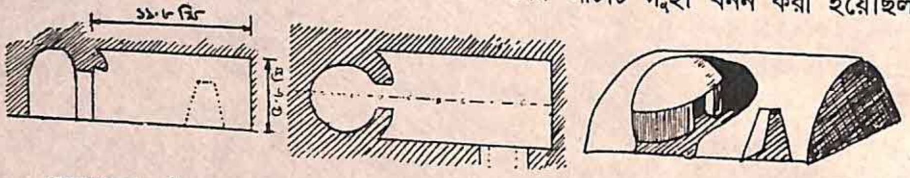
ইতিহাস এ প্রশ্নের আজও জবাব দেয়নি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অজন্তা স্থাপত্যের বিবর্তন

কোন একটি মহান্ শিল্পকর্মকে উপলব্ধি করতে হলে তার প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতটা জানা থাকা দরকার। দেশ-কালের কোন্ অবস্থায় বিচার্য শিল্পবস্তুটি নির্মিত হয়েছিল, কী তার পশ্চাৎপট এবং কী তার পরিবেশ তা জানা না থাকলে, শিল্পকর্মটির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অজন্তা-গুহার মূল্যায়নের জন্য তাই গুহা-মন্দিরের ক্রম-বিবর্তনের একটি আলোচনা এ গ্রন্থে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আগেই বলেছি, অজন্তার স্থাপত্য এক বিশেষ জাতের স্থাপত্য, যাকে "গুহা-স্থাপত্য" (Cave Architecture) বলা যেতে পারে। প্রাকৃতিক গুহায় প্রাচীর খোদাই করে, অথবা স্রেফ পাহাড় কেটে কৃত্রিম গুহা বানিয়ে তাতে স্তূপ, স্তম্ভ, খিলান ইত্যাদি রূপায়িত করাই এ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ, সম্রাট অশোকের আমলে এ-জাতীয় গুহা খনন প্রথম শুরু হয়। প্রায় সমসময়ে বর্তমান বিহার প্রদেশে এই ধরনের আটটি গুহা খনন করা হয়েছিল।



সেকশানাল এলিভেশান সেকশানাল প্ল্যান স্কেচ

চিত্র—৭৩ ॥ প্রাচীনতম ভারতীয় কৃত্রিম গুহা, অশোক নির্মিত।

সেগুলি—কর্ণকৌপর, লোমশঋষি, বিশ্ব ঝোপড়ি, গোপিকা, বহজিকা, বদলিকা ও সীতামারি। এদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে সুদামা। চিত্র—৭৩-তে এই আদিমতম গুহা-মন্দিরের স্বরূপটি বোঝাবার চেষ্টা করেছি। লক্ষ্য করে দেখুন, গুহার ভিতরে গর্ভগৃহের ছাদটি কেমন ছণ্ডা (eave) বার করে খোদাই করা হয়েছে। খড়ের বা টিনের চালাঘরে আমরা যে ধরনের ছণ্ডা বা 'ঈভ' বার করি, ঠিক যেন তেমন দেখতে ওটা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মাটকোঠায় আমরা ছণ্ডা বানাই কেন? যাতে ছাদ থেকে বৃষ্টির জলটা দেওয়াল বেয়ে না নামে, সেইজন্যই তো? কিন্তু এক্ষেত্রে দেওয়াল তো পাহাড়ের গা। তাছাড়া, গর্ভগৃহটি তো আবার গুহার ভিতর। ফলে, বৃষ্টির জলের তো কোন প্রশ্নই এখানে উঠছে না। তাহলে?

তার কারণ এই যে, যে সব আদিম কারিগর এই প্রথম গুহা-মন্দিরটি খনন করেছিল, তারা তখনও খড়ের চাল আর মাটির দেওয়ালের কথা ভুলতে পারেনি। তাদের হাত কাজ করেছে পাথরের উপর, কিন্তু চিন্তাধারায় তারা তখনও রয়েছে কাঠের যুগে। ফলে, গুহার ভিতর পাথরের দেওয়ালেও তারা ছণ্ডা বানিয়ে যাচ্ছে আবহমানকালের অভ্যাসবশে।

প্রথম যুগের এই আটটি গুহা-মন্দিরের মধ্যে একমাত্র লোমশঋষির প্রবেশ-পথেই আছে কিছুটা কারুকার্য—অন্যান্যগুলি একেবারে অলঙ্করণ-বর্জিত। কিন্তু কারুকার্য না থাকলে কি হবে, গুহা-মন্দিরগুলির অভ্যন্তরভাগ ঠিক অশোকস্তম্ভের মত অবিশ্বাস্য রকমে মসৃণ!

প্রথম যুগের এই আটটি কৃত্রিম গুহাকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে বস্তুতঃ তিনটি কারণে। প্রথমতঃ, এগুলি আদিমতম কৃত্রিম গুহা ; অর্থাৎ, পরবর্তী যুগের অনবদ্য গুহা-স্থাপত্য ও গুহা-ভাস্কর্যের—ভাজা, নাসিক, অজন্তা, এলোরা, এলিফান্টা প্রভৃতির আদি-জনক। দ্বিতীয়তঃ, কাঠ ও খড়ের যুগ থেকে পাথরের যুগে ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের এখানেই প্রথম পদক্ষেপ। তৃতীয়তঃ, সম্রাট অশোকের ব্যক্তিগত চরিত্রের একটা দিক এরা উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে—সম্রাটের

আদেশে ও অর্থে নির্মিত এ গুহা-মন্দিরগুলি অজীবক দিগম্বর জৈন (বৌদ্ধ নয়) সন্ন্যাসীদের সাধন-স্থল হিসাবেই খনন করা হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের ধারক প্রিয়দর্শী অশোকের উদারতার সাক্ষী এরা।

নাগার্জুন পর্বতে গোপিকা-গুহাটি অবশ্য সম্রাট অশোকের আমলে নির্মিত নয়। অশোক-পৌত্র সম্রাট দশরথের আদেশে সেটি খোদিত। আকারে সেটি অপেক্ষাকৃত বড়—১৩·৫ মিঃ লম্বা, প্রস্থে কিন্তু সেই ৫·৮৩ মিঃ।

এর পরই দেখতে পাচ্ছি, নাসিককে কেন্দ্র করে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় একদল বৌদ্ধ শ্রমণ পাহাড়ের বুকে গুহা-মন্দির খনন শুরু করেছেন একাধিক স্থানে। সেগুলির আকার, আয়তন, রচনাশৈলী প্রায় একই রকমের। এগুলি সবই উপাসনা-গৃহ বা চৈত্য।

বস্তুতঃ, এখন থেকে আমরা 'গুহা-মন্দির' শব্দটির পরিবর্তে গুহা-চৈত্য ও গুহা-বিহার শব্দ দুটি ব্যবহার করব। কারণ, এই সময় থেকে গুহা-মন্দির খননের কাজ ঐ দুটি নির্দিষ্ট ধারায় বইতে শুরু করে। সমবেত উপাসনার জন্য খোদিত হত চৈত্য এবং বৌদ্ধ শ্রমণদের আবাস হিসাবে তৈরি করা হত বিহার। বিহারের কথা পরে বলছি। প্রথমে গুহা-চৈত্যের কথা বলি।

গুহা-চৈত্য

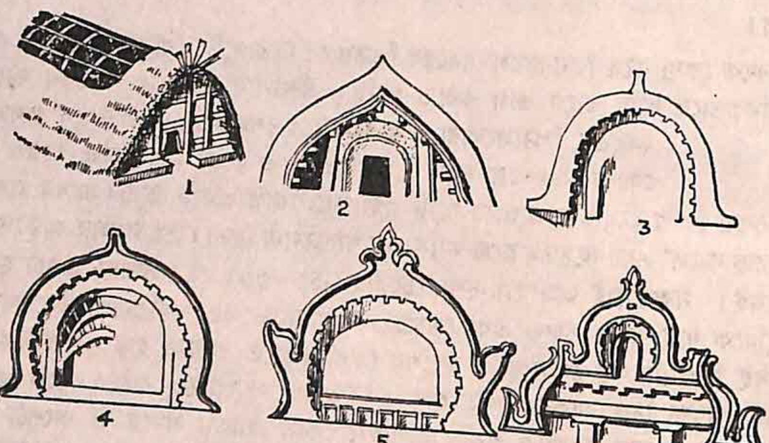
নাসিককে কেন্দ্র করে তিন-চারশ' বছরের ভিতর যে চৈত্যগুলি খোদিত হয়েছিল, সেগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভাগে—ভাজা, কনডেন, পিঠালকোরা এবং অজন্তার দশম গুহা। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে—বেদশা, অজন্তার নবম গুহা, নাসিক ও কার্লে। এছাড়াও, আরও শতখানেক বছরের ভিতর তৈরি হয়েছিল জুন্নারে দুটি এবং কাহ্নেরিতে একটি চৈত্য। এদের মধ্যে আকারে বৃহত্তম হচ্ছে কার্লে এবং ক্ষুদ্রতম হচ্ছে নাসিকের পাণ্ডুলেনা চৈত্য। চৈত্যগুলির আকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য নেই। সবগুলিই অজন্তার দশম চৈত্যের (চিত্র—৩০) মত। লম্বাটে একটা হল্-কামরা, তাতে দুদিকে দুই সারি স্তম্ভ এবং শেষপ্রান্তে পাহাড়ের গা অর্ধ-গোলাকৃতি করে খোদাই-করা। সেই পিছনদিকের গোলাকৃতি অংশের কেন্দ্রবিন্দুতে বসানো হত স্তূপটিকে। 'বসানো হত' বলাটা অবশ্য ঠিক ব্যাকরণসঙ্গত হল না। কারণ, স্তূপটিকে বাইরে থেকে এনে বসানো হয়নি আদপেই, গেঁথে তোলাও হয়নি। পাহাড় খনন করবার সময়ে ঐ অংশটা বাদ দিয়ে খনন করা হয়েছে এবং পরে সেই অংশটিকে ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে খোদাই করে স্তূপের আকার দেওয়া হয়েছে। ঠিক এইভাবেই এসেছে স্তম্ভগুলি।

এই দশটি উদাহরণের মধ্যে একমাত্র অজন্তার নবম গুহার শেষপ্রান্তটি চৌকোণা, অন্যান্য সবগুলি গুহার শেষপ্রান্ত অর্ধ-গোলাকৃতি। এই আদিম গুহা-চৈত্যগুলির আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, গুহার ছাদে কাঠের কড়ি-বরগার আকারে পাথর খোদাই করা হয়েছে। ছাদের ভারবহনের কাজে এ-জাতীয় বীম-বরগার কোনও প্রয়োজন ছিল না ; ও শুধু অলঙ্করণ। এছাড়া, শিল্পীরা বোধ করি পূর্ব-যুগের অভ্যাসটাও তখনও ত্যাগ করতে পারেননি। চিত্র—৭৪ থেকে চিত্র—৭৯-এ আমরা গুহা-চৈত্যের সম্মুখ-দৃশ্য কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি। চিত্র—৭৪-এ টোড়া-কুটিরের ছাদের খড় কিছুটা সরিয়ে আমরা ভিতরে কাঠের কাজটা দেখবার সুযোগ করে দিয়েছি। সব কয়টি গুহা-চৈত্যেই ঐ জাতীয় কৃত্রিম বীম-বরগা বা রাফটার-পার্লিন খোদাই করা আছে। চিত্র—৭০-এ ঊনবিংশ গুহা-চৈত্যের অভ্যন্তরভাগ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এছাড়া, চিত্র—৭৫ থেকে চিত্র—৭৯-এ সব কয়টি গুহা-চৈত্যের প্রবেশ-পথেই বরগা বা পার্লিনের প্রান্তদেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে স্তম্ভগুলি জমি থেকে ঠিক খাড়াভাবে ওঠেনি। কাঠের খুঁটি যেমন বাকাঁ করে ঠেস্ দেওয়া হয় (পার্শ্বচাপ বা side thrust-এর প্রতিবিধান করতে), সেইভাবে বাঁকা করে বসানো। লোমশঋষির প্রবেশপথে (চিত্র—৭৫) এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবেশ-পথের উপরে একটি গবাক্ষ তৈরি করা হত, যাকে বলে "সূর্য-গবাক্ষ"।

গুহা-চৈত্যের কথা এই পর্যন্ত। এবার বলতে হয় গুহা-বিহারের কথা। চৈত্যের মত বৌদ্ধ শ্রমণদের আবাস-স্থল এই বিহারগুলিরও একটা সর্ববাদিসম্মত রূপ আছে। অজন্তায় ত্রিংশতি, অষ্টম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিহার হচ্ছে প্রাচীনতম। এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব কালের এবং হীনযান বৌদ্ধ যুগের। এগুলিতে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, অভ্যন্তরভাগ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; দ্বিতীয়তঃ, এতে কোন স্তম্ভ নেই; তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রস্থ হলের সংলগ্ন কয়েকটি ছোট ছোট খুপরি বা গর্ভগৃহা আছে। এই গর্ভগৃহাগুলির উপরে সূর্য-গবাক্ষের অনুকরণে কয়েকটি জানালার প্রতীক। এগুলি কিন্তু সত্যিকারের গবাক্ষ নয়—আলো-হাওয়া যাওয়ার পথ নয়, এ শুধু অলঙ্করণ। চতুর্থতঃ, এই প্রাচীনতম বিহারে কোন স্তূপ নেই (বুদ্ধমূর্তি থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না, যেহেতু, এগুলি হীনযান যুগের)। পঞ্চমতঃ, বিহারের ভিতর পাথরের খোদাই-করা শয়নের উপযুক্ত আসন বা বেদী আছে।

গুহা-বিহার



চিত্র—৭৪ (1) ॥ টোডা কুটির।
চিত্র—৭৫ (2) ॥ লোমশঋষি।
চিত্র—৭৬ (3) ॥ ভাজা চৈত্য।
চিত্র—৭৭ (4) ॥ কার্লে চৈত্য।
চিত্র—৭৮ (5) ॥ অজন্তা ১৯তম।
চিত্র—৭৯ (6) ॥ এলোরা, বিশ্বকর্মা।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা হীনযানী বৌদ্ধ শ্রমণদের জীবনযাত্রার কথা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। প্রথমতঃ, তাঁরা চৈত্য-গুহাকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন—তাই আদিম গুহা-চৈত্যের প্রবেশ-পথে নানারকম অলঙ্করণের প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও নিজেদের আবাস-স্থল বিহার-গুলির প্রবেশ-পথে কোনরকম অলঙ্করণ করেননি। দ্বিতীয়তঃ, হীনযানী শ্রমণের দল মূর্তিপূজা অথবা প্রতীক পূজার চেয়ে 'শীল' ও 'বিনয়'-এর উপরেই বেশি জোর দিতেন। তাই বিহারে স্তূপের কোন অস্তিত্ব নেই। তৃতীয়তঃ, অনুমান করতে পারি, সাধারণ শ্রমণরা মাঝের হল্-কামরায় নৈশ বিশ্রাম করতেন এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ-শ্রেণীর অর্হতেরা ঐ ছোট ছোট খুপরিগুলিতে বাস করতেন। চতুর্থতঃ, হীনযানী যুগের প্রস্তর-শয্যা পরবর্তী যুগের বিহারে দেখতে না পাওয়ার কারণ হিসাবে অনুমান করছি, পরবর্তী যুগে কাঠের তৈরী চৌকি ব্যবহার করা হত।

মহাযান যুগেই অজন্তার অধিকাংশ বিহার নির্মিত। কালানুক্রমিকভাবে আমরা তাদের চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি:

প্রথম পর্ব : ৪০০—৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ—গুহা নং ৬, ৭, ১৫, ১৬ ও ১৭
দ্বিতীয় পর্ব : ৫০০—৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ—গুহা নং ১৮, (১৯) ও ২০
তৃতীয় পর্ব : ৫৫০—৬০০ খ্রীষ্টাব্দ—গুহা নং ২১, ২২ ও ২৩
চতুর্থ পর্ব : ৬০০—৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ—গুহা নং ১—৫, ১৪, ২৪, ২৫, (২৬), ২৭, ২৮, (২৯)

বন্ধনীর ভিতর উল্লিখিত অর্থাৎ গুহা নং ১৯, ২৬ ও ২৯ অবশ্য বিহার নয়, চৈত্য। সময়-কাল বোঝাবার জন্য এগুলি উল্লেখ করেছি।

এগুলি গুপ্ত ও চালুক্য রাজবংশের শাসনকালে নির্মিত। বেশ বোঝা যায়, আদিম পরিকল্পনাকারের স্থান-নির্বাচন এতই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যে, ধীরে ধীরে অজন্তাতেই অধিকসংখ্যক শ্রমণ এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ফলে, অজন্তার দশম চৈত্যের সমসময়ে অথবা পূর্ববর্তী কালে অন্যত্র যেসব গুহা-চৈত্য নির্মিত হয়েছিল—যথা ভাজা, কার্লে, নাসিক প্রভৃতি—সেগুলিতে সম্প্রসারণের প্রয়োজন ততটা অনুভূত হয়নি, যতটা হয়েছিল অজন্তায়। তাই ক্রমাগত একটির পর একটি বিহার অজন্তায় বানাতে হয়েছে নবীন আগন্তুকদের স্থান দিতে। আবার যখন দেখা গেল, নবীন আগন্তুকদের আর পূর্বেকার উপাসনা-চৈত্যে স্থান হচ্ছে না, তখন নূতন চৈত্যও তৈরি করতে হয়েছে। এভাবেই আদিম শিল্পীর দশম-চৈত্য-লাঞ্ছিত অজন্তা দুদিকে দু-বাহু প্রসারিত করে মহিমময়রূপে ক্রমে সম্পূর্ণ পাহাড়টাকেই আলিঙ্গনবন্ধ করেছে।

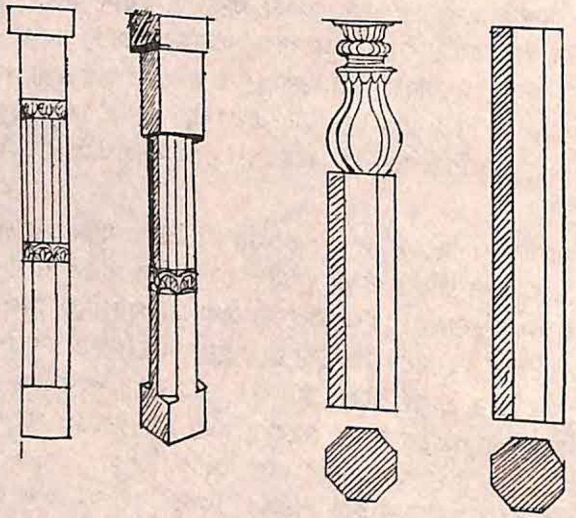
হীনযান বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ছিলেন বস্তুতঃ জ্ঞানমার্গী। তাঁরা ধ্যান করতেন, তপস্যা করতেন, চারিত্রিক শীলতার দিকে ছিল তাঁদের প্রখর দৃষ্টি। বোধ করি, প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁরা সমবেত হতেন চৈত্য-গুহায়। সমবেতকণ্ঠে প্রার্থনা করতেন এবং তারপর নিজ নিজ বিহারাবাসে ফিরে এসে ধ্যানে বসতেন। কিন্তু মহাযানী ভিক্ষুরা ক্রমে হয়ে পড়লেন ভক্তি-মার্গের পথিক। তাঁরা ধর্মাচরণের সময় বুদ্ধমূর্তির পূজা করতে ইচ্ছুক। তাই বারে বারে, দিনের মধ্যে অনেকবার তাঁদের যেতে হত চৈত্যে—স্তূপমূলে পূজা, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য দান করতে। ফলে, সমস্ত দিবারাত্রই চৈত্যে লেগে থাকত ভীড়। এই অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই বোধ করি বিহারেও স্তূপ তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কিন্তু বিহারেই যদি পূজার ব্যবস্থা করা অনুমোদনযোগ্য হয়, তাহলে স্তূপ কেন, একেবারে বুদ্ধদেবের মূর্তি তৈরি করলেই হয়। তাতে তো আর বাধা নেই এখন। তাই দেখছি, মহাযানী যুগে বিহারের দূরতম প্রান্তে একটি গর্ভমন্দির তৈরি করে তাতে বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা হয়েছে। মূর্তিপূজা অনুমোদনযোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ চিন্তাধারায় নানান্ দেব-দিবীর অনুপ্রবেশও ঘটল। তৈরি হল জম্ভলের মূর্তি, হারিতীর মূর্তি—দেওয়ালে চিত্রিত হল শক্র, ব্রহ্মা প্রভৃতির আলেখ্য।

শুধু তাই নয়, কোন কোন স্থানে চৈত্য-স্তূপের গায়েও বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা হয়েছিল—যেমন দেখতে পাই কাহ্নেরিতে। কিন্তু এর কন্‌ভার্স থিয়োরেম্‌টা অনুমোদিত হল না। অর্থাৎ, মহাযান যুগে চৈত্যে স্তূপের গায়ে বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা হল বটে, কিন্তু বিহারে বুদ্ধমূর্তির বদলে স্তূপ তৈরি হল না। প্রসঙ্গতঃ বলি, এই নিয়মের একটিমাত্র ব্যতিক্রম দেখতে পাই নাসিকের তিন নং গুহায়। এটিকে বলা হয় 'গোতমীপুত্ত বিহার'। এটি একেবারে হীনযান যুগের, কিন্তু এই বিহারে একটি স্তূপ খোদাই করা হয়েছিল। এই ব্যতিক্রমটির পিছনে একটি বিশেষ কারণও ছিল। ঐ গোতমীপুত্ত বিহারে বাস করতেন ভিক্ষুণীরা। মহিলাদের পক্ষে বারে বারে বাসস্থান ত্যাগ করে চৈত্যে যাওয়া অসুবিধাজনক হতে পারে মনে করেই প্রধান অর্হৎ গোতমীপুত্ত বিহারে একটি স্তূপ নির্মাণের বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন।

চিত্র—৭৫ থেকে চিত্র—৭৯-এ আমরা লক্ষ্য করেছি, গুহা-চৈত্যের প্রবেশ-পথে কি ভাবে ক্রমশঃ অলঙ্করণের বাহুল্য এসেছে। অজন্তার বিভিন্ন যুগে খোদাই-করা স্তম্ভগুলিকে লক্ষ্য

করলেও আমরা দেখব, প্রথম যুগের সরল অনাড়ম্বর স্তম্ভ কেমনভাবে ক্রমশঃ নানা অলংকরণে বিভূষিত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে, অজন্তার কোন স্তম্ভই ভারবাহী নয়। ছাদের অথবা কোনও বীমের ওজন তারা বহন করছে না। স্তম্ভগুলি ভেঙে ফেললেও ছাদ ভেঙে পড়বে না। অজন্তায় প্রাচীনতম স্তম্ভ দেখতে পাচ্ছি নবম ও দশম গুহায়। এগুলি আট-কোণা এবং জমি থেকে অল্প বাঁকা হয়ে উঠেছে (চিত্র—৮০)। পরবর্তী যুগের একটি স্তম্ভের চিত্র সপ্তম গুহা থেকে সংকলিত হয়েছে চিত্র—৮১-তে। এখানে দেখছি, অষ্ট-কোণ-বিশিষ্ট নিম্নাংশের উপর সুন্দর একটি 'ঘট-পল্লব' এবং তার উপর একটি 'আমলক' বসানো আছে। আমলকটি যেন পল-তোলা একটি আমলকী ফল। অজন্তায় এ-জাতীয় অলংকরণ এসেছে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে। ষোড়শ গুহাতে দু-তিন রকমের স্তম্ভ দেখতে পাচ্ছি, সপ্তদশ গুহাতেও তাই। আদিম আট-কোণা স্তম্ভও আছে, আবার নানান্ জাতের অলংকরণসম্বলিত স্তম্ভও আছে। চিত্র—৮২-তে ষোড়শ বিহারের একটি

স্তম্ভ

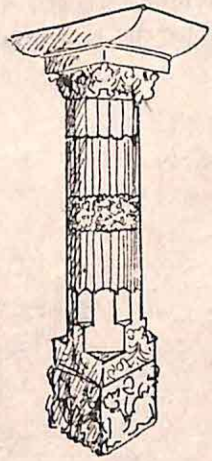


চিত্র—৮০ ॥ অজন্তায় প্রাচীনতম স্তম্ভ (নবম ও দশম চৈত্য)। চিত্র—৮১ ॥ সপ্তম গুহার প্রবেশ-পথের স্তম্ভ (দ্বিতীয় যুগ)। চিত্র—৮২ ॥ ষোড়শ-বিহারের অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভ (তৃতীয় যুগ)।

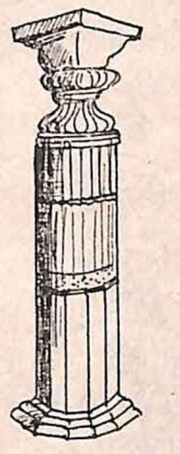
বিশেষ জাতের স্তম্ভের সেক্সানাল প্ল্যান, এলিভেসান ও স্কেচ সংযোজন করা গেল। তাতে পরিষ্কার চারটি অংশ দেখতে পাচ্ছি। (i) সবার নিচে চতুষ্কোণ পাদপীঠ। (ii) তার উপরে আট-কোণা দ্বিতীয় অংশ, সেখানে অমরাবতীর অনুকরণে আলিম্পন-নক্শা। (iii) তার উপরে ষোল-কোণাবিশিষ্ট স্তম্ভের মধ্যদেশ যার উপরে আবার ঐ অমরাবতী-নক্শা। (iv) সবার উপরে চতুষ্কোণ এ্যাবাকাস্, অলংকরণবর্জিত।

সপ্তদশ বিহারটিও প্রায় ঐ একই সময়ে নির্মিত। সেখানকার একটি বিশেষ স্তম্ভের চিত্র এখানে দেওয়া গেল। এটিকে আমরা উপরি-বর্ণিত স্তম্ভের পরিবর্ধন বলিতে পারি (চিত্র—৮৩)। এখানে দেখছি, পূর্বেকার উদাহরণের চারটি অংশকে বাড়িয়ে সর্বসমেত ছটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : (i) সবার নিচে চতুষ্কোণ পাদপীঠটি এবার মোটেই অলংকরণ-বর্জিত নয়। (ii) তার উপরের অংশে কিছুটা চতুষ্কোণ এবং কিছুটা আট-কোণা। তাতে আবার রাক্ষসের মুখের নক্শা। (iii) মধ্যদেশের যোলো-কোণা-বিশিষ্ট অংশের মাঝামাঝি আছে একটি বাজুবন্ধ ধরনের নক্শা। এতে লম্বাটে মধ্যদেশের একঘেয়েমি দূর হয়েছে। (iv) তার উপরে আবার একটি আট-কোণা অংশ। (v) শীর্ষদেশের এ্যাবাকাস্, সেখানে ক্ষুদ্রকায় বামনমূর্তি। (vi) সর্বোচ্চ ব্র্যাকেটটিও নূতন ধরনের।

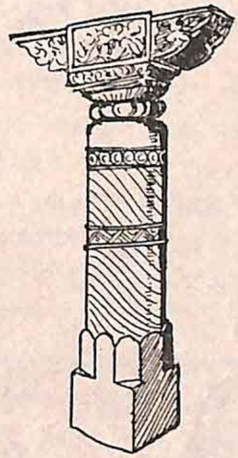
সপ্তদশ গুহায় নানান্ জাতের স্তম্ভ আছে। তার ভিতর একটিমাত্র এখানে আলোচিত হল। পরবর্তী উদাহরণটি (চিত্র—৮৪) গ্রহণ করা হয়েছে ঊনবিংশতি চৈত্যের প্রবেশ-পথ থেকে। চিত্র—৭০-এ এই সম্পূর্ণ ফাসাদটিকে দেখানো হয়েছে। সেখানে প্রবেশ-মুখের দুদিকে এই স্তম্ভ দুটিকে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। এবার দেখছি, বৈচিত্র্য-সন্ধানী অজন্তা-শিল্পী আর চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডে পাদপীঠ তৈরি করতে রাজী নন। পাদপীঠটি এবার আট-কোণা



চিত্র—৮৩ ॥ সপ্তদশ বিহারের অভ্যন্তরে (তৃতীয় যুগ)।



চিত্র—৮৪ ॥ ঊনবিংশতি চৈত্যের ফাসাদে অবস্থিত স্তম্ভ (চতুর্থ যুগ)।



চিত্র—৮৫ ॥ প্রথম বিহারের অলিন্দে অবস্থিত (শেষ যুগ)।

এবং তাতে তিন-সারি ধাপ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ লক্ষণীয়, উপরের দিকে ঘট-পল্লবের আধখানামাত্র খোদাই করা হয়েছে। আমলকটিকেও আবার আমদানি করা হয়েছে। শেষ উদাহরণটি প্রথম গুহা-মন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দা থেকে নেওয়া (চিত্র—৮৫)।

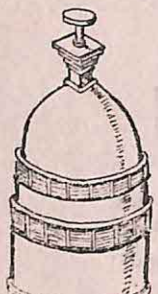
স্তম্ভের বিষয়ে আলোচনা ঐ পর্যন্ত। এবার আমরা স্তূপের বিষয়ে আলোচনা করব। অজন্তায় স্তূপ আছে চারটি। সেগুলি আছে এখানকার চারটি চৈত্যের প্রত্যন্তদেশে ; নবম, দশম, ঊনবিংশতিতম ও ষড়বিংশতিতম চৈত্যে। নবম ও দশম চৈত্যের স্তূপ হীনযানী-যুগের, অলঙ্করণবর্জিত। নাসিক, ভাজা, কার্লে প্রভৃতি চৈত্যের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য প্রকট। দশম গুহার স্তূপের একটি ভার্টিকাল সেক্সান চিত্র—৩০-এ আমরা দেখেছি। এখানে চিত্র—৮৬-তে কার্লে-চৈত্যের একটি নক্শা সংযোজিত হল, তুলনা করলেই বোঝা যাবে, দুটির সৌসাদৃশ্য কতখানি।

স্তূপ

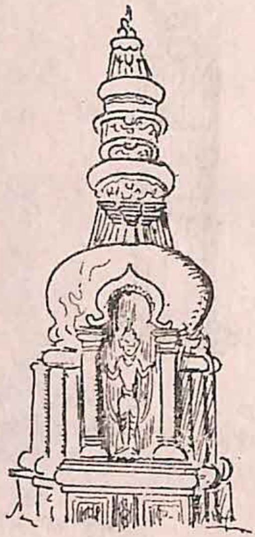
ঊনবিংশতিতম চৈত্যের স্তূপটি অনেক পরে তৈরী—মহাযান যুগে। এখানে দেখছি (চিত্র—৮৭), সেই আদিম সরল স্তূপ আর নেই। নানান্ রকম অলঙ্করণে ভরে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। পাদপীঠে নানারকম পল-তোলা নক্শা খোদাই করা হয়েছে। মধ্যভাগে দুটি ছোট স্তম্ভও খোদাই করা হয়েছে। মাঝখানে দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি। অণ্ডটি গোলাকৃতি, তার সম্মুখভাগে অজন্তার বিশেষ জাতের খিলানের নিচে যেন একটি কুলুঙ্গি—তাতে আছে একটি বুদ্ধমূর্তি। কার্লে স্তূপে অণ্ডের উপর কর্বেলিঙ-করা যে অংশটা আছে, তাকে বলে হর্মিকা ; বর্তমান উদাহরণেও সেই কর্বেলিঙ-করা হর্মিকার আদিম রূপটি আছে অবিকৃত। তার উপর রচিত হয়েছে তিনটি ছত্র, যাকে বলে ছত্রাবলী। আরও লক্ষণীয়, ছত্রাবলীর উপরে আছে একটি অংশ, ক্ষুদ্রায়তন একটি আমলক, যা নাকি ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি।

ষড়বিংশতিতম চৈত্যে স্তূপটির সঙ্গে (চিত্র—৮৮) পূর্বোক্ত স্তূপের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বৈসাদৃশ্যও কম নয়। এবারে দেখছি, পাদপীঠ বা মেধির আপেক্ষিক উচ্চতা অনেকটা কম।

পূর্বোক্ত স্তূপে জমি থেকে খাড়া হয়ে উপরে-ওঠা রেখার প্রাবল্য ছিল। এবারে দেখছি, জমির সমান্তরাল সরলরেখার সংখ্যাও কম নয়। তার কারণ, ঊনবিংশতিতম স্তূপের গঠনটি এমন, যেন উচ্চতার দিকেই আমাদের নজরটা টানে। তাই অধিকাংশ রেখাই মাটি থেকে খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠেছে (চিত্র—৮৭)। অপরপক্ষে, ষড়বিংশতিতম চৈত্যে স্তূপটির আকার এমন, যেন সেটি উচ্চতা ও প্রস্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে চায় ; তাই সেখানে জমি থেকে খাড়া ও জমির সমান্তরাল রেখাগুলি ভারসাম্য রক্ষা করে রচিত। তাই বুদ্ধমূর্তির উপর এবার আর খিলান নেই, জমির সমান্তরাল লিন্টেল খোদাই করা হয়েছে।



চিত্র—৮৬ ॥ কার্লে চৈত্যের স্তূপ।



চিত্র—৮৭ ॥ ঊনবিংশতিতম চৈত্যের স্তূপ।



চিত্র—৮৮ ॥ ষড়বিংশতিতম চৈত্যের স্তূপ।

এই লিন্টেলের উপর ক্ষুদ্রাকৃতি তিনটি অজন্তা-খিলান—সেই ত্রিবর্ণিকার প্রতীক। অন্ডটিও অনেকটা চাপা। কিন্তু হর্মিকার সেই খাঁজ-বার-করা কর্বেলিঙ, সেই নিচের থাকের চেয়ে উপরের থাকের বেশি ঝুঁকে থাকার প্রাচীন কায়দাটা আছে অব্যাহত। সেই আদিম কার্লের অনুকরণ। এখানে বুদ্ধমূর্তিটি দেখছি ধর্মচক্রমুদ্রায়।

লক্ষ্য করে দেখুন, ঊনবিংশতিতম গুহার স্তূপটির সামগ্রিক রূপটা হচ্ছে মোচার মত (কনিকাল)। তলার দিকে মোটা, উপর দিকে ক্রমশঃ সূচালো। পাদপীঠের তুলনায় স্তূপের সামগ্রিক উচ্চতাটা বেশি। তাই অজন্তার ভাস্কর এখানে বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মূর্তি খোদাই করেছেন। তাই তাঁর দুই হাত থেকে মালার আকারে দুটি বস্ত্রখণ্ড নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। দেখুন, বুদ্ধমূর্তিটি স্তূপের সামগ্রিক আকৃতির সঙ্গে যেন এক সুরে বাঁধা।

এবার দেখুন ষড়বিংশতি গুহার স্তূপটিকে (চিত্র—৮৮)। এখানে বুদ্ধদেব উপবিষ্ট। ফলে, মূর্তির প্রস্থ ও উচ্চতা স্তূপের সামগ্রিক রূপের সঙ্গে আবার একে সুরে বাঁধা হয়েছে ; কারণ, স্তূপটি প্রস্থের তুলনায় সূচালো নয়। বুদ্ধমূর্তির তিনটি ভাগ—তলায় পাপড়িভরা পদ্ম, মাঝখানে তথাগতের দেহাবয়ব, উপরে গোলাকৃতি জ্যোতিঃপ্রভা বা ছটা। সমগ্র স্তূপটিরও তলায় পল-তোলা পাদপীঠ বা মেদিকা, মাঝখানে লিন্টেল পর্যন্ত মধ্যাংশ এবং উপরে গোলাকৃতি অন্ড—যেন দুটি ক্ষেত্রেই শিল্পী বলতে চাইছেন—হে তীর্থযাত্রী, অনুধাবন কর, স্তূপ ও বুদ্ধদেব অভিন্ন!

পরিচ্ছেদ শেষ করার পূর্বে আর একটি নিবেদন আছে :

অজন্তা পরিদর্শন করেছিলাম এগারো বছর আগে—১৯৬৫ সালে। তারপর গত দশ বৎসর ধরে ও-বিষয়ে গ্রন্থাগারে গিয়ে শুধু ঘাঁটাঘাটি করেছি। অতি সম্প্রতি একটি বিষয়ে আমার খট্‌কা লেগেছে। সেটা হচ্ছে চৈত্যগুলির দিক্ নির্ণয় বা orientation। অজন্তায় চারটি চৈত্য, তার মধ্যে প্রাচীনতম চৈত্য হচ্ছে দশম গুহা। সেটি ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিয়ে দেখছি বাকি তিনটি চৈত্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক আছে। সেই বিচিত্র সম্পর্কটা হচ্ছে এই : নবম, ঊনবিংশতি এবং ষড়বিংশতি চৈত্যের longitudinal bisector অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের দিকের মধ্য-রেখা তিনটিকে যদি বর্ধিত করা যায়, তাহলে সেই তিনটি সরল-রেখা অজন্তার প্ল্যানে বাঘরা নদীর ও-পারে ভিউ-পয়েন্টে পরস্পরকে ছেদ করে! অজন্তার একাধিক সযত্ন-নির্মিত প্ল্যানে এটা পরখ করে দেখেছি। এ-গ্রন্থের চিত্র—১-এ সেই তথ্যটা এঁকে দেখাবার চেষ্টা করেছি। এই আবিষ্কারটি করে যদিচ 'ইউরেকা-ইউরেকা' বলে আমি লাফিয়ে উঠিনি, তবু এটাকে নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনা বলে বাতিল করতেও মন সরেনি। কেন এই তথ্যটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি সে-কথা বুঝিয়ে বলি—গণিত-জ্যোতিষ ও স্থপতিবিষয়ে যাঁর অধিকার আছে এমন কোন বিদগ্ধ পাঠক যদি এ-নিয়ে গবেষণা করেন তবেই আমার শ্রম সার্থক।

প্রথমতঃ, ধরে নিন এটা কাকতালীয় ঘটনা নয়। অর্থাৎ প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের পর কোনও জ্যোতির্বিজ্ঞানী অর্হৎ সুপরিকল্পিতভাবে পরবর্তী তিনটি চৈত্যকে ঐ-ভাবে খনন করিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? আমরা জানি, প্রতিটি চৈত্যের সম্মুখদিকে একটি করে সূর্য-গবাক্ষ আছে, যার ভিতর দিয়ে সূর্যালোক এসে চৈত্যের অভ্যন্তরভাগকে আলোকিত করে। চিত্র—৭০-এ লক্ষ্য করে দেখুন কী-ভাবে সেটা হয়। ঐ চিত্র দেখে এ-কথা বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, সূর্য প্রতিদিন যখন পূব থেকে পশ্চিমে সরে যান, তখন ঐ সূর্য-রশ্মির আলোক দৈনিক পশ্চিম থেকে পূবে সরে যায়। আমরা আরও বুঝতে পারছি যে, সূর্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ হয় বলে ঐ আলোকগুচ্ছ দৈনিক যে রেখাটা রচনা করছে সেটি ছয় মাস ধরে ক্রমশঃ স্তূপের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর ছয় মাস ধরে রেখাটা ক্রমশঃ পিছিয়ে আসে। আমরা আরও বুঝতে পারি যে, চৈত্যের দৈর্ঘ্য এবং মেঝে-থেকে সূর্য-গবাক্ষের উচ্চতা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যাতে বৎসরের কোন একটি বিশেষ দিনে সূর্যরশ্মি স্তূপকে আলোকিত করবে। সূর্যরশ্মি ঐ-ভাবে বৎসরের কোন দিন স্তূপ-তিনটিকে উদ্ভাসিত করে কি না তার কোন ইঙ্গিত বা হদিস আমি পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোন গবেষণা-গ্রন্থে খুঁজে পাইনি।

যদি ধরে নিই বৎসরের কোন বিশেষ তিনটি দিনে সূর্যরশ্মি ঐ-ভাবে তিনটি চৈত্যের তিনটি স্তূপকে আলোকিত করে, বা এককালে করত—তাহলে আমার পূর্বোক্ত আবিষ্কার থেকে এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনটি চৈত্যেই রবি-রশ্মি সূর্য-গবাক্ষপথে প্রবেশের পূর্বে চিত্র—১-এ 'ক'-চিহ্নিত 'ভিউ-পয়েন্ট' বিন্দুতে অবস্থিত একটি কল্পিত-রেখাকে ছেদ করে আসে—সেই কল্পিত-রেখাটি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে 'ক'-বিন্দুতে অবস্থিত খ-মধ্য (zenith) পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ঊর্ধ্বাধ (vertical) রেখা।

ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? আমরা ধরে নিয়েছি তিনটি বিভিন্ন দিনে সূর্য-রশ্মি সূর্য-গবাক্ষ পথে প্রবেশ করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তূপপাদমূলে লুটিয়ে পড়ছে : কিন্তু হিসাবে দেখছি, ঐ তিনটি খণ্ড-মুহূর্তে সূর্যরশ্মিকে ছেদ করতে হচ্ছে 'ক'-বিন্দুতে অবস্থিত ঊর্ধ্বাধ-রেখাটি। তার মানে তিনটি বিভিন্ন দিনে নয়, কোন একটি বিশেষ তিথিতে বিভিন্ন সময়ে হয়তো তিনটি স্তূপ উদ্ভাসিত হয়, বা হ'ত।

স্বীকার করছি, এ আবিষ্কার থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। থিওডোলাইট ঘাড়ে করে পুনরায় অজন্তায় গিয়ে মাপজোখ নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসার না আছে সুযোগ, না সময়, না সামর্থ্য। কিন্তু এই সূত্র ধরে কোন গবেষক যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, তিনটি বিভিন্ন দিনে নয়, একই দিনে ঐ ঘটনা ঘটত এবং সেই দিনটি ছিল গুহা নির্মাণকালের

কোন একটি বুদ্ধপূর্ণিমা তাহলে অবাকও হব না। আমার এ-জাতীয় চিন্তা যে নিতান্ত আকাশ-কুসুম নয়, সে বিষয়ে একটি কথা বলেই এ প্রসঙ্গে ক্ষান্ত দেব :

গিজাতে অবস্থিত বৃহত্তম পিরামিডে গবেষকরা লক্ষ্য করেছিলেন, একটি ছিদ্রপথে ড্র্যাকো-নক্ষত্রপুঞ্জের একটি বিশেষ তারকার রশ্মি পিরামিডে প্রবেশ করে রাজার ভ্রূমধ্যে পড়ে। পড়ে নয়, পড়ত। অয়ন-চলন-জনিত কারণে (precession of the equinox) খ-বিষুবরেখার অবস্থান ইতিমধ্যে বদলে গেছে বলে এখন আর তা পড়ে না। অয়ন-চলন-জনিত কারণে খ-বিষুব-রেখার সঙ্গে ক্রান্তিবৃত্তের ছেদ-বিন্দু ছাব্বিশ হাজার বছরে তিনশ' ষাট ডিগ্রি ঘোরে—সেই সূত্র থেকে বিশেষজ্ঞরা গিজায় অবস্থিত ঐ পিরামিডের নির্মাণকাল নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেছিলেন। সুতরাং আমার ঐ অদ্ভুত আবিষ্কারটাকে নিতান্ত কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেবার আগে কিছু গবেষণা করে দেখার অবকাশ হয় তো আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

অজন্তা-চিত্রের বিশ্লেষণ

অজন্তা-চিত্রের মর্মোদ্ঘাটনে আমাদের বুঝে নিতে হবে এই চিত্র-শিল্পের বৈশিষ্ট্যটুকু—তার ব্যাকরণ, বিন্যাস, রচনাশৈলী। না হলে এই বিশ্ববন্দিত শিল্পসামগ্রীর পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হবে চিত্র-শিল্পের ষড়ঙ্গের কথা।

বাৎসায়ন-প্রণীত কামসূত্রের টীকায় যশোধর প্রসঙ্গক্রমে একটি শ্লোক সংকলন করে বলেছিলেন চিত্রের ছয়টি অঙ্গ :

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্‌
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্‌ ॥

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ' নিবন্ধে এ-বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেছেন। তার মূল বক্তব্যটুকু আলোচনা করে নিলে বুঝতে কিছু সুবিধা হবে।

আচার্য বলছেন, আলেখ্যের ছয়টি অঙ্গ। কী তারা? না—রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য-যোজনা, সাদৃশ্য আর বর্ণিকাভঙ্গ। এই শব্দগুলির অর্থ কি?

রূপভেদ—অর্থাৎ, পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান। এই প্রপঞ্চময় জগৎ থেকে শিল্পী একটি বা কয়েকটি বিশেষকে বেছে নিয়ে তাঁর আলেখ্যের বিষয়-বস্তু নির্বাচন করছেন। সেই

রূপভেদ

বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর যে বাহ্যিক রূপ, সে সম্বন্ধে চিত্রকরের সম্যক্‌ জ্ঞান থাকা উচিত। অর্থাৎ, শিল্প-নিদর্শনটি দেখে দর্শক যেন বুঝতে পারে চিত্রের বিষয়-বস্তুটা কী। চিত্রটি নর অথবা নারীর, অল্প অথবা অধিক বয়সী, কোন্‌ দেশের, কোন্‌ শ্রেণীর মানুষ ইত্যাদি। হরিণ আঁকলে তাকে অনুদ্‌গতশৃঙ্গ মেষ বলে যদি সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন দর্শকদল ভুল করে বসে, তবে বুঝতে হবে শিল্পীর রূপভেদ সম্বন্ধে ধারণা পর্যাপ্ত নয়।

প্রসঙ্গতঃ, এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী পিকাসো-র সম্বন্ধে প্রচলিত একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। জগদ্বিখ্যাত শিল্পীর কাছে প্রতিদিন অসংখ্য চিঠিপত্র আসে—যে ডাক-পিয়ন তাঁর চিঠিগুলি লেটার-বাক্সে রোজ রেখে যায়, তার ভারি কৌতূহল ছিল শিল্পীকে স্বচক্ষে দেখার। বেচারির বরাত খারাপ, রেজেস্ট্রী চিঠি এলেও শিল্পীর একান্ত-সচিব সেগুলি সই করে নেন। শিল্পীর দর্শন আর মেলে না। শেষ পর্যন্ত ডাক-পিয়ন দারোয়ানজীর শরণাপন্ন হল। দ্বারপাল শেষবেশ দয়াপরবশ হয়ে একদিন সুযোগমত ওকে বললে, আজ একান্ত-সচিব মশাই বাড়ী নেই। তুমি সোজা ভিতরে স্টুডিওতে চলে যাও।

ডাক-পিয়ন বললে, ভিতরে আর কে আছেন?

: আর কেউ নেই। শিল্পী আর তাঁর দশ বছরের ছেলেটি আছে।

সাহসে ভর করে ডাক-পিয়ন ঢুকে পড়ে ঘরে। দেখে, ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে শুধু ছবি আর ছবি। শিল্পী আর তাঁর বালক-পুত্র বসে আছেন সেই চিত্র-সম্ভারের মাঝখানে। সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে শিল্পীকে রেজিস্ট্রী খামটি এগিয়ে দিল ডাক-পিয়ন। কলম বার করে শিল্পী সই করছেন, ডাক-পিয়নের মনে হল এই অবকাশে কিছু বললে ভাল হয়—তাহলে বন্ধুদের কাছে বলতে পারবে স্বয়ং পিকাসো-র সঙ্গে সে বাক্যালাপ করেছে। তাই অনেক বুদ্ধি খরচ করে ডাক-পিয়ন বললে, ছোটকর্তাও দেখছি তার বাবার মত ছবি আঁকার চেষ্টা করছে। ভাল, ভাল!

পিকাসো একটু অবাক্‌ হয়ে বলেন—এ-কথা মনে করছ কেন?

একগাল হেসে ডাক-পিয়ন বললে—ঐ ঘোড়ার ছবিখানি নিশ্চয় আপনার পুত্রের আঁকা। চমৎকার হয়েছে!

পিকাসো জবাব দেননি। মৃদু হেসেছিলেন শুধু।

কারণ, চিত্রটি পুত্রের নয়—পিতার আঁকা। বিশ্ববিশ্রুত একটি শিল্পকর্ম, ঘোড়া নয়—faun : 'দ্য হেড অফ এ ফন!'—একটি গ্রীক কাল্পনিক জীব।

গল্পটি উল্লেখ করলুম এজন্য যে, এ নিয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। ডাক-পিয়নও একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন দর্শক। সে বেচারি যদি রোমক অধিদেবতা faun-কে ঘোড়া বলে ভুল করে, তবে কি আমরা ধরে নেব শিল্পী পিকাসো-র 'রূপভেদ' সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান নেই? এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। কারণ, স্বয়ং পিকাসো-ই তার জবাব দিয়ে গেছেন এবং তাঁর সে স্বীকারোক্তিতে সারা বিশ্বের চিত্র-সমালোচকরা নূতন করে ভাবতে শুরু করেছেন।

সে যাইহোক, রূপভেদের আনুষঙ্গিক হিসাবে এসে পড়ে প্রমাণ, অর্থাৎ নানাবিধ মাপ-জোখ। বানর ও নরের পার্থক্য শুধু একটি সুদীর্ঘ অঙ্গবিশেষের অস্তি-নাস্তির উপরেই নির্ভরশীল নয়। হাত-পা-মুখ-দেহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের আপেক্ষিক মাপের বহুবিধ পার্থক্যই প্রমাণ দেয় এ চিত্রটি নরের, ওটি বানরের। আমাদের প্রাচীন শিল্প-সাধকরা শিল্পমূর্তিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ; যথা—নর, ক্রুর, আসুর, বালা এবং কুমার। এই পাঁচ শ্রেণীর মূর্তি গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রকার তাল ও মান নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন নরমূর্তি—দশতাল ; ক্রুরমূর্তি—দ্বাদশতাল ; আসুরমূর্তি—ষোড়শতাল ; বালামূর্তি—পঞ্চতাল ; কুমার-মূর্তি—ষট্‌তাল। শিল্পীর নিজমুষ্টির এক-চতুর্থাংশকে বলে এক আঙ্গুল ; এই রকম দ্বাদশ অঙ্গুলিতে বা তিন মুষ্টিতে হয় এক তাল। শিল্পাচার্যরা বলছেন, রাম, নৃসিংহ, ইন্দ্র, অর্জুন প্রভৃতির মূর্তি হবে নরমূর্তি অর্থাৎ দশতাল। চণ্ডী, ভৈরব, বরাহ প্রভৃতি হবে দ্বাদশতালের ক্রুরমূর্তি। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মহিষাসুর প্রভৃতি হবে ষোড়শতালের আসুরমূর্তি। বালামূর্তি হবে বটকৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি এবং কুমারমূর্তি হবে বামন, কৃষ্ণসখা ইত্যাদির। শুধু তাই নয়, দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ কোন্ মূর্তিতে কত হবে তাও বলা আছে—নরের ও নারীর পৃথকভাবে। প্রশ্ন হতে পারে, এত বাঁধাবাঁধির মধ্যে মূর্তি গড়তে গেলে বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে? সবই তো একঘেয়ে হয়ে যাবে। না, তা যাবে না! বৈচিত্র্যের জন্য ঈশ্বর এই দুনিয়ার চারশ' কোটি মানুষের কাউকে চার-হাত দুই-মাথা করেননি। মানুষের অবয়বের একটি প্রাথমিক পারম্পর্য সত্ত্বেও প্রত্যেকটি মানুষ বিশেষ। তেমনি শিল্পসম্মত এই সব মাপজোখ মেনে চলা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা বৈচিত্র্যের স্বাদ আনতে পেরেছেন তাঁদের শিল্পকর্মে। সে যাই হোক, এই মাপজোখ, এই গাণিতিক হিসাবকেই যশোধর বলতে চেয়েছেন চিত্রের দ্বিতীয় অঙ্গ বা 'প্রমাণ'।

প্রমাণ

চিত্রের বহিরঙ্গের রূপ দিতে এল রূপভেদ ও প্রমাণ—তার পরের অঙ্গটি হচ্ছে 'ভাব'। সেটি বহিরঙ্গের নয়, অন্তরঙ্গের জিনিস। ভাবের কিছুটা আমরা বুঝতে পারি ভঙ্গীতে। কিছুটা অনুধাবন করতে হবে হৃদয় দিয়ে। ও মেয়েটি গালে হাত দিয়ে বসেছে—ও ভাবছে ; এ ছেলেটি তরবারির মুট ধরেছে, এ ক্রোধান্ধ ; এগুলি হচ্ছে প্রকট ভঙ্গী ; এর ভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না! কিন্তু ঐ যে মেয়েটির মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টি ও লজ্জাবনতা—ঐ প্রোষিত-ভর্তৃকার অসম্বদ্ধ কবরীপাশ, ওর চুলবাঁধায় মন নেই, এগুলি অনুধাবন করতে হলে আর একটু অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু ভাবের রাজ্য তো ওখানেই শেষ নয়—অধরের একটু কম্পনে, ভ্রূর সামান্যতম কুঞ্চনে, হাতের বিশেষ একটি মুদ্রায় শিল্পী অনেক কিছু অনেক সময় বলতে চান—সেগুলি দেখবার চোখ চাই। কিন্তু এহ বাহ্য! শিল্পচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলছেন :

ভাব

চিত্র করিবার সময় দেখাইব কতখানি এটাও যেমন ভাবিতে হইবে, দেখাইব না কতখানি তাহাও বিচার করিতে হইবে। কি দিয়া ভাবের প্রচ্ছন্নতাকে বুঝাইব? প্রচ্ছন্ন যাহা তাহাকে খুলিয়া দেখাইলে তো সে আর প্রচ্ছন্ন রহে না। ছায়ার উপরে আতপের প্রয়োগ করিয়া ছায়াকে তো দেখাইতে পারি না—সে যে আতপ পাইলেই দূরে পালায়। কাজেই দেখিতেছি, ছায়া দেখাইতে হইলে আমরা যেমন আতপের সম্মুখে কোনো

এক পদার্থ আড়াল করিয়া ধরিয়া—যেমন গাছটি কিম্বা আমার হাতখানি ধরিয়া দেখাই 'এই ছায়া', তেমনি চিত্রেও ব্যঞ্জনা দিই আমরা যেটা প্রচ্ছন্ন তাহার আর যেটা স্ফুট তাহার মাঝে কিছু একটা আড়াল দিয়া।

কুটিরটি আধখানা লিখিলাম, আর আধখানা গাছের আড়ালে ঢাকিয়া দিলাম ; কুটিরের লেখা অংশটি কুটিরের ভঙ্গী বা কুটিরের ভাবের প্রকাশের দিকটা আমাদের দেখাইল, আর গাছের আড়ালে ঢাকা কুটিরের প্রচ্ছন্ন অংশটুকু ইঙ্গিতে জানাইতে লাগিল কুটিরের ভিতরের ভাব, কুটিরবাসীর নানা লীলা। সেদিকটায় আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি নানা অলিখিত বস্তু।

বস্তুতঃ, এই ভাবের রাজ্যেই শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের আত্মীয়তা। সবটুকু যদি শিল্পী বলে দেন, তাহলে ভাবরাজ্যের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়—কিন্তু এই যে কিছুটা ঢাকা, কিছুটা আড়াল-করা, ভাবের রাজ্যে শিল্পী একটু আভাস, একটু ইঙ্গিত দিয়ে থেমে যান এবং এই যে সেই আভাস-ইঙ্গিতের পথ ধরে দর্শক ভাবরাজ্যে ভেসে চলেন এতেই চিত্র-দর্শনের প্রকৃত আনন্দ। প্রকৃতিও একজন উঁচুদরের শিল্পী, তাই তার অনেক রহস্য আজও দুর্জ্ঞেয় এবং তাতেই তার মাধুর্যের উপাদান। আর তাই 'মাটির দুয়ার আধেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর দেখায় বসুন্ধরা'। সবটা যদি খুলে দেখাত, তাহলে রহস্যের রোমাঞ্চ শিহরণ থেকে বঞ্চিত হতুম আমরা।

ভাবের পরে বলতে হবে লাবণ্যযোজনার কথা।

লাবণ্য শব্দটির সঙ্গে লবণ শব্দটির ধ্বনি-সাদৃশ্য থেকে আমার মনে একটা কথা জাগছে। কোন একটি তরকারি রাঁধবার সময় আলু, পটল, মাছ ইত্যাদি নির্বাচন করাকে যদি বলি 'রূপভেদ', বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ স্থির করাকে যদি বলি 'প্রমাণ', তাহলে সেই তরকারিতে লবণ যোগ করাকে বলব লাবণ্যযোজন। অল্প ও পরিমাণ অনুযায়ী লবণ যতক্ষণ না যোগ করা হচ্ছে ততক্ষণ সেটি বিস্বাদ ও আলুনী! কিন্তু আমার এই স্থূল উপমায় লাবণ্যযোজনার মর্মকথা যতটা উদ্ঘাটিত হল, তার চেয়ে অনেক মধুর করে, অনেক হৃদয়গ্রাহী করে এই লাবণ্যযোজনার প্রকৃত স্বরূপটি উদ্ঘাটন করেছেন শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ তাঁর একটি শ্লোকে :

লাবণ্যযোজনা

মুক্তাফলেষুচ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥

নিটোল একটি মুক্তার আকার আর আয়তন বোঝানো শক্ত নয়, তার বর্ণের কথাও বোঝানো যায় ; কিন্তু তার সর্বাঙ্গে যে ঢলঢল তরলিত আভা, সেটির বর্ণনা দেওয়া যাবে কেমন করে? চিত্রকর মুক্তাটির রূপভেদ সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করেন, তার মাপজোখ বা প্রমাণও অনায়াস-লভ্য—কিন্তু ঐ ঢলঢল তরলিত আভাটি যদি তিনি রূপায়িত করতে পারেন, তবেই তাঁর মুক্তা আঁকা সার্থক—সেটিই হচ্ছে লাবণ্যযোজনা!

কিন্তু লবণ না হলেও যেমন চলবে না, লবণের আধিক্যও তেমনি সুস্বাদু আহার্যটিকে বিস্বাদ করে দিতে পারে। তাই পরিমিত-বোধ লাবণ্যযোজনার মূলকথা।

তুলি-কলমের জাদুকর অবনীন্দ্রনাথ অতি অল্প কথায় লাবণ্যযোজনার এই মর্মকথা ভারি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন!

রূপকে যেমন পরিমিত দেয় প্রমাণ, যথোপযুক্ত এবং যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে আনিয়া, তেমনি লাবণ্য পরিমিতি দেয় ভাবের কার্যকে বা ভঙ্গীকে অদ্ভুত ও উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গী হইতে নিরস্ত করিয়া। ভাবের তাড়নায় ভঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছে উন্মত্ত অশ্বের মতো অসংযত উদ্দাম অসহিষ্ণু এমনকি অশোভন-রূপে প্রমাণের সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ; লাবণ্য আসিয়া তাহাকে শান্ত করিতেছে নিজের মধুর কোমল স্পর্শটি ধীরে ধীরে তাহার সর্বাঙ্গে বুলাইয়া। ভাবের তাড়নায় রূপ যখন শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানকালে দুর্বাসা ঋষির মতো অপরিমিত রূপে হাত পা নাড়িয়া, দাঁত মুখ খিঁচাইয়া উদ্দণ্ড ভঙ্গিতে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তখনই আমাদের লাবণ্য তাহার কাছে আসিয়া বলিতেছে,—স্থিরোভব! পাগল হইলে যে!

প্রমাণের বন্ধনে যে কঠোরতাটুকু আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই ; অথচ সেও বন্ধন, সুনিশ্চিত একটি সুকুমার বন্ধন। সে প্রমাণের মতো জোরে রাশ টানিয়া অশ্বের ঘাড় বাঁকাইয়া দেয় না। কিন্তু তাহার স্পর্শে অশ্ব আপনি ঘাড় বাঁকাইয়া লয় ও তালে তালে পা ফেলিয়া চলে। প্রমাণ যেন মাস্টার, বেত মারিয়া সবলে ছেলেকে সোজা করিতেছে ; আর লাবণ্য যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে ভুলাইয়া যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন।

লাবণ্যযোজনার পর পঞ্চম অঙ্গের আলোচনা করতে হয়। সেটি 'সাদৃশ্য'।

সাদৃশ্য কি? না, সদৃশস্য ভাব ইতি সাদৃশ্য। কাব্যে বা সাহিত্যে আমরা উপমার সাহায্য নিয়ে থাকি। কখন? যখন কোন বস্তু বা ব্যক্তির কোন গুণ প্রকাশ করতে গিয়ে বিশেষণের লাগিতে আর এক বাঁও মেলে না, তখন আমরা উপমার দ্বারস্থ হই। তোমাকে দেখবার জন্য আমার মন কতদূর ব্যাকুল হয়েছে বোঝাতে আমাকে বলতে হচ্ছে 'দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়'। ছেলেকে পেয়ে মা সব ভুলেছেন, ঘর-সংসার-আত্মীয়-পরিজন সব ছাড়তে তিনি প্রস্তুত; তাই বলছেন, 'ধনকে নিয়ে বনকে যাব সেখানে খাব কি?' জবাবে নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছেন 'বিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি'। এখানে আর বিশেষণে কুলাল না, আঁখিকে 'পাখী' করে প্রেমিকের, পুত্রকে 'চাঁদ' করে মায়ের মনের আকুলতা মিটল।

সাদৃশ্য

কাব্য ও সাহিত্যেও যেমন, চিত্রেও তেমন অনেক কথা না বলে উপমা বা সাদৃশ্যের সাহায্যে অল্প রেখায় অল্প রঙে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। তাকেই বলি 'সাদৃশ্য'।

কাব্যে বা সাহিত্যে উপমা-রূপকের কোথায় শেষ তা আমরা জানি! তাই রসোপলব্ধিতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। আকাশের চাঁদের সঙ্গে বাছনির মুখচন্দ্রের তুলনায় শুধু চাঁদের দীপ্তি, সৌকুমার্য আর লাবণ্যটুকুকেই আমরা বুঝে নিই—আকার বা আকৃতিগত সাদৃশ্য আমরা খুঁজি না; ঠিক তেমনি চিত্রের বেলাতেও সাদৃশ্যের সীমারেখাটি বুঝে নিতে হবে—কী শিল্পীর কী দর্শকের পক্ষে।

সেই সীমারেখাটি কী? না, রূপে রূপে মিলের চেয়ে বড় কথা ভাবে ভাবে মিল। গ্রীক চিত্রকর জিউক্সিসের দ্রাক্ষাগুচ্ছ দেখে পাখী ভেবেছিল সত্যিকারের আঙুর। বাস্তবের সঙ্গে চিত্রের এই মিলকে কিন্তু সাদৃশ্য বলছি না; চাঁদের উপমান যেমন চাঁদ হতে পারে না। ঐ সুন্দরীর চোখ দুটি দেখে যদি আমার মনে হয় খঞ্জনের মত সে দুটি চঞ্চল, তবেই বলব খঞ্জন-নয়নার ঐ চিত্রটি সাদৃশ্যের নিরিখে উৎরেছে!

'সাদৃশ্য' প্রসঙ্গের আলোচনাকালে শিল্পাচার্য বলেছেন:

চিত্রে তেমনি শতসহস্র রেখা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণভেদাদি মানসমূর্তির সদৃশ করিয়া অঙ্কন করিতেছি তখনই যথার্থ সাদৃশ্য দিতেছি। কাজেই বলিতে হইতেছে যে ভাবের অনুরণন যাহা দেয় তাহা উত্তম সাদৃশ্য আর কেবলমাত্র আকৃতি বা রূপের অনুকরণ যাহা দেয় তাহা অধম সাদৃশ্য।

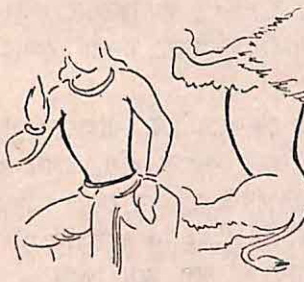
মহাজনক জাতকে প্রমোদভবনের দুটি দৃশ্যের (চিত্র—৬ ও ৭) পরিকল্পনায় সাদৃশ্য যে একটা প্রধান গুণ, এ-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু শিল্পী দুটি দৃশ্যপটকে হুবহু এক করে আঁকেননি। বস্তুনিচয় ও পশ্চাদ্‌পটে সাদৃশ্য নেই—কিন্তু পাত্রপাত্রীদের ভাবের অনুরণনে অপরূপ সাদৃশ্য। শিল্পী যেন পোর্ট্রেট এঁকেছেন কতকগুলি। যেন এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ করে এঁকেছেন। মহাজনক ও সীবলীর আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য অনস্বীকার্য, কিন্তু আগেই বলেছি, ভাবের ব্যঞ্জনায় তাদের আলেখ্য দুটিতে বৈপরীত্যই প্রকট। অন্যান্য চরিত্রগুলি লক্ষ্য ও তুলনা করে দেখুন। প্রথম চিত্রে সীবলীর মাথার ঠিক উপরেই যে চামরধারিণী মেয়েটি আছে, তাকে দেখলেই মনে হয় সে যেন উদাসী, আনমনা, সে যেন প্রমোদকক্ষে থেকেও অন্যমনে কি ভাবছে। এবার দ্বিতীয় চিত্রটিতে সর্বদক্ষিণের মেয়েটিকে দেখুন—ঐ একই চরিত্র নয় কি? একটি চম্পক-অঙ্গুলি গালে দিয়ে সে যেন আনমনে কি ভাবছে। ভাবুকপ্রকৃতির এ মেয়েটির ডানহাতে ছিল এক গোছা ফুল—পরমুহূর্তেই যেন তা হস্তচ্যুত হবে। দ্বিতীয় একটি মেয়ে আছে এ নাটকে, যে চায় মহাজনক যেন সীবলীর আকর্ষণে স্বধর্মচ্যুত না হন। প্রথম চিত্রে দুটি স্তম্ভের মাঝখানে দেখছি, সে যেন হাত তুলে মহাজনককে নিবারণ করতে চাইছে, দ্বিতীয় চিত্রে চামরহস্তা এ মেয়েটিকে দেখছি সীবলীর ঠিক উপরেই। সে যেন আনন্দিতা, সে যেন উপভোগ করছে মহাজনকের এ সিদ্ধান্ত; একমাত্র তার মুখেই ফুটে উঠেছে তৃপ্তির আভাস!

মহাজনক জাতক চিত্র আলোচনা

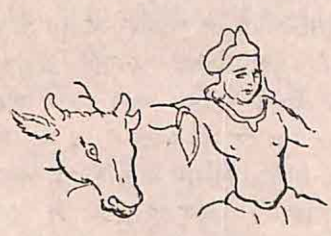
আরও একটা কথা। দ্বিতীয় চিত্রে (চিত্র—৭) সীবলীকে দু'বার আঁকা হয়েছে। রাজার সম্মুখে সীবলী, রাজার বামেও সীবলী। এ পাশের চরিত্রটা কিন্তু প্রমোদকক্ষে নয়; সে তার শ্বশ্রূমাতার কাছে অন্যত্র যুক্তকরে উপদেশ নিচ্ছে। চলচ্চিত্রের ভাষায় যাকে আমরা 'সুপার-ইম্পোস' বলি, এই খণ্ড-দৃশ্যটি যেন তেমনি মূল চিত্রে আরোপিত। সাঁচিতে ও অজন্তায় এ জাতীয় শিল্পচাতুর্যের বহু নিদর্শন আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই দুটি নারী-মূর্তির পরিধেয় বস্ত্র ও অলঙ্কার একই রকমের—কিন্তু সেটি সাদৃশ্যের মর্মকথা নয়;—এই দুটি নারীমূর্তি যে একই ব্যক্তির তা বোঝা যায় তাদের মুখভঙ্গির, তাদের চাহনির, তাদের অসহায়ত্বের ভাবব্যঞ্জনার সৌসাদৃশ্যে! যেন ভাবের অনুরণনে চরিত্রগুলি একই ছন্দে দুলছে, একই সময়ের মাথায় থামছে! আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নিয়োগ করা হয় পূর্বাপর দৃশ্যে পারম্পর্যের সমতাবিধানের কাজে (continuity)। অজন্তার শিল্পীর তুলিতে কোন্ মন্ত্রে সে সামঞ্জস্যবিধানের এ অদ্ভুত ব্যবস্থা করা হত? পারম্পর্য শুধুমাত্র বসন-ভূষণ-নির্ভর নয়, তা ভাবব্যঞ্জনায় পূর্বাপর ঘনিবদ্ধ। এ যে কতবড় কৃতিত্ব তা লিখে বোঝানো যায় না। বোধ করি, এ কোন কৃতিত্বই নয়, এ কোন শিল্পচাতুর্যই নয়—এ হল ওঁদের ধ্যানের ধন। রূপভেদ পর্যায়ের আলোচনায় শিল্পাচার্য বলেছিলেন :

রূপের বহিরঙ্গণে ভিন্নতা ধরিতে বা ধরিয়া দিতে পারিলেও চক্ষু বিভিন্ন রূপের সত্তাকে অর্থাৎ রূপের আসল ভেদাভেদটা ধরিতে পারে না, রূপের এই আসল ভেদ বা রূপের মর্ম কেবল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই ধরিতে পারি।

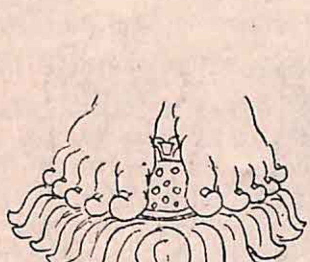
তাই বলছিলুম, এ অজন্তা-শিল্পীর কোন প্রয়োগ-কৌশলের কৃতিত্ব নয়—এ ওঁদের ধ্যানের ধন, সহজাত জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি!



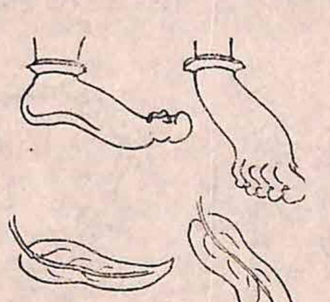
চিত্র—৮৯ ॥ সাদৃশ্য—সিংহ-কটি।



চিত্র—৯০ ॥ সাদৃশ্য—গোমুখ-কাণ্ড।



চিত্র—৯১ ॥ সাদৃশ্য—চরণ-কমল।



চিত্র—৯২ ॥ সাদৃশ্য—পদপল্লব।

সপ্তদশগুহায় আঁকা একটি অনবদ্য চিত্রের সমালোচনাকালে শিল্পরসিক ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী বলেছেন, এই অনবদ্য চিত্রটির একটিমাত্র খুঁত হচ্ছে রাজকুমারীর ডানপায়ের পাতা। চিত্রটি 'প্রসাধনরতা রাজকন্যা' (চিত্র—৫০)। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য কলারসিকের শিল্পবিচারে

এ-কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অথচ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঐ চরণযুগলের চিত্রই এঁকেছেন তাঁর 'ভারতশিল্পে মূর্তি' পুস্তিকায় সাদৃশ্যপর্যায়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখাতে। কাব্যে আমরা মীননয়না, কম্বুগ্রীব, গোমুখ-কাণ্ড ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে যে ভাব ব্যক্ত করি ভারতীয় শিল্পী তাঁদের তুলির টানে কিরূপে সেই ভাব ব্যক্ত করেন তা বুঝিয়ে দিতে শিল্পাচার্য অনেকগুলি চিত্র এঁকে দেখিয়েছেন। শিল্পাচার্যের অনুকরণে আমি এখানে চারটি মাত্র উদাহরণ সন্নিবেশিত করলুম। সিংহ-কটি, গোমুখ-কাণ্ড, চরণকমল ও পদপল্লব। শেষ উদাহরণ দুটি নিয়ে শিল্পাচার্য বলছেন :

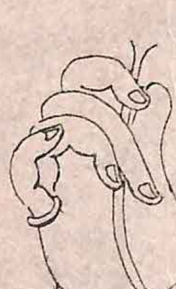
কমলের সহিত ও পল্লবের সহিত কর ও পদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য অজন্তা চিত্রাবলীতে ও ভারতীয় মূর্তিগুলিতে যেমন স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই এমন আর কোনো দেশের কোনো মূর্তিতে নয়।

অথচ মজা হচ্ছে এই যে, শিল্পাচার্য যেটিকে পদপল্লবের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে সংকলন করেছেন, ডাঃ ইয়াজদানী সেইখানেই লক্ষ্য করেছেন আঙ্গিক বিকৃতি বা 'এ্যানাটমিকাল ডিফেক্ট'।

প্রসঙ্গতঃ কিশোর বয়সের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কোন একটি সে-কালীন আধুনিক কবিতা আমার বাবাকে পড়ে শোনাচ্ছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, কবি সুধীন দত্তের কবিতা। কথা-প্রসঙ্গে আধুনিক কাব্যে অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগের বিষয় উঠল। আমি বলেছিলুম, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমি সেই কিশোর বয়সের ঔদ্ধত্যে দাখিল করেছিলুম এই পংক্তিটি 'হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল' ; বলেছিলুম এখানে 'পূষন্' শব্দের প্রয়োগ শুধু পাঠকের কাছে পাণ্ডিত্য জাহির করা—যাতে তাকে বিশ্বকোষ খুলে বুঝে নিতে হয় পূষন্ শব্দের অর্থ সূর্য। মনে আছে, বাবা তখনই তাঁর বইয়ের আলমারি থেকে ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থটি বার করে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমার ধারণা ভ্রান্ত। বলেছিলেন, কবিতাটি রচনা করার সময় কবির মনে 'তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে' মন্ত্রটি অনুরণিত হচ্ছিল এবং সেইজন্যই ঐ পূষন্ শব্দের প্রয়োগ।

এই আপাত-অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাটি উল্লেখ করলুম এ-কথা বোঝাতে যে, আমাদের স্বল্প-জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে আমরা যখন কোন বৃহৎ শিল্পকর্মের বিচার করতে বসি, তখন প্রায়ই ভুল করি, আর ভুল যে করি তা বুঝি না যতক্ষণ না সে ভুলটা কেউ বুঝিয়ে দেয়। কিশোর বয়সে আমি যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলুম প্রায় সেই জাতীয় ভ্রমাত্মক উক্তিই কি করেননি পণ্ডিত-প্রবর ডাঃ ইয়াজদানী, যখন বলেছেন ঐ পদযুগলে 'এ্যানাটমিক্যাল' ভুল রয়ে গেছে?

অবলোকিতেশ্বর পদ্মপানির অনবদ্য চিত্রটিতে (চিত্র—৮) লক্ষ্য করে দেখা যাক ওঁর দক্ষিণ করমুষ্টির পরিকল্পনা। চিত্র—৯৩-তে দেখছি মুদ্রাটি, অনুভব করছি ঐভাবে মুঠি পাকাতে


চিত্র—৯৩।


চিত্র—৯৪।

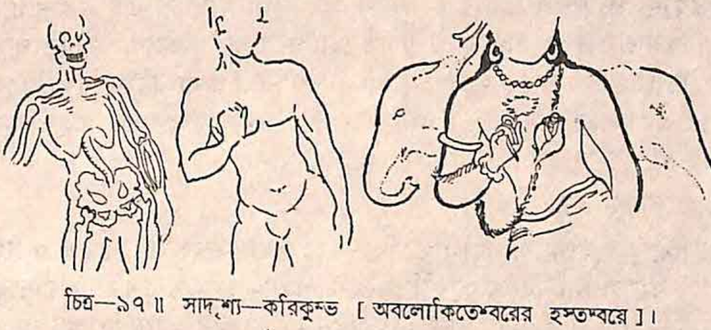

চিত্র—৯৫।


চিত্র—৯৬।

হলে অস্থি-সংস্থান হওয়া উচিত চিত্র—৯৪-এর অনুরূপ ; কিন্তু তাহলে তো রক্ত-মাংস সমন্বিত মুষ্টি চিত্র—৯৫-এর মতো হবে। চিত্রকর করমুষ্টির বহিরঙ্গ-রেখা এত পেলব করলেন কোন প্রেরণায়? সেটা অনুধাবন করব চিত্র—৯৬-এর দিকে চোখ ফেরালে ; বুঝব—পদ্মপাণির

করমূষ্টি বস্তুতঃ একটি পুষ্পকোরকের সাদৃশ্য ধ্যানের-দৃষ্টিতে দেখে আঁকা। 'এ্যানাটমি' নয়, শিল্পীর মূল লক্ষ্য ছিল ভাবের রাজ্যে।

অনুরূপভাবে প্রত্যক্ষবাদীর ফটোগ্রাফিক দৃষ্টি অনুযায়ী অবলোকিতেশ্বরের দুটি বাহু ও হাতে যেন বাস্তবতার ব্যত্যয় ঘটেছে। মানবদেহের অস্থি-সংস্থান অনুযায়ী দুটি হাতের বহিরঙ্গরেখা যেভাবে আঁকার কথা সেভাবে এখানে আঁকা হয়নি। এখানেও বলব, শিল্পী



চিত্র—৯৭ ॥ সাদৃশ্য—করিকুম্ভ [অবলোকিতেশ্বরের হস্তদ্বয়ে]।

সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনাটুকু ভুলতে পারেননি। আজানুলম্বিত বাহুর উপমান হচ্ছে করিকুণ্ড এবং শুণ্ড। চিত্র—৯৭-তে এইটাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

অজন্তা-চিত্রে শিল্পী এ-ভাবে প্রায় প্রতিটি চিত্রে একটা কোমলতা বা পেলবতার ভাব এনেছেন, যে সাবলীলতা ক্রমশঃ ভারতীয় চিত্র-শিল্পের সঙ্গে এমনভাবে অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেছে যে, ভারতীয় দর্শকের চোখে তা অপ্রাকৃত বা অবাস্তব বলে আদৌ মনে হয় না—স্বাভাবিক সৌন্দর্যের দ্যোতক রূপেই অনুভূত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকেই অবনীন্দ্রনাথ এবং পরে নন্দলাল প্রাধান্য দেওয়ায় বর্তমান শতাব্দীতে অঙ্কিত বহু ভারতীয় শিল্পীর তুলিতেও ঐ পেলবতা মূর্ত হয়েছে।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতশিল্পে মূর্তি' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

ষড়-অঙ্গের শেষ অঙ্গটি হচ্ছে বর্ণিকাভঙ্গ এবং এটিই শিল্পীর শেষ সাধনা। সেটি হচ্ছে তুলির উপর, রঙের উপর শিল্পীর দখল। মহাদেব পার্বতীকে বলছেন : বর্ণজ্ঞানং যদা নাস্তি কিং তস্য জপপূজনৈঃ? যদি বর্ণজ্ঞান না জন্মায়, যদি ঐ বর্ণিকাভঙ্গটি আয়ত্তাধীন না হয়, তবে ষড়ঙ্গের আর পাঁচটির সাধনা বৃথা যাবে। জপ ও পূজায় কোন লাভ হবে না। তুলি ও পট স্পর্শমাত্র না করেও শুধু বুদ্ধি দিয়ে, ধী-শক্তি দিয়ে ষড়ঙ্গের প্রথম পাঁচটির সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা চলতে পারে। কিন্তু বর্ণিকাভঙ্গ? সেখানে তোমাকে তুলিহাতে আসরে নামতে হবে। শিল্পাচার্য বলছেন :

বর্ণিকাভঙ্গ

> চোখের তারাটি যাহা তিলমাত্র বিচলিত হইলে, নিটোল গালের রেখাটি যাহা একচুল এদিক ওদিক হইলে, লতাতন্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম হাসিরেখা যাহা একটু কাঁপিলে, সব নষ্ট হইয়া যায়—তুলির আগায় সেগুলি আঁকিয়া দেখানো হস্তের কি ক্ষিপ্রকারিতার, স্পর্শের কত লঘুতারই অপেক্ষা রাখে।......তুলিটি ঠিক কতটুকু ভিজাইব, তাহার আগায় কতটা রঙ তুলিয়া লইব ও ঝাড়িয়া ফেলিব এবং সেই রঙ সমেত ভিজা তুলিটি ঠিক কতটুকু চাপিয়া অথবা কতখানি না-চাপিয়া কাগজের উপর বুলাইয়া দিব—ইহারই সম্বন্ধে প্রমা লাভ করা হইতেছে ষড়ঙ্গের বর্ণিকাভঙ্গ নামে শেষ শিক্ষা বা চরম শিক্ষা।

অজন্তা-চিত্রকে আমরা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমতঃ, সমাপিকা বা একক-চিত্র ; দ্বিতীয়তঃ, কাহিনী-চিত্র এবং তৃতীয়তঃ, নক্শা। সমাপিকা-চিত্র আমি সেগুলিকেই বলতে চেয়েছি যেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ—যারা একটি বিশেষ মুহূর্তকে শাশ্বত করে ধরে রেখেছে। যেমন—সপ্তদশ গুহায় বুদ্ধদেব-গোপা-রাহুল, অথবা প্রথম গুহায় মার ও বুদ্ধদেব, কিংবা ষোড়শ গুহায় প্রসাধনরতা নারীত্রয়ের আলেখ্য ; এগুলির বক্তব্য একটি খণ্ড-মুহূর্তে সীমিত। দ্বিতীয়তঃ, কাহিনী-চিত্রগুলি। সেগুলি

তিন-শ্রেণীর চিত্র

অধিকাংশই জাতক অবলম্বনে রচিত, অথবা স্বয়ং বুদ্ধদেবের জীবনের নানান্ ঘটনার অনুসারী। এই চিত্রগুলি একক-চিত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাতে সময়ের বিস্তার আছে ;—পরবর্তী চিত্রে দর্শককে এগিয়ে দেওয়ার কাজে এরা যেন রীলে-রেসের অন্যতম প্রতিযোগী। এই জাতের চিত্রগুলিকে বিচার করতে হলে সম্পূর্ণ কাহিনী-চিত্রটির সামগ্রিক ফলশ্রুতিকেও তোল করতে হবে। তৃতীয়তঃ, নক্শা। এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমরা কোন আলোচনাই করিনি; কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভায় গানের যে স্থান, অজন্তার মহিমায় এই নক্শাগুলিরও সেই মর্যাদা। অনবদ্য গীতি-কবিতা, অপূর্ব উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটক অথবা অচিন্ত্যপূর্ব জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সত্ত্বেও রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ন যেমন সম্পূর্ণ হয় না রবীন্দ্র-সংগীতকে বাদ দিয়ে, তেমনি অতুলনীয় একক-চিত্র, মর্মস্পর্শী কাহিনী-চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সত্ত্বেও অজন্তার কথা শেষ হবে না এই অপূর্ব নক্শাগুলির কথা আলোচনা না করা পর্যন্ত।

একে একে আলোচনা করা যাক।

চিত্র-সম্ভারে সমৃদ্ধ গুহা-মন্দিরগুলিতে, বিশেষতঃ প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ গুহায় প্রবেশ করলে প্রথম কয়েক মিনিট দর্শক রীতিমত দিশেহারা হয়ে পড়েন। চারিদিকের দেওয়াল যেন ছবিতে মোড়া। কোথাও একটু ফাঁক নেই, যেন ভীড় করে আছে তারা। কোথায় কোন্ দর্শনীয় চিত্র আছে, কী তাদের বক্তব্য, কোথায় তার শুরু ও শেষ যেন বোঝাই যায় না। তারপর আঁধারে চোখ একটু সয়ে এলে, মন একটু শান্ত আত্মস্থ হলে, একে একে দেখা যায় যে, চিত্রগুলি মোটেই এলোমেলোভাবে সাজানো নয়—তাদের একটি ছন্দ আছে। অসংখ্য জনপদ, অট্টালিকা, শোভাযাত্রা, রাজসভা, পশু-পাখী, গাছ-পালার ভিতর থেকে এক-একটি গ্রুপ ফুটে বের হয়। বোঝা যায়, এক-একটি অংশে এক-একটি কাহিনী-চিত্র শুরু ও শেষ হয়েছে। এই কাহিনী-চিত্রগুলি দেখতে দেখতে দর্শক যাতে ক্লান্ত না হয়ে পড়েন, তাই মাঝে মাঝে একক-চিত্রে অথবা নক্শা দিয়ে দুটি কাহিনীর মাঝখানে বিরাম বা ছেদ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। যেন দুটি একাঙ্ক নাটিকা অভিনয়ের বিরতিকালে কিছুটা বাণীহীন সুরের আলাপ।

সমাপিকা বা একক চিত্রের রীতি, ব্যাকরণ ও বিন্যাসের (কম্পোজিশন) সংগে কাহিনী-চিত্রগুলির অঙ্কন-পদ্ধতির যথেষ্ট প্রভেদ আছে। একক-চিত্রগুলি অধিকাংশই প্রতিসাম্যমূলক। অর্থাৎ, কেন্দ্রস্থলের কোন একটি বস্তু বা ব্যক্তিতে শিল্পী সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তার দুপাশে, উপরে ও নিচে ফিগর বা বস্তু-নিচয় এমনভাবে সাজাতে থাকেন, যাতে ভারসাম্য রক্ষিত হয়, যাতে দর্শকের দৃষ্টি কেন্দ্রাভিমুখী হয়।

সমাপিকা বা একক-চিত্র

পুকুরের জলে ঢিল ফেললে যেমন সেই কেন্দ্র-বিন্দুর চতুর্দিকে সমতা রক্ষা করে তরঙ্গ-ভঙ্গিমা বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে, কোন কোন চিত্রে সেইভাবে ফিগর-গুলি চারপাশে সাজানো। যেমন বুদ্ধ ও মার (চিত্র—১১), যেমন সারীপুত্তের পরীক্ষা (চিত্র—৫৬) অথবা স্বর্গে বুদ্ধদেব (২।২ক)। এ তিনটি উদাহরণেই এবং এ জাতীয় চিত্রের প্রায় সর্বত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্রটি সামনে-ফেরা। স্বর্গে বুদ্ধদেবের চিত্রে তো শিল্পী যামিনী রায়ের কাঠের পুতুলের মত একেবারে সামনে-ফেরা। এতে স্বতঃই কেন্দ্র-বিন্দুটি প্রতিসাম্য রক্ষা করে। শিল্পী তখন দু-পাশে, উপরে ও নিচে, অন্যান্য ফিগর-গুলি সাজাতে থাকেন। দু-পাশে যে সম-সংখ্যক ফিগর থাকবে এমন কোন বাঁধা-ধরা আইন নেই। সংখ্যার ঘাট্তি রঙের গাঢ়তা দিয়ে, ঔজ্জ্বল্য দিয়ে পুরিয়ে দিয়েছেন ক্ষেত্রবিশেষে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে আবার নূতন পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন কোথাও বা। যেমন ধরা যাক, বুদ্ধদেব-গোপা-রাহুল চিত্রটি (চিত্র—৫৭)। এটিও প্রতিসাম্যমূলক চিত্র। কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু কি? কেন্দ্রবিন্দু এক্ষেত্রে শূন্য। বুদ্ধদেবের বাম কনুইয়ের উপর দিয়ে টানা একটি কল্পিত ঊর্ধ্বাধঃ রেখার দু-পাশে চিত্রটি প্রতিসাম্য রক্ষা করেছে। বিশালায়তন বুদ্ধদেবের দেহের তুলনায় গোপা ও রাহুল অত্যন্ত নগণ্য। শিল্পী এভাবে ছোট-বড় করে আঁকতে বাধ্য হয়েছেন বুদ্ধদেবের চরিত্রে মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব আরোপ করতে। তাই প্রতিসাম্যের খাতিরে শিল্পী গোপার পিছনে একটি বিশাল

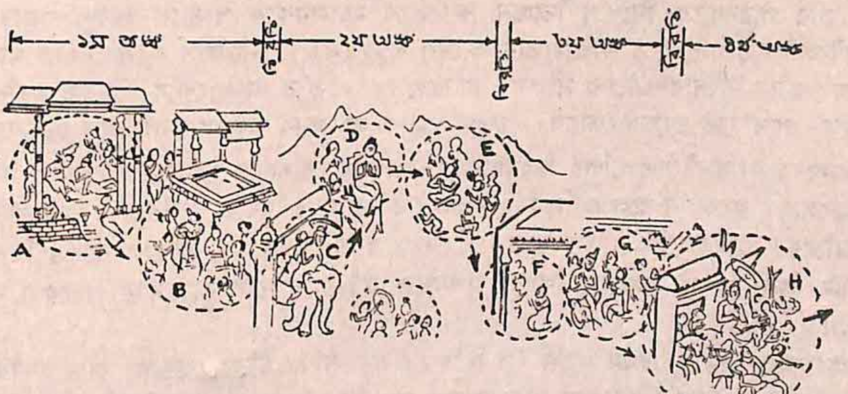
তোরণ-দ্বার এঁকে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। ঘোর রঙের প্রলেপ দিয়েছেন গোপা ও রাহুলকে আঁকতে। ম্যাস ও রঙ নিয়ে যদি তৌল করেন, দেখবেন ঐ কল্পিত সরলরেখার দু-দিকের পাল্লাই সমান ওজনের।

এবার কাহিনী-চিত্রগুলির বিন্যাস বা কম্পোজিশনের প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে একটি গ্রুপ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—তার কাজ হচ্ছে দর্শককে বিশেষ একটি ঘটনার কথা জানিয়ে দেওয়া

কাহিণী-চিত্রের ব্যাকরণ

এবং পরবর্তী ঘটনার দিকে তাকে ঠিকমত চালিত করে দেওয়া। শুধু তাই নয়, কোথায় যে ঐ খণ্ডচিত্রের ঘটনাটি শেষ হল তাও দর্শককে বুঝিয়ে দেওয়া। ফলে, এখানে যতিচিহ্ন—কমা, সেমি-কোলন, ছেদ ও অধ্যায়ের বিভাগ বা পাঙ্চুয়েসন-মার্কগুলি দর্শকের জানা থাকা চাই। কথা-সাহিত্যে আমরা পরিচ্ছেদ টেনে, অধ্যায়ের মাথায় সংখ্যা লিখে কাহিনীটিকে কালানুক্রমিকভাবে ভাগ করে থাকি। নাটকে পটক্ষেপণের ব্যবস্থা থাকে, চলচ্চিত্রে ফেড-আউট, ফেড-ঈন করে অথবা ডিসল্ভ-কাট-ওয়াইপের মাধ্যমে দর্শককে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে আনা হয়। অজন্তার শিল্পীকেও তেমনি কতকগুলি যতিচিহ্নের আবিষ্কার করতে হয়েছে। চিত্র থেকে চিত্রান্তরে যাবার মাঝখানের ফাঁকে কোথাও বসিয়েছেন তোরণ-দ্বার, কোথাও বৃক্ষ, কোথাও বা অট্টালিকার একটি অলিন্দ। বেশ অনুভব করা যায়, একটি যতিচিহ্ন পার হয়ে এলাম। বিশ্বান্তর জাতক-কাহিনীতে (১৭।২৬) অথবা চম্পেয়্য জাতকে (চিত্র—১৪, ১৫) এই যতিচিহ্নগুলি প্রায়শঃই স্তম্ভ। পূর্ণ-অবদান জাতকে ভাবিলের নৌকা রক্ষা ও দুই ভাইয়ের শ্রাবস্তী আগমনের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান বোঝাতে শিল্পী দুটি সমান্তরাল রেখা টানতে বাধ্য হয়েছেন (চিত্র—২২)। এছাড়া, প্রথম যুগ থেকেই আর একটি অভিনব যতিচিহ্নের ব্যবহার করেছেন তাঁরা। সেটি হচ্ছে বিভিন্ন ফিগরের মুখ-ফেরানোর ভঙ্গি। শিল্পী দেখলেন, চিত্র থেকে চিত্রান্তরে সংক্রমণের পথে কোন স্থূল বস্তু না রেখেও শুধুমাত্র ফিগরগুলির মুখ এদিক থেকে ওদিকে ঘুরিয়ে দৃশ্যান্তর বোঝানো সম্ভব হচ্ছে।

কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। ধরা যাক মহাজনক-জাতকের কাহিনীটি। চিত্র—৬ ও চিত্র—৭-এ আমরা যে চিত্রগুলি দেখেছিলাম সেগুলি সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে চিত্র—৯৮-তে।



চিত্র—৯৮ ॥ মহাজনক চিত্র-নাট্যের বিন্যাস।

এ কাহিনী-চিত্রটি যেন একটা চার-অঙ্কের নাটক। চিত্রনাট্যকার কী-ভাবে তাঁর নাটককে সাজিয়েছেন তারই বিশ্লেষণ করব আমরা।

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য—'A'-চিহ্নিত প্রথম বৃত্তটি—চিত্র—৬-এর বামদিকের অংশ—সভাকক্ষ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—'B'চিহ্নিত দ্বিতীয় বৃত্ত—চিত্র—৬-এর দক্ষিণদিকের অংশ—নর্তকীদল।

দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য—'C'-চিহ্নিত বৃত্ত—মহাজনক হস্তিপৃষ্ঠে তোরণদ্বার অতিক্রম করে হিমাবলী পর্বতে সন্ন্যাসী দর্শনে চলেছেন।
দ্বিতীয় দৃশ্য—'D-E'-চিহ্নিত উপবৃত্ত—হিমাবলী পর্বতের ঘটনা।
তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য—'F'-চিহ্নিত বৃত্ত—মহাজনক-জননী ও সীবলী।
দ্বিতীয় দৃশ্য—'G'-চিহ্নিত বৃত্ত—মহাজনক সীবলীকে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন। চিত্র—৭-এর বামদিকের অংশ।
চতুর্থ অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য—'H'-চিহ্নিত বৃত্ত—মহাজনক তোরণদ্বার অতিক্রম করে সন্ন্যাস নিতে চলেছেন। চিত্র—৭-এর দক্ষিণদিকের অংশ।

এবার লক্ষ্য করে দেখুন, প্রথম অঙ্কের দুটি দৃশ্য যেন একটি উপবৃত্তের (ellipse) অন্তর্ভুক্ত। মহাজনক ও নর্তকী যেন মুমুক্ষা ও রতিরঙ্গের প্রতীকরূপে ঐ উপবৃত্তের দুটি 'নাভি' (focii)। ঐ দৃশ্যদ্বয় একই স্থান-কালের অন্তর্গত, ফলে বৃত্ত দুটিকে একই উপবৃত্তের অঙ্গীভূত করা গেছে এবং তাদের মাঝখানে চিত্রকর কোন পূর্ণচ্ছেদ টানেননি, রেখেছেন একটি 'কমা'-চিহ্ন, স্তম্ভের রূপে। অপর পক্ষে 'B' ও 'C'-চিহ্নিত দৃশ্যদ্বয় একই স্থান-কালের নয়, এই দুটি দৃশ্যের মাঝখানে তাই অঙ্ক-সমাপ্তির যবনিকা টানতে হয়েছে তোরণের পূর্ণচ্ছেদে। অথচ ঐ তোরণ যতি-চিহ্নটি নাটকে প্রক্ষিপ্ত বা আরোপিত নয়—কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় অঙ্কের দুটি দৃশ্য—'D' ও 'E'-চিহ্নিত বৃত্তদ্বয় পুনরায় একটি উপবৃত্তের গর্ভে সংস্থাপিত। এই উপবৃত্তের নাভিদ্বয় বস্তুতঃ দৃশ্যদ্বয়ের দুই প্রধান চরিত্র—হিমাবলী পর্বতের সন্ন্যাসী ও মহাজনক। দ্বিতীয় অঙ্কের পর পটপরিবর্তনে স্থান-কালের পার্থক্য বোঝাতে পুনরায় এক প্রাচীর-রেখা। এলাম তৃতীয় অঙ্কের দুটি দৃশ্যে, হিমাবলী পর্বত থেকে রাজপ্রাসাদে আমরা ফিরে এলাম। তৃতীয় অঙ্কে পুনরায় একটি উপবৃত্ত 'F' ও 'G'-চিহ্নিত বৃত্তদ্বয়কে ধরে রেখেছে ;—না, এবার উপবৃত্ত নয়, এবার যেন মনে হচ্ছে F ও G দুটি চাকা—উপবৃত্তোপম একটি ফ্যান-বেল্টে যেন আটকানো। যেন, F-চিহ্নিত ছোট চাকাটি ঐ ফ্যান-বেল্টের সাহায্যে G-চিহ্নিত বড় চাকাটিকে ঘোরাতে চাইছে। বহিরঙ্গের এই রূপক কিন্তু কাহিনীর সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। F-চিহ্নিত ক্ষুদ্রতর বৃত্তে দেখছি মহাজনক-জননী তাঁর পুত্রবধূকে নির্দেশ দিচ্ছেন, কী-ভাবে মহাজনককে সংসারে আবদ্ধ করতে হবে, আর সীবলী নতজানু হয়ে শ্বশ্রূমাতার আদেশ শুনছেন। G-চিহ্নিত বৃত্তে দেখছি মহাজনক তাঁর ধর্মপত্নীকে সংসার-ত্যাগের সংকল্প জানাচ্ছেন। তৃতীয় অঙ্ক শেষে পুনরায় যবনিকা বা entracte—পূর্বদৃষ্ট প্রাসাদ-তোরণ। চতুর্থ অঙ্কে মহাজনক সংসার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন।

অজন্তার কাহিনী-চিত্রগুলির চিত্রনাট্যের এ-জাতীয় বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে কোনও দিকপাল চিত্র-সমালোচক করেছেন বলে জানি না। আমার বিশ্বাস, এ-বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণা করলে, অজন্তাচিত্রের অনেকগুলি নূতন রহস্য প্রতিভাত হবে। তাই এই প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনা করে দেখাই অজন্তা শিল্পী দর্শককে কী-ভাবে তাঁর কাহিনীর পথরেখা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষ্য করে দেখুন, প্রথম বৃত্তে (A-চিহ্নিত) সব কয়টি চরিত্র কেন্দ্রস্থ রাজারানীর দিকে তাকিয়ে আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম দৃশ্য শেষের মেয়েটি ; সে এবং বংশবাদিনীর নিচের দাসীটি (চিত্র—৬ দেখুন) তাকিয়ে আছে বিপরীত দিকে। ওরা দুজন দর্শককে কাহিনীর গতিপথের ইঙ্গিত দিচ্ছে—পৌঁছে দিচ্ছে পরবর্তী দৃশ্যে। অনুরূপভাবে C-চিহ্নিত বৃত্তের পর কাহিনী যে উপর দিকে যাবে তার ইঙ্গিত দিতে শিল্পী একটি রেখা এঁকেছেন—হস্তিপৃষ্ঠে মহাজনকের মেরুদণ্ড, দক্ষিণহস্ত ও ছত্রদণ্ড একটি সরল-রেখায় দর্শককে উপরের দিকে, D-চিহ্নিত বৃত্তের দিকে যেতে বলছে। ঐ D-চিহ্নিত বৃত্তে সন্ন্যাসীর পদমূলে যে হরিণটি আছে সেটি কাহিনীর সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। ঊর্ধ্বমুখ হরিণটি সন্ন্যাসীর মুখনিঃসৃত ধর্মবাণী শুনছে। সারনাথ মৃগদাবের একটা ব্যঞ্জনা সে ফুটিয়ে তুলছে ; কিন্তু ঐ সঙ্গে সে আঙ্গিকের দিক থেকে আরও

একটি উপকার করছে। তার ঊর্ধ্বমুখ ভঙ্গিটি যেন একটি তীর-চিহ্নের ফলা! দর্শককে সে কাহিনীর গতিপথ নির্দেশ করছে। একই ভাবে লক্ষ্য করুন E-চিহ্নিত বৃত্তের প্রতিটি কুশীলব তাকিয়ে আছে সন্ন্যাসীর দিকে ; একমাত্র ব্যতিক্রম বৃত্তের শেষপ্রান্তের লোকটি। সে কাহিনীর গতিমুখের দিকে ফিরে বসেছে। একই ভাবে H-চিহ্নিত বৃত্তের শেষপ্রান্তের ছেলেটি যদিও মহাজনকের দিকে ফিরে আছে (চিত্র—৭ দেখুন) তবু তার ডান হাতটি দর্শককে চিত্রনাট্যের গতিপথ দেখিয়ে দিচ্ছে। তার উপরে-আঁকা খঞ্জনীবাদকও একই ইঙ্গিত করছে।

আমরা যা আলোচনা করলাম তা যে কাকতালীয় নয়, গ্রন্থকারের উর্বর-মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা নয় তা প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র উপায় আরও দু-একটি উদাহরণ নিয়ে যাচাই করে দেখা। আসুন, এবার পূর্ণ অবদানের কাহিনী নিয়ে বিচার করি।

চিত্র—২২-এ আমরা পূর্ণ অবদানের একটি অংশ দেখেছি। এটি একটি দুই-অঙ্কের নাটক। নিচে প্রথম অঙ্ক, উপরে দ্বিতীয় ; এবং দুই অঙ্কের মাঝখানে একটি সুস্পষ্ট ছেদ রেখা। এখানে কাহিনীটি সমুদ্রযাত্রাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে—জলযাত্রাই এ নাটকের মূল ঘটনা। তাই শিল্পী দুটি অঙ্ককেই এক-একটি নৌকার আকারে সাজিয়েছেন। নিচেকার অঙ্কে বামপ্রান্তে যে দৃশ্যে বুদ্ধদেব ও পূর্ণকে দেখছি তার পর নৌকার পাল-এর এক যতিচিহ্ন,



চিত্র—৯৯ ॥ পূর্ণ অবদানে চিত্রনাট্যের ছন্দ।

ঐ পালের দড়িটি আমাদের পথনির্দেশ করছে পরবর্তী দৃশ্যের দিকে। কেন্দ্রস্থিত নৌকার দৃশ্যে প্রধান কুশীলব ভাবিলের ভাগ্য যে দুটি বিপরীতধর্মী আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঘূর্ণাবর্তে পড়েছে সে তথ্যটা শিল্পী জানিয়েছেন একটি সুপরিকল্পিত কায়দায়। নৌকার দাঁড় নির্দেশ করছে জলতলের যক্ষসৈন্যদের এবং নৌকার অলঙ্কৃত গলুইটি নির্দেশ করছে ভাবিলের

ত্রাণকর্তার দিকে--কাহিনী যেন এখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ক্লাইম্যাক্সের প্রতীক্ষা করছে। অনুরূপভাবে উপরের অঙ্কেও আমরা দেখছি মূলতঃ তিনটি গ্রুপ। সর্ববামের গ্রুপে চারটি চরিত্র, তারপর স্তম্ভের এক ছেদ রেখা। ঐ গ্রুপের তৃতীয় যে মেয়েটি অর্ঘ্যথালা বহন করে এনেছে তার মুখ ফেরানোর ভঙ্গিতে আমরা চলে আসি কেন্দ্রস্থ গ্রুপ-এ। এটি পূর্ণ ও ভাবিলের দল। সেটি ত্রিকোণাকৃতি। ইংরাজিতে একে বলে 'পিরামিড কম্পোজিশন'। পূর্ণের মস্তক এই ত্রিকোণের শীর্ষবিন্দু। তৃতীয় গ্রুপ একটি উপবৃত্ত। তার একপ্রান্তে পাঁচটি চরিত্র অপর প্রান্তে একা বুদ্ধদেব—তবু রঙে ও রেখায় এবং বলা বাহুল্য গুরুত্বে ভারসাম্য ঠিক মতই রক্ষিত হয়েছে।

নিচের প্যানেলটির কম্পোজিশনে মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এটি শ্রেণীগত ছান্দসিক কম্পোজিশন। এর মূল ছন্দ হচ্ছে নৌকাটি। লক্ষ্য করে দেখুন, বামদিক থেকে বুদ্ধদেব, পূর্ণ, নৌকার তলদেশের বক্ররেখা, দেবদূত ও উড্ডীয়মান পূর্ণ একটি অর্ধ-চন্দ্রাকার মালার আকারে সাজানো। যেন সেটিও একটি নৌকা। এটা মনশ্চক্ষে দেখতে পেলে এবার লক্ষ্য করে দেখুন, উপরের তিনটি খণ্ডদৃশ্যও অনুরূপ আর একটি নৌকা। শুধু তাই নয়, দুটি কল্পিত-নৌকাতেই বিভিন্ন গ্রুপগুলি একই ছন্দে সাজানো। এ তথ্যটা বুঝতে সুবিধা হবে যদি ঐ চিত্রের উপরে আমরা কল্পিত অর্নবপোতদ্বয়ের বহিরঙ্গ-রেখা আরোপিত করি (চিত্র—৯৯)। এখন দেখুন, প্রতিটি গ্রুপ কী-ভাবে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে! দুটি অঙ্কের সামঞ্জস্য-বিধানে কী সুচারু পরিকল্পনা—এমনকি শিল্পী নিচের নৌকার খাড়া চন্দন কাঠগুলিকে 'ব্যালেন্স' করতে উপরের খাড়া স্তম্ভ তিনটিকেও একই ছন্দে সাজিয়েছেন।

আপনি যদি এবারও আমার উর্বর-মস্তিষ্কের অভিযোগ তোলেন, তবে আমার পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের সবচেয়ে ভাল উপায় তৃতীয় একটি উদাহরণ পেশ করা। বেশ, তাই করছি :

দশম-চৈত্যে দেখা ষড়দন্ত জাতকের চিত্রটি নিয়ে আসুন বিচার করে দেখা যাক। এ চিত্রটির বিস্তারিত রূপ আমরা দেখেছি চিত্র—৩৭-এ। পূর্ণ অবদানে যেমন সমুদ্র-যাত্রাকে ঘিরে কাহিনীটি গড়ে উঠেছিল, এখানে তেমনি কাহিনীটি গড়ে উঠেছে জাতিস্বর ফুল্ল সুভদ্রার জন্মান্তরবাদ-তত্ত্বে। আমার তো মনে হয়েছে, অজন্তা শিল্পী তাঁর কম্পোজিশন-এর মাধ্যমে একটি তত্ত্বকথা শোনাতে চেয়েছেন : জন্মান্তরবাদ একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা! আমাদের খণ্ড-

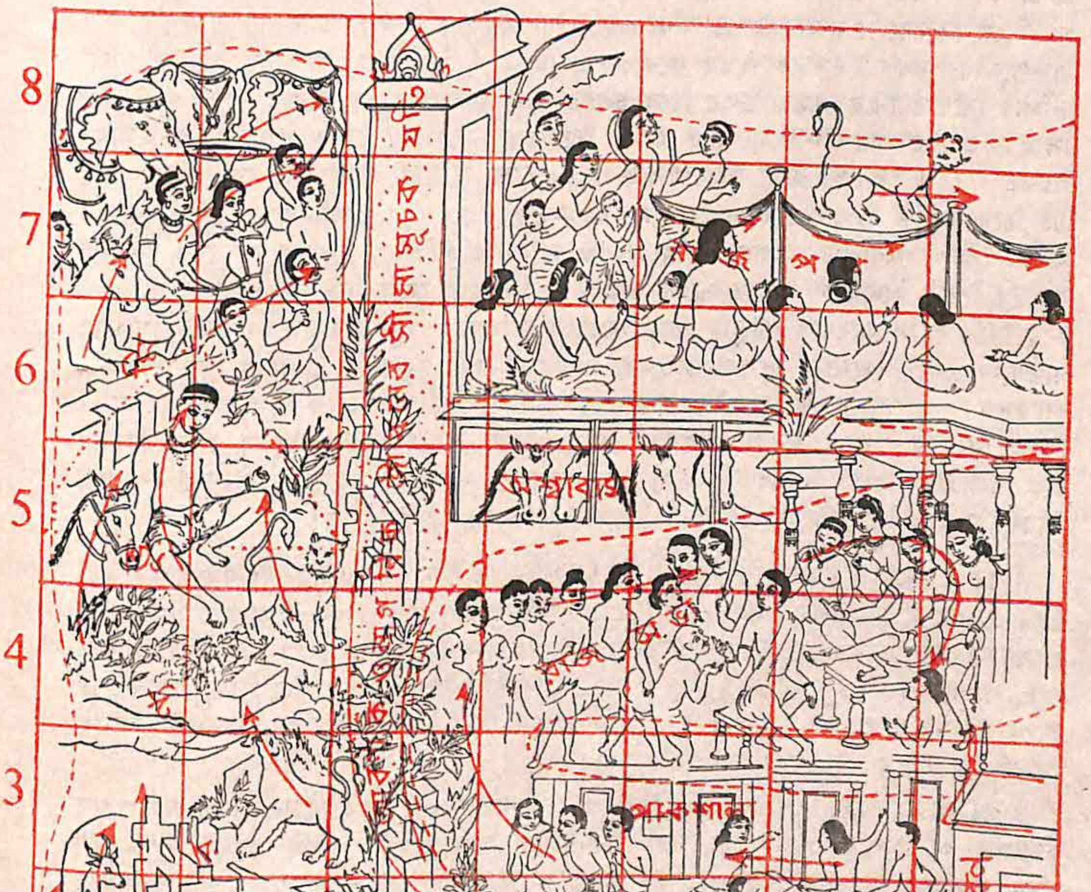


চিত্র—১০০॥ ষড়দন্ত জাতকে চিত্রনাট্যের ছন্দ।

জীবনের হাসি-অশ্রু আনন্দ-বিষাদ পরবর্তী জীবনে একই ছন্দে ফিরে ফিরে আসে। এই তত্ত্বটাই শিল্পী তাঁর তরঙ্গায়িত কম্পোজিশনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেব ছিলেন জাতিস্মর—পূর্ব-পূর্ব জীবনের ঘটনা তিনি ভুলে যাননি। কিন্তু সাধারণ মরমানুষ আমরা সে সত্যটা প্রণিধান করি না। যদি আমাদেরও সে দিব্য দৃষ্টি থাকত তাহলে আমরাও দেখতাম

একই নাটক এই দুনিয়ায় বারে বারে অভিনীত হচ্ছে ; নায়ক-নায়িকার প্রেম একটি শাশ্বত সত্য, চিরন্তন সত্য খল-নায়কের কপটতাও। শিল্পীর এই মেঘ-রৌদ্রের তত্ত্বগত বক্তব্য বুঝে নেওয়া সহজ হয় যদি আমরা ঐ চিত্রের উপর কতকগুলি কল্পিত তরঙ্গ-রেখা আরোপ করি (চিত্র—১০০)। এবার আমরাও বুদ্ধদেবের মত জাতিস্মর হয়ে উঠেছি!

এবারে দেখুন, প্রতিটি তরঙ্গের কেন্দ্রে আছে তারকা-চিহ্নিত মূল আকর্ষণ, যা-থেকে জ্যোতিচ্ছটা এঁকে অন্যান্য চরিত্রের প্রতি বিস্তারটা বোঝানো হয়েছে। প্রথম তরঙ্গের শীর্ষে



চিত্র—১০১॥ সুতসোম জাতকে চিত্রনাট্যের বিন্যাস।

দক্ষিণে দুটি, বামে একটি মুখ—সমতারক্ষা করে দ্বিতীয় তরঙ্গ-শীর্ষে বামে দুটি, দক্ষিণে একটি মুখ। প্রতিটি তরঙ্গের পাদদেশে একই পদসেবাকারী কিঙ্করী। এখন কি মনে হচ্ছে,

কম্পোজিশনের পৌনঃপুনিকতার মাধ্যমে শিল্পী জন্মান্তরবাদের একটা অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনার তির্যকপ্রকাশ করতে চেয়েছেন? অর্থাৎ এখানেও কাকতালীয় কিছু ঘটেনি?

অজন্তা চিত্রনাট্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার বিষয়ে আমরা আরও একটি উদাহরণ নিয়ে এবার দেখব। চিত্র—৫৫-তে সুতসোম জাতকের অনেকখানি আমরা একসঙ্গে এঁকে দেখিয়েছিলাম এবং কাহিনী যে সর্পিল গতিতে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে গিয়েছিল তা আলোচনা করেছিলাম। ঐ চিত্রের উপর এবার একটি গ্রাফ আরোপিত করে আমরা কাহিনীর গতিচ্ছন্দটা বুঝে নেবার চেষ্টা করব (চিত্র—১০১)। কাহিনীর সুরু G-1 খোপে। কাহিনী এগিয়ে চলে সুদাসের গতিমুখে, সৈন্যদলের মাথার উপরে-আঁকা একটি পাথরের প্রাচীর—যে পাষাণ-প্রাচীর উপরিস্থিত রাজপুরীর পরবর্তী দৃশ্যকে পৃথক করেছে। তারপর A-3-চিহ্নিত খোপে হরিণযূথের গ্রীবা-ভঙ্গির নির্দেশ নিয়ে আমরা উপর দিকে চলতে সুরু করলাম। সেখানকার প্রস্তর-খন্ড এবং সিংহীর গ্রীবাভঙ্গির (B-3) সঙ্কেতে আমরা নিদ্রাভিভূত সুদাসের দৃশ্যে এসে উপনীত হলাম। পরবর্তী দৃশ্যে দেখছি—রাজা উঠে বসেছেন। এদৃশ্যে সুদাসই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু—তাই এই ত্রিকোণাকৃতি 'পিরামিড-কম্পোজিশনে' রাজমস্তকই ত্রিকোণের শীর্ষবিন্দু। এরপর রাজার মাথার পিছনে অবস্থিত পাষাণ-প্রাচীর (A-6) কাহিনীর গতিমুখ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করছে। তাই অনায়াসে রাজার সঙ্গে আমবা শোভাযাত্রায় যোগ দিই, নগর-তোরণ অতিক্রম করে ফিরে আসি আরণ্যক পটভূমি থেকে নাগরিক জীবনে। পথ হারাবার ভয় নেই—সিংহীর গতিচ্ছন্দ এবং পথশোভা-বর্ধক ফেস্টুনই আমাদের পথ দেখাচ্ছে, দেখাচ্ছে সার-দিয়ে-বসা দর্শকদল। এ খন্ড-দৃশ্যে সিংহীই কেন্দ্রবিন্দু, তাই সকলেই তার দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। কিন্তু সিংহীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা চিত্র-সীমান্ত অতিক্রম করে গেলাম। তার প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী দৃশ্য যে পরবর্তী অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত—স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন হবে পরের দৃশ্যে, তাই ঐ বিরতির ব্যবস্থা। ইন্টারভ্যাল!

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য সুরু হচ্ছে G-3-চিহ্নিত খোপে। এবার দক্ষিণ থেকে আমরা বামে এগিয়ে যাব। এবার আমাদের গতিপথ একটি পাষাণ স্তম্ভে (C-3) ব্যাহত হবে, বাঁধে বাধাপ্রাপ্ত নদী যেভাবে বেঁকে যায়, সেইভাবে আমাদের গতিপথ মুখ ঘোরায়। ঐ স্থানে অঙ্কিত কিছু পত্রপল্লবও (C-3) আমাদের নির্দেশ দেয় : সেনাপতি কালাহাত্তির পিছু পিছু প্রজাবৃন্দের সঙ্গে রাজসভায় প্রবেশ করতে হবে। রাজা-প্রজার যুদ্ধ-দৃশ্য চিত্রের বাহিরে—সেই দিকেই চিত্র-ফ্রেমের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হই আমরা।

লক্ষ্য করে দেখুন, নাগরিক এবং আরণ্যক জীবনকে শিল্পী কী সুচারু ভঙ্গিমায় পৃথক করেছেন, কী অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে চিত্রনাট্যকে সাজিয়েছেন। তাই, অনেক পূর্বসুরী যদিচ বলেছেন যে, অজন্তার কাহিনী চিত্রগুলি এলোমেলোভাবে সাজানো, আমরা কিন্তু সে-কথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারছি না। আমাদের মনে হচ্ছে, এ কাহিনীর রসগ্রহণে আমরা ঠিকমত শিক্ষিত নই বলেই ও-কথা মনে করি। অজন্তা-শিল্পের আঙ্গিকটা বুঝে নিতে পারলে এ নাটক মোটেই দুর্বোধ্য মনে হবে না।

একক-চিত্র ও কাহিনী-চিত্রের অঙ্কন-রীতি ও কম্পোজিশন নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি, এবার তৃতীয় জাতের ছবি—নক্শার প্রসঙ্গে আসতে হয়। অজন্তার এই নক্শা বা অলঙ্করণ-চিত্র হচ্ছে তার প্রাণের বস্তু। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আখ্যান-চিত্রে কাহিনীই মৌল, চিত্র গৌণ। কাহিনীর প্রয়োজনেই চিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাহিনী শাস্ত্র-সম্মত ও পূর্ব-নির্ধারিত। শিল্পের প্রয়োজনে কাহিনীর সামান্য রকমফের হতে পারে, অদল-বদল হতে পারে না। ফলে, চিত্রই কাহিনীর অনুগ। তাছাড়া, শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য দর্শকের মনে ধর্মের অনুশাসন ও ভাব জাগিয়ে তোলা—তাই 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এ বাণী সেখানে অচল। তবু দেখছি, কাহিনী কোথাও চিত্রশিল্পের ভার হয়নি—হয়েছে বাহক, হয়েছে সাথী।

শব্দ বা বাণী যেমন রবীন্দ্রসংগীতের সুরের ভার বা বোঝা নয়, তার প্রাণ। কিন্তু এই নক্‌শা-গুলিতে কোন কাহিনী নেই, সেখানে কোন বাণী বা কথা নেই—তা যেন শুধু সা-রে-গা-মা সাঙ্কেতিক-ধ্বনির সাহায্যে ধ্রুপদী-সংগতের আলাপ। সেই সা-রে-গা-মা এখানে হচ্ছে রেখা আর রঙ। রেখার কড়ি ও কোমলে, রঙের মীড় ও মূর্ছনায় শিল্পী যেন চিত্রের আসরে রাগপ্রধান সুরের আলাপ করছেন এই নক্‌শা-গুলিতে।

নক্‌শা বা অলঙ্করণ-চিত্র

কিন্তু ধ্রুপদী-সংগীত নয়, আমরা এই নক্‌শাগুলির সঙ্গে ইতিপূর্বেই তুলনা করেছি রবীন্দ্রসংগীতের! গীতবিতানের সহস্র সংগীত যেমন সহস্র ভাবের দ্যোতক, এই অলঙ্করণের নক্‌শাগুলিও তেমনি সহস্র ভাবের ব্যঞ্জক। তাতে কখনও রুদ্র রস, কখনও বীভৎস রস, আবার কখনও বা হাস্য রস, করুণ রস। এই অলঙ্করণ-নক্‌শায় আছে আম-আতা-আঙ্গুর-আনারসের 'নৈবেদ্য', আছে পদ্ম-চাঁপা-চন্দ্রমুখী-চামেলীর 'গীতিমাল্য', আছে রঙ ও রেখার 'গীতাঞ্জলি'। এত বিচিত্র ভঙ্গি, বিচিত্র ভাব, এত রেখার কারিগরি এই নক্‌শাগুলিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যই কি কম? হাতী, ঘোড়া, মহিষ, ধাবমান হরিণ, হনুমান, কাকাতুয়া, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, বানর, বাঘ, সাপ—কী নেই? আবার উদ্ভট কিম্ভুত নাগ, কিন্নর, কৃষ্ণনগরী পটুয়ার আল্লাদী-পেল্লাদী, আজগুবি জন্তুও আছে। বিষয়-বস্তু ছাড়াই শুধুমাত্র রঙ ও রেখার আলপনাও আছে। ফল-ফুল-লতা-পাতার বৈচিত্র্যই কী কম? পদ্মফুলই বা কত রকম। শাড়ির পাড়ের মত নক্‌শা আছে, লক্ষ্মীপূজার আল্‌পনার মত গোলাকৃতি নক্‌শা আছে, আবার ছোট ছোট চৌখুপিতে ছোট ছোট বিষয়-বস্তুও আছে।

দুটি কথা বলব। প্রথমতঃ, অলঙ্করণের মৌলিকতা। আলপনা-নক্‌শার মর্মকথা হচ্ছে কতকগুলি রেখা ও রঙ একই ভাবে বারে বারে ফিরে ফিরে আসবে। যাতে সবটা মিলিয়ে একটা সুষম ছন্দে নক্‌শার রূপ নেয়। মুঘলযুগের চিত্রে যা জাফরির কাজে, রাজপুত চিত্রে ও 'ফাঁদগ্রন্থী'তে আমরা এ সত্যকে বারে বারে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু অজন্তা এ-বিষয়ে এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। প্রত্যেকটি নক্‌শাই নূতন ও মৌলিক। কেউ কারও নকল নয়। আগেই বলেছি, দ্বিতীয় গুহার সিলিঙে একটি গোলাকৃতি নক্‌শায় তেইশটি হাঁসের একটি আলপনা আছে (২।৫)। সেখানে প্রত্যেকটি হাঁসের ভঙ্গি মৌলিক ও বিশিষ্ট। অলঙ্করণ-শিল্পে এটা নূতন কথা। এর কারণ হিসাবে বলতে পারি, অজন্তার চিত্রকর হচ্ছেন জাতশিল্পী ; প্রত্যেকটি মুহূর্তেই তিনি নূতন সৃষ্টির উন্মাদনায় আত্মহারা।

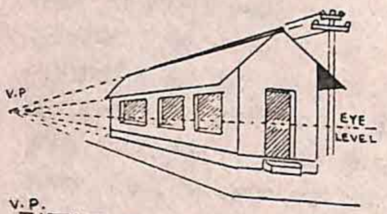
দ্বিতীয় কথা, শিল্পী এই সব নক্‌শা যা-কিছু এঁকেছেন, তার ভিতর তাঁর শ্রদ্ধানম্র হৃদয়ের পরিচয় পাই। বিশ্ব-সৃষ্টির অসীম বৈচিত্র্যকে তিনি রঙ ও রেখায় ধরতে চেয়েছেন, ছোট ছোট চৌখুপিতে ; কিন্তু প্রতিটি বিষয়-বস্তুর প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা, দরদ আর সংবেদনা বর্তমান। ইউরোপীয় চিত্রকরের মত বাস্তবের হুবহু নকল করার দিকে তাঁর ঝোঁক নেই—কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুর প্রাণসত্তাটিকে তিনি সযত্নে বিকশিত করে তুলেছেন। গাছ-ফল-পাখী-পশু বাস্তবানুগ হল কিনা এ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই—কিন্তু সেগুলি যে এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শময় জগৎ-প্রপঞ্চে ভীষণ ও সুন্দরের বিচিত্র প্রকাশ, এ-কথা শিল্পী কখনও ভোলেননি। 'একবর্ণা' যেন 'বহুধা' হয়েছেন। পদ্মফুল যখন এঁকেছেন তখন তা বলতে পেরেছে—'এই দেখ অভিজ্ঞান, আমি সেই সুন্দরের দূত!' 'স্বাভাবিক পদ্মকে পৃথিবীতে যদি কেউ হার মানিয়ে থাকে, তবে তা অজন্তার ছবি। শিল্পী যেন সারা বিশ্বকে জড়িয়ে ধরতে চান, জাপটে ধরতে চান!'

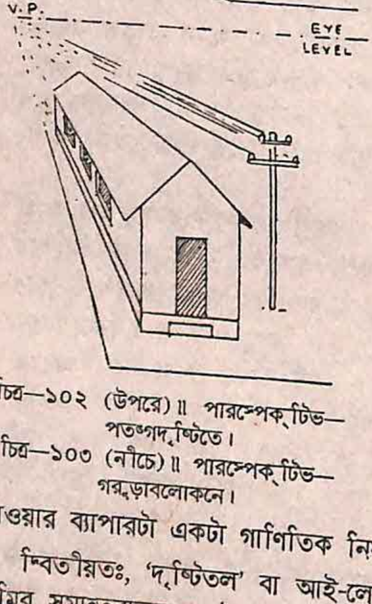
অজন্তার অসংখ্য প্রাচীরে, অযুত স্তম্ভে ও সিলিঙে যে লক্ষাধিক নক্‌শা আছে, দু-চারটি নমুনাচিত্র এঁকে তার পরিচয় দিতে যাওয়া হবে ধৃষ্টতা। এ গ্রন্থে পরিচ্ছেদের সমাপ্তিসূচক ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যাবতীয় নক্‌শা বা আলপনা অজন্তা-গুহা থেকে অনুকৃত।

অজন্তা-চিত্রের বিন্যাস বা কম্পোজিশন, যতিচিহ্ন বা পাঙ্চুয়েশান এবং ব্যাকরণ নিয়ে আমরা মোটামুটি আলোচনা করেছি। চিত্র-রীতির আর একটি বিশেষ দিকের কথা আলোচনা না করলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হচ্ছে অজন্তা-চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের (পারস্পেক্‌টিভের) সংজ্ঞা এবং তার প্রচলিত ধারা। বিষয়টা বুঝতে হলে পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেক্‌টিভ কাকে বলে, তা আগে জেনে নিতে হবে :

অজন্তা-চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত

জগতে আমরা যা-কিছু দেখি, তার তিনটি মাত্রা বা ডাইমেনশান,—লম্বা, চওড়া ও খাড়াই। এই ত্রিমাত্রিক বিষয়-বস্তুকে আমরা যখন দ্বিমাত্রিক কাগজে ছবি এঁকে দেখাই, তখন চিত্রকরকে একটা কৌশল করতে হয়, যাতে ছবিটা অবাস্তব বলে না মনে হয়। এই কৌশলটির মূলে আছে দুটি জিনিস—'বিলীয়মান বিন্দু' (ভ্যানিশিং পয়েন্টস্‌) এবং 'দৃষ্টিতল' (আই-লেভেল)। এবার এ-দুটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।





চিত্র—১০২ (উপরে) ॥ পারস্পেক্‌টিভ—পতঙ্গদৃষ্টিতে।
চিত্র—১০৩ (নীচে) ॥ পারস্পেক্‌টিভ—গরুড়াবলোকনে।

আমরা যখন একটি রেললাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লাইন-জোড়ার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই সমান্তরাল রেলের লাইন দুটি যেন দিগন্ত রেখার দিকে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। তেমনি কোন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হয়, টেলিগ্রাফের তার, গাছ বা বাড়ীগুলি যেন ক্রমশঃ দূরে যেতে যেতে আকারে ছোট হয়ে গেছে—যেন সব সমান্তরাল রেখাই দিগন্তের একটি বিন্দুর দিকে মিলিত হতে চাইছে। এই বিন্দুকেই বলি বিলীয়মান বিন্দু। ছবি আঁকবার সময় ঐ কথাটি মনে রেখে আমরা যদি কাছের জিনিস বড় ও দূরের জিনিস ক্রমশঃ ছোট করে আঁকি, তবে সেটা বাস্তবানুগ হয়, ছবিতে গভীরতাবোধ দেখা দেয়। এই ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একটা গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে।

দ্বিতীয়তঃ, 'দৃষ্টিতল' বা আই-লেভেল। প্রথমে ছবির উপর কল্পিত একটি সরলরেখা জমির সমান্তরালভাবে টানা হয়। দু-পাশের দুটি বিলীয়মান বিন্দু এই সরলরেখায় এসে মেশে। এই কল্পিত সরলরেখাটি ছবির নিচেকার দিক থেকে ক্রমশঃ উপরের দিকে তুলে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে (এ্যাঙ্গেল অব ভিশানকে) 'পতঙ্গদৃষ্টি' (ওয়ার্মস্‌ আই-ভিয়ু) থেকে ক্রমশঃ গরুড়াবলোকনের (বার্ডস্‌ আই-ভিয়ু) দিকে নিয়ে যেতে পারি। চিত্র—১০২ এবং চিত্র—১০৩-এ এটাকেই বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে।

বিলীয়মান বিন্দুর সংস্থাপন ও দৃষ্টিতলের নির্বাচন বস্তুতঃ গাণিতিক ছকে বাঁধা। এই গণিত-সূত্রগুলি রেনেসাঁস যুগের পূর্ববর্তী ইউরোপীয় চিত্রকররা জানতেন না। এই আইন-গুলি ইউরোপখণ্ডে প্রথম আবিষ্কার করেন ফিলিপ্পো ব্র্যানেলেশ্চি (Filippo Brunelleschi, 1377—1448 A. D.)। পরে লিওনার্দো, ডুরার্‌ প্রভৃতি চিত্রবিশারদরা আইনগুলি ঠিকমত বিধিবন্ধ করেন। তার পূর্বে ইউরোপীয় চিত্রে গভীরতাবোধ ছিল না। মিশর এবং চীনের প্রাচীন চিত্রকররা এই পরিপ্রেক্ষিতের কথা জানতেন না। মিশরীয় চিত্রকররা দূরের মানুষকে উপরের সারিতে আঁকতেন, মাপে তাদের ছোট করতেন না।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকররা সম্ভবতঃ পরিপ্রেক্ষিতের এই মূলসূত্রগুলি জানতেন, কিন্তু সব

সময়ে মেনে চলতেন না। কোন কোন সময়ে তাঁরা উল্টো-পরিপ্রেক্ষিতের আশ্রয় নিতেন। অর্থাৎ, দূরের জিনিসই বড় করে আঁকা হত, কাছের জিনিস ছোট করে। এই প্রাচ্য পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে চৌকি বা পালঙ্কের যে ধারটি আমাদের থেকে সবচেয়ে দূরে সেটিই ছবিতে সবচেয়ে চওড়া দেখানো হত, যে ধারটি সবচেয়ে কাছে সেটাই হবে সবচেয়ে সরু। বলা বাহুল্য, এটা বাস্তবের উল্টো। ধরা যাক, চিত্র—৬-এ নর্তকী দলের পিছনে বাড়ীটি। চৌকা ছাদের যে পাঁচিলটা আমাদের কাছে সেটাই মাপে ছোট, যে পাঁচিলটা দূরে সেটাই আকারে বড়। প্যারাপেটের সমান্তরাল রেখাটি বিলীয়মান বিন্দুর দিকে দূরে গিয়ে মেশেনি—দর্শকের দিকে যেন এসে মিশতে চায়। পরিপ্রেক্ষিতের সংজ্ঞা অনুযায়ী এ-কে ত্রুটি ছাড়া আর কি বলা যাবে?

এই আপাত-অসঙ্গতির সমাধান হিসাবে আমরা তিনটি যুক্তি দাখিল করতে পারি। এক, ধরে নিতে পারি অজন্তা-শিল্পী পরিপ্রেক্ষিতের আইন-কানুন জানতেন না। দুই, ধরে নেওয়া যায়, অজন্তা-শিল্পী এটা জানতেন কিন্তু খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন না। তিন, শিল্পী সজ্ঞানে এই আপাত-বিকৃতি ঘটিয়েছেন বিশেষ কোন কারণে।

প্রথম প্রস্তাবটাকে আমরা সরাসরি পরিত্যাগ করতে পারি। চিত্রশিল্পের অন্যান্য বিষয়ে যাঁরা অদ্ভুত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, পরিপ্রেক্ষিত-সম্বন্ধে তাঁদের এই প্রাথমিক ধারণা ছিল না—এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া, অসংখ্য ক্ষেত্রে তাঁরা পরিপ্রেক্ষিতের বিজ্ঞান-সম্মত নির্ভুল প্রয়োগ করেছেন। না জেনে তাঁরা তা কেমন করে করবেন? দ্বিতীয় প্রস্তাবটাও ঐ একই কারণে বাতিল করতে হচ্ছে। চিত্রের ষড়ঙ্গ-সম্বন্ধে যাঁরা এত বেশী যত্নশীল, যাঁদের হাতের কাজ একেবারে নিখুঁত, তাঁরা পরিপ্রেক্ষিত বিষয়েই বা কেন অযথা এমন অসাবধানী হবেন?

প্রশ্ন হতে পারে, তবে জেনেশুনেই বা তাঁরা এ ভুল করলেন কেন?

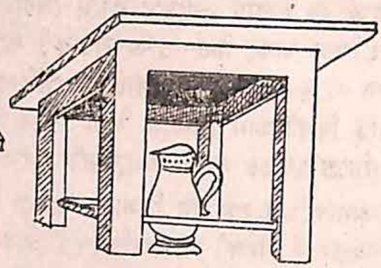
তার প্রতিপ্রশ্ন হিসাবে আমি বলব, জেনেশুনে কি প্রচলিত রীতিকে যুগে যুগে শিল্পী লঙ্ঘন করেননি? পোলকের 'এ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশানিস্‌ম্‌' অথবা পল সেজানের 'পোস্ট-ইম্প্রেশানিস্‌ম্‌' যদি আজ থেকে হাজার বছর পরে কোন চিত্র-সমালোচকের নজরে পড়ে, তবে সে-ও তো বলবে পোলক ও সেজান পরিপ্রেক্ষিত-সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। শিল্পী যামিনী রায়কে হাজার বছর পরে কোন চিত্র-সমালোচক তো অনায়াসে মিশরীয় চিত্রকরদের সমকালীন বলে মনে করতে পারেন, যেহেতু যামিনী রায়ের চিত্রে সামনে-ফেরা মুখে পাশ-থেকে-দেখা চোখ আঁকতে দেখেছি! ষোড়শ শতাব্দীর চিত্রকর পারমিগিয়ানিনো (Francesco Parmigianino) যে দীর্ঘগ্রীবা ম্যাডোনার চিত্রটি এঁকেছিলেন 'ম্যানারিস্‌ম্‌'-এর খাতিরে, সেটি দেখেও তো আমরা বলতে পারি, চিত্রকর স্ত্রীলোকের গ্রীবা কত লম্বা হয়—এ সামান্য কথাটিও জানতেন না। গত শতাব্দীর 'ইম্প্রেশানিস্ট' এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে 'ডাডাইস্ট' ও 'সাররিয়ালিস্ট' চিত্রকররা জ্ঞানসারে প্রচলিত চিত্র-রীতিকে যে কত ভাবে পরিবর্তিত করেছেন, তা তো আমরা চোখের উপরেই দেখেছি। আধুনিক চিত্র-রীতিতে তো পরিপ্রেক্ষিত একেবারেই অপাংক্তেয়। তার মানে কি এঁরা কেউ পরিপ্রেক্ষিতের প্রচলিত রীতি সম্বন্ধে অবহিত নন? একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

মনে করা যাক, চিত্রকর দেখাতে চান একটি টেবিলের উপর একটি প্লেট রাখা আছে, যাতে সুন্দর নক্‌শা-কাটা, আর দেখাতে চান যে, টেবিলের নিচে রাখা আছে, একটি ফুলদানি। 'দৃষ্টিতল' গরুড়াবলোকনের দিকে নিয়ে গেলে (চিত্র—১০৬) প্লেটের নক্‌শাটা দেখানো যায়, কিন্তু ফুলদানিটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। অপরপক্ষে, দৃষ্টিতল নামিয়ে এনে যদি 'পতঙ্গদৃষ্টি'তে ছবিটা আঁকতে বসি, তখন ফুলদানিটা স্পষ্ট হয় বটে, প্লেটটা হারিয়ে যায় (চিত্র—১০৫)। এবার যদি দৃষ্টিটা ছবির তলের মাঝামাঝি রাখি, তাহলে দেখছি, ফুলদানি ও প্লেট দুটোই মোটামুটিভাবে দেখা যাচ্ছে; কিন্তু প্লেটের নক্‌শাগুলি ভালভাবে আঁকা যাচ্ছে না (চিত্র—১০৪)।

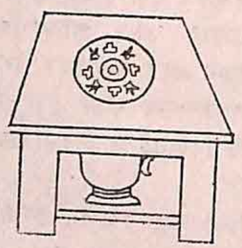
এবার যদি পরিপ্রেক্ষিতের প্রচলিত পাশ্চাত্য সংজ্ঞাকে বিসর্জন দিয়ে প্রাচ্য রীতিতে ছবিখানি আঁকতে বসি? তাহলে দেখছি (চিত্র—১০৭) ফুলদানি এবং প্লেটের নক্‌শাকে একই চিত্রে আঁকা সম্ভব হচ্ছে, যদি ছবিটা আলোকচিত্রের মত বাস্তবানুগ মনে হচ্ছে না।



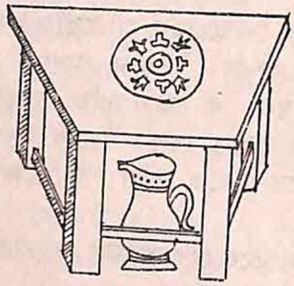
চিত্র—১০৪ ॥ প্লেট ও ফুলদানি—সাধারণ দৃষ্টিতে।



চিত্র—১০৫ ॥ প্লেট ও ফুলদানি—পতঙ্গদৃষ্টিতে।



চিত্র—১০৬ ॥ প্লেট ও ফুলদানি—গরুড়াবলোকনে।



চিত্র—১০৭ ॥ প্লেট ও ফুলদানি—প্রাচ্য পরিপ্রেক্ষিতে।

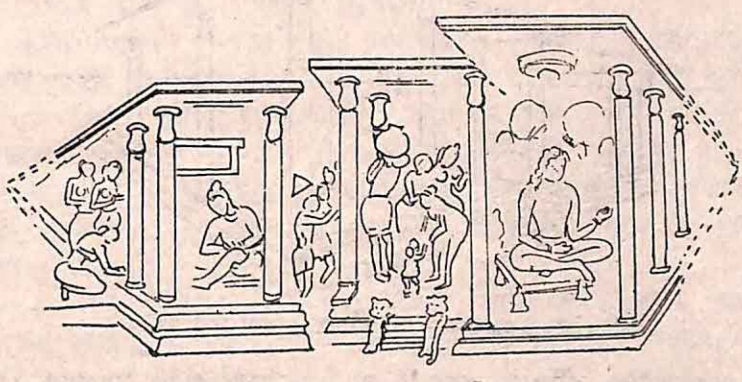
প্রায় এই জাতীয় সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়েছিল অজন্তার চিত্রকরকে বারে বারে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এজন্যই তিনি এ-সব স্থলে প্রাচ্য-পরিপ্রেক্ষিতের নূতন ধারায় কোন কোন চিত্র এঁকেছেন। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক :

অজন্তা-চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত-সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-সমালোচক শ্রীমতী জাঁ ওবোআইয়ে* যে উদাহরণটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, আমরা সেটিকেই মান হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। চিত্রটিতে পাশাপাশি তিনটি সভামণ্ডপ আছে। এটির অবস্থান ১।৭ এবং ১।২২। সর্বদক্ষিণে মহাজনকের (?) অভিষেক-স্নানের দৃশ্য ; মাঝের মণ্ডপে সীবলীকে (?) স্নান করানো হচ্ছে এবং সর্ববামের মণ্ডপে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে কয়েকটি স্ত্রীলোক অর্ঘ্য দান করছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মণ্ডপের মাঝখানে, পথে কয়েকজন ভিক্ষু (অভিষেক-) দান গ্রহণ করছে। অজন্তা-শিল্পী বিষয়-বস্তুটা যেভাবে এঁকেছেন, তার চুম্বক চিত্র এখানে চিত্র—১০৮-এ দেওয়া গেল। লিওনার্দো-নির্দেশিত পাশ্চাত্য-পরিপ্রেক্ষিত মেনে আঁকলে এবং সর্বদক্ষিণের মণ্ডপের সামনে থেকে আঁকলে মণ্ডপ তিনটিকে চিত্র—১০৯-এর মত দেখাবে।

নিঃসন্দেহে চিত্র—১০৬ অনেক বেশী বাস্তবানুগ,—ফটোগ্রাফিক! চিত্র—১০৫-এ 'দৃষ্টিতল' বদলে গেছে, আর বিলীয়মান বিন্দু তো বারে বারে স্থান বদলেছে। শ্রীমতী ওবোআইয়ে বলছেন—"এই বিভ্রমটি ঘটেছে তার কারণ শিল্পী সত্যিকারের কোন বাড়ী দেখে আঁকেননি বা নকল করেননি। বাড়ীর রূপটি মানসচক্ষে দেখে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।"

* "Composition & Perspective at Ajanta"; Art and Letters, India & Pakistan, Vol. 22, No. 1, London, 1948—by Jeanne Auboyer.

আমার মনে হয়েছে, কারণটা তা নয়। শিল্পী সজ্ঞানে সম্মুখ-চিত্র বা মণ্ডপত্রয়ের ফাসাদ আঁকবার সময় জমির সমান্তরাল রেখাগুলিকে বিলীয়মান বিন্দুর দিকে তেরছা করে আঁকেননি। কেন আঁকেননি, তা উপলব্ধি করা যায় চিত্রের মূল বিষয়-বস্তুর কথা চিন্তা করলে। শিল্পী তিনটি দৃশ্য একত্রে আঁকতে চেয়েছেন। ফলে, পারস্পেক্টিভের ব্যাকরণ মানতে গিয়ে তিনি মণ্ডপ-ফাসাদের বিস্তার কমাতে রাজী নন। এমন কি সর্ববামের মণ্ডপের কাছে গিয়ে তিনি সচ্ছন্দে বিলীয়মান বিন্দুটিকে উল্টো দিকে সরিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ, চিত্রকর যেন স্থির নন, এক-একটি স্থান থেকে যেন এক-একটি মণ্ডপ তিনি এঁকেছেন। দর্শক যেন



চিত্র—১০৮ ॥ প্রাচ্য-পরিপ্রেক্ষিতের রীতি অনুসারে আঁকা মণ্ডপত্রয়, অবস্থান—১।২২ ও ১।৭।

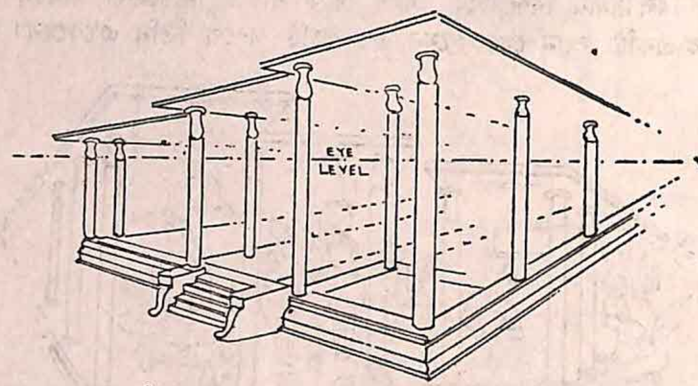
চিত্রের রাজ্যে প্রবেশ করে ঘুরে ঘুরে মণ্ডপগুলিকে দেখতে পাচ্ছেন। না হলে গলিপথে-দাঁড়ানো ভিক্ষুদের আঁকা যাবে কেমন করে? বৌদ্ধ ভিক্ষুর চরণে অর্ঘ্যদানকারী মহিলাবৃন্দের সঙ্গেই বা দর্শকদের কেমন করে পরিচয় করিয়ে দেবেন চিত্রকর? আজকের চলচ্চিত্রের ভাষায় বলতে পারি, ঐ মণ্ডপত্রয়ের বিভিন্ন ঘটনা একই সিকোয়েন্সের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সেটিকে রূপায়িত করতে অজন্তা-শিল্পের ক্যামেরাম্যান তিন তিনবার তাঁর ক্যামেরার স্থান বদলেছেন, তিনটি বিভিন্ন সট নিতে।

ব্যাকরণ কি? প্রচলিত সাহিত্য-রীতির সঙ্কলিত মূলসূত্র বৈ তো নয়? কিন্তু ব্যাকরণ সাহিত্যের অনুগ, তার পদাঙ্ক অনুসারী। স্রষ্টা যখন সৃষ্টির তাগিদে ব্যাকরণ-বহির্ভূত কোন শব্দ বা বাক্য রচনা করেন, তখন বৈয়াকরণিক সবিনয়ে তা মেনে নিয়ে বলেন—এ হল 'আর্ষ প্রয়োগ'। অঙ্কন-রীতিও প্রয়োজনের তাগিদে বদলাতে পারে। আর্কিটেক্ট যখন বাড়ীর পরিপ্রেক্ষিত আঁকেন, তখন তিনি বিলীয়মান বিন্দুর বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি সহ্য করেন না। কিন্তু বাস্তুকার যখন তাঁর বাড়ীর 'এলিভেশান' বা 'সাইড-ভিয়ু' আঁকেন, তখন বিলীয়মান বিন্দু বিলীন হয়ে যায়। চিত্রকর যদি তখন এসে বলেন—ওহে বাপু বাস্তুকার, তোমার এ ছবি লিওনার্দো-নির্দেশিত সূত্র হিসাবে আগাগোড়া ভুলে ভরা। কোথায় তোমার আই-লেভেল? কোথায় ভ্যানিশিং পয়েন্ট? বাস্তুকার তখন তার জবাবে বলবেন—মশাই, এ হল সাঙ্কেতিক চিত্র, বিশেষ জাতের চিত্র। বাস্তব জগতে এ-চিত্র একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন করবার প্রয়োজনে আঁকা হয়েছে, তাই এর ব্যাকরণও পৃথক।

অজন্তার শিল্পীও ঠিক ঐ কথাই বলবেন। এখানে কোন 'বিভ্রম' বা anomaly নেই। এ-চিত্রটিও একটি বিশেষ প্রয়োজনে আঁকা হয়েছে। তাঁর চিত্র এখানে তিনটি ঘটনাকে একই চিত্রের পরিসরে দেখাতে চায়! ভক্তি ও ভাবরসের আবেদনই এখানে মুখ্য, চিত্রের ব্যাকরণ-সূত্র গৌণ। শিল্পের প্রয়োজনে তাই শিল্পী নূতন ব্যাকরণ-সূত্র নির্দেশ করতে চান। সে সূত্র এই : মণ্ডপ তিনটির সামনের দিক বা ফাসাদ আঁকবার সময় নিছক 'এলিভেশান' আঁকা হবে,

তখন বিলীয়মান বিন্দু অপাংক্তেয় এবং পাশ আঁকবার সময় বিষয়-বস্তুর প্রয়োজনে বিলীয়মান বিন্দু ইচ্ছানুসারে সরানো যাবে।

এই নূতন সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে বলেই একই চিত্রে তিনটি মণ্ডপে তিনটি দৃশ্য এবং গলিপথে আরও একটি দৃশ্য আঁকা সম্ভবপর হয়েছে। লিওনার্দো-নির্দেশিত পন্থায় চিত্র—১০৬-এর সঙ্কুচিত পরিসরে এই বিষয়-বস্তুগুলি একত্রে আঁকা অসম্ভব।



চিত্র—১০৯॥ পাশ্চাত্য রীতিতে আঁকা মণ্ডপত্রয়।

প্রাচ্য-পারস্পেক্‌টিভ রীতিতে কর্ণরেখা বা ডায়াগোনাল-গুলি দৃশ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে আমাদের চোখে এসে মেশে। অর্থাৎ, চৌকির যে প্রান্তটা আমাদের কাছে আছে, সেটাকেই আমরা ছোট দেখি, দূরের প্রান্তটা বড় দেখি। এ-জাতীয় পরিকল্পনা অজন্তায় অনেক স্থানে দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, শিল্পী অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পের প্রয়োজনেই এ রীতি অনুসরণ করেছেন—নিছক রীতি মেনে চলার জন্য নয়। যেমন ধরা যাক, বিধুর পণ্ডিত জাতকে যেখানে পূণ্যক ও ইন্দ্রপ্রস্থরাজ পাশা খেলছেন, সেখানে পাশার মেজটিকে প্রাচ্য রীতিতে আঁকা হয়েছে (চিত্র—২৩)। তার জন্য পাশার ছকটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন শিল্পী উপর থেকে পাশার ছকের প্ল্যান এঁকেছেন, অথবা বলা যায়, পাশার ছকটা যেন টেবিল থেকে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। এটি কেন করেছেন শিল্পী? করেছেন এজন্য যে, ঐ পাশার ছকটিই এই খণ্ডদৃশ্যে সবচেয়ে জরুরী জিনিস, তাই কাহিনী-চিত্রের প্রয়োজনের দিক থেকে পাশার ছকটিকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে। এ দৃশ্যে কাহিনীটি তখন ঐ পাশার ছকের পাকে পাকে ফিরছে। পাশ্চাত্য-পরিপ্রেক্ষিতের আইন অনুসারে আঁকতে গিয়ে ঐ অক্ষক্রীড়ার ছককে শিল্পী ছোট করে দেখাতে রাজী নন। তাই এ প্রাচ্য রীতির অনুসরণ।

আরও ভাল একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়। বাস্তবে চিত্রটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এর রসোপলব্ধি করতে হলে গ্রিফিথ সাহেবের দুষ্প্রাপ্য মূল গ্রন্থটি আপনাকে দেখতে হবে (চিত্র—৪০)।

চিত্রের বিষয়-বস্তু—যশোধরা ও রাহুলকে শয্যায় রেখে বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করছেন। সেখানে শিল্পী দেখাতে চান পালঙ্কের উপর যশোধরা শায়িতা এবং দেখাতে চান পালঙ্কের নিচে কিছু তৈজসপত্র। পাশ্চাত্য রীতিতে আই-লেভেল উঁচুতে ধরে, গরুড়াবলোকন করে শিল্পী দেখেছেন নিদ্রামগ্না গোপাকে আঁকতে অসুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পালঙ্কের নিচে তৈজসপত্র। কিন্তু শিল্পী তাতে রাজী নন ; কারণ, ঐ তৈজসপত্রের মধ্যে দুটি জিনিস যে তাঁকে আঁকতেই হবে। একটি ছিন্নতার বাদ্যযন্ত্র এবং একটি নির্বাপিত-দীপ দীপাকার! এ দুটি তো সামান্য তৈজসপত্র নয়, এ যে তাঁর চিত্রের আবশ্যিক অঙ্গ। ঐ নির্বাপিত-শিখা দীপাধারটি যে এ চিত্রের অন্তর্গূঢ় বেদনার মূর্ত প্রতীক! ঐ ছিন্নতার বীণাটি যে সুপ্রবুদ্ধ-তনয়া যশোধরার ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী দাম্পত্য জীবনের অবসানের দ্যোতক। ও দুটি চাই।

শিল্পী পাশ্চাত্য রীতিতে আই-লেভেল নামিয়ে এনে দেখেছেন—ও দুটিকে আঁকা যাচ্ছে বটে, কিন্তু নিদ্রাভিভূতা মন্দভাগিনী যশোধরার দেহটি ছোট হয়ে যায়, সঙ্কুচিত হয়ে যায়। শিল্পী এ-দুটি বিষয়-বস্তুর কোনটিকেই খাটো করতে রাজী নন ; ফলে, ত্যাগ করলেন ঐ নিষ্ঠুর পঙ্গু পাশ্চাত্য-পারস্পেক্‌টিভের ব্যাকরণ-সূত্রকে। প্রাচ্য রীতিতে ছবিটি আঁকলেন তিনি। বিলীয়মান বিন্দু দুটিকে সরিয়ে আনলেন দূর দিগন্ত রেখা থেকে সম্মুখের দিকে, দর্শকের দিকে। এইবারে পালঙ্কের উপরে নিদ্রিতা যশোধরা এবং নিচে নির্বাপিত-শিখা দীপাধার ও ছিন্নতার বীণাকে একই দৃশ্যপটে আঁকা গেল!

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল যেন শিল্পীর এতক্ষণে!

এ পরিচ্ছেদের শেষ পর্যায়ে আর একটি কথা বলব। শিল্পীরা সকলেই বৌদ্ধ ; কিন্তু মনে হয়, হিন্দু-শাস্ত্রকারদের মূল নির্দেশ তাঁরাও মেনে চলতেন। সে শাস্ত্র বলে, 'শিল্পানি শংসতি দেব-শিল্পানি।' সমস্ত শিল্পই দেব-শিল্পের অনুপ্রেরণায়, সর্ব-শিল্পের মূলে দেব-শিল্প। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।' অর্থাৎ, এই দেব-শিল্পের দ্বারা যে লাভ হয় তা আত্মসংস্কৃতি। এই শিল্প-সাধনাই এক যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের মাধ্যমে যজমান আপনার আত্মাকে বিশ্বছন্দে ছন্দোময় করে তোলেন।

অজন্তার শিল্পী সেই মহান্ শিল্পযজ্ঞের ঋত্বিক্, তিনিই তার হোতা। রঙ আর তুলি সে যজ্ঞের সমিধ্ আর হোমদন্ড। শিল্পের পথে তিনি মুক্তির সন্ধান করেছেন—তিনি মুক্ত হয়েছেন ; তাঁর পরমপ্রাপ্তি ঘটেছে।

সা মুক্তি—সাতিমুক্তিঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

এশীয়-শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে অজন্তা

কোন একটি মহৎ শিল্পকর্মের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে স্থান-কাল-পারিপার্শ্বিকের নিরিখে তাকে যাচাই করতে হবে। অজন্তা-চিত্রের বিশ্লেষণ আমরা করেছি, এখন দেখব সমগ্র এশীয় শিল্পচেতনায় তার স্থান কোথায়। অজন্তা কী-ভাবে, কতখানি তার পারিপার্শ্বিককে প্রভাবিত করেছে, সে নিজেই বা কতটা প্রভাবিত হয়েছে। বস্তুতঃ ভারত-শিল্পে অজন্তার স্থান অতি উচ্চে, এবং যে-হেতু এশীয়-শিল্প ভারত-শিল্পচেতনার দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত তাই সমগ্র এশিয়ার শিল্পবিকাশে অজন্তার একটি বিশিষ্ট্য স্থান আছে। এজন্যই বিশ্ব-শিল্পে অজন্তা এক বিশেষ।

পুরাকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানী বুঝতে পেরেছিলেন—নৈশ-আকাশের জ্যোতির্বিন্দুগুলি সব এক জাতের নয়। তাদের মধ্যে কয়েকটির নভোচারণছন্দে বৈশিষ্ট্য আছে—তারা নক্ষত্র নয়, গ্রহ। গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এলেন—মহাকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে পৃথিবী আছে স্থির, আর গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য-চন্দ্র সেই কেন্দ্রস্থ পৃথিবীকে ক্রমাবর্তন করছে। ঊনবিংশ-শতকের ভারতীয় সংস্কৃতিবিদেরাও অনুরূপভাবে এক সময় ভেবেছিলেন—সমগ্র এশিয়ার শিল্পচিন্তা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণরত। পরবর্তী যুগের শিল্প-বিশারদেরা ক্রমশঃ প্রণিধান করলেন, (ঠিক যে-ভাবে পরবর্তী-যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বুঝেছিলেন যে, পৃথিবী মহাকাশের কেন্দ্রবিন্দু নয়, সেও সূর্য প্রদক্ষিণরত গ্রহমাত্র)—এশীয় শিল্প-সংস্কৃতির সৌরমণ্ডলে ভারত-বর্ষও একটি গ্রহ। আফগানিস্থান, তিব্বত, নেপাল, মধ্য-এশিয়া, সিংহল, কাম্বোজ, চীন, জাপান এবং যবদ্বীপ ভারতবর্ষকে প্রদক্ষিণ করছে না আদৌ, ভারত-সমেত সকলেই সূর্যপ্রতিম এক কেন্দ্রবিন্দুকে প্রদক্ষিণ করছে। তারা তাদের চক্রাবর্তন-পথে কখনও পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে, কখনও বা দূরে সরে গেছে—কিন্তু এক অলক্ষ্য অজ্ঞাত অভিকর্ষের বন্ধনে তারা কেউ সেই অজ্ঞাত সূর্যের প্রভাবের বাইরে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারেনি ; তাদের যূথবদ্ধতায় কোন ভাঙন ধরেনি। কী সেই কেন্দ্রস্থ সূর্য? কী সেই মহাজাগতিক অভিকর্ষের বন্ধন, যা তাদের কেন্দ্রাতিগ বেগকে প্রতিহত করেছিল? সেই তত্ত্বটাই বর্তমান পরিচ্ছদে খুঁজে দেখব আমরা।

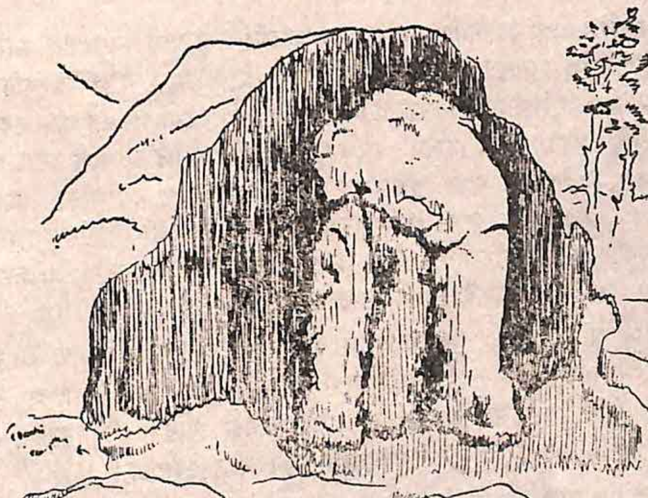
ভারতবিদ্ ডক্টর কুমারস্বামী বলেছিলেন, "খ্রীষ্টজন্মের শত শত, বোধ করি, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ ছিল আভূমধ্যসাগর-গাঙ্গেয়-উপত্যকা প্রাচীন-প্রাচীর এক গুরুত্ব-পূর্ণ অংশীদার।" সুতরাং সেই 'প্রাচীন-প্রাচী-শিল্পচিন্তা'র নিরিখে সর্বাগ্রে অজন্তা-শিল্প নয়, ভারত-শিল্পকেই বিচার করতে হবে—যে শিল্পচেতনার ভৌগোলিক বিস্তার সহস্র-সহস্র মাইল, যার কালের বিস্তার কয়েক সহস্রাব্দী। এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদের সীমিত পরিসরে আমরা সেই অতিব্যাপক মহান শিল্পমানসের একটা আভাস মাত্র দিতে পারি।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যদিচ হরাপ্পা-মহেন্-জো-দারোর কাঁচা-ইটের গাঁথনির সঙ্গে হিন্দু-ভারতের প্রাচীনতম প্রস্তর-মন্দিরের কোন সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাই না, তবু প্রথম পর্যায়ের ঐতিহাসিক হিন্দু-ভারতের ভাস্কর্যের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার শিল্প-সম্পদের একটা ক্ষীণ যোগসূত্র নজরে পড়ে। আঙ্গিকে এবং শিল্প-ভাবনায়। উদাহরণ স্বরূপ চিত্র—১১৬-তে প্রদর্শিত মহেন্‌জো-দারোর ব্রোঞ্জ-নির্মিত নায়িকার সঙ্গে চিত্র—১১৭-র মথুরা-যক্ষীর তুলনা করে দেখতে পারি। একটি ব্রোঞ্জের, একটি পাথরের ; একটি ক্ষীণাঙ্গী কিশোরীর, একটি পূর্ণ-যৌবণা রমণীর। প্রথমোক্তের লঘু নিতম্ব, শীর্ণ বাহুদ্বয়, এবং অপরিণত স্তনযুগল বিকচ-যৌবনা দ্বিতীয়োক্তের যৌবনভারনম্র দেহাকৃতির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা নয়—তবু মনে

হয় কোথায় যেন কী-একটা মিল আছে! মনে হয় না—ঐ দুটি শিল্প-সামগ্রীর মধ্যে দুই-তিন সহস্রাব্দীর ব্যবধান! মিলটা যে ঠিক কোথায় তা আপাতদৃষ্টিতে এখনই ধরতে পারছি না, কিন্তু ওর পাশাপাশি কোন মিশরীয়, ব্যাবিলোনীয়, চীনা বা গ্রীক ভাস্কর্যের নারীমূর্তি রাখলে বলতে পারব সেগুলি ভিন্ জাতের! কেন, তা জানি না!

অনেকে লঘু-মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন, পশ্চিমখণ্ডে শিল্পচেতনা অনেক বেশী বাস্তবানুগ, জাগতিক এবং প্রকৃতি-অনুসারী, তুলনায় নাকি ভারতীয় শিল্পমানস অবাস্তব, ধর্মীয় এবং অপার্থিব। কথাটা অর্ধ-সত্য, বরং বলা যায়—ক্ষেত্রবিশেষ বাস্তবের বিপরীত। উদাহরণ স্বরূপ মধ্যযুগের গথিক-স্থাপত্যের গীর্জায়, সুউচ্চ মোচাকৃতি মিনারে এবং সূচালো খিলানের পাশে মূর্তিগুলির কথা চিন্তা করুন। খ্রীষ্টান শিল্পীদল—তাঁদের অধিকাংশই যাজক-সম্প্রদায়ভুক্ত—সারা য়ুরোপের গীর্জায় যে যীশু, সন্ত ও দেবদূতদের মূর্তিগুলি গড়েছেন তারা পার্থিব নয় আদৌ। তারা সবাই অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘাকার, তারা হাসে না—তারা যেন রক্ত-মাংসের জীবের অনুকৃতি নয় ; তারা স্বর্গীয়, অপার্থিব, দর্শকের মনে শ্রদ্ধা ও ভীতি সঞ্চারের জন্যই তাদের আবির্ভাব। তুলনায় সমসাময়িক ও পূর্বযুগের ভারতীয় শিল্পী শিল্পশাস্ত্রের বাঁধা-ফর্মুলার ভিতরেই যে-সব দেবমূর্তি, যক্ষ-কিন্নর-নাগ-গন্ধর্ব মূর্তি গড়েছেন তারা ভাবরাজ্যে পার্থিব ;—তাদের দেখলে মনে হয়, এই দুনিয়ার আনন্দ-বেদনা হাসি-অশ্রু দিয়েই তাদের গড়া। গণেশজননীর ক্রোড়ের শিশুটি যে অবাস্তব, অপার্থিব, এ-কথা মনে থাকে না ; মাতৃস্নেহের ভাবব্যঞ্জনাই সেখানে বড় হয়ে ওঠে।

সিন্ধু-সভ্যতার পতন ও মৌর্যদের উত্থানের অন্তর্বর্তী কয়েক সহস্রাব্দীর ভিতর ভারত-বর্ষের শিল্পচেতনা কী-ভাবে স্ফুরিত হয়েছিল তার কোন প্রমাণ নেই। সম্রাট অশোক



চিত্র—১১০ ॥ ধৌলি শিলালেখের নিকট হস্তীমূর্তি
[ঐতিহাসিক ভারতের প্রথম শিল্পসামগ্রী]।

নির্মিত স্তম্ভগুলিই বস্তুতঃ হিন্দু-ভারতের প্রথম যুগের শিল্প-নিদর্শন। সারনাথে প্রাপ্ত ত্রি-সিংহ-শীর্ষ স্তম্ভটিই সমধিক পরিচিত। কারণ ঐ স্তম্ভের শীর্ষদেশ থেকেই ভারত-সরকারের প্রতীক-চিহ্নটি সংগৃহীত। বোধকরি হিন্দুভারতের প্রচীনতম ভাস্কর্য-নির্দশনটি আছে ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে ধৌলি শিলালেখের ঠিক উপরেই। স্থানীয় এক সয়ম্ভূ প্রস্তরখণ্ডে মূর্তিটি উৎকীর্ণ—দণ্ডায়মান হস্তীর সম্মুখভাগ। তথাগত বুদ্ধের, প্রতীক

(চিত্র—১৯০)। সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেই কলিঙ্গযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন, সেই যুদ্ধান্তে ঐ শিলালেখ ও হস্তিমূর্তি নির্মিত। সুতরাং ঐ হস্তিমূর্তি অশোকস্তম্ভ-গুলির অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ। এই হস্তিমূর্তি এবং বিম্বিসারের রাজপ্রাসাদে উৎকীর্ণ নক্শায় (মথুরায় কার্জেন সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি পাষাণফলকে বিম্বিসারের প্রাসাদের 'ফাসাদ' খোদিত দেখেছিলাম—সেই পাষাণ-ফলক ষাটের দশকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে শুনেছি) ভাস্কর্যের যে নমুনা দেখছি, তাতে মনে হয় প্রাক-মৌর্যযুগেও এ শিল্প উন্নতমানেরই ছিল। বুদ্ধের সমসময়ে, আলেকজাণ্ডারের সমকালে তাঁরা কী গড়েছিলেন জানি না, কিন্তু মৌর্য ও সুঙ্গ যুগে ঐ শিল্পীদল যে রাজানুগ্রহ লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। বহিঃভারতের প্রভাব সত্ত্বেও এই ভারতীয় ভাস্করদল গুরুমুখী-বিদ্যায় বংশ পরম্পরায় শিল্পকর্মে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

মৌর্য ও সুঙ্গযুগের সেই শিল্পীদলের প্রভাব উত্তরে পঞ্জাব, পূর্বে মগধ এবং দক্ষিণে সাতবাহন রাজ্য পর্যন্ত ক্রমে বিস্তৃত হল। এই শিল্পস্ফুরণের প্রথম অভিব্যক্তি দেখতে পাই মধ্যভারতের এক ত্রিকোণাকৃতি ভূ-খণ্ডে। ভারহুত-বুদ্ধগয়া ও সাঁচীতে। যেন ঐ ত্রিকোণা-কৃতি ভূখণ্ড থেকেই ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমে ও দক্ষিণে—ভাজা, কার্লে, কনডেন, কাহ্নেরী, নাসিক, অমরাবতী ও অজন্তায়। কয়েক শতাব্দীর ভিতরেই সেই ধারা পৌঁছে গেল উত্তরে গান্ধার, কাশ্মীর, মথুরায় এবং এদিকে উড়িষ্যার উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে। মূল উৎসের ঐ যে ত্রিকোণাকৃতি ভূ-খণ্ড—ভারহুত, বুদ্ধগয়া ও সাঁচী, এদের পরস্পরের দূরত্ব দেড়-দুশ' মাইলের বেশী নয়। বোধকরি এই শিল্পস্ফুরণের আর্থিক সহযোগিতা এসেছিল পাটলীপুত্র ও বিদিশা থেকে। এই ত্রয়ীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন হচ্ছে ভারহুত, সর্বশেষ সাঁচী—বুদ্ধগয়া এই দুইয়ের মাঝামাঝি বলে অনুমিত হয়।

ভারহুতে প্রাপ্ত রেলিং-এর কয়েকটি নমুনা কলকাতার যাদুঘরে ঢুকতেই ডানহাতি ঘরে দেখতে পাবেন। মূর্তিগুলি পাথরে অর্ধ-উৎকীর্ণ, যাকে ইংরাজিতে বলে 'অলটো-রিলিভো'।

ভারহুত

এখানে বুদ্ধমূর্তি নাই—সবই হীনযান যুগের। রেলিং-এর গঠন-কৌশল একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে চলে। নক্শা ও মূর্তিগুলি দেখলে মনে হয় ভাস্কর-দল পূর্বযুগের একদল শিল্পীর দ্বারা প্রভাবিত; এবং সেই পূর্বসূরীরা ছিলেন সূত্রধর অথবা গজদন্তশিল্পী। ভারহুত শিল্পী যেন পুরোপুরি ভাস্কর নন, তিনি মূলতঃ চিত্রকর। তাই মূর্তিগুলি ত্রি-মাত্রিক নয়, পটে-আঁকা ছবির মত পাশাপাশি সাজানো। জাতক-কাহিনীকে প্রস্তরে খোদাই করার প্রয়াশ এখানেই প্রথম দেখতে পাচ্ছি।

বুদ্ধ-গয়ার নিদর্শন অতি অল্প। প্রথম যুগে বুদ্ধগয়ার মেরামতি করতে গিয়ে তার বহু

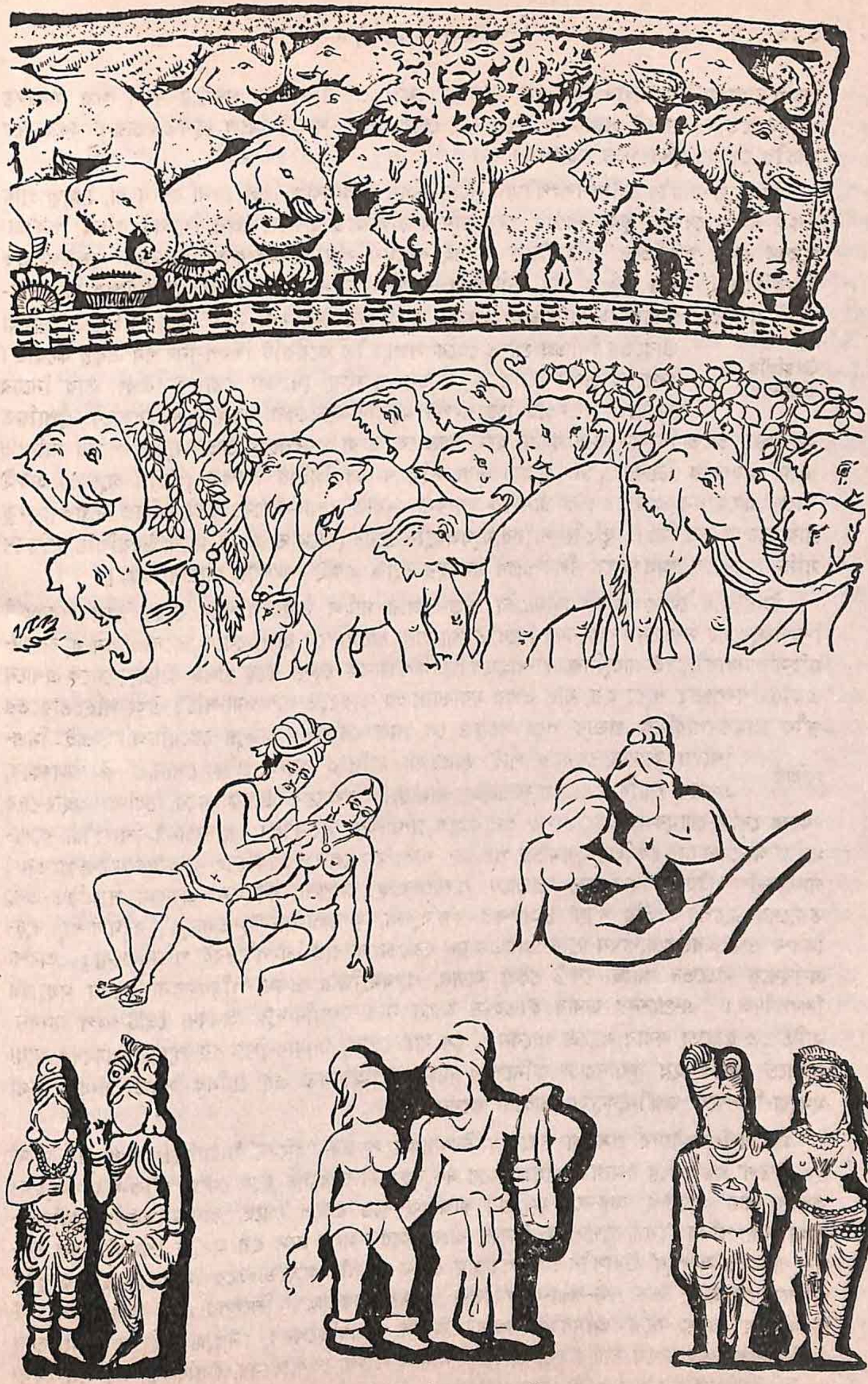
বুদ্ধগয়া

নিদর্শন নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তবু ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় কিছু কিছু নমুনা আজও দেখতে পাওয়া যায়। তা দেখে বোঝা যায় বুদ্ধগয়া ভারহুত শিল্পের সঙ্গে একটি যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো।

সাঁচীতে মূল আকর্ষণ হচ্ছে একটি বৃহদায়তন স্তূপকে ঘিরে একটি রেলিং ও তার চারটি তোরণ। এ-ছাড়াও সেখানে আরও কয়েকটি স্তূপ, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

সাঁচী

সাঁচীর শিল্পীদলকে মোটামুটি দুটি দলে বিভক্ত করতে পারা যায়। প্রথম দলের আদিগুরু আনন্দ। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সম্রাট শ্রীসতকর্ণী। আনন্দের নাম দক্ষিণ-তোরণে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। আনন্দের 'ঘরাণায়' যাঁরা মূর্তি গড়তেন তাঁদের মূর্তিগুলি সনাক্ত করা শক্ত নয়। মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত শীর্ণকায়, দীর্ঘাকৃতি ও লঘুচ্ছন্দ। দ্বিতীয় শিল্পীদল সম্ভবতঃ ছিলেন বিদিশার (সাঁচীর অনতিদূরে এক বর্ধিষ্ণু শিল্পনগরী) হস্তিদন্ত-শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁদের তৈরী মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত ভারী, হ্রস্বাকৃতি ও স্থূলকায়। প্রথমোক্ত শিল্পীদল পাথরের অনেকটা গভীরে খনন করেছেন, দ্বিতীয়োক্তরা করেননি। কারণটা সহজেই অনুমেয়। দ্বিতীয়োক্ত দলের উপর গজদন্ত



চিত্র—১১১॥ সমসাময়িক শিল্পে পারস্পরিক প্রভাব।

শিল্পীদের প্রভাব ছিল। গজদন্ত অত্যন্ত দামী, তাই শিল্পীরা গভীরে খনন করে গজদন্ত নষ্ট করতে স্বভাবতই পরাঙ্মুখ। সে যাই হোক, দুই শিল্পী মিলে দু-তিন-চারশ' বছর ধরে সাঁচীর তোরণগুলি গড়ে তোলেন।

ভারহুত-সাঁচীর বৌদ্ধ-শিল্পীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রায় একই সময়ে দেখছি ভুবনেশ্বরের উদয়গিরি-খন্ডগিরিতে একদল জৈন শিল্পী কৃত্রিম পার্বত্য-গুহায় একই পদ্ধতিতে কাহিনীচিত্র খোদাই করছেন, স্তম্ভে অলঙ্করণ করছেন। ভৌগোলিক দূরত্ব যথেষ্ট, ধর্মও পৃথক, তবু উড়িষ্যার একান্তবাসী এই জৈন-শিল্পীদের উপর ভারহুত-সাঁচী-অজন্তার প্রভাব যে পড়েছিল এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। চিত্র—১১১-এ আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত কয়েকটি শিল্প-নির্দশন একত্র করেছি। উপরের প্রথম সারিতে সাঁচির ভাস্কর (দক্ষিণ তোরণ) এবং তার নিচের সারিতে অজন্তার চিত্রশিল্পী ষড়দন্ত-জাতকের একই দৃশ্য যেভাবে রূপায়িত করেছেন, তাতে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, তাঁরা পরস্পরের প্রভাবমুক্ত। পরের সারিতে বামে অজন্তার চিত্রকর (১০ গুহা) এবং দক্ষিণে উদয়গিরির ভাস্কর (গণেশ গুম্ফা) একই কালে এঁকেছেন রাজা কর্তৃক রানীকে সান্ত্বনা দেবার দৃশ্য—তাঁদের ভৌগোলিক দূরত্ব কিন্তু প্রায় হাজার কিঃ মিঃ। তৃতীয় সারির যুগলমূর্তিত্রয়ের (বামে ভারহুত, মাঝে উদয়গিরি, দক্ষিণে সাঁচি, পোষাকে, অলঙ্কারে, শিরস্ত্রাণে ভ্রম হয় বুঝি একই শিল্পীর হাতের কাজ!

উদয়গিরি খণ্ডগিরি

উদয়গিরি থেকে এবার আমাদের দেড়-হাজার মাইল উত্তর-পশ্চিমে যেতে হবে পরবর্তী শিল্পফুরণের সন্ধানে—বক্ষুনদী-বিধৌত 'গান্ধার' রাজ্যে, যে রাজ্য থেকে এসেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র-মহিষীগান্ধারী, সেই আধুনিক কান্দাহারে। তক্ষশীলাকে কেন্দ্র করে প্রথম খ্রীষ্টাব্দ থেকে এখানে একটি শিল্পচর্চা শুরু হয়, যার উপর মধ্যভারতের ভারহুত-বুদ্ধগয়া-সাঁচী এবং বহিঃভারতের গ্রীক-রোমক-পারসিক প্রভাব পড়া সত্ত্বেও সে নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখেছিল। এই মিশ্র-শিল্পে আমরা দেখতে পাই ভারতীয় মূর্তির অঙ্গে গ্রীক পোষাক ও অলঙ্কার, এখানে বোধিসত্ত্বের গুম্ফরাজি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে, বৌদ্ধ অর্হৎ-দের স্কন্ধে দেখি রোমক-সেনাপতিদের অনুকরণে গ্রন্থীবদ্ধ উত্তরীয়। হীনযানী শিল্পীরা বুদ্ধ-মূর্তি গড়তেন না—বোধিদ্রুম, ধর্মচক্র, পদচিহ্ন বা পদ্মফুলের প্রতীকচিহ্নে বুদ্ধদেবকে বোঝাতেন; গান্ধার-শিল্পীরা গ্রীক-রোমক প্রভাবে বুদ্ধদেবকে কল্পনা করলেন একজন সুগঠিত-তনু তরুণের রূপে। তাঁর দীর্ঘ প্রলম্বিত কর্ণযুগল, কুন্ডলায়িত কুন্তলচূর্ণ, দীর্ঘনাশা, দৃঢ়-নিবন্ধ ওষ্ঠ এবং করুণাঘন দুটি আয়ত নয়ন হয়তো গান্ধার শিল্পীদেরই পরিকল্পনা। অবশ্য এ-বিষয়ে মতভেদ আছে—কেউ কেউ বলেন, বুদ্ধমূর্তির প্রথম পরিকল্পনা করেন মথুরার শিল্পীদল। এ-প্রশ্নের জবাব ইতিহাস জানে না। শরদিন্দুর অনবদ্য ছোট-গল্প 'চন্দন-মূর্তি'তে হয়তো জবাব খুঁজে পাবেন। সে যাই হোক, গান্ধার-শিল্পের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে সর্বাগ্রে বলতে হয় কুশানরাজ কনিষ্কের নাম। বহিরাগত এই চৈনিক সম্রাট গান্ধার তথা মথুরা-শিল্পকে অর্থানুকূল্যে সাহায্য করেন।

গান্ধার

মথুরা-শিল্পীদের প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিস্ময়কর সংবাদ—তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। দীর্ঘ ছয়-সাতশ' বছর ধরে ক্রমাগত বহিরাক্রমণে মথুরাপুরী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, গ্রীক-শক-পল্হব-কুশান আর হূণদের আক্রমণে মথুরার রাজপথ রক্তে ভেসে গেছে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের যুগান্তর এসেছে বারে বারে—অথচ মনে হয় মথুরা শিল্পীর দল সে-সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন; প্রপিতামহ থেকে প্রপৌত্র গুহাভ্যন্তরে নিরন্তর ছেনি-হাতুড়ি চালিয়ে গেছেন; এত ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতেও তাঁদের সাধনকক্ষে শিল্পের সেই পঞ্চপ্রদীপ এই ছয়-সাতশ' বছর ধরে অনির্বাণ-শিখায় জেবলে রেখেছিলেন। মথুরা-শিল্পের সিংহভাগ নিঃসন্দেহে দখল করে আছে বৌদ্ধশিল্প—নানান ভঙ্গিতে বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব, মহাযান দেব-দেবী,—হারিতী-জম্ভল-মঞ্জুশ্রী-প্রজ্ঞাপারমিতা; কিন্তু হিন্দু দেবদেবীদেরও তাঁরা উপেক্ষা

করেননি—বিষ্ণুমূর্তি, সূর্য, গণেশ, হরপার্বতী, লক্ষ্মী-নারায়ণ সবই আছেন। প্রথমযুগে মথুরা-শিল্পী যেন ভারহুত-সাঁচী-স্টাইলের অনুবর্তী। ক্রমশঃ তাঁরা তাঁদের বৈশিষ্ট্যটুকু খুঁজে পেলেন। মথুরা-স্কুলের যে প্রথম শিল্পনিদর্শনটি খুঁজে পাওয়া গেছে তা সম্ভবতঃ কুশানরাজ কনিষ্কের দণ্ডায়মান মূর্তিটি, যেটি বর্তমানে মথুরার কার্জন সংগ্রহ-শালায় রক্ষিত। মূর্তিটির মস্তক ও হস্তদ্বয় অন্তর্হিত, তবু দীর্ঘদেহী সম্রাটের ব্যক্তিত্ব ঐ ভগ্নমূর্তিতেও পরিস্ফুট। ভীম কদ্‌ভিশ্‌-এর অপর একটি মূর্তি অবশ্য অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। সেই মূর্তির মুখাবয়বের সঙ্গে সাঁচী উত্তর-তোরণের (প্রথম খ্রীষ্টাব্দ) দ্বারপালের মুখের নির্মাণ-কৌশল তুলনীয়। শুধু ঐ একটি মূর্তিতেই নয়, অসংখ্য মূর্তিতে লক্ষ্য করি—প্রথমযুগে তাদের শিরস্ত্রাণ, অলঙ্কার, কোমর-বন্ধ ইত্যাদি ছিল ভারহুত-সাঁচী-অজন্তার সমধর্মী—যেমন দেখছি চিত্র—১১১-এ ; কিন্তু ক্রমশঃ মথুরা-শিল্প যেন নিজ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল। তাই পরবর্তী-যুগের মূর্তিগুলিতে মথুরার ছাপ পড়ল।

মথুরা

এ-কথা মনে করা ভুল যে, খাইবার-পাস্ অথবা বোলান-পাস্ দিয়ে শুধুমাত্র বিধ্বংসী বিজয়-বাহিনীই ভারতবর্ষে লুটপাট করতে এসেছিল—বস্তুতঃ ঐ পথেই ভারতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার যোগাযোগ ঘটেছিল। সেই পার্বত্য পথ ধরে যুগ-যুগান্তর ধরে এসেছেন এবং গিয়েছেন অসংখ্য যাত্রী, বণিক, তীর্থকামী, পর্যটক। তাঁরা নিয়ে গিয়েছেন ভারতীয় ধর্ম, শিল্প, চিন্তাধারা ; নিয়ে এসেছেন ভিন্‌দেশী সম্পদ—'দিবে আর নিবে' মন্ত্রে দীক্ষিত সেই পার্বত্যপথে, ইতিহাস যাকে বলেছে 'রেশম-সড়ক'। ঐ রেশম-সড়কের ধারে গড়ে-ওঠা কয়েকটি জনপদের শিল্পবিচার করব এবার।

আফগানিস্থানে ঘোরবন্দ্-নদীর উত্তরপারে 'বেগ্রাম' গ্রামে একসময়ে ছিল কুশান-সম্রাটদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। তার নাম 'কপিশ'। এই কপিশ-নগরীর উল্লেখ আছে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-ৎসাঙ্-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে। এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে কিছু গ্রীক ও রোমক মূর্তি, পম্পিনগরীতে প্রাপ্ত চষকের অনুকরণে নির্মিত পানপাত্র, চীনা-লাক্ষায় নির্মিত মঞ্জুষা। এইসব বহিঃভারতীয় শিল্পনিদর্শনের সঙ্গে একই ভূস্তরে পাওয়া গেছে অসংখ্য ভারতীয় মূর্তি, ক্ষুদ্রমূর্তি (statuette) যাতে গান্ধার ও মথুরা শিল্পের প্রভাব অনস্বীকার্য। বেগ্রাম ছাড়া জালালাবাদ অথবা হাড্ডাতেও পাওয়া গেছে প্রচুর মূর্তি ; ভারতীয় ও গ্রীক ভাস্কর্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। প্রফেসর রোল্যান্ড বলেছেন, 'হাড্ডায় (যার প্রাচীনকালে নাম ছিল 'নগরহার') প্রাপ্ত শিল্পসামগ্রীতে মহাযানী বৌদ্ধ-শিল্পের প্রভাব যথেষ্ট।' এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শিল্প-নির্দশন পাওয়া গেছে 'বামিহান'-এ। সেখানে আছে অতি প্রকাণ্ড দুটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি, ৫৩ মিটার ও ৩৯ মিটার উচ্চ। প্রথমটিতে গান্ধার-শিল্পের ছাপ অতি স্পষ্ট। ঐ বুদ্ধমূর্তির উপরে একটি কুলুঙ্গিতে যে ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায় তাতে নিঃসন্দেহে ভারতীয় ছাপ। বামিহানে কিছু প্রাচীর-চিত্রও পাওয়া গেছে যার নির্মাণ-পদ্ধতি ও স্টাইলে অজন্তা-ম্যুরালের প্রভাব।

আফগানিস্থান
কপিশ, হাড্ডা,
বামিহান

এবার চীন-অভিমুখে রওনা দেওয়া যাক। চীন ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব যুগ থেকেই ছিল। কেউ কেউ বলেন, এশীয় শিল্প-উপবৃত্তের এই দুটি নাভির প্রথম পরিচয় ঘটে চীন-সম্রাট শী-হোয়াঙ তি-র আমলে, খ্রীঃ পূঃ ২২১ অব্দে। বোধকরি সম্রাট অশোক চীনদেশে তাঁর ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। যদিও সঠিক সময়টা জানা যায় না, তবে এ-কথা বোঝা যায় যে, চীনদেশে চ'-ঈন সাম্রাজ্য এবং ভারতে মৌর্য-সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি যখন মধ্য-গগনে তখন এ-দুটি মহান প্রতিবেশী পরস্পরের পরিচিত ছিল। ভারত-চীনের ভিতর রেশম-সড়কের তিনটি সমান্তরাল ধারা। প্রথমটি উত্তরদিক ঘেঁষে—তিয়েনশান পর্বত-মালার উত্তর-সানুদেশ বরাবর—সমরখন্দ্, তাশখন্দ্, খোকন্দ্ পার হয়ে ইশ্‌ককুল হ্রদের

চীন ও
মধ্য-এশিয়া

কিনার ঘেঁষে সে-পথ ছিল চীন-ব্যাকট্রিয়া-পারস্যের বাণিজ্যপথ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথদ্বয় তিয়েশান্ (চীনা ভাষায় 'শান' মানে পর্বতমালা) পর্বতের দক্ষিণ-সানুদেশ বরাবর। কিন্তু ঐ পর্বতের দক্ষিণে আছে ঊষর তাকলামাকান মরুভূমি—পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ; যদিচ মরুভূমির সমান্তরালে বয়ে চলেছে স্বচ্ছতোয়া তারিম নদী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পথ ঐ নদীর দুই পার ঘেঁষে। দ্বিতীয় পথে, তারিম নদীর অববাহিকার উত্তর দিকে পড়বে—খাশগড়, তুমশুক্, খ্যিজিল, কুচা, কারাশহ্র, তুরফান। তৃতীয় পথটা চলেছে তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণপ্রান্ত ঘেঁষে, অর্থাৎ হিমালয় পর্বতের উত্তর-ঢাল বরাবর। সে পথও সুরু হয়েছে ঐ খাশগড়ে—সে-পথে পড়বে ইয়ানকাঙ্, নিয়া, চার্চান, মীরান, লব-নর। তিনটি পথেরই এ-প্রান্তে খাইবার-পাস্ এবং ও-প্রান্তে তুন-হুয়াঙ।

ঐ তিনটি 'রেশম-সড়ক' বা 'মশল্লা-সড়ক' দিয়ে সহস্রাব্দীকাল ধরে চলাচল করেছে অযুত-নিযুত ব্যবসায়ী, বণিক, পর্যটক ও তীর্থকামী। বণিকেরা উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে নিয়ে গেছে লাক্ষা, মশল্লা, গজদন্ত, তৈজসপত্র, মৃগনাভি, কস্তুরী, চন্দন আর নিয়ে এসেছে চীনাংশুক, সিন্দুর, ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র, জেড-পাথরের কারুকার্যখচিত সৌখীন সামগ্রী। আবার ঐ পথেই এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজকের দল—ফা-হিয়ান, হিউ-এন-ৎসাঙ, ই-ৎসিঙ ; চীনদেশে গিয়েছিলেন ভারতীয় শ্রমণদল—কাশ্যপমাতঙ্গ, ধর্মরত্ন, কুমারজীব, ধর্মক্ষেম, বুদ্ধযশ, বুদ্ধভদ্র, বোধিধর্ম, বজ্রবোধি ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমশঃ পথের ধারে ধারে গড়ে উঠল গ্রাম, জনপদ,



চিত্র—১১২॥ অর্হৎ ও সিংহী
চৈনিক শিল্পী—লি লুঙ-মিয়েন।



চিত্র—১১৩॥ সুদাস ও সিংহী অজন্তা সপ্তদশ-বিহার।

মরুপান্থশালা। গড়ে উঠল মরু-সঙ্ঘারাম—খাশগড়, তুরফান, খ্যিজিল, মীরান, তুন-হুয়াঙ। আমরা খবর রাখি না, তাই জানি না—কিন্তু খুঁটিয়ে যদি দেখতে বসেন অনুভব করবেন—হাজার হাজার মাইল দূরে দুর্গম মরু, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত অতিক্রম করে কী অনিবার্যভাবে সেইসব মরু-সঙ্ঘারামে ভারতীয় তথা অজন্তা-শিল্পের স্বাক্ষর পড়েছে! বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নয়, তবু আসুন কিছুটা দেখে আসি সেই 'হারানো-দিগন্তের' দেশ।

খাশগড়, মীরাণ, তুরফান তুন-হুয়াঙ

খাশগড়ে আছে কিছু প্রাচীর-চিত্র, যার নির্মাণ-কৌশল ও স্টাইল অজন্তার অনুসারী। এগুলি অধিকাংশই ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে আঁকা, অর্থাৎ অজন্তার ষোড়শ সপ্তদশ-বিহারের প্রায় সমসাময়িক। তুরফান গড়ে ওঠে আরও অনেক পরে, নবম শতাব্দীতে। সেখানে গান্ধার শিল্পের সঙ্গে চীনদেশের ট্যাঙ-যুগের শিল্প-চেতনার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। খোটান থেকে তুনহুয়াঙের পার্বত্য-পথের প্রায় মাঝামাঝি কতকগুলি কৃত্রিম গুহা আছে মীরানে, সেখানে অজন্তার-ঢঙে আঁকা প্রাচীর-চিত্রে জাতক-কাহিনী। এখানকার বিশ্বান্তর-জাতকের একটি কাহিনী-চিত্রের নিচে রোমান হরফে চিত্রকর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রোমক চিত্রকর, নাম—তিতা অথবা তিতাস্। ভাবতে অবাক লাগে মধ্য-এশিয়ার মরু-পান্থশালার সংঘারামে ভারতীয় ঢঙে বৌদ্ধ-জাতকের ছবি আঁকছেন একজন ইতালীয় চিত্রকর! খাশগড়ের মিংগোই (সহস্র-গুহা)-বিহারে অঙ্কিত একটি চিত্রে সমবেত বৌদ্ধশ্রমণদের দেখলে মনে হয় হুবহু তাঁরাই জটলা করে বসেছিলেন অজন্তা সপ্তদশ-বিহারে সারিপুত্রের পরীক্ষাদৃশ্যে (চিত্র—৫৬)। এই মধ্য-এশিয়া শিল্পের সবচেয়ে পরিণত উদাহরণ পাই চীনের প্রবেশদ্বারে গড়ে ওঠা মরু-শহর—তুনহুয়াঙে। সেখানকার শিল্পে ভারত-চীন যেন একাকার করে গেছে। ঐ পথেই বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি গিয়েছিল চীন, কোরিয়া ও জাপান।

দু-একটি উদাহরণ পেশ করতে পারলে বক্তব্যটা সহজে বোঝানো যাবে। আমাদের প্রথম উদাহরণ চীনা-শিল্পী 'লি লুঙ-মিয়েন-এর আঁকা একটি সিল্কের স্ক্রোল। দ্বাদশ-শতাব্দীতে ঐ বিখ্যাত চীনা চিত্রকরকে মধ্য-এশিয়ার কোন সংঘারামের প্রধান অর্হৎ মহাযান-ধর্মের কিছু চিত্র আঁকতে নিয়োগ করেন। এই রেশম-চিত্রটি তারই ফলশ্রুতি (চিত্র—১১২)। এটি প্রফেসর



চিত্র—১১৪ ॥ কোয়াং-য়িং (চীনাশৈলীতে)।



চিত্র—১১৫ ॥ অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি (অজন্তাশৈলীতে)।

লরেন্স বিনিয়নের বিখ্যাত সংগ্রহ-এ্যালবাম থেকে অনুকৃত। প্রফেসর বিনিয়ন চিত্রটির নামকরণ করেছেন "An Arhat and a Lioness" (জনৈক অর্হৎ ও সিংহী)—তিনি বলেননি—কে ঐ অর্হৎ, কেন ঐ সিংহীর অদ্ভুত ভঙ্গি। কোন কোন বিদগ্ধ কলাসমালোচক বলেছেন—'অহিংসামন্ত্রে-দীক্ষিত অর্হৎ-কে পশুরা আক্রমণ করছে না'—এটাই হচ্ছে চিত্রের বিষয়বস্তু। আমার কিন্তু মনে হয়েছে 'লি লুঙ মিয়েন' চিত্রের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন সুতসোম

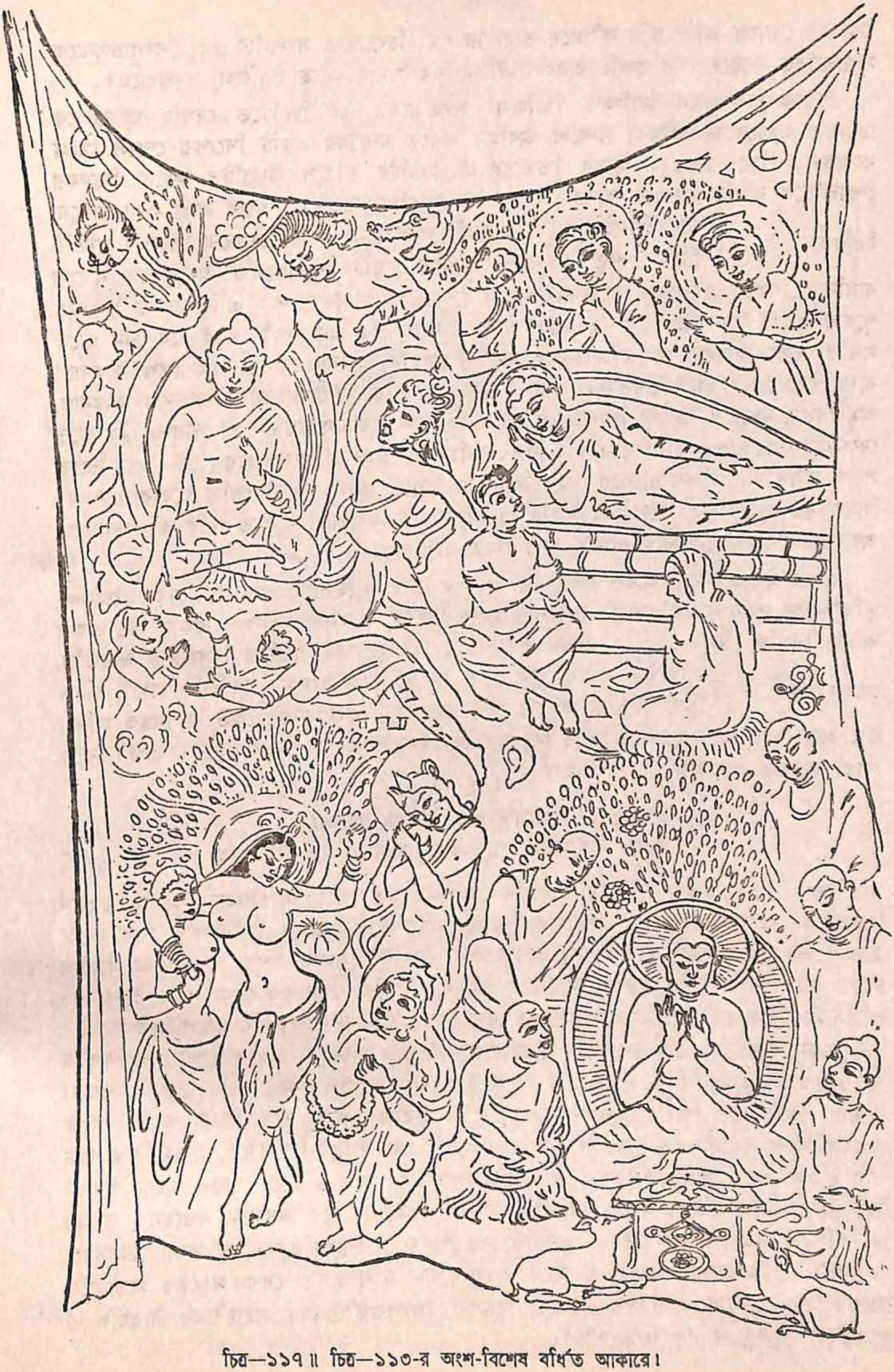
জাতক কাহিনী থেকে। ঐ বৃদ্ধ অর্হৎ নন, কাশীরাজ সুদাস এবং সিংহীটা পশুশক্তির প্রতীক নয়, কামাতুরা রাজার প্রেয়সী। তথাকথিত অর্হৎ-এর মস্তক মুণ্ডিত, পিছনে রত্নচ্ছটাও আছে—কিন্তু তাঁর অঙ্গে পীত অজীন নয়, রাজোচিত কারুকার্যখচিত চীনাংশুক, তাঁর কর্ণে কুণ্ডল, বাম হস্তে অঙ্গদ। সবচেয়ে বড় কথা, পুরুষ ও সিংহী যেভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন তার ভিতর একটা বিশেষ রসের সন্ধান পাচ্ছি যেন। ঐ চিত্রের পাশাপাশি যদি অজন্তা সপ্তদশগুহার সেই খণ্ড চিত্রটিকে সন্নিবেশিত করি (চিত্র—১১৩) তাহলে তুলনামূলক বিচারটা সহজ হবে। লক্ষণীয়, মঙ্গোলীয় অশ্ব-দেখতে-অভ্যস্ত চীনাশিল্পী অদেখা সিংহীর পুচ্ছটি আঁকতে পারেননি। লুঙ্-মিয়েনের চিত্রের পশ্চাৎ-পট পর্বতের রেখা এবং মেঘস্তূপ একেবারে 'টিপিক্যাল' চীনা; অথচ পুরুষটির ভঙ্গি, চরণযুগল প্রভৃতি অজন্তা-ধর্মী।

আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণটি সংগ্রহ করেছি তুন-হুয়াঙ-এর ২৫৭ নং গুহা থেকে। চিত্রটি (চিত্র—১১৪) 'ক্বোয়াং-য়িন্' হচ্ছেন অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির চৈনিক রূপান্তর। এবারেও পাশাপাশি তুলনা করতে সুবিধা হবে বলে অজন্তার প্রথমগুহার চিত্রটি এখানে সন্নিবেশিত করে দিলাম (চিত্র—১১৫)। সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছেন? চীনা চিত্র ত্রিভঙ্গ নয়, তাঁর মুকুটের চেয়ে রত্নচ্ছটাই বেশী প্রকট—তবু দক্ষিণ হস্তের মুদ্রায়, করুণাঘন আনত দৃষ্টিতে কি



চিত্র—১১৬ ॥ খিয়াজিল-সঙ্ঘারামের প্রাচীরচিত্র।

একই জাতের ব্যঞ্জনা নেই? মনে হচ্ছে না কি যে, তুন হুয়াঙ-শিল্পী অজন্তার ঐ বিখ্যাত চিত্রটি নিশ্চয় দেখেছিলেন। তার মানে এ নয় যে, মধ্য-এশিয়ার শিল্পীকে হাজার মাইল পার্বত্যপথ পদব্রজে অতিক্রম করতে হয়েছিল—কারণ আমরা অনায়াসে অনুমান করতে পারি, চিত্রটি কোন বৌদ্ধশ্রমণের সংগ্রহে তুনহুয়াঙে বসেই তিনি হয়তো দেখেছিলেন। বস্তুতপক্ষে বণিক, পরিব্রাজক, ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে এভাবে বহু শিল্প-অনুকৃতি ভারতের বাইরে যেত। হিউ-এন-ৎসাঙ স্বয়ং তিনশতের অধিক শিল্পসামগ্রী ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।



চিত্র—১১৭ ॥ চিত্র—১১৩-র অংশ-বিশেষ বর্ধিত আকারে।

সিল্কের স্ক্রোলে আঁকা ছবি কীভাবে ভারতীয় ধর্ম, চিন্তাধারা সংস্কৃতি এবং শিল্পচেতনাকে সম্প্রসারিত করেছে তার একটি অনবদ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে খিজিল্ সঙ্ঘারামে।

চৈনিক-তুর্কিস্থানে অবস্থিত খিজিল্ সঙ্ঘারামের এই চিত্রটিতে দেখছি মহারাজকে তথাগত বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধে অবহিত করতে মন্ত্রীবর একটি সিল্কের স্ক্রোল মেলে ধরেছেন। (চিত্র—১১৬)। চিত্রের ভিতরের ঐ চিত্রটির স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে সিল্কের স্ক্রোলটিকে বর্ধিত আকারে পুনরায় এঁকে দিলাম (চিত্র—১১৭)। এবার লক্ষ্য করে দেখুন, শাক্য-সিংহের জীবনের চারটি মূল ঘটনা ওখানে দেখানো হয়েছে। প্রতিটি চিত্রই কিন্তু অজন্তার বিখ্যাত চারটি শিল্পকর্মের অনুকৃতি। নীচের বামদিকে শিল্পী এঁকেছেন—লুম্বিনী-কাননে বুদ্ধদেবের জন্মবৃত্তান্ত। এটি অজন্তা দ্বিতীয় গুহার একটি চিত্র (অবস্থান—২।২ঙ) অবলম্বনে আঁকা। মায়াদেবী একইভাবে ডান হাতে সখীর গলা জড়িয়ে শালভঞ্জিকা-ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানা। নিম্নভাগের দক্ষিণাংশে মৃগদাবে বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্মচক্রপ্রবর্তন। এটি নিছক ভারতীয় স্টাইলে আঁকা—অজন্তা, সারনাথ, অমরাবতী, মথুরার অসংখ্য শিল্পসামগ্রীতে একই ছন্দে ধর্মচক্রপ্রবর্তন-দৃশ্য পরিস্ফুটিত হতে দেখেছি। ঊর্ধ্বাংশের বাম পার্শ্বে মার-বিজয় কাহিনীটি অজন্তা প্রথমগুহার (চিত্র—১১) চিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। দক্ষিণ-প্রান্তের মহাপরিনির্বাণ চিত্রটি অজন্তা ষড়বিংশতি গুহার ভাস্কর্য-নিদর্শনের অনুকৃতি। ফলে, এই চিত্রটি থেকেই আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি কী-পদ্ধতিতে অজন্তার শিল্পচেতনা বহিঃভারতে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

খিজিল্

আমরা মধ্য-এশিয়ার আরও একটি শিল্পসম্পদ উদাহরণ হিসাবে পরখ করে দেখব। চৈনিক-তুর্কিস্থানে তুরফান মরুপ্রান্তরে অবস্থিত বেজেক্লিক্ গুম্ফায় অবস্থিত একটি চিত্র এবার আমরা দেখছি (চিত্র—১১৮)। অষ্টম শতাব্দীতে অঙ্কিত এই চিত্রটির বিষয়বস্তু ভারতীয়, বৌদ্ধধর্মের, উপরাংশে লেখা পংক্তির ভাষা সংস্কৃত, বর্ণলিপি ব্রাহ্মী, যদিও চিত্রে অঙ্কিত ব্যক্তিরা কেউ ভারতীয়, কেউ তুর্কি, কেউ বা নিছক চীনা। ফুল-লতা-পাতা অলঙ্করণে ভারতীয় শিল্পের অপেক্ষা মধ্য-এশীয় প্রভাব বেশী। ব্রাহ্মী-হরফে লেখা সংস্কৃত শ্লোকটা বাঙলা হরফে :

বেজেক্লিক

হস্তাশ্বেন সুবর্ণেন নারীভিরত্নমুকুটাভিঃ।
সন্নাম জীনানাম্ পূজার্থম্ উদ্যানম্ শ্রেষ্ঠীনাকৃতম্॥

যার অর্থ : "হস্তী-অশ্ব-স্বর্ণ-যোষিত-মণি-মুক্তাদি সমেত আমি বাণিজ্যযাত্রা করেছি ছয়জন বিজয়ীকে অর্ঘ্যদান-মানসে।" অর্থাৎ জাতিস্মর ভবিষ্য-বুদ্ধ বলছেন, তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে ছয়বার অর্থবান বণিকগৃহে জন্মলাভ করেছিলেন, এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ তদানীন্তন বুদ্ধের চরণে অর্ঘ্য দিতে তিনি ছয়বার গৃহত্যাগ করেন। চিত্রের মেরুদণ্ড-রেখা স্বয়ং বুদ্ধদেব। প্রতিসাম্য-মূলক এ-চিত্রের নিচে, বামপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে সুসজ্জিত কয়েকটি গৃহপালিত প্রাণী—উট, ঘোড়া, অশ্বেতর। তার উপর জ্যোতিঃপ্রভা-মণ্ডিত এক দেবদূত—অর্থাৎ বুদ্ধদেবের স্বর্গীয় অনুচরদলের একজন। যিনি তথাগতের তরফে উপহারগুলি গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়ে আসছেন। আমরা যদি কিনার বরাবর কেন্দ্রস্থ বুদ্ধমূর্তিকে প্রদক্ষিণ করি, তবে এরপর আরও উপরে দেখব পাশাপাশি বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি ও পদ্মপাণিকে। বোধিসত্ত্বের বিপরীতে, বুদ্ধমূর্তির বামে তাঁর দুজন প্রধান শিষ্য—সারিপুত্র ও মহামৌদগল্ল্যায়ন। তাঁদের নিচে আরও দুজন অর্হৎ। নিচে চিত্রের দক্ষিণপ্রান্তে দুজন স্থানীয় বণিক নতজানু হয়ে অর্ঘ্যদান করছেন। তাঁদের দেহাকৃতি ও সাজ-পোষাকে চীন ও তুর্কিস্থানের প্রভাব। কেন্দ্রস্থ বুদ্ধমূর্তি তন্ময়, উদাসীন, আত্মমগ্ন : দক্ষিণহস্তে অভয় ও বামে বরদা-মুদ্রা। চীন-ভারত রেশম-সড়কের মাঝামাঝি বেজেক্লিক গুম্ফায় অবস্থিত এই অপরিজ্ঞাত শিল্পকর্মটি যেন মহাচীনের ট্যাঙযুগ ও ভারতীয় গুপ্তযুগের এক মিলনতীর্থ।

তা হোক, আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি। আমি ভাবছিলুম : এ চিত্রের সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্ল্যায়নকে কী-ভাবে রূপায়িত করলেন শিল্পী ? বেজেক্‌লিকের চিত্রকর যখন তুলি-হাতে এ প্রাচীরচিত্র আঁকতে বসেন তার অন্ততঃ সহস্রবর্ষ পূর্বে বুদ্ধের ঐ দুই মহান শিষ্য দেহরক্ষা



চিত্র—১১৮॥ বেজেক্‌লিক্‌-এর গুহাচিত্র।

করেছেন, অর্থাৎ পরিনির্বাণ লাভ করেছেন। এবং তাঁদের দেখতে যে কেমন ছিল তা কেউ জানে না। তাহলে বেজেক্‌লিক্‌ শিল্পী তাঁদের আঁকলেন কেমন করে ? নিছক কল্পনায় ? মনে করে দেখুন, অনুরূপ সমস্যার সমাধান রাফায়েল কী-ভাবে করেছিলেন। রেনেসাঁ-যুগের দিক্‌পাল

শিল্পী রাফায়েল আঁকতে বসলেন 'এথেন্সের আকাদেমি' ; কিন্তু সেই জ্ঞানপীঠের যেসব বিখ্যাত চরিত্র তাঁরা তো দেড়-দু হাজার বছর আগে গত হয়েছেন! রাফায়েল একটি সুন্দর কৌশল করলেন—অতীত যুগের দিকপালদের কল্পনাশ্রয়ী চিত্র আঁকলেন না, তাঁর সমসাময়িক দিকপালদের করলেন মডেল। প্লেটোর মডেল হলেন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, হেরাক্লিটাস-এর মডেল হলেন মিকেলাঞ্জেলো, জ্যামিতি-জনক পিথাগোরাস্-এর প্রতিকৃতি আঁকলেন কম্পাস-হাতে সমসাময়িক স্থপতিবিদ্ ব্রামান্টির আকৃতি অনুসারে। তাই ভাবছিলাম—বেজেক্লিক-শিল্পীও কি সারিপুত্র আর মহামোদ্গল্ল্যায়নকে রূপায়িত করতে স্থানীয় দুজন অর্হৎকে মডেল করে নিয়েছিলেন ?

পাঠককে অনুরোধ করব—সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে একবার অজন্তা সপ্তদশ-বিহারের 'সারিপুত্রের পরীক্ষা' চিত্রের কোন অনুলিপি দেখুন। না, এ-গ্রন্থের চিত্র-৫৫ নয়, আপনাকে তুলনা করতে হবে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া'-সম্পাদিত 'অজন্তা ম্যুরালস্' গ্রন্থের প্লেট নং Lxxv-এর সঙ্গে ডক্টর জিমার-এর 'দ্য আর্ট অব্ ইণ্ডিয়ান-এশিয়া'-র প্লেট নং ৬১৩। চিত্র—৫৫-র সঙ্গে চিত্র—১১৮-তে মিল খুঁজে না পেলে সে দোষ বর্তমান গ্রন্থকারের অপটু তুলির। প্রামাণিক গ্রন্থে মিলিয়ে দেখলেই বুঝবেন, বেজেক্লিক-শিল্পী তাঁর সমকালীন কোন বৌদ্ধ অর্হৎ-কে মডেল করেননি—অজন্তা-শিল্পীর আঁকা বৌদ্ধ অর্হৎ-দের তাঁর চিত্রে অনুকৃত করেছেন। সম্ভবতঃ এই অজন্তা-চিত্রের কোন অনুলিপি তিনি সেই মধ্য এশিয়াতে বসেই পেয়েছিলেন কোন পরিব্রাজকের সংগ্রহে।

উত্তরদিকের অভিযানে ক্ষান্ত দিয়ে আমরা যদি এবার সমুদ্রপথে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করি তাহলেও দেখব সেই একই দৃশ্য। সমুদ্রের ওপারে ভিন্ন দেশে ভিন্ন শিল্পীর দল তাঁদের স্থানীয় শিল্পের ধ্যানধারণার সঙ্গে ক্রমাগত মিশিয়েছেন ভারতীয় কলাকৌশলকে, ভারতীয় চিন্তাকে। ভারহুত-সাঁচী-অমরাবতী-অজন্তার কলা-চিন্তার তির্যক প্রতিফলন হয়েছে—সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, কাম্বোজে, চম্পায়, জাভায়। সিংহলের সিগিরিয়া-গুম্ফায় অপ্সরা-কিন্নরী-বোধিসত্ত্ব-জীবজন্তু যেন অজন্তার ভাবরূপ দিয়ে গড়া। সুদূর জাভা, বালি, বরবুদরে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী ভারতীয় শিল্পসৌকর্যে রূপায়িত। কাম্বোজের ওঙ্কারথম এবং ওঙ্কার-ভাটে নাগমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি ভারতীয় প্রভাবমুক্ত নয়। 'প্রভাবমুক্ত নয়' মানে একথা বলছি না যে, ঐ সব দূর-প্রাচ্যের শিল্প প্রচেষ্টা একমাত্র ভারতনির্ভর! অথবা ভারতীয় শিল্পীরাই গিয়ে সেগুলি গড়েছেন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপ যেভাবে এশিয়ার রাজনৈতিক অর্থ-নৈতিক জীবনে ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তার করেছিল—ভারত সেভাবে প্রাচীন প্রাচীতে নিজের শিল্পচেতনা কোথাও জোর করে চাপায়নি। অপরপক্ষে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব তার উপর পড়েছে, কিন্তু তাতে সে নিজস্ব ভারসাম্য হারায়নি। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের "The Foundations of Indian Culture"-গ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদ স্মরণ করা যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন

"মিশরীয়, ফিনিশীয় এবং অপরাপর প্রাচ্য-প্রভাবের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠেছিল গ্রীক সভ্যতা ; কিন্তু অ-হেলেনীয় বা 'বর্বর'-সভ্যতা থেকে গ্রীক-সংস্কৃতি সুস্পষ্টভাবে সরে থাকতে চেয়েছিল। আভ্যন্তরীন দান-প্রতিদানের উর্বর রূপান্তরের বৈচিত্র্যে এ-ভাবে সে কয়েক শতাব্দী ধরে বেঁচেও ছিল। প্রাচীন ভারতেও আমরা অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখেছি —পারিপার্শ্বিক সভ্যতার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আভ্যন্তরীন প্রাণ-প্রাচুর্যের দাক্ষিণ্যে সেও সজীব ছিল ; বরং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখেছি তার আন্তর-বৈচিত্র্য এবং আভ্যন্তরীন দান-প্রতিদান তাকে আরও অধিক পরিমাণে প্রাণবন্ত রেখেছিল। চীনের সভ্যতা একটি তৃতীয় উদাহরণ। গ্রীস আত্মকেন্দ্রিক থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি কোন যুগেই বাইরের প্রভাবকে অবাঞ্ছনীয় মনে করেনি। বরং বলব : নিজস্ব সুচয়ন-বৃত্তি, পরিপাক-শক্তি এবং বহিরাগত প্রভাবকে রূপান্তরের ক্ষমতা ভারতের পক্ষে রক্ষাকবচের কাজ করেছে।

বহির্বিশ্বের চিন্তাধারার অনুরণন সে অনুভব করেছে, হয়তো তাতে অভিভূতও হয়েছে ; কিন্তু হতচকিত হয়ে স্বধর্মকে পরিত্যাগ করেনি—আপন জারকরসে জীর্ণ করে সেগুলিকে স্বীয় সংস্কৃতির মধ্যে সুসংহত রূপ দিয়ে আপন করে নিয়েছে।"

তাই বলছিলাম, ভারত এইসব শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হতে চায়নি, বরং ওদের সঙ্গে একই তালে একই ছন্দে যৌথনৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছে, চক্রাবর্তন করেছে, দিয়েছে ও নিয়েছে ; —হয়তো দিয়েছে বেশী, নিয়েছে কম ; সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা, এরা সবাই সমধর্মী, যৌথনৃত্যের অংশীদার।

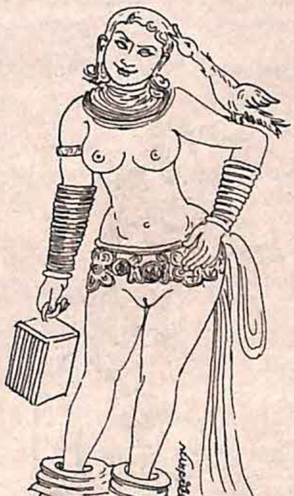
এ পরিচ্ছেদের সূচনায় আমরা সৌর-জগতের যে চিত্ররূপটি দিয়েছি সেটাই আবার বলি : শুক্র-মঙ্গল-বৃহস্পতির সঙ্গে পৃথিবী যেমন সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে, ঠিক সেইভাবে প্রাচীন-যুগে জাভা-বালী-চীন-জাপান-মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষও নিরন্তর চক্রাবর্তন করেছে। তাহলে এই শিল্প-সৌর-জগতের সূর্য কে? কোন্ অভিকর্ষ-শক্তিই বা এদের কেন্দ্রাতিগ বেগে কক্ষচ্যুত হতে দিল না সহস্রাব্দীকাল?

আসুন, সেই মূল প্রশ্নদ্বয়ের সমাধান খুঁজে দেখি এবার :

একটা শাশ্বতকালের শিল্পভাবনাকে ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক : নারীর সৌন্দর্য!



চিত্র—১১৯ ॥ মহেন জো-দারোর সুন্দরী।



চিত্র—১২০ ॥ মথুরা যক্ষিণী।



চিত্র—১২১ ॥ সাঁচী বৃক্ষিকা।

আমাদের আলোচনার সুবিধা হবে যদি আমরা প্রাচীন-প্রাচীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের কয়েকটি উদাহরণ পাশাপাশি সাজিয়ে পরীক্ষা করি। চিত্র—১১৯ থেকে চিত্র—১২৪-এ তাই করা হয়েছে। এই শিল্পসামগ্রীগুলি ভিন্ন কালে ভিন্ন দেশে শিল্পীরা রূপায়িত করেছেন ; কিন্তু প্রত্যেকটির মূল প্রতিবেদন অভিন্ন : নারী দেহের সৌন্দর্য!

ঐ শিল্প-সম্পদগুলির উপর চোখ বুলালে একটা সত্য আমরা অনুভব করব : ওরা একজাতের। কেন ওরা একজাতের? কী ওদের সমধর্মিতা? না, এখনই তা বুঝিয়ে বলতে

পারছি না। কিন্তু ঐ সঙ্গে যদি আর এক সারি শিল্পসামগ্রী পশ্চিমখন্ড থেকে সংগ্রহ করে এনে সাজিয়ে দিই তবে সহজেই বলতে পারব : ওরা ভিন্‌জাতের। ধরা যাক, ভেনাস-ডি মেলো, রাফায়েলের মাদোনা, লিওনার্দোর মোনালিসা, তিশান-জর্জনে-রুবেন্স-এর ভেনাস, কিম্বা রেনোয়া দেগাদেলাক্রোয়ার স্নানরতা—তাহলে একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি—যদিও দুটি তালিকাতেই মূল প্রতিবেদন অভিন্ন : অনাবৃতা নারীদেহের সৌন্দর্য, তবু ওরা ভিন্‌-জাতের!

নারী দেহের সৌন্দর্য

বিষয়বস্তু যখন অভিন্ন, নারীদেহের সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য-সুষমার প্রতিবেদন যখন দেশ-কাল-নিরপেক্ষ মোটামুটি শাশ্বত—তখন কেন ঐ দুটি তালিকাভুক্ত রমনীকুলের চিত্র ভিন্ন জাতের? ভৌগোলিক অথবা সময়ের দূরত্বটাই কিন্তু এই বৈসাদৃশ্যের মূল কথা নয়। বিচার করে দেখুন—মহেন্‌-জো-দারো (চিত্র—১১৯) এবং যবদ্বীপের (চিত্র—১২৪) মধ্যে যতটা ভৌগোলিক দূরত্ব গ্রীস-ইতালী ভারত থেকে অত দূরে নয়। মথুরা যক্ষিণীর (চিত্র—১২০) তুলনায় ভেনাস-ডি-মেলো-র সময়ের দূরত্ব মহেন্‌-জো-দারোর চেয়ে কম। তাহলে?

ভারতবর্ষ নারী-সৌন্দর্যের তিনটি রূপান্তর দেখেছিল—নারীর মাতৃভাব, সখীভাব ও কন্যাভাব। প্রথমটি এসেছে প্রাগৈতিহাসিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধ্যান-ধারণা থেকে। এই মাতৃভাবের চিন্তাটি পশ্চিমখন্ডেও ছিল—তা রূপায়িত হয়েছে অসংখ্য মাদোনায়, মেরী-মাতার মূর্তিতে। আমরা এখানে যে ছয়টি মূর্তি সন্নিবেশিত করেছি তাদের কারও মাতৃভাব



চিত্র—১২২ ॥ কার্লে চৈত্য—দাতার সহধর্মিণী।



চিত্র—১২৩ ॥ সিংহল-অপ্সরী।



চিত্র—১২৪ ॥ সুজাতা-বরবুদর।

প্রকট নয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখব, চিত্র—১২২ এবং চিত্র—১২৪-এর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে কন্যাভাব—বাকি চারটির হচ্ছে সখীভাব, তারা নায়িকা।

রমণী দেহের সৌন্দর্য-সুষমার বিষয়ে নির্দেশ দেবার সময় ভারতীয় শিল্পাচার্যরা যেন খুলে বসেছিলেন সংস্কৃত-কাব্যে নায়িকার বর্ণনা। তার মধ্যদেশ হবে ক্ষীণ, উপরে ও নীচে যৌবন বীচিভঙ্গ ; তার উরসে যৌবনের যুগ্ম জয়স্তম্ভ। উপস্থাপিত ছয়টি নারীমূর্তির প্রত্যেকটিতেই সেই কাব্য-নায়িকার সুলক্ষণগুলি সুস্পষ্ট—শুধুমাত্র ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি

প্রথম উদাহরণটিতে। কারণটা বলা বাহুল্য—সেটি নির্মিত হয়েছিল হিন্দু কবিকুলের জন্মের বহু পূর্বে, বস্তুতঃ হিন্দুধর্মের আদিগ্রন্থ 'বেদ' রচিত হওয়ারও পূর্বে। তা হোক, তবু যদি আমরা চিত্র—১১৯ এবং চিত্র—১২০-র মধ্যে তুলনামূলক বিচার করি, তাহলে দেখব ওদের সাদৃশ্যও বড় কম নয়। সে সাদৃশ্য ওদের মণিবন্ধে অলঙ্কার প্রাচুর্যের জন্য নয়, দেহ-ভঙ্গিমার জন্য নয়—সে সমধর্মিতার মূল আরও গভীরে। ওরা দুজনেই মাজায় হাত রেখে বিচিত্র ঠামে দর্শকের দিকে রহস্যময়ী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওদের ওষ্ঠপ্রান্তে একই জাতের আস্য, কৌতুকময়ীর কটাক্ষে একই জাতের লাস্য,—বোধকরি ওদের জীবনদর্শনেও একই জাতের ভাষ্য। কী ওদের ব্যঞ্জনা? প্রথমটি প্রাচীনতর, মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপনে তার সূক্ষ্ম বর্ণিকাভঙ্গ বিনষ্ট—তাই দ্বিতীয়াকেই আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে পারি। দেখছি, মথুরা-যক্ষিণীর পদতলে মৃত্যু-অসুর পিষ্ট হচ্ছে—সে মৃত্যুঞ্জয়ী। না, ব্যক্তিগত জীবনে সে মৃত্যুকে জয় করেনি—তোমার-আমার মত সেও মরণশীল। তবু দার্শনিক বার্গসঁ যাকে বলেছেন জীববিবর্তনের পথে 'জীবন-অমৃত' সেই অমৃতের সন্ধান সে পেয়েছে ; ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত জীবনে যৌবনের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে সে নন্দন-তত্ত্বের মূলকথা, প্রজনন-তত্ত্ব জেনেছে। তার দক্ষিণ হস্তে একটি পিঞ্জর—কিন্তু তার পোষ-মানা শুকপক্ষীকে সে পিঞ্জরাবন্ধ করেনি, পাখীটি আছে তার কাঁধে। ও জানে, প্রেমের নিগড় দিয়ে দয়িতকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন—বন্ধনের মধ্যেই প্রেমের মুক্তি, নন্দন-তত্ত্ব সেই শিক্ষাই দিয়েছে তাকে। তাই শিল্পী ওর পদতলে পরাভূত মৃত্যু-অসুরকে খোদাই করেই ক্ষান্ত হননি, ঐ নায়িকার উপরে গড়েছেন এক মিথুন-মূর্তি। ঐ যুগলমূর্তির আনন্দঘন প্রেমরসই দর্শককে বুঝিয়ে দিচ্ছে কী-ভাবে ঐ যক্ষিণী মৃত্যুকে জয় করেছে। মৃত্যু যদি মরজীবনের অন্ত-রস, তবে ঐ রসিকা সন্ধান পেয়েছে প্রজনন-তত্ত্বে আদি-রসের। আর তাই ও দর্শকের দিকে তাকিয়ে হাসছে ; সে হাসিতে আছে আহবান! মরণ-সমুদ্রে জীবন-তরী ভাসাতে ভীত দর্শককে ডেকে যেন ঐ নায়িকা তার বিলোল-কটাক্ষে আর মোহময়ী আস্যে বলছে,

> "কিম্ তত্র পৃচ্ছয়তে যুস্মাকম্ খলু প্রেমনির্মাণজালে।
> মদনসমুদ্রে স্তননিতম্বজঘনয়োর্যানপাত্রাণী মনোহরাণী॥

মৃচ্ছকটিকে বিদূষক বলছেন—সমুদ্রযাত্রায় জলযানের কথা কেন চিন্তা করছেন মহারাজ, বসন্তসেনার স্তননিতম্বজঘন-যান থাকতে এ শৃঙ্গার-সাগর পাড়ি দিতে আর ভয় কি?

তৃতীয় উদাহরণটি (চিত্র—১২১) সাঁচীর পূর্ব-তোরণশীর্ষস্থিতা এক 'বৃক্ষিকা'র—বনদেবীর। যৌবনের জয়মাল্য তারও করায়ত্ত। দেহবল্লরীতে তার প্রাণ-প্রাচুর্য বিস্ময়কর। অলঙ্কারের বাহুল্য ওকে পীড়িত করেনি—কটিদেশে প্রলম্বিত রত্নহার এবং হস্তপদাদির মণিবলয় সত্ত্বেও তার নারীত্ব বিকচিত।

ঐ মদালসা বৃক্ষিকার সঙ্গে এবার যদি চতুর্থ উদাহরণটি (চিত্র—১২২) তুলনা করেন, তাহলে একটি বৈপরীত্য নজরে পড়বে। কার্লে-মন্দিরের ঐ নারীমূর্তিটির যৌবন-সম্ভারেও কোন ঘাটতি নাই—বর্তুলাকার পূর্ণ-বিকশিত উরস, ক্ষীণ মধ্যদেশ, গুরুনিতম্ব এবং যুগ্ম-কদলীবৃক্ষের ন্যায় জানুদ্বয়ে নারী সৌন্দর্যের সে-এক অনুপম উদাহরণ। তবু মনে হয়, ওর আবেদন অন্যজাতের। ওর হাসিটি মোহময়ী নয়, পরিতৃপ্তির ; ওর সুঠাম ভঙ্গিমায় রত্যাতুরা-রমণীর প্রদর্শনবাদ নেই, আছে সাফল্যের সনদ। বস্তুতঃ এ রমণী দাতার সহধর্মিণী, নিজ যৌবন বিজ্ঞাপিত করতে সে প্রগল্‌ভার মত মন্দিরদ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়নি। এর আবেদন পুরোপুরি বোঝা যেত যদি এর স্বামীর মূর্তিটাও পাশে এঁকে দিতুম—কারণ ওরা দুজন তথাগতের মন্দির-দ্বারে দ্বারী হয়েই দাঁড়াতে এসেছে। কার্লে চৈত্যে বুদ্ধদেবকে চিরস্থায়ী আসনে বসাতে পেরে ওরা দুজন পবিতৃপ্ত। তাই ঐ বিকচ-যৌবনার মূল প্রতিবেদন শ্রদ্ধার ; তাই ওর কন্যাভাব।

কন্যামূর্তি'ই যদি, তাহলে ও বিকচ-যৌবনা কেন? এক কথায় জবাব দেওয়া মুশকিল। যে প্রশ্নটা তোমার-আমার মনে জাগল, তা দু-হাজার বছর আগে জাগত না শিল্পী-দর্শকের মনে। ওদের কাছে ওটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। নারীমূর্তি—তা সে মাতৃভাবই হোক আর কন্যা-ভাবই হ'ক—হবে সুন্দরী নায়িকার ; এবং সে সৌন্দর্য কাব্যে নারীরূপ বর্ণনার সঙ্গে তাল রেখে চলবে। প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে এই ব্যাপারটাই তলিয়ে বুঝে নিই :

য়ুরোপ-খণ্ডে রেনেসাঁ-পরবর্তী যুগে লক্ষ্য করে দেখেছি, প্রতিটি চিত্রকর সমসাময়িক নারীর প্রতিকৃতি বা 'পোর্ট্রেট' আঁকবার সময় তাদের যৌনাঙ্গগুলি সঙ্গোপনে রেখেছেন। গ্রীক দেবদেবীর, রোমক স্ত্রীলোকের, বাইবেল-বর্ণিত নারীচরিত্রের স্তনদ্বয় তাঁরা বারে বারে এঁকেছেন—কোন কোন স্থলে নারীমূর্তিকে নগ্নিকা করে আঁকবার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া যায় না (উদাহরণ স্বরূপ : জর্জনের 'দ্য টেম্পেস্ট' কিম্বা Fete Champetre, অথবা 'মানে'-র 'Luncheon on the Grass')। সম্ভবতঃ মধ্যযুগের খ্রীষ্টান যাজকদের কড়া অনুশাসন ভেঙে যখন রেনেসাঁ যুগে অনাবৃতা নারীদেহের সুষমা নূতন করে আবিষ্কৃত হল তখনই এল এই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি। সে যাইহোক, যে কথা বলছিলাম—সমসাময়িক সামাজিক রমণীর প্রতিকৃতিতে পশ্চিমের চিত্রকর যেন 'টাবু' হিসাবে তার বক্ষাবরণে হাত দেননি। ইয়ান-ভ্যান আইক-এর 'গিওভান্নি ও তাঁর স্ত্রী' থেকে শুরু করে ওয়েডেন-এর 'পোর্ট্রেট অব এ লেডি', লিওনার্দোর 'গিনেভ্‌রা দেই বেনসী' অথবা 'মোনালিসা', তিশানের 'লা বেলা', এমনকি আধুনিককালেও ঐ 'টাবু' মেনে চলা হয়েছে। দেলাক্রোয়ের 'মাদমোয়াজেল রোজ' অথবা মানের 'অলিম্পিয়া' প্রভৃতিকে ব্যতিক্রম বলব না, কারণ 'রোজ' অথবা 'Victorine Meurend' (অলিম্পিয়ার মডেল) সামাজিক মর্যাদা-সম্পন্না মহিলা নন, সর্বজনস্বীকৃতা মডেল। বরং বলব, ঐ অলিখিত, 'টাবু'-র বন্ধন ছিন্ন করতে হলে চিত্রকরকে দু-খানি ছবি আঁকতে হয়েছে—একটি গোপনে ; যথা দা-ভিঞ্চির তথাকথিত 'অনাবৃতা মোনালিসা' অথবা গোইয়ার 'মাজা দ্য ন্যুড'। তুলনায় ভারতবর্ষে দেখছি, অসংখ্য সমসাময়িক নারীমূর্তি চৈত্য-বিহারের বহির্দ্বারে উৎকীর্ণ করা হয়েছে—অধিকাংশই দাতার সহধর্মিণী, যেখানে রমণী সগৌরবে স্তনযুগল বিকশিত করে দণ্ডায়মানা। জানি না,—সে-যুগে ভারতীয় আর্যনারী ও-ভাবে বিকচ-উরসা-রূপে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন কি না, অথবা শিল্পী তাঁর কল্পনায় ঐ প্রত্যঙ্গ রূপায়িত করার শৈল্পিক ও সামাজিক অনুমোদন লাভ করেছিলেন কি না। এই প্রসঙ্গে আরও বলব—মন্দির বা চৈত্য-বিহারে রূপায়িত দাতার সহধর্মিণীদের স্তনদ্বয় উৎকীর্ণ করা হলেও, কোথাও তাঁদের নিম্নাঙ্গ প্রকট করা হয়নি, যেভাবে দাঁড়িয়েছে মহেন-জো-দারোর নায়িকা, সাঁচীর বৃক্ষিকা অথবা মথুরার যক্ষিণী।

পঞ্চম উদাহরণটি সিংহলের গুহাপ্রাচীর থেকে সংগৃহীত (চিত্র—১২৩)। সিংহল-অপ্সরী মেঘান্তরাল থেকে পৃথিবীতে পুষ্পবর্ষণ করছে। এ-চিত্রে অজন্তার প্রভাব অতি সুস্পষ্ট, যদিও বলব—অজন্তার বর্ণিকাভঙ্গ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাব-ব্যঞ্জনার ঔৎকর্ষ লাভ করতে পারেননি সিংহলী-শিল্পী। সংস্কৃত কাব্যে রমণীর স্তনবর্ণনার প্রচলিত উপমান—স্বর্ণঘট, দাড়িম্ব প্রভৃতি এ-ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ প্রযোজ্য হতে পারে না, তবু সংস্কৃত কাব্যকে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে, এ-কথাও বলতে পারি না। স্বয়ং কালিদাস কি তাঁর নায়িকা যক্ষিণীর বর্ণনায় বলেননি 'স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং'?

শেষ উদাহরণটি (চিত্র—১২৪) বরবুধর, জাভা থেকে সংকলিত। এখানেও কন্যাভাব। মূর্তিটি গোপবালা সুজাতার ; পায়স-ভাণ্ড নিয়ে সে মরণোন্মুখ সন্ন্যাসীর দিকে এগিয়ে চলেছে। তাই এই বিকচ-যৌবনার ভিতরেও আমরা মোহিনীরূপ দেখি না, যা দেখেছি পূর্ব উদাহরণগুলিতে। তাই এখানেও দেখছি কন্যাভাব, যা মাতৃভাবেরই রূপান্তর। এবং সে-জন্য এ মূর্তিটির সঙ্গে ভাবের রাজ্যে ছয়টি উদাহরণের ভিতর একমাত্র কার্লে-রূপসীই সমধর্মী। এতক্ষণে আমরা হয়তো একটু একটু বুঝতে পারছি—সংকলিত ছয়টি শিল্পসামগ্রীর মধ্যে

আন্তর যোগসূত্রটা কোথায়, কেন তারা পশ্চিমখণ্ডের অনুরূপ একসারি রমণীর স্বগোত্র নয়। পশ্চিমখণ্ডেও মাতৃভাব আছে—অসংখ্য মাদোনায়, মেরী মাতার রূপায়ণে। কিন্তু সেখানে মাতৃমূর্তিতে নারীত্বের উপর একটি কুজ্ঝটিকার প্রলেপ আছে ; মাদোনা-মূর্তির স্তন বিকশিত হলেও তা শুধু শিশুপুত্রের জন্য, রমণ-অনুষঙ্গাঙ্গ নয়। ভারতবর্ষে মাতৃমূর্তিকে নায়িকা করায় বাধা ছিল না—কুমারসম্ভবের কবি তাই তাঁর নায়িকা জগজ্জননীকে অষ্টম সর্গের শেষ সীমান্তে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

প্রতীচ্য 'অ্যাপোলো-ভেনাস'কে মূল খুঁটি করে বহিরঙ্গের মাধ্যমেই অন্তরঙ্গের চরম উৎকর্ষের সন্ধান করেছে—শিল্প সেখানে কাব্যধর্মী নয়, জীবনধর্মী ; অপরপক্ষে প্রাচ্যজগত শিল্প-শাস্ত্রকারদের নির্দেশকে মূল খুঁটি করে কাব্য ও মহাকাব্যের অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনাকে শিল্পের দর্পণে প্রতিফলিত করতে চেয়েছে। এখানে শিল্প ভাবরূপী, কাব্যধর্মী, বাস্তব জীবনধর্মী নয়। শাস্ত্র নির্দেশ কোথাও তার বাধা হয়নি, হয়েছে সোপান। সমস্ত প্রাচ্য জগৎ একই শিল্পচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল—ধ্যানের জগতে শিল্পের অন্তরঙ্গের অভিসারে তার যাত্রা। আর তাই একদিকে তক্ষশীলা, তুনহুয়ান, অপরদিকে আঙ্কর-ভাট, বরবুদর—একদিকে সিংহল অপর দিকে জাপান—তারা সবাই একই আবর্তনছন্দে মেতেছে।

এ পরিচ্ছেদের প্রথমে সৌর-জগতের যে উপমাটা দিয়েছিলাম 'মিলটনী'-সম্প্রসারণে সেটাকেই বলতে পারি—এ শিল্প-সৌর-জগতে ভারহুত-গয়া-সাঁচীর ত্রয়ী হচ্ছে সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ—বুধ। তুনহুয়ান, বরবুদর অথবা জাপান সে তুলনায় হয়তো ইউরেনাস-নেপচুন-প্লুটো। বিশালায়তন মহাচীন সে উপমায় বোধকরি বৃহস্পতির উপমান—আর আমাদের অজন্তা এই পৃথিবীর মত জীবনরসে অভিষিক্ত সূর্যপ্রদক্ষিণরত একটি গ্রহমাত্র।

জানি, পাঠক এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে অনিবার্য শেষপ্রশ্নটি দাখিল করবেন : তাহলে কেন্দ্রস্থিত সূর্য কে?

উত্তরে অনিবার্য জবাবটিকেই দাখিল করতে হবে আমাকে : তথাগত বুদ্ধ!

আশা করি, এতক্ষণে বোঝা গেছে যে, যৌথনৃত্যের অংশীদারদের কেন 'তনু তনুতে বাঁধনহারা', নৃত্যরসে কেন ওদেব চিত্ত উচ্ছল হয়ে বাজছে ; কেন বন্দনা ওদের ভঙ্গিতে, ওদের সঙ্গীতে। বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থানকারী ওরা সবাই চৈত্যপ্রদক্ষিণরত একদল শ্রদ্ধাবিনম্র শ্রমণ!

অভিকর্ষের বন্ধন? কেন্দ্রাতিগ-বেগে যা ওদের কক্ষচ্যুত হতে দিল না? তার সন্ধান পাবেন ত্রিরত্নের অপর দুটি ধ্যানমন্ত্রের রত্নে : ধম্মং শরণম্ গচ্ছামি! সঙ্ঘং শরণম্ গচ্ছামি!

দূর-দূরান্তের ঐসব ভক্তদের পথ দেখাতে অজন্তা অনির্বাণ-শিখায় তার পঞ্চপ্রদীপখানি জেলে রেখেছে। কী সেই পঞ্চপ্রদীপ? কী সেই অজন্তা-শিল্পীর মূল প্রতিবেদন? প্রফেসর লরেন্স বিনিয়ন এককথায় তার জবাবে বলেছেন : জীবন!

আমার মন মানে না। 'জীবন'কে নিশ্চয়ই দেখিয়েছেন তাঁরা—নানা ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছেন। কিন্তু সে তো মহাকবিরাও দেখিয়েছেন। দেখাননি বাল্মিকী? দেখাননি বেদব্যাস? কিন্তু মহাকাব্যের মূল প্রতিবেদন কি শুধু জীবন-বৈচিত্র্য? লক্ষকে তাঁরা দেখিয়েছেন—কিন্তু লক্ষের লক্ষ্য কি 'এক' নয়? অযুত চরিত্রের অসংখ্য বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে কি বাল্মিকী-বেদব্যাস শোনাননি উপনিষদের সে ধ্যানমন্ত্রটি?

অজন্তার মূলমন্ত্র

> যঃ একবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান নিহিতার্থ দধাতি।
> বীচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ সঃ দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

—সেই একবর্ণাই বহুধাবিভক্ত হয়েছেন, তিনি আদিতে, মধ্যে এবং অন্তেও আছেন সেই পরমপুরুষ আমাদের শুভবুদ্ধিতে নিযুক্ত রাখুন।

অজন্তার মহাশিল্পীও নানা অলংকারে, নানা আভরণে সাজিয়েছেন তাঁদের মন্দির—'একবর্ণা' কী-ভাবে 'বহুধা' হয়েছেন তা দেখিয়েছেন—কিন্তু লক্ষের লক্ষ্য এখানেও সেই এক। এখানেও তাই অজন্তাশিল্পী পাষাণগাত্রে উৎকীর্ণ করেছেন এই মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী :

অলঙ্কৃতান্তে কুসুমৈর্মহীরুহাণ্ তরিদ্‌গণায়ৈঃ তোয়ভির্লম্বিত গণাঃ।
সরাংসী মত্তভ্রমরৈঃ সরোবরাভির্গুনৈর্বিশেষাধিগতৈঃ তু দেহিনঃ॥

অর্থাৎ মহীরুহকে অলঙ্কৃত করে কুসুম, মেঘস্তবক সুসজ্জিত হয় বিদ্যুৎ-মালায়, মত্ত-ভ্রমর-পরিবেষ্টিত শতদলই সরোবরকে সুন্দর করে তোলে—তেমনি দেহধারীর কাছে সৎগুণই হচ্ছে একমাত্র অলঙ্কার। অর্থাৎ,—'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু!'

সেই চিত্তশুদ্ধির পর্ব শেষ হলে বিগতকল্মষ শ্রমণ তাঁর পঞ্চপ্রদীপ তুলে ধরে ভক্তদের দেখাবেন পরম সত্যকে। যারা বলে, প্রদীপ ধরে সূর্যকে দেখানো যায় না, তারা ভুল বলে। ভক্তির রাজ্যে ভঙ্গুর মাটির প্রদীপ তুলে ধরেই সূর্যারতি করতে হয়। অজন্তাশিল্পীর নিরলস সাধনা এই সৌর-জগতের সেই আদিত্যবর্ণকেই দেখানো :

গবাক্ষনির্যূহসুভিদিবেদিকাসুরেন্দ্রকান্যাপ্রতিমাদ্যালঙ্কৃতম্।
মনোহরাস্তম্ভঃ.................... রা চৈত্যমন্দিরম্॥*

অর্থাৎ "গবাক্ষ-দ্বার-চিত্রশোভিত প্রাচীর, ইন্দ্র-গন্ধর্ব-কিন্নর সমন্বিত মনোহর স্তম্ভ পরিশোভিত এই গুহানিচয়—এইসব কিছুই গর্ভগৃহের অভ্যন্তরস্থ সেই মহাকারুণিকের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।"

এই বাণীই অজন্তার শেষ কথা!

---

* এই উদ্ধৃতিটি ষোড়শ গুহাবিহারের বহিঃস্থ অলিন্দে উৎকীর্ণ একটি শিলালেখের অংশ। শিলা-লিপিতে ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃতে সাতাশটি চরণ ; উদ্ধৃত অংশ—দশম শ্লোকের যেটুকু পাঠোদ্ধার করা গেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শেষ প্রণাম

অজন্তাবাসের মেয়াদ আমার শেষ হয়ে এল। যাবার দিন সকালে বসেছিলুম বাগোড়া নদীর ধারে মীর্জা ইসমাইলের সঙ্গে। গুহা-মন্দিরের দ্বার তখনও খোলেনি, শুরু হয়নি যাত্রীদের ভীড়। কথা প্রসঙ্গে ইসমাইল সাহেব বলেন—ইয়াজদানী বলেছেন, The artist, to enhance the emotional effect of the scenes, has delineated Madri with all the charms of youth and beauty which he could imagine.

শুনে আমি বলেছিলুম—বোধ করি সেটাই একমাত্র কারণ নয়। করুণ কাহিনীটিকে হৃদয়গ্রাহী করবার উদ্দেশ্যেই শিল্পী মাদ্রীকে অপরূপ সুন্দরী করে চিত্রিত করেননি। সম্ভবতঃ কারণটি আরও গভীরে নিহিত।

উনি বলেন—কি রকম?

বলি—পালি ভাষা আমি জানি না, কাল রাত্রে মূল জাতকের আক্ষরিক অনুবাদ পড়ছিলুম। পড়ে আমার মনে হয়েছে, জাতককার বিশ্বান্তরের মহানুভবতা প্রচারে এতই মুখর যে, মাদ্রী-চরিত্রটির অন্তর্গূঢ় বেদনার কথা বলবার সময় স্বতঃই স্বল্পভাষ হয়ে পড়েছেন। মাদ্রীর প্রসঙ্গ সেখানে অতি অল্পই আছে।

ইসমাইল সাহেব হেসে বলেন—আপনি এ গল্প আপনার বইয়ে লেখবার সময় নিশ্চয় জাতককারের এ ত্রুটি সংশোধন করে নেবেন।

আমি বলি—কথাটা ঠিক হল না, ইসমাইল সাহেব। জাতককারের রসবোধের অভাবের প্রতি ইঙ্গিত করছি না আমি। মহৎ সাহিত্যের বোধহয় এই লক্ষণ। আপনি বাঙলা ভাষা জানেন না, না হলে একটি উদাহরণ দিতুম। বাণভট্ট অথবা বাল্মীকির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও এ-জাতীয় অভিযোগ এনেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। গত যুগের মহাকবির উপেক্ষায় ক্ষুব্ধ হয়ে এ-যুগের মহাকবি পত্রলেখা আর ঊর্মিলা চরিত্রের মর্যাদা মিটিয়ে দিতে লেখনী ধারণ করেছিলেন।

উনি বলেন—এখানে কি বলতে চাইছেন?

আমি বলতে চাই, জাতককার মাদ্রী-চরিত্রটি চিত্রণে যে অবহেলা, যে উপেক্ষা দেখিয়েছেন, তাতে ক্ষুব্ধ হয়েই অজন্তার শিল্পী সেই কাব্যে-উপেক্ষিতার আলেখ্য আঁকবার সময় সৌন্দর্যের পরিপূরকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছেন মাদ্রীর অপ্রাপ্ত মর্যাদা!

ইসমাইল বলেন—তা তো বুঝলাম, কিন্তু অজন্তার শিল্পী স্বয়ং যে চরিত্রটির প্রতি অবহেলা করেছেন, উপেক্ষা করেছেন, তার মর্যাদা তাহলে কে মেটাবে?

—কার কথা বলছেন আপনি?

—ভেবে দেখুন। নাগরানী সুমনা খুঁজে পেয়েছে চম্পেয়্যরাজকে, মাদ্রী ফিরে পেয়েছে তার স্বামীপুত্রকে, সীবলীর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে পরজন্মে, মহাজনকের পুত্রকে জঠরে ধারণ করেছে সে। জন্ম-জন্মান্তরে বোধিসত্ত্ব এগিয়ে গেছেন পরম পরিণতির দিকে—শেষ জন্মে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, তাঁর মহাপরিনির্বাণ হয়েছে। কিন্তু বাবুজি, আমার যশোধরা মায়ের পরিণতি কি? অজন্তা গুহায় তাঁকে শেষবার দেখেছি কপিলাবস্তুর প্রাসাদ-তোরণে মহাভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে—জেনেছি, তারপর উপেক্ষিতা অবহেলিতা রাজবধূ নিদারুণ অভিমানে পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন পিতার কাছে, তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন পিতৃধন প্রার্থনা করতে। তাঁর সে ছেলে আর ফিরে আসেনি! তাঁকে মূর্ছাতুর অবস্থায় রেখে রাজা শুদ্ধোধন ছুটে গিয়েছিলেন ন্যগ্রোধারামে। ব্যস্, তারপর তাঁর কথা বলতে ভুলেছেন শিল্পী! বাবুজি,

আমি মুসলমান,—বুদ্ধদেবকে আমি মহামানব হিসাবে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার যশোধরা মাকেও কম শ্রদ্ধা করি না। অজন্তার শিল্পীদের দেখা পেলে আমি বলতাম—গৌতমবুদ্ধের মহানুভবতা প্রচারে তুমি এতই মুখর যে, আমার মা-যশোধরার পরিণতি দেখাতে ভুলে গেলে তুমি!

আমি অবাক হয়ে দেখি, বলিরেখাঙ্কিত বৃদ্ধের মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে! তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য আমি বলি—আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন। ফর্দাপুর গ্রাম তো অজন্তা গুহা থেকে মাত্র তিন মাইল। এ গ্রামে লোকজনের বাস নিশ্চয়ই তিন-চারশ' বছরের। অথচ ওরা জানত না এত কাছের এই গুহা-মন্দিরগুলির অস্তিত্ব?

মীর্জা ইসমাইল ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন নিজেকে, বলেন—ওরা জানত না ধরে নিচ্ছেন কেন?

—তাহলে বাইরের দুনিয়া এতবড় খবরটা জানতে পারল না কেন?

—জানবে কেমন করে? এটাকে তো ওরা মস্ত বড় কোন খবর মনে করেনি। ওদের বিশ্বাস এ খুবই স্বাভাবিক। ক্যানিংহ্যাম সাহেব ফর্দাপুর গ্রামে খোঁজখবর করেছিলেন। গাঁওবুড়ো তাঁকে বলেছিল—ও গুহার কথা তো আমরা বরাবরই জানি। আমাদের খুড়ো-জ্যাঠা-বাপ-পিতামোঁ সব্বাই জানত।

সাহেব কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—ওই গুহার মধ্যে অমন সব ছবি কারা এঁকে গেছে জানবার কৌতূহল হয়নি তোমাদের?

সাহেবের অনভিজ্ঞতায় হেসেছিল গাঁওবুড়ো, বলেছিল—জানব না কেন? সবই তো জানি। ওগুলো তো ছবি নয়, ওগুলোর পিছনে মস্ত এক কাহিনী আছে।

অতঃপর গাঁওবুড়ো সাহেবকে শুনিয়েছিল সে ইতিকথা :

অনেক—অনেকদিন আগে—সে কত কুড়ি বছর আগেকার কথা তো বলতে পারব না; কিন্তু তখন আকাশের পাখী আর গাছ-পাথর-নদী-ফুল, সব মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারত। স্বর্গের দেবদেবীরা স্বর্গবাসের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে এসে ধর্না দিলেন একদিন, বললেন—প্রভু, একরাতের জন্য আমাদের মর্ত্যে গিয়ে বনভোজন করে আসবার অনুমতি দিন। ইন্দ্র বলেন,—তা যাও, কিন্তু হুঁশিয়ার! মনে রেখ, সকালের আলো ফোটার আগেই, প্রথম পাখীর ডাক শোনার আগেই, সকলকে স্বর্গে ফিরে আসতে হবে। তা না হ'লে স্বর্গের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু। দেবদেবী-গন্ধর্ব-কিন্নর-অপ্সরার দল খুশীয়াল হয়ে ওঠে। দলে দলে ওরা হাওয়ায় ভেসে ভেসে নেমে এল মর্ত্যে। এই বাগোড়া নদীর গুহাগুলি দেখতে পেয়ে তারা স্থির করে, খেয়াল-খুশিতে এখানেই কাটিয়ে দেবে একটা পৌষালী ছুটির দিন। ওরা বাগোড়ায় নেমে স্নান করে এল। গাছের শুক্‌নো পাতা কুড়িয়ে এনে খিচুড়ি বানালো। মহা আনন্দে কেটে গেল একটা দিন আর একটা রাত। কিন্তু গুহার অন্ধকারে ওরা ভুলে গেল পূব-আকাশের দিকে নজর রাখতে। ওদের অজান্তে ক্রমে ফর্সা হয়ে এল পূব-আকাশ, ভোরের ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে—অন্ধকার গুহার ভিতর ওরা জানতেও পারল না। শেষ মেশ সবাইকে চম্‌কে দিয়ে ডেকে উঠল ভোরের কুঁকড়ো! ব্যস! বন্ধ হয়ে গেল স্বর্গের সোনার দরজা! আটক পড়ে গেলেন ওঁরা। যে যেখানে যেভাবে ছিলেন বন্দী হয়ে পড়লেন গুহার দেওয়ালে—কেউ ছবি, কেউ স্রেফ পাথর!

কাহিনী শেষ করে মীর্জা ইসমাইল বলেন—কী মুর্খ ছিল ওরা!

আমি বলি—এ গল্প শুনে কিন্তু ওদের মুর্খামির কথাটাই আমার সর্বাগ্রে মনে পড়েনি। আমি ভাবছিলুম—কী সুন্দর উপকথাটি। ভাবছিলুম, যদি ওদের মতো সরল বিশ্বাসে এ কাহিনী মেনে নিতে পারতুম।

ভ্রূ কুঞ্চিত হয় ইসমাইল সাহেবের। বলেন—আপনি বিশ্বাস করতে চান এ আষাঢ়ে গল্প?

বলি—ইসমাইল সাহেব, বিশ্বাস করি এ-কথা তো আমি বলিনি। কিন্তু এই অজন্তা-চিত্রের রসোপলব্ধির জন্য আপনি-আমি তো অনায়াসে মেনে নিয়েছি—জন্মমাত্র বিশ্বান্তর মায়ের কাছে দানের সামগ্রী চায়, মেনে নিয়েছি বোধিসত্ত্বের সঙ্গে মৃগীর মিলনে ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্রের জন্ম হতে পারে, স্বীকার করে নিয়েছি ষড়দন্ত হস্তীর অস্তিত্ব, বিশ্বাস করেছি সুতসোম-জাতকের অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। কিংবদন্তীটিকেও মেনে নিলে যদি রসের রাজ্যে লাভবান হই, তবে একেই বা স্বীকার করে নেব না কেন?

অনেকক্ষণ ইসমাইল সাহেব কোন জবাব দিলেন না। তারপর দূর-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন—বাবুজি, তাহলে আপনাকে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। এ-কথা আজও কাউকে বলিনি—জানতুম কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে পাগলা বুড়োর ক্ষ্যাপামি। আপনাকেও আমি এ-গল্প বিশ্বাস করতে বলছি না—মনে করুন এ-ও এক আষাঢ়ে গল্প। দেখুন, একে মেনে নিলে যদি রসের রাজ্যে লাভবান হতে পারেন।

উপলবন্ধুর বাগোড়া নদীর প্রবহমান স্রোতের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মতো বৃদ্ধ মীর্জা ইসমাইল অতঃপর বলতে থাকেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা :

এখানে যখন আমি প্রথম চাকরি নিয়ে আসি, তখন আমার জোয়ান বয়স। জাতক-কাহিনীগুলি তখনও জানি না, মেজর গিল, গ্রীফিথ, লেডী হেরিংহ্যামের নামও শুনিনি। তিনকুলে আমার কেউ নেই, ফলে এখানেই পড়ে থাকতুম সারা বছর। ছবিগুলি দেখে আর সকলের মতো আমিও অবাক হয়েছিলুম প্রথমটায়। তারপর সহকর্মীদের মুখে একে একে শুনলুম জাতকের কাহিনীগুলি। আগে চিত্রের চরিত্রগুলিকে যে চোখে দেখতুম, এর পর থেকে অন্য চোখে ওদের দেখতে শুরু করলুম। ওদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ভাগ নিতে শুরু করি সেই সময় থেকেই। প্রতিটি চিত্রের হাতী, বাঘ, হরিণ, রাজহংস, সাপ, পাহাড়, নদী—প্রতিটি অপ্সরী, কিন্নর, গন্ধর্ব—জাতক-বর্ণিত নরনারীর সঙ্গে আমার মিতালি হল। ওদের ভালবেসে ফেলি ক্রমে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালো লাগত। সরকারী কাজের অবকাশে ওদের ছবি আঁকতে শুরু করি। পাতার পরে পাতা, খাতার পরে খাতা ভরে গেল ছবিতে। সবই পেন্‌সিল স্কেচ। একটা মানুষের জীবন তো বড় কম নয়, শেষে আর কপি করবার উন্মুক্ত নূতন ছবি পাই না। ঘুরে ঘুরে বেড়াই নূতন ছবির সন্ধানে।

এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ব্যাখ্যা আমি আজও দিতে পারি না। অনেকদিন আগেকার কথা, তবু সেদিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। সেটা ঘোর বর্ষাকাল। সেদিন একটিও যাত্রী আসেনি। আমার সহকর্মীরা কেউই আসেনি গুহা-মন্দিরে। সকাল থেকে বর্ষণ হচ্ছে ক্রমাগত। তবু নেশার ঝোঁকে স্কেচ-বই বগলে আমি এসেছিলাম গুহায়। হঠাৎ প্রচণ্ড বর্ষণ সুরু হওয়ায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে আশ্রয় নিলাম দশ নম্বর গুহা-মন্দিরে। বসে আছি তো বসেই আছি, বৃষ্টি থামার নাম নেই, শেষে ক্লান্ত হয়ে পাথরের মেজেতে শুয়ে পড়ি। এ গুহায় কোন ছবি নেই। চারদিকের দেওয়াল জুড়ে শুধু আঁকিবুঁকি। গত দেড়-দুশ' বছর ধরে নানান্ জাতের মানুষ নানান্ ভাষায় রেখে গেছে তাদের অপকীর্তির স্বাক্ষর। ক্রমে ঘুমিয়ে পড়ি। নিশ্চয় দীর্ঘ সময় ঘুমিয়েছি আমি—ঘুম ভাঙল একেবারে পড়ন্ত বেলায়। না, ঘুম ভাঙল বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না। হয়তো ঘুম আমার সত্যিই ভাঙেনি—আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, ঘুম ভেঙে চম্‌কে উঠে বসেছি। ঘুমের ভিতর স্বপ্নই হ'ক, অথবা জাগরণেই হ'ক, দেখলাম আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে—বর্ষার জলে উপলমুখর কলনাদিনী বাগোড়া অনর্গল প্রলাপ বকে চলেছে। এদিকে সূর্যগবাক্ষের পথে বাঁকা হয়ে গুহায় প্রবেশ করেছে এক ঝলক রোদ—পূবের দেওয়ালে পড়েছে সেই সোনালী আলো। হঠাৎ নজরে পড়ল, আমার সম্মুখে গুহার প্রাচীরের যে অংশটা অস্তসূর্যের স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেখানে সমস্ত প্রাচীর জুড়ে একটা বৃহদায়তন চিত্রাবলী। স্তম্ভিত হয়ে যাই আমি ;—কী আশ্চর্য, এ ছবি তো কই আগে কখনও দেখিনি। শুধু তাই

নয়, রঙে আর রেখায় এমন উজ্জ্বল ছবি তো অজন্তার কোথাও নজরে পড়েনি আমার। স্তব্ধবিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমি তাকিয়ে দেখতে থাকি সেই চিত্রটিকে, অদ্ভুত সেই প্যানেলটি...বড় বড় হস্তিযূথের অরণ্য আবাস...রাজসভা...মূর্চ্ছাতুরা রানী...রানীর এলায়িত তনুকে ধরে আছেন রাজা...পার্শ্বচর...কিঙ্কর...সভামণ্ডপ! তন্ময় হয়ে দেখতে থাকি চিত্রগুলি। আমার চোখে যেন পলক পড়ে না। ক্রমে তিল তিল করে অপসারিত হল অস্তসূর্যের শেষ আলোকরশ্মি। একেবারে নিভে গেল সন্ধ্যায়। দিগন্ত-জোড়া অন্ধকারে ঢেকে গেল বাগোড়া উপত্যকা।

ঠিক সেই সময়েই তন্ময় ভাবটা কেটে গেল আমার। যেন বাস্তবজগতে ফিরে এলাম ফের। অথবা বলতে পারেন ঠিক তখন স্বপ্নদর্শন শেষ হল আমার। মোট কথা, বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ামাত্র নজরে পড়ল, গুহার ভিতরটা সম্পূর্ণ অন্ধকারের গর্ভে বিলীন। গুহামুখ থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, আকাশে ফুটে উঠেছে সপ্তর্ষির চিরন্তন জিজ্ঞাসা। পায়ে পায়ে চলে আসি নিজের ডেরায়। আচ্ছন্ন ভাবটা তখনও আছে কিন্তু। বাসায় ফিরে এসেই ফের বার করি স্কেচ-বই। গুহায় দেখা ছবিটি তখনও স্পষ্ট মনে আছে আমার। খাড়া করলুম সেখানা আমার ছবির খাতায় সারারাত জেগে।

পরদিন সকালে সহকর্মী বন্ধুকে সেখানি দেখাতে সে বলে—এখন থেকে কি অজন্তা-স্টাইলে এমন মন-গড়া ছবিই আঁকবে?

আমি বলি—মন-গড়া ছবি নয় ভাই, এ ছবি দশ নম্বর গুহায় দেখে এঁকেছি।

বন্ধু হো হো করে হেসে উঠে বলে—মায়ের কাছে মাসীর গল্প? দশ নম্বর গুহা আমি চিনি না?

ওর সেই অট্টহাসে যেন অভিজ্ঞান ফিরে আসে আমার। তাই তো! এ ছবি আমি কাল কেমন করে দেখলুম? বছর দশেক আছি অজন্তায়—দশ নম্বরে যে কোন ছবি নেই তা আমার চেয়ে আর কে বেশী জানে? তাহলে?

তখনই দৌড়ালুম দশ নম্বর গুহার দিকে। আশ্চর্য! সমস্ত দেওয়াল জুড়ে শুধু সারি সারি স্বাক্ষর! আঁকিবুঁকি! দেবনাগরি, ইংরাজি, মারাঠি, ওড়িয়া। আমি কি তাহলে স্বপ্ন দেখেছি কাল? এত স্পষ্ট? বসে রইলুম সেখানে। সমস্ত দিন। সে দিনটি ছিল মেঘমুক্ত হাস্যকরোজ্জ্বল। যেন আমার দুর্দশা দেখে বৃষ্টি-ধোওয়া গাছের পাতাগুলি ঝিক্‌মিক্ করে হাসছে! পড়ন্ত বেলায় ঠিক তেমনি করে সূর্যগবাক্ষের পথে বাঁকা হয়ে গুহা-মন্দিরে প্রবেশ করল অস্তসূর্যের কৌতূহল ; কিন্তু যেন আমাকে দেখে থমকে গেল। যেন সচেতন আমাকে দেখে প্রথামাফিক সে কর্তব্যকর্ম করে গেল শুধু—উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পূর্বপ্রাচীর। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করছে কিন্তু সেই আঁকিবুকি ছাড়া কিছুই দেখতে পেলুম না। নিজের পাগলামিতে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠি ক্রমশঃ। তবু উঠে যেতে পারি না। ক্রমে তিল তিল করে সরে গেল সূর্যের শেষ আলো। মানুষের অত্যাচারে ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত মুখে পূর্বপ্রাচীর অন্ধকারের যবনিকা টেনে দিল।

মোহগ্রস্থের মতো ফিরে এলুম অস্নাত অভুক্ত একটি দিন ঐ গুহার ভিতর ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটিয়ে। পরদিন, তার পরদিন—কিন্তু না, সে চিত্রটিকে আর দেখতে পেলুম না একবারও। মনকে বোঝাই স্বপ্নই দেখছিলুম তাহলে।

এই ধারণা নিয়েই খুশী হয়ে থাকতুম আমি ; কিন্তু একটা ঘটনায় আবার গুলিয়ে গেল সব। প্রায় বছরখানেক পরের কথা। আর্কিওলজিকাল অফিস থেকে বড়সাহেব এসেছেন কাজ পরিদর্শনে। আমাকে খুব স্নেহ করতেন ; তিনি বলেন—কই ইসমাইল, কি কি নতুন ছবি আঁকলে ইতিমধ্যে? তাঁকে দেখাই আমার স্কেচ-বই। সেই ছবিখানি তাঁকে দেখাতেই বলেন—মেজর গিলের স্কেচ কোথায় পেলে হে?

আমি বলি—মেজর গিল কে?

সাহেব হেসে বলেন—যাঁর ছবি দেখে নকল করেছ এখানা।

আমি অবাক হয়ে বলি—এখানা কিসের ছবি?

—দশ নম্বর গুহার পূর্বপ্রাচীরে ষড়দন্ত-জাতকের ছবি। প্রায় একশ' বছর আগে এ ছবি অক্ষত অবস্থায় দেখেছিলেন মেজর গিল, কপি করেছিলেন তিনি। অফিসের আলমারি থেকে একটি প্রাচীন এ্যালবাম বার করে ছবিখানি দেখালেন আমাকে! স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি! কি আশ্চর্য! যে ছবি আমি এঁকেছি, হুবহু সেই ছবি।

আমি কাউকে কিছু বলেনি! জানতুম, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। ভাববে চালবাজি। ভাববে, মেজর গিলের ছবি দেখে নকল করে মিছে কথা বলছি আমি। কিন্তু কেমন যেন একটা নেশায় পেয়ে বসল আমাকে। মনে হল, অজন্তা গুহার এ চিত্রগুলি তো শুধু রঙ আর রেখায় আঁকা নয়—এ যে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলশ্রুতি। বংশানুক্রমিকভাবে বৌদ্ধ শ্রমণের দল ধ্যানের মন্ত্রে এদের পেয়েছিলেন—ধ্যানের জগতে এরা অবিনশ্বর। ধ্যানের জগতে খুঁজলে তাদের দেখা পাওয়া যায়। স্বপ্ন আমি দেখিনি—সেদিন কোন্ মন্ত্রে জানি না আমি সূক্ষ্মশরীরে উপনীত হয়েছিলাম সহস্রাব্দীর ওপারে কোন একটি কালে! কয়েকটি খণ্ড-মুহূর্তের জন্য আমার চৈতন্যময় সত্ত্বা উপস্থিত হতে পেরেছিল সেই অতীত যুগে—প্রত্যক্ষ করেছিল রঙে ও রেখায় সমুজ্জ্বল সদ্য-সমাপ্ত সেই ষড়দন্ত-জাতকের চিত্রটিকে! ধর্মে আমি মুসলমান—মূর্তিপূজায় আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু গৌতমবুদ্ধ যে একজন মহামানব ছিলেন, এ-কথা তো মানি। আন্তরিক শ্রদ্ধা করি অজন্তার শিল্পীকে। শিল্পীর কি জাত আছে? বিধর্মী বলে কি আমাকে কৃপা করা হবে না?

তাই যদি হবে, তাহলে সেই অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত সান্ধ্য মুহূর্তে সহস্রাব্দীর যবনিকা কেন সরে গেল আমার দৃষ্টির সামনে থেকে?

অদ্ভুত এক পাগলামিতে পেয়ে বসল আমাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি বসে থাকি শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে। মনে মনে বলতুম—হে অজ্ঞাতশক্তি, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে দাও এই মহাকালের যবনিকা, আমাকে দেখতে দাও সেই হাজার বছর আগেকার চিত্র-সম্ভার! সহস্রাব্দীর ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত এ ধ্বংসাবশেষ নয়, আমাকে দেখাও রঙে ও রেখায় সমুজ্জ্বল সেই সদ্য-সমাপ্ত চিত্রাবলী। এই সময়েই বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি যোগাড় করে পড়তে সুরু করি। মিস্টিসিজম্ সম্বন্ধে যেখানে যা-কিছু লেখা হয়েছে খুঁজে পড়ি। ক্ষুধিতপাষাণ গল্পটিও এই সময়ে পড়ি। রাত্রে বই পড়ি, আর দিনের বেলা বসে থাকি শূন্য প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে। দিন আসে, দিন যায়—কিন্তু আর একটি দিনের তরেও এমন কোন ঘটনা ঘটল না। আহার নাই, নিদ্রা নাই, শরীরের প্রতি যত্ন নাই—পাগলের মতো আমি মগ্ন হয়ে রইলুম আমার সাধনায়। সহকর্মীরা এই সময়েই ধরে নিল আমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে।

জানি এ আমার পাগলামি, তবু একদিন মনে হল কৃষ্ণা রাজকুমারীর চিত্রটিতে যেন অতি সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেন কেউ আমার অলক্ষ্যে ওর ওষ্ঠাপ্রান্তে, চোখের কোণায় দু-একটা তুলির সূক্ষ্ম টান দিয়ে গেছে। বিরহিণী কৃষ্ণা রাজকুমারীকে এতদিন দেখেছি বিষাদের প্রতিমারূপে—এখন মনে হল, তার দৃষ্টিতে লেগেছে কৌতুকের ছিটে, ওষ্ঠপ্রান্তে যেন ফুটে উঠেছে অস্ফুট হাস্যরেখা। ও যেন এতদিনে একজন দোসর খুঁজে পেয়েছে। সেই দোসরও যেন এই অন্ধগুহায় ওরই মতো কিসের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে চলেছে।

সহকর্মী বন্ধুকে বলি—কৃষ্ণা রাজকুমারীর আলেখ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ ইতিমধ্যে?

বন্ধু রাগ করে বলে—হ্যাঁ। রাজকুমারী নয়, রাজকুমারের। তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

তারপর আর একদিন। সেদিনও আকাশ জুড়ে নেমেছে পাহাড়ী বর্ষা। যাত্রীরা কেউ আসেনি। সহকর্মীরা কেউ বার হয়নি ঘর ছেড়ে। পূর্বরাত্রে আমার জ্বর হয়েছিল, তবু

নেশার ঝোঁকে আমি এসে হাজির হলুম গুহা-মন্দিরে। প্রথম গুহাটিতে পোঁছাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি একেবারে। ছুটির দিন, কাজ নেই। ঘরে বসে আড্ডা দেওয়ার চেয়ে এই নির্জন গুহাই আমার ভালো। দেখছি চারদিকে চেয়ে চেয়ে—বুদ্ধের প্রলোভন চিত্র, বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, চম্পেয়্য-জাতক, যুযুধান ষণ্ডদ্বয়—দেখলুম চেয়ে কৃষ্ণা রাজকুমারীর দিকেও। যে যেমন ছিল সে তেমনি আছে—ভোরের কুঁকড়ো ডেকে ওঠায় বন্দী হয়ে পড়েছে সবাই। দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে ছবিগুলো—শুধু ঐ কৃষ্ণা রাজকুমারীর ওষ্ঠপ্রান্তে যেন মনে হয় এসে লেগেছে অতি ক্ষীণ একটা কৌতুকের আভাস। না, ওষ্ঠ-প্রান্তেও নয়—মেদিনী-নিবন্ধ দৃষ্টির প্রান্তে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল যখন তখন গভীর রাত। বাহিরের বর্ষণ থেমে গেছে, ছেঁড়া মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বাগোড়া উপত্যকা। অত্যন্ত দুর্বল লাগছে শরীর। উঠে বসব এমন শক্তি নেই। স্থির করি, বাকি রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দেব। আবার ঘুমিয়ে পড়ি আমি।

এই পর্যন্ত বলে মীর্জা ইসমাইল থামলেন।

আমি বলি—তারপর?

—বলছি ; কিন্তু কিভাবে বললে আপনাকে বোঝাতে পারব তা বুঝে উঠতে পারছি না।

আমি অপেক্ষা করতে থাকি। একটু চুপ করে থেকে বললেন—না, স্বপ্নই দেখেছিলুম।

আবার উনি চুপ করে যেতে বলি—কি স্বপ্ন?

আমার প্রশ্ন ওঁর কানে গেল না। গল্পের সূত্র তুলে নিয়ে ফের বলতে থাকেন—সমস্ত দিন এ গুহায় বসে বসে পেয়েছি ভিজে-মাটির সঙ্গে মেশানো বন-তুলসী আর মৌরীফুলের গন্ধ। মনে হল, এবার যেন তার সঙ্গে এসে মিশেছে ধূপ-ধুনো-অগুরু-চন্দনের সৌগন্ধ। মনে হল, দশ নম্বর গুহার দিক থেকে ভেসে আসছে একটি ক্ষীণ সমবেত কণ্ঠের প্রার্থনা সংগীত। বেশ বুঝতে পারছি প্রবল জ্বর এসেছে আমার। মাথাটা অত্যন্ত ভার, সর্বাঙ্গে বেদনা—কিন্তু সে বোধকে অতিক্রম করে অনুভব করছি কী যেন একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটছে আমার। জ্বরতপ্ত ভূমিশয্যালীন এ দেহটি ত্যাগ করে আমি যেন অতীতের যুগে ফিরে চলেছি উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের মতো। ধীরে ধীরে চোখ মেলে বসি।

গুহার ভিতর দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছে! তারই আলোয় প্রতিফলিত হয়েছে গুহাচিত্র-গুলি। সেগুলির দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি। সব যেন বদলে গেছে! কী আশ্চর্য! সব চিত্রই স্থির, নিষ্প্রাণ, অচল—কিন্তু তারা যেন পূর্ব মুহূর্তেই সব সচল ছিল! যেন, আমি যতক্ষণ ঘুমাচ্ছিলাম ততক্ষণ ওরা সজীব হয়ে পড়েছিল, যে মুহূর্তটিকে চোখ মেলে তাকিয়েছি আমি, অমনি যে যেমন ছিল আবার স্থির হয়ে গেছে। বুদ্ধের প্রলোভন চিত্রে দেখছি—মারের তিন কন্যা লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফিরে যাচ্ছে—শিবি-জাতকে মহারাজ শিবি তুলাদণ্ডটি নামিয়ে রেখেছেন ভূতলে, প্রণাম করছেন তিনি ছদ্মবেশী ধর্মরাজকে। ষণ্ডদ্বয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে, আবার খোস মেজাজে গায়ে-গা দিয়ে শুয়ে আছে ওরা স্তম্ভশীর্ষে! আমার ঠিক সম্মুখে সেই কৃষ্ণা রাজকুমারীর অনবদ্য চিত্রটি—কিন্তু তার সম্মুখবর্তিনী সেই অর্ঘ্য-থালা-হাতে সহচরীটি অন্তর্হিতা। সেখানে দেখছি এক রাজপুত্রের চিত্র। তার মাথায় হীরা-পান্না-পোখরাজের মুকুট, তার কণ্ঠে মুক্তার শতনরী। কৃষ্ণা রাজ-কুমারীর মূর্তি আর বিষাদখিন্ন নয়, পরমপ্রাপ্তির আনন্দে প্রোজ্জ্বল ; তাঁর দৃষ্টি আর মেদিনী-নিবন্ধ নয়, সলজ্জে তিনি তাকিয়ে আছেন ঐ রাজপুত্রের দিকে। রাজপুত্রের মুখাকৃতি মনে হল আমার অত্যন্ত পরিচিত। কোন্ গুহার কোন্ প্রাচীরের কোন্ মুখাকৃতির সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে মনে করতে পারছি না, অথচ মনে হচ্ছে এ আমার অত্যন্ত চেনা, অত্যন্ত পরিচিত।

হঠাৎ অনুভব করি গুহায় আমি একা নই। গুহার অপরপ্রান্তে কে একজন আমার দিকে

পিছন ফিরে ক্ষীণ দীপালোকে কি করছেন। এগিয়ে গেলুম তাঁর দিকে। স্পষ্ট কিছুই দেখতে পেলুম না, তবু মনে হল, আমার দিকে পিছন ফিরে দেওয়ালে তুলির টান দিচ্ছিলেন যিনি তাঁর পরিধানে গৈরিক কাষায়, তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, তাঁর দেহ থেকে যেন একটা অপার্থিব জ্যোতিঃ বের হচ্ছে।

পদশব্দে যেন তিনি পিছন ফিরে তাকালেন, যেন ধ্যানভগ্ন হল তাঁর। জহরত-গোলা বাটি থেকে খানিকটা তরল রঙ পড়ে গেল মাটিতে।

আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম তাঁকে। নীরবে তিনি যেন একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার মাথার উপর, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে।

বলি—প্রভু, আপনাকে চিনেছি। আপনাকে প্রণাম!

স্মিত হাসলেন তিনি।

কি জানি কেন তাঁকে দেখেই আমার মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই বিক্ষুব্ধ প্রশ্নটা। বললুম—আপনি আমাকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন প্রভু, তবু বলব, আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে!

শান্ত সমাহিত দৃষ্টিতে কৌতূহল ফুটে ওঠে।

আমি বলতে থাকি—সকলের পরিণতি আপনি দেখিয়েছেন, কিন্তু আমার যশোধরা মায়ের শেষ কথাটা বলতেই বা কেন ভুল হল আপনার? এমন মহিমময়ী মাতৃমূর্তির উপসংহার নেই কেন অজন্তায়? তিনি কি ক্ষোভে দুঃখে আত্মহত্যা করেছিলেন? তাই যদি করে থাকেন তা সে-কথাই বা বলে গেলেন না কেন আপনি?

একটি হাত সম্মুখে প্রসারিত করে দিয়ে তিনি আমাকে থামতে বললেন। ক্ষান্ত হলুম আমি। উনি উঠে দাঁড়ালেন, হাতের ইঙ্গিতে তিনি আমাকে আদেশ করলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। জ্বরের উত্তাপে আমার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে, তবু অসীম আগ্রহে আমি টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম তাঁর পিছন পিছন। বাহিরে তখন আবার ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি নেমেছে। গাঢ় কালিমায় ঢেকে গেছে দিক দিগন্ত। অগ্রবর্তী পথপ্রদর্শককে আমি দেখতে পাচ্ছি না—তবু পদশব্দ লক্ষ্য করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁকে অনুসরণ করে চলেছি। মনে হচ্ছে কত মরুপ্রান্তর, নদনদী অতিক্রম করে যুগ-যুগান্তর ধরে চলেছি আমরা দুজন। যেন সে চলার আর শেষ নেই।

সহসা অগ্রবর্তী বৌদ্ধ শ্রমণ স্তব্ধ হলেন। আমিও দাঁড়িয়ে পড়ি। এ কোথায় এসেছি? সহসা আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ চমক দিল, সেই ক্ষণপ্রভার আলোয় দেখলুম আমরা এসে দাঁড়িয়ে আছি ঊনবিংশতি গুহা-মন্দিরের প্রবেশদ্বারে। বিদ্যুতের আলোয় দেখলুম অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন মহাশিল্পী—তিনি তাঁর দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে প্রবেশ-তোরণের একটি বিশেষ স্থান নির্দেশ করছেন। কী আছে ওখানে? পায়ে পায়ে আমি এগিয়ে গেলুম সেদিকে; কিন্তু ঘন মেঘে আঁধার হয়ে গেছে দিক দিগন্ত। নীরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। ঠিক তখনই সশব্দে বজ্রপাত হল কোথাও। আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ি পাষাণ বেদীতে। মীর্জা ইসমাইল আবার থামলেন।

আমি বলি—তারপর?

—তারপর আর কিছু নেই। বন্ধুদের কাছে শুনেছি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পরদিন সকালে তারা আমাকে আবিষ্কার করেছিল ঊনিশ নম্বর গুহার সামনে। এ-কথা জেনেছিলাম দু মাস পরে, আওরঙ্গবাদ হাসপাতালে। ডবল নিমুনিয়া হয়েছিল আমার। বাঁচব এ আশা ছিল না।

বলি—অদ্ভুত গল্প তো?

ইসমাইল বলেন—হ্যাঁ, নিছক আষাঢ়ে গল্প। কিন্তু বাবুজি, ফর্দাপুরের গাঁওবুড়োর মতো যদি আমি বলি, এ কোন গল্প নয়, এ আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা?

আমি তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলি—সে তো বটেই। আপনি সত্যই স্বপ্ন দেখেছিলেন সে রাত্রে ; তবু বলব স্বপ্নটা বড় অদ্ভুত!

—কিন্তু পরদিন আমাকে ওরা অতদূরে ঐ ঊনিশ নম্বরের সামনে দেখতে পেল কি করে? সেটা তো আর স্বপ্ন নয়?

—সেটা কিছু অসম্ভব নয়। ঘুমের ঘোরে মানুষের এরকম অনেকদূর হেঁটে যাওয়ার নজির আছে। তাকে বলে—

বাধা দিয়ে উনি বলেন—জানি, সোমনাম্‌বলিসম্‌।

সংক্ষিপ্ত বিদায় জানাতে গেলুম ইসমাইল সাহেবকে।

হেসে উনি বলেন, বাবুজি, গল্পটা আমার শেষ হয়েছিল, বাকি ছিল সামান্য উপসংহার। কিন্তু তা আমি বলব না। শুধু এটুকু বলব, সুস্থ হয়ে আমি আবার এসে দাঁড়িয়েছিলুম সেই ঊনিশ নম্বর গুহার প্রবেশপথে। কী দেখাতে চেয়েছিলেন সেই মহান অজন্তা শিল্পী? নির্দেশিত মূর্তিটি খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি আমার। স্বপ্নই বলুন, আর গল্পই বলুন, আমার এতদিনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলুম ঠিকই।

কৌতূহলী হয়ে বলি—কী দেখেছিলেন বলুন তো?

উনি জবাব দিলেন না। যুক্তকরে নমস্কার করে বৃদ্ধ ইসমাইল ধীরে ধীরে চলে গেলেন। নিতান্ত খেয়ালী মানুষ!

আমিও হন্‌হনিয়ে চলে আসি ঊনিশ নম্বর গুহার প্রবেশপথে। নির্দেশিত মূর্তিটি খুঁজে বার করতে আমারও অসুবিধা হল না। প্রবেশপথের ডানদিকে (চিত্র—৭১-র বামপ্রান্তের আঁকা মূর্তিটি) দেখলুম সেই রিলিফ কাজ। বুদ্ধদেব—গোপা ও রাহুল। আশ্চর্য, এ মূর্তিটির যে বিশেষ ব্যঞ্জনা তা তো আগে লক্ষ্য করিনি!

পরিকল্পনা ঠিক সেই সপ্তদশ গুহার বিশ্ব-বন্দিত ফ্রেস্কোটির (চিত্র—৫৭) অনুরূপ। প্রভেদ এই যে, সেটি প্রাচীরচিত্র, এটি পাথরের রিলিফ কাজ। আরও সামান্য একটি প্রভেদ আছে—সে পার্থক্য এত ক্ষীণ যে মীর্জা ইসমাইল সাহেবের রহস্য-ঘন ইঙ্গিতটুকু না জানা থাকলে নজরেই পড়ত না। মহাভিক্ষুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন যশোধরা আর রাহুল। ইতিপূর্বে দেখেছিলাম মা যশোধরার অন্তরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মূর্ত হয়েছিল তাঁর দুটি হাতের করাঙ্গুলির মুদ্রায় (চিত্র—৫৮)। এবার দেখছি, সন্তান সম্বন্ধে জননীর মনে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। রাহুলকে তিনি আর স্পর্শ করে নেই। তাঁর দুটি হাত যুক্ত হয়েছে নমস্কারের ভঙ্গিতে। গৌতমবুদ্ধ তাঁর কাছে আর গৃহত্যাগী যুবরাজ নন—তিনি মহা-কারুণিক, মহাসত্ত্ব! এবার কান পাতলে শুনতে পাব ভিক্ষুণীর প্রার্থনামন্ত্র—"মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সব্বপাণিনং পূরত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমম্‌॥"

মা যশোধরার হাতে এবার দেখছি একটি সন্ন্যাসদণ্ড। ভিক্ষুণী হয়েছেন তিনি। দণ্ডের উপরে ধর্মের একটি নিশান। সন্ন্যাসদণ্ডের শীর্ষে ত্রিশূলাকৃতি তিনটি ফলক। না, শৈব ত্রিশূল নয়। বৌদ্ধ ধর্মানুসারে একে বলে ত্রিরত্ন। মুক্ত নীলাকাশের দিকে নির্দেশ করে ত্রিশূলের তিনটি ফলা জানিয়ে দিচ্ছে সিদ্ধার্থ-জায়া যশোধরার জীবনের উপসংহার—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

* * * *

ফেরার পথে ভাবছিলুম অজন্তার অনেক-কিছুই দেখা হল, আবার অনেক-কিছুই রইল অজানা-অদেখা। মীর্জা ইসমাইলের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন স্বপ্নে ; কিন্তু আমার মনে এ স্বল্পদিনে যে প্রশ্নটি জেগেছে তার জবাব আমি খুঁজে পাইনি। কোন্‌ চিত্রটির প্রেমে বৃদ্ধ মীর্জা ইসমাইল পড়ে আছেন এই অজন্তাগুহায়। পাগলা মেহেরালির মতো আট্‌কা পড়েছেন পাথরের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে! সে কি ঐ মদালসা কৃষ্ণা অপ্সরা? সে কি সিবলী, সুমনা, নাগবালা ইরান্দাতী, প্রসাধনরতা রাজকন্যা, নিরাবরণা

স্নানার্থিনী, অনিন্দ্যকান্তি মাদ্রী, মরণাহতা জনপদকল্যাণী? না কি সে ঐ প্রায় মুছে-যাওয়া কৃষ্ণা রাজকুমারী? কৃষ্ণা অপ্সরাকে দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন—মোহময়ী, মদালসা; মাদ্রীর প্রসঙ্গে অনুরোধ করেছিলেন আমার গ্রন্থে যেন জাতককারের অবহেলার প্রতিকার করি; সীবলীর কথায় জানিয়েছিলেন—রূপ ছিল ঐ মন্দভাগিনীর অভিশাপ। কিন্তু প্রতীক্ষারতা কৃষ্ণা রাজকুমারীর প্রসঙ্গে তিনি কিছু বলেছিলেন কি? জ্বরের ঘোরে তিনি ঐ কৃষ্ণা রাজকুমারীর সম্মুখে দেখেছিলেন একটি রাজকুমারকে। বলেছিলেন, রাজপুত্রের মুখাকৃতি ওঁর অতি পরিচিত মনে হয়েছিল। কিন্তু কোন্ প্রাচীরের কোন্ চিত্রটির সঙ্গে রাজপুত্রের সাদৃশ্য আছে তা তিনি মনে করতে পারেননি। যে কথাটা তিনি স্বীকার করেননি সেটা কি এই যে, ঐ রাজপুত্রের অতি-পরিচিত মুখচ্ছবি উনি অজন্তাগুহার কোন প্রাচীরে দেখেননি, দেখেছেন দর্পণে? জানি না।

অজন্তার অনেক-কিছুই অনুক্ত, অজ্ঞাত, রহস্যঘন। এটুকুও অজানা রয়ে গেল আমার কাছে। তা থাক। তবু তৃপ্ত আমি। এ কয়টি দিন অজানা অচেনা অতীত যুগের বৌদ্ধ শ্রমণদের সঙ্গে হাসি-অশ্রুর এ মহাসঙ্গমে হেসেছি আর কেঁদেছি। রসের অমৃতসমুদ্রে অবগাহনস্নান করেছি পরমানন্দে। যাবার বেলায় তাই খুশী মনেই বলে যাব—

এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

হে অজন্তা অপরূপা! তোমাকে প্রণাম।

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

কালোকালো
কিশোর অমনিবাস
অরিগামি
নাকউঁচু
ডিজনেল্যান্ড
হাতি আর হাতি

সদ্যসাক্ষর সাহিত্য

গ্রাম্যবাস্তু
পরিকল্পিত পরিবার
দর্শেমিলি

না-মানুষ-আশ্রয়ী

গজমুক্তা
তিমি-তিমিঙ্গিল
না-মানুষের পাঁচালী
রাস্কেল
না-মানুষী বিশ্বকোষ

বিজ্ঞান-আশ্রয়ী

বিশ্বাসঘাতক
হে হংসবলাকা
অবাক পৃথিবী
নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা
আজি হতে শতবর্ষ পরে

চিত্রশিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য

কারুতীর্থ কলিঙ্গ
ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন
লা-জবাব দেহ্লী—অপরূপা আগ্রা
রোদ্যাঁ
প্রবঞ্চক
IMMORTAL AJANTA

ভ্রমণ-সাহিত্য

দণ্ডকশবরী
পথের মহাপ্রস্থান
জাপান থেকে ফিরে

স্মৃতিচারণধর্মী

পঞ্চাশোর্ধ্বে
ষাট-একষট্টি

মনোবিজ্ঞান আশ্রয়ী

অন্তর্লীনা
তানজের স্বপ্ন
মনামী

গোয়েন্দা-কাহিনী

সোনার কাঁটা
মাছের কাঁটা
পথের কাঁটা
ঘড়ির কাঁটা
কুলের কাঁটা
উলের কাঁটা
অ-আ-ক-খুনের কাঁটা
সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা

প্রয়োগবিজ্ঞান/গবেষণা মূলক

বাস্তুবিজ্ঞান
নেতাজী রহস্য সন্ধানে
চীনভারত লঙমার্চ
গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা
গ্রামের বাড়ি
পয়োমুখম্

উদ্বাস্তু সমস্যা-আশ্রয়ী

বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প
বল্মীক
অরণ্যদণ্ডক

ইতিহাস-আশ্রয়ী

মহাকালের মন্দির
আনন্দ-স্বরূপিণী
লাড্লি-বেগম
হংসেশ্বরী
রূপমঞ্জরী

জীবনী-আশ্রয়ী

আমি নেতাজীকে দেখেছি
আমি রাসবিহারীকে দেখেছি
লিণ্ডবার্গ

দেবদাসী বিষয়ক

সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম
সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয়

সামাজিক-উপন্যাস

ব্রাত্য
মনামী
অলকনন্দা
সত্যকাম
নীলিমায় নীল
নাগচম্পা
পাষণ্ড পণ্ডিত
আবার যদি ইচ্ছা কর
অশ্লীলতার দায়ে
লালত্রিকোণ
প্যারাবোলা স্যার
মিলনান্তক
পুরবৈয়া
আচ্ছাদ্যবন্ধন
ছোঁবল
ছয়তানের ছাওয়াল




17.4.84

"অপূর্ব হইয়াছে। সম্ভব হইলে, অবলুপ্ত চিত্রগুলির রেখাময় অনুলিখন দিতে পারিলে গ্রন্থটির মূল্য আরও বাড়িবে।" **—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।**

"শ্রীনারায়ণ সান্যালের বইখানি পড়ে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেছি। এ ধরনের আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। একাধারে নির্দেশক, রসসাহিত্য এবং শিল্প-সমালোচনা সন্নিবেশিত হয়ে গ্রন্থখানি অনন্যসাধারণ রূপ নিয়েছে।" **—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।**

"বইটি ঝলমল করছে। এর জন্য আপনি অনেক খেটেছেন ; অনেক পড়েছেন ; কিন্তু এও বুঝতে পারছি, এর সম্যক মূল্য সাধারণ বাঙালী পাঠক-সমাজ আপনাকে দেবে না। ক্ষীর হজম করার শক্তি যে আর তাদের নেই—রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দল-বেঁধে 'ফুচকা' খেতে তারা অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি নেই। সস্তা হাততালি নাই বা পেলেন ;—বাঙলা-সাহিত্যের যে উপকার আপনি করলেন, তার মূল্য তাতে একতিলও কমবে না।"

—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)।

"লেখকের দেওয়া নামই বিদগ্ধ পাঠকসাধারণের অকপট মুগ্ধতা ধ্বনিত করে—এরকম গ্রন্থের দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। সেই বিরল-দৃষ্টান্তের একটি হিসাবে 'অপরূপা-অজন্তা' সত্যই অপরূপ! দুর্লভ নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরস রচনা-নৈপুণ্যের সমাহারে প্রায় কিংবদন্তী-কল্পনার অজন্তার এই প্রামাণ্য পরিচায়িকাটি স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি হয়ে উঠেছে।"

—প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র।

"আপনার সোনার কলম হ'ক! আর দীর্ঘজীবন।" **—সৈয়দ মুজতবা আলী** (শান্তিনিকেতন)।

"ত্রিশ বছর আগে অজন্তা দেখি ; ভাল বুঝতে পারিনি। আপনার বই পড়তে পড়তে মীর্জা ইসমাইলের মতো মানসনেত্রে স্বপ্নের ঘোরে বিস্মৃত-অতীতের স্মৃতি ভেসে উঠ্‌লো। মনে হচ্ছে বইটি নিয়ে আর একবার গেলে হত! কিন্তু এদিকে বাহাত্তর হ'ল। হয়তো আর হবে না। আপনার ঠিকানা জানিনা, আশাকরি প্রকাশক মশাই এ চিঠি পাঠিয়ে দেবেন।"

—ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল (জলপাইগুড়ি)।

"তুমি একজন এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু সেটাই তোমার আসল পরিচয় নয়। আসলে তুমি একজন নির্ভেজাল Krishnagarian! যার প্রধান বৈশিষ্ট্য a keen sense of humour ; গোপালভাঁড়ের স্থূল রসিকতা থেকে বীরবল ও দ্বিজেন্দ্রলালে যার বিকাশ। কিন্তু এ বইটি পড়তে পড়তে আমার সে ভুলও ভাঙ্‌লো ; তুমি আসলে সুন্দরের পূজারী!"

—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর)।

"নারায়ণ সান্যাল কথাসাহিত্যে যেমন দক্ষ তেমনি ভাল ছবি আঁকতে পারেন। বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প, দণ্ডকশবরী, সত্যকাম প্রভৃতি সুপরিচিত গ্রন্থের লেখকের পুরস্কৃত এই বইটি 'অপরূপা অজন্তা'। বইটির সমস্ত ছবি তাঁর নিজের আঁকা। অজন্তা গুহায় ঘুরে ঘুরে তিনি অসংখ্য চিত্রের অনুলিখন করেছেন, সেই সঙ্গে ছবিগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-সব জাতকের কাহিনী—তার বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন গুহায় কোথায় কোন্ ছবির অবস্থান—তাও তিনি এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।" **—আনন্দবাজার।**

"নারায়ণ সান্যাল আপন অভিজ্ঞতা-নির্ভর মানবতাবোধে উজ্জ্বল কাহিনী লেখার জন্য বাঙলা-সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত।...ছবি আঁকাতেও তাঁর হাত আছে। 'অপরূপা অজন্তা'য় তাঁর সাহিত্য ও চিত্রকলা একসঙ্গে মিলেছে। ভাষা ও লেখায় অজন্তা আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"

—অমৃত।